“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

পরিচয়   বর্ষ ৩৮ ॥ সংখ্যা ১

সূচিপত্র

১৩৭৫ শ্রাবণ/আগস্ট ১৯৬৮

কেন সমাজতন্ত্র ॥ ১ ॥ আলবার্ট আইনস্টাইন

সার্ত্রের সাম্প্রতিক দর্শনচিন্তা ॥ ১০ ॥ মৃণালকান্তি ভদ্র

যে কোনও লোকের গল্প ॥ ৩৪ ॥ কার্তিক লাহিড়ী

চাল-চিত্র ॥ ৪২ ॥ চিত্ত ভট্টাচার্য

দরজা ছেড়ে দাঁড়াও ॥ ৫৬ ॥ প্রভাকর মাঝি

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা ॥ ৫৭ ॥ মুকুল গুহ

কয়েকটা অনিবার্য কারণে ॥ ৫৮ ॥ তুলসী মুখোপাধ্যায়

বাঁকের চিন্তা ॥ ৬০ ॥ সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রেন ॥ ৬১ ॥ অনন্ত দাশ

অবিশ্বাস্য তেলাকুচো লতা ॥ ৬২ ॥ বাসুদেব দেব

ছুঁতে হবে মধ্যরাত্রে সূর্য ॥ ৬৩ ॥ প্রভাত চৌধুরী

সীমানা খুঁজি ॥ ৬৪ ॥ কাননকুমার ভৌমিক

প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে ॥ ৬৫ ॥ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

ডোরাকাটার অভিসারে ॥ ৮৩ ॥ শের জঙ্গ

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ : বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ-বিজ্ঞানী ল্যান্ডাউ/অটো হান ॥ ১০১ ॥ শঙ্কর চক্রবর্তী

চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গ : বাঙলা চলচ্চিত্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক সঙ্কট ॥ ১০৭ ॥ ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

নাট্য-প্রসঙ্গ : নাটক-বিষয়ে কয়েকটি কথা ॥ ১১২ ॥ উমানাথ ভট্টাচার্য

সঙ্গীত-প্রসঙ্গ : রুচিগঠনের পক্ষে ॥ ১১৮ ॥ সুভাষ সেন

পুস্তক-পরিচয় : নাট্যশাস্ত্র ॥ ১২০ ॥ আর. ভাতোয়ান
বিবিধ প্রসঙ্গ : পাক-সোভিয়েত অস্ত্রবিক্রয় চুক্তি ॥ ১২৩ ॥ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
প্লাবিতের আবেদন ॥ ১২৭ ॥ দেবেন দাশ/শ্রীনগরের নির্দেশ ও কংগ্রেস
নেতৃবৃন্দ ॥ ১৩৪ ॥ শান্তিময় রায়/সংবাদপত্রে ধর্মঘট ॥ ১৩৯ ॥ ধনঞ্জয় দাশ

প্রচ্ছদশিল্পী :

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

উপদেষ্টামণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, চিন্মোহন সেহানবীশ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ সান্যাল

পরিচয় (প্রা) লিঃ-র পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

কেন সমাজতন্ত্র

আলবার্ট আইনস্টাইন

আমার বিশ্বাস, অর্থনীতি ও সামাজিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন এমন ব্যক্তির পক্ষে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে যাওয়া নানাকারণেই ঠিক নয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা প্রথমে বিবেচনা করা যাক। মেথোডলজির (methodological) দিক থেকে, মনে হয়, জ্যোতির্বিদ্যা ও অর্থনীতির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই; উভয় ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিকগণ সন্নিবিষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র আবিষ্কারের জন্য সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য এমন কতগুলো সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন, যাতে বিষয়টা যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু পদ্ধতিগত পার্থক্য থেকেই যায়। পর্যবেক্ষিত অর্থনৈতিক ঘটনাবলী প্রায়শই এমন কতগুলো কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত, যেগুলোর পৃথক পৃথক মূল্যায়ন প্রায় অসম্ভব। এমন ক্ষেত্রে অর্থনীতির সাধারণ সূত্রাবলীর আবিষ্কার কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, মানব-ইতিহাসের তথাকথিত সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকে যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তা একমাত্র অর্থনীতির দ্বারাই প্রভাবান্বিত এবং সীমিত নয়; বরং তার পিছনে নানাবিধ কারণই বহুল পরিমাণে বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইতিহাসোক্ত প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি, তাদের অস্তিত্বের জন্য বিজয়াভিযানের কাছেই ঋণী। বিজয়ীজাতিগুলো সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসেবে বিজিতদেশে আইন ও অর্থনীতিগতভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। গায়ের জোরেই তারা ভূমির উপর একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করে এবং স্ব-শ্রেণীর মধ্য থেকেই পুরোহিত নিযুক্ত করে। পুরোহিত সম্প্রদায়, শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের পথেই, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের একটা স্থায়ী রূপ দেন এবং তাঁরা কতগুলো মূল্যবোধ সৃষ্টি করেন; যার দ্বারা তৎকালীন সময় থেকেই সাধারণ

মানুষ নিজেদের অজ্ঞাতসারে সামাজিক আচার-আচরণ পরিচালনা করে আসছে।

কিন্তু বিগত দিনের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যই বলে দেয় যে, Thorstein Veblen বর্ণিত মানববিকাশের 'লুণ্ঠনজীবীস্তর'-কে আমরা কোথাও অতিক্রম করতে পারিনি। ঐ স্তরের পর্যবেক্ষণীয় অর্থনৈতিক ঘটনাবলী এবং তৎজাত সূত্রগুলো অন্যান্য স্তরে প্রয়োগযোগ্য নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমাজতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, মানববিকাশের লুণ্ঠনজীবীস্তরকে অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হওয়া। বর্তমান স্তরের অর্থনৈতিকজ্ঞান, ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে খুব কম-ই আলোকপাত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত সমাজতন্ত্র সামাজিক-নৈতিক লক্ষ্যের অভিমুখী। বিজ্ঞান চরম-লক্ষ্য সৃষ্টি করতে পারে না, এমন কি, মানুষের মধ্যে এই লক্ষ্যবোধ আরো কম সৃষ্টি করতে পারে—খুব বেশি হলে যা পারে, তা হল মানুষকে পথের সন্ধান দান, যে পথে অগ্রসর হয়ে তারা মোটামুটি কতগুলো লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে। উচ্চনৈতিক আদর্শসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই লক্ষ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারেন। যদি লক্ষ্যসমূহ মৃতজাত না হয়ে জীবন্ত ও তেজোসম্পন্ন হয়, তাহলে যে-সমস্ত মানুষ সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে নিজেদের প্রায় অজ্ঞাতসারেই নির্ধারণ ক'রে থাকে, তারা ঐ চরম লক্ষ্য-গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হতে পারে।

এইসব কারণে, মানবিক সমস্যার প্রশ্নে, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অতিরিক্ত মূল্যায়নে সদাসর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এবং একথাও মনে করবার কোনো হেতু নেই যে, সমাজ-সংগঠনের প্রশ্নাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরাই একমাত্র মতামত প্রকাশের অধিকারী।

বেশ কিছুদিন ধরে অগণিত মানুষ জোরের সংেই ঘোষণা ক'রে চলেছেন যে, অধুনা মানবসমাজ এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে এবং এর অস্তিত্ব গভীরভাবে বিপন্ন। এমতাবস্থায় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ব্যক্তি-মানুষ, তা সে ছোট-বড় যে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, সেই দল সম্পর্কে উদাসীন, এমন কি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আমার বক্তব্যের সমর্থনে এখানে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া যাক। বুদ্ধিমান ও প্রসন্নচিত্তের অধিকারী জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে আর-একটা যুদ্ধের বিপদ নিয়ে অধুনা আমি আলোচনা করেছি। আমার মতে—সে-যুদ্ধ মানবজাতির

অস্তিত্বকে সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন ক'রে তুলবে এবং আমি এ-বক্তব্যও প্রকাশ করেছি যে, কোনো অধি-জাতীয় সংগঠনই (Supra-national organization) একমাত্র এ-বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। এ-কথার পর আমার অতিথি অতি প্রসন্ন ও শান্তভাবে বললেন—"মানবজাতির অবলুপ্তির পথে আপনি গভীরভাবে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন কেন?"

আমি নিশ্চিত যে, এক শতক আগে পর্যন্ত এ-ধরনের হালকা উক্তি কেউ করতেন না। এ-উক্তি করেছেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি নিজের জীবনে ভারসাম্য আনয়নে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন এবং সাফল্য সম্পর্কে কম-বেশি কোনো আশাই আর পোষণ করেন না। বর্তমানকালে অগণিত মানুষ যে বেদনাময় নিঃসঙ্গতা আর নির্জনতার কবলে পড়ে যন্ত্রণা পাচ্ছে—এ হল তারই অভিব্যক্তি। এর কারণ কি? পরিত্রাণের পথই বা কি?

এসব প্রশ্ন তোলা সহজ, কিন্তু নিশ্চিত কোনো উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। যতদূর সম্ভব উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করব। তবে, এ-ব্যাপারে আমি খুবই সচেতন যে, আমাদের অনুভূতি ও প্রচেষ্টাগুলো পরস্পর-বিরোধী এবং অস্পষ্ট। সহজ-সরল ফরমুলার (formulas) মধ্যে ফেলে তাদের ব্যক্ত করা যায় না।

মানুষ একই সময়ে একক ও সামাজিক জীব। একক জীব হিসেবে মানুষ স্বীয় বাসনা পূরণে, সহজাত প্রবৃত্তির স্ফুরণে সক্রিয় এবং নিজের ও প্রিয়জনের অস্তিত্বরক্ষায় সচেষ্ট। আর, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ স্ব-শ্রেণীর স্বীকৃতি ও ভালোবাসার প্রত্যাশী, তাই সে তাদের আনন্দ-বেদনার অংশীদার ও সমব্যথী হয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আগ্রহশীল। বহুবিচিত্র এবং প্রায়শ ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ এই প্রচেষ্টাগুলো মানুষেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-জাত। এবং এদের মধ্যে বিশেষ ধরনের একটা ঐক্য গড়ে তোলার পথেই মানুষ তার সীমানির্ধারণে সমর্থ হয় এবং অন্তর্নিহিত ভারসাম্য অর্জনে ও মানব-সমাজের কল্যাণসাধনে সক্ষম হয়। এটা খুবই সম্ভব যে, উত্তরাধিকার সূত্রের দ্বারাই মূলত এই উভয় প্রচেষ্টার আপেক্ষিক শক্তি স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু পরিণামে মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়, তা প্রধানত গঠিত হয় পরিবেশ সমাজ-কাঠামো ও সামাজিক ঐতিহ্যের দ্বারা—যার মধ্যে সে জন্মের পর থেকেই বেড়ে ওঠে। বিশেষ ধরনের কতগুলো

আচার-আচরণের মূল্যায়ণও এ-ব্যাপারে কম ভারী নয়। 'সমাজ' শব্দটির বিমূর্ত ধারণা হচ্ছে এই—তা হল ব্যক্তির সঙ্গে তার সমসাময়িক ও পূর্ব-পুরুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের যোগফল।

কর্ম-চিন্তা-অনুভব ও প্রচেষ্টা—এ-সকগুলো ব্যক্তি নিজে নিজেই করতে সক্ষম, কিন্তু তার দৈহিক-মানসিক ও আবেগময় অস্তিত্বের জন্য—বহুল পরিমাণেই সে সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজ-কাঠামোর বাইরে মানুষকে বোঝা বা তার অস্তিত্বের চিন্তা অসম্ভব। সমাজই তার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করে; তার কাজের হাতিয়ার ও মুখের ভাষা জোগায়। এমন কি, তার চিন্তা-চেতনার রূপ ও বিষয়বস্তু যুগিয়ে থাকে সমাজ। 'সমাজ' এই ছোট্ট শব্দটার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে অতীত ও বর্তমানের শত-সহস্র বছরের কর্মোদ্যম ও অর্জিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং এর ফলেই মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে।

অতএব, একথা খুবই স্পষ্ট যে সমাজের উপর ব্যক্তির নির্ভরশীলতা একটা প্রাকৃতিক সত্য এবং এ-সত্যকে আমরা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারব না—যেমন পারি না পিঁপড়ে ও মৌমাছিদের জীবনযাত্রার আলোচনায়। যাই হোক, আমরা যদি পিঁপড়ে বা মৌমাছিদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার পুঙ্খানু-পুঙ্খ পর্যালোচনা করি, তা হলে দেখতে পাব, তাদের জীবনধারা অপরি-বর্তনীয় বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তির দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। আর, মানবজাতির সামাজিক কাঠামো ও সম্পর্কগুলো পরিবর্তনশীল এবং সহজেই রূপান্তরধর্মী। স্মরণশক্তি, নতুন নতুন সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা ও ভাষার ব্যবহার—এগুলো জৈবিক প্রয়োজন-সাপেক্ষ নয়—অথচ এরাই মানবজাতির বিকাশকে সম্ভব ক'রে তুলেছে। এই বিকাশ, বিচিত্র ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান এবং যন্ত্র-বিদ্যার মধ্যে স্ব-প্রকাশিত হচ্ছে। এর দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার নিজস্ব আচরণের দ্বারা তার জীবনকে প্রভাবান্বিত করে এবং এক্ষেত্রে তার সচেতন চিন্তা এবং আগ্রহও একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। বংশগত কারণে, জন্মলগ্নেই মানুষ জৈব-দেহ-বিন্যাসের অধিকারী। জৈব-দেহের বিন্যাস ও মানব-প্রজাতির প্রকৃতিগত এই বিশিষ্ট প্রবৃত্তিগুলোকে আমরা অপরিবর্তনীয় অমোঘ নিয়ম হিসেবেই বিচার করব। এছাড়া, জীবদ্দশাতে মানুষ সমাজকে অবলম্বন ক'রে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নানা-বিধ প্রভাবের মাধ্যমে তার সাংস্কৃতিকজীবন গড়ে তোলে। এই সাংস্কৃতিক

জীবন সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তিত হয় এবং ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কটি বহুল পরিমাণে নির্ণয় করে থাকে।

তথাকথিত আদিম-সংস্কৃতিগুলির তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের দ্বারা আধুনিক নৃতত্ত্ব-বিদ্যা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, বিভিন্ন সমাজে সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ বিদ্যমান এবং ভিন্নভিন্ন সংগঠন প্রভাবশালী—এর ফলেই মানবজাতির আচরণে গভীর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই মানবভাগ্য উন্নয়নে যাঁরা সচেষ্ট, তাঁরা আশা রাখতে পারেন যে, জৈবিক গঠনের জন্যই মানুষ পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করবে না বা স্ব-আরোপিত নিষ্ঠুর নিয়তির করুণার মুখাপেক্ষী হবে না।

আমরা যদি নিজেদের প্রশ্ন করি, যথাসম্ভব সন্তোষজনক একটা মানব-জীবন গড়ে তোলার অনুকূলে কিভাবে আমরা সমাজের কাঠামো এবং মানুষের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত করব—তাহলে এ-ব্যাপারে একটা সত্য সম্পর্কে আমাদের সবদা সচেতন থাকতে হবে যে, কিছু কিছু অবস্থা আছে, যা আমরা পরিবর্তনে অক্ষম। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, মানুষের জৈব-প্রকৃতি কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন-সাপেক্ষ নয়। অধিকন্তু, বিগত কয়েক শতকের প্রযুক্তি বিদ্যা ও demographic অগ্রগতির ফলে পারিপার্শ্বিক যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা এখনও স্থায়ী রয়েছে। অপেক্ষাকৃত ঘন বসতি-পূর্ণ অঞ্চলের অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিরন্তর সরবরাহের জন্য চাই চরম শ্রম-বিভাজন সমন্বিত অতি-কেন্দ্রীভূত উৎপাদন-ব্যবস্থা। অতীতে ব্যক্তি-মানুষ বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকা সম্ভব ছিল। পেছনে চোখ ফেরালে, সে-অতীত যতই সহজ-সরল মনে হোক, আজ তা চিরতরে বিলুপ্ত। একথা বললে খুব একটা অতিশয়োক্তি হবে না যে, সমগ্র মানবজাতি এখনই গ্রহব্যাপী উৎপাদন ও ভোগভিত্তিক একটা সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

আমি এখন মূল বক্তব্যে পৌঁছে গিয়েছি, যেখানে দাঁড়িয়ে বর্তমান যুগ-সঙ্কটের মৌল কারণ বলে যা আমার মনে হয়েছে—তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি। এগুলো হচ্ছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ সম্পর্কিত।

সমাজ-নির্ভরতা সম্বন্ধে ব্যক্তি-মানস আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। এই নির্ভরশীলতা মানুষের অভিজ্ঞতায় কিন্তু কোনো সদর্থক-সম্পদ, প্রাণময়-বন্ধন বা পালিকাশক্তি রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠেনি—বরং তার

স্বাভাবিক অধিকার, এমনকি তার অর্থনৈতিক অস্তিত্বের পক্ষে পর্যন্ত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকন্তু, সমাজে তার অবস্থানটা এমন যে, তার স্বভাবের অহংবাদী প্রচেষ্টা (egotistical drives) গুলোই অবিরত বলশালী হয়ে উঠছে। অন্যদিকে তার সামাজিক-প্রচেষ্টাগুলো, যা স্বভাবতই দুর্বলতর, তা ক্রমক্রতহারে অবনতির পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষই আজ এই অবনতির কবলে। নিজেদের অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ অস্মিতায় বন্দী-মানুষেরা নিঃসঙ্গতা ও নিরাপত্তাহীনতা-বোধে আক্রান্ত এবং সরল-অকপট ও অকৃত্রিম জীবনরসে বঞ্চিত। নিজেকে একমাত্র সমাজের হাতে উৎসর্গ করেই বিপদসঙ্কুল ও স্বল্পায়ু এই জীবনের সার্থকতা মানুষ খুঁজে পেতে পারে।

ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক নৈরাজ্যই যাবতীয় অমঙ্গলের প্রকৃত উৎস বলে আমার ধারণা। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে, এক বিশালকায় উৎপাদক-সম্প্রদায়ের সদস্যরা যৌথশ্রমের ফল থেকে পরস্পরকে বঞ্চিত করবার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা ক'রে আসছে। তারা এ-ব্যাপারে যে শক্তি প্রয়োগ করছে তা নয়, বরং আইনানুগ নিয়মকানুনের প্রতি বিশ্বস্তভাবে অনুগত থেকেই তারা এ-সব করছে। এ-সম্পর্কে এ-কথাটা বোঝা অত্যন্ত জরুরি যে, উৎপাদনের উপকরণসমূহ—অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য এবং অতিরিক্ত মূলধন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক উৎপাদিকাশক্তি—আইনের চোখে ব্যক্তিগত মালিকানা-ভুক্ত হতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটেছেও তাই।

পরবর্তী আলোচনা সহজবোধ্য করবার জন্য, আমি উৎপাদন-উপকরণের অংশীদার নয় এমন শ্রমজীবী মানুষকেই 'শ্রমিক' নামে অভিহিত করব। যদিও শব্দটির প্রচলিত অর্থের সঙ্গে আমার অর্থের ঠিক ঠিক মিল হবে না। উৎপাদন-উপকরণের মালিকেরা আজ শ্রমিকের শ্রম-শক্তি ক্রয়ে সমর্থ। উৎপাদন-উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিক যে নতুন পণ্য উৎপাদন করছে, তা-ও ধনিকের সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছে। শ্রমিকের বাস্তব-উৎপাদন এবং তার প্রকৃত আয়, এদের ভেতরকার সম্পর্ক হল—এই উৎপাদন-প্রণালীর একটা অপরিহার্য বিষয়। যে-পরিমাণে শ্রমচুক্তি স্বাধীন, তাতে শ্রমিক কি পাবে তা তার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃত-মূল্যের দ্বারা নির্ণিত হয় না; বরং শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা, কর্মের জন্য প্রতিযোগী শ্রমিকের সংখ্যা এবং পুঁজিপতির

শ্রমশক্তির চাহিদার উপর তা নির্ভরশীল। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা বুঝতে হবে যে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে পর্যন্ত শ্রমের মজুরি শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় না।

ব্যক্তিগত পুঁজি, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে। এর কারণ হিসেবে আমরা পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, প্রযুক্তি বিস্তার অগ্রগতি এবং ক্রমবর্ধমান শ্রমবিভাগের উল্লেখ করতে পারি। ছোট ছোট উৎপাদন-সংস্থাগুলোকে গ্রাস করেই বিশালকায় উৎপাদন-সংস্থা গ'ড়ে উঠছে। এর ফলেই ঘটছে ফাইনান্সিয়াল-অলিগার্কির (financial-oligarchy) উৎপত্তি। যার সীমাহীন আধিপত্যকে গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত কার্যকরভাবে প্রতিহত করতে পারে না। একথা সত্য যে, আইন-পরিষদের সদস্যরা রাজনৈতিক দল থেকেই নির্বাচিত হন। এই রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পুঁজিপতিদের অর্থে পুষ্ট এবং তাদের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবান্বিত। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থেই এইভাবে আইন-পরিষদ ও নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে একটা ব্যবধান গ'ড়ে তোলে। যার ফলশ্রুতি হচ্ছে, জনগণের প্রতিনিধিরা বাস্তবে কিন্তু জনগণের কম-সুবিধাভোগী অংশের স্বার্থরক্ষায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে না।

অধিকন্তু, বর্তমান পরিস্থিতিতে, ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকগোষ্ঠী অবশ্যম্ভাবী কারণেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তথ্য-সরবরাহের প্রধান উৎসগুলোকে (প্রেস, রেডিও, শিক্ষা) নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে, বাস্তবসিদ্ধান্তে (objective conclusions) পৌঁছনো বা তার রাজনৈতিক অধিকারের বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যবহার একান্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, এমন কি অনেকক্ষেত্রে তা বাস্তবিকই অসম্ভব।

বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল দুটো চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত—উৎপাদন। উপকরণের (পুঁজি) ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী মূলধনের নিয়োগ। দ্বিতীয়ত—শ্রমিকের চুক্তিবদ্ধ হবার স্বাধীনতা। অবশ্য এ-অর্থে বর্তমানে খাঁটি ধনতান্ত্রিক সমাজ (pure capitalist society) বলতে কোনো বস্তু নেই। বিশেষ ক'রে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শ্রমিকশ্রেণী সুদীর্ঘ ও তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত

শ্রমজীবী মানুষের জন্য কিছুটা উন্নতমানের স্বাধীন শ্রম-চুক্তি ("free labor contract") অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি দেখা যায়, তাহলে বলতে হয় যে, বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে নির্ভেজাল ধনতান্ত্রিক ("Pure" capitalism) ব্যবস্থায় বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

উৎপাদন চালানো হয় মুনাফার জন্য, প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে নয়। সক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রই কর্মে নিযুক্ত হতে পারবে এমন কোনো সুযোগ নেই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বরং প্রায় সব সময়ই সেখানে বেকারবাহিনী (army of unemployed) মজুত থাকে। শ্রমিকেরা কর্মচ্যুতির ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে। যেহেতু বেকার এবং স্বল্পবেতনভোগী দরিদ্র শ্রমিকেরা ভোগ্য পণ্যের ক্রেতা হিসেবে বাজার সৃষ্টি করতে পারে না, তাই তার উৎপাদন সীমাবদ্ধ। এবং এর ফলেই গভীর কষ্টের উদ্ভব হয়। শ্রমভার লাঘব অপেক্ষা, প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি প্রায়শই আরো বেশি বেকারির সৃষ্টি করে। মুনাফা শিকারের প্রবণতা পুঁজিপতিদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে মিশে পুঁজিসংগ্রহ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে এবং ক্রমবর্ধমান গভীর মন্দার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে বিপুল শ্রমশক্তির অপচয় ঘটছে এবং ব্যক্তির সামাজিক-চৈতন্য পঙ্গু হয়ে পড়েছে—যা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি।

আমার বিবেচনায়, ব্যক্তি-মানসের পঙ্গুত্বই হচ্ছে ধনতন্ত্রের সব থেকে অমঙ্গলের দিক। আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটাই এই অমঙ্গলের দ্বারা আক্রান্ত।

মাত্রাতিরিক্ত প্রতিযোগিতার মনোভাব ছাত্র-সমাজের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যৎ-জীবনে উন্নতি-বিধানের প্রস্তুতি হিসেবে, আহরণমূলক সাফল্যকে (acquisitive success) তারা পূজা করতে শিখছে।

আমি নিশ্চিত যে, এই গভীর অমঙ্গলকে বাতিল করবার একটাই মাত্র রাস্তা, তা হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক লক্ষ্যের অভিমুখী একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-উপকরণের মালিকানা থাকে সমাজের হাতে এবং তার ব্যবহারও হয় পরিকল্পিতভাবে। পরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজের চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের সামঞ্জস্যবিধান করবে, কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে কর্মের সুষ্ঠু বণ্টন করবে এবং নর-নারী-শিশু প্রত্যেকের জন্য জীবনধারণের উপযোগী

নিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে। ব্যক্তিজীবনে শিক্ষা, তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজে ক্ষমতা ও সাফল্যের যে-গৌরবগান করা হয়, তার পরিবর্তে চারপাশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে ব্যক্তিকে সচেতন করে তুলবে।

সব সময় একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিকল্পিত অর্থনীতির অর্থ কিন্তু সমাজতন্ত্র নয়। তথাকথিত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেক সময় ব্যক্তিজীবনে পুরোপুরি দাসত্বের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। জটিল ও দুরূহ সব সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথেই সমাজতন্ত্রের সাফল্য সম্ভব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুদূরপ্রসারী কেন্দ্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে, আমলাতন্ত্রকে সর্বময় ক্ষমতা ও দাম্ভিকতার হাত থেকে রক্ষা করা কি সম্ভবপর? ব্যক্তি-মানুষের অধিকার রক্ষা ও সেই সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার উপর পাল্টা কোনো গণতান্ত্রিক ক্ষমতার চাপানো কি সম্ভবপর?

আমাদের এই পরিবর্তনশীল যুগে, সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও সমস্যা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যেহেতু, বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি নির্বাধ আলোচনা কঠোর নিষেধের আওতায় এসে পড়েছে, তাই এ-ক্ষেত্রে আমি মনে করি, এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজসেবার একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রতিপালিত হবে।

অনুবাদ : চার্বাক সেন

সার্তের সাম্প্রতিক দর্শনচিন্তা

মৃণালকান্তি ভদ্র

১৯৬০এ প্রকাশিত Critique of Dialectical Reason-এ সার্ত ঘোষণা করলেন, বর্তমান যুগের একমাত্র দর্শন হল মার্কসবাদ। অস্তিবাদ তার উপর নির্ভরশীল একটি মতবাদ মাত্র, যা ভিতর থেকে মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ-বিকাশকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই মতবাদ মার্কসবাদের বিরোধিতা করলেও, তার মধ্যেই মিলিত হতে চাইছে। Critique of Dialectical Reason-এর প্রথমে সার্ত একটি আলাদা প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করেছেন, যে-প্রবন্ধের নাম হল Question of method বা Problem of method। এই প্রবন্ধে সার্ত দেখাতে চেষ্টা করেছেন, অস্তিবাদ কিভাবে সুষ্ঠু পদ্ধতির সাহায্যে মার্কসবাদের আরও যথাযথ প্রয়োগ ক'রে ব্যক্তি-মানুষ, সমাজ এবং ইতিহাসের সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারে। পরের অংশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের কথা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কিভাবে ইতিহাস গড়ে উঠছে, তা সার্ত আলোচনা করবেন Critique of Dialectical Reason-এর দ্বিতীয় পর্বে, যা এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

এই গ্রন্থে সার্ত কাণ্টের মতোই মানুষের যুক্তির প্রকৃতি, ক্ষমতা এবং সীমা নির্ধারণ করতে চান। তবে হেগেলের কাছেই তিনি বেশি ঋণী। তিনি বলতে চান মার্কসবাদের মধ্য দিয়ে অস্তিবাদ হেগেলের কাছ থেকে দুটি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে: (১) সত্য বিকাশ লাভ করে এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। (২) সত্য হল সমগ্রীকরণ। হেগেলে যেমন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পর্বে সত্য গড়ে উঠছে এবং শেষ পর্যন্ত সার্বিক সত্তার সম্পর্কেই সত্য নির্ণীত হচ্ছে; সার্ত অবশ্য সেরকম সার্বিক সত্তা মানেন না। তবে তিনি বলেন, ইতিহাসে প্রত্যেক পর্বে এই সমগ্রীকরণ চলেছে এবং সত্যকে বিচার করতে হবে ইতিহাসের সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে। সার্তও মনে করেন, ইতিহাসের ঘটনার দ্বন্দ্বে সমাজ বিকশিত হচ্ছে এবং পরের যুগের সমন্বয় দ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে

যাচ্ছে। এই ইতিহাসের বিকাশ এবং সত্যের গঠন সার্ত্র পরের পর্বে আলোচনা করবেন বলে, সে সম্বন্ধে কিছু বলেননি। তবে তাঁর ধারণা, বর্তমান বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের পদ্ধতি দিয়ে ইতিহাসের এই বিকাশকে বোঝা যায় না। তা বুঝতে পারা যাবে এক নতুন ধরনের যুক্তি দিয়ে, যা বাস্তব অবস্থা এবং জ্ঞানের দ্বন্দ্বের উপর নির্ভর করে। বাস্তব ইতিহাসে যে সমগ্র রূপ গড়ে উঠছে, তাই চেতনার মাধ্যমে সত্যকে সৃষ্টি করছে। তাই, বাস্তব অবস্থা এবং চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দ্বন্দ্বের উপলব্ধি যার দ্বারা হয়, তাই দ্বান্দ্বিক যুক্তি। সার্ত্র মনে করেন, মার্কসবাদকে যথাযথ প্রয়োগে বাধ্য ক'রে অস্তিবাদ এই যুক্তির স্বরূপকে ব্যাখ্যা করতে পারবে। দ্বান্দ্বিক যুক্তি তাই অস্তিবাদ দ্বারা সংস্কৃত মার্কসবাদের প্রয়োগ। Problem of method-এর প্রথম অধ্যায়ে সার্ত্র মার্কসবাদ এবং অস্তিবাদের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক যুগেই বিশেষ কোনো দর্শন সে-যুগের ইতিহাসের ধারাকে প্রকাশ করতে চায়। এরই মধ্য দিয়ে সেই যুগে আবির্ভূত শ্রেণী নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়। ধনতন্ত্রের গোড়ার যুগে ধনিক ব্যবসায়ীরা দেকার্তের দর্শনের মধ্যে নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিল। এক শতাব্দী পরে শিল্পায়ণের প্রথম দিকে শিল্পপতি, যন্ত্রবিদ এবং বৈজ্ঞানিকরা কাণ্টের সার্বজনীন মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু দর্শনের ভিতর দিয়ে যুগের সমস্ত জ্ঞানকে প্রতিফলিত হতে হয় বলে, দর্শন এমন কতগুলি নির্দেশক কাঠামো গ'ড়ে তোলে, যার দ্বারা যুগের নব-উত্থিত শ্রেণীর সমস্ত ধারণা রূপায়িত করা যায়। সামাজিক আন্দোলনে জন্ম নিয়ে দর্শন তার ঐক্যের প্রয়াসকে বহুদূর নিয়ে যায়। যে-উদ্দেশ্য দর্শনকে গ'ড়ে তোলে, তা যতদিন সজীব থাকে; ততদিনই দর্শনের কার্যকারিতা থাকে। প্রত্যেক যুগের দর্শন যে-ইতিহাসকে ব্যক্ত করে, তাকে অতিক্রম করা যায় না বলে, যুগের দর্শনকেও অতিক্রম করা যায় না। আজকের দিনে মার্কসবাদ হচ্ছে যুগের দর্শন, কারণ তা বর্তমানের যুগের উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করছে। কিন্তু দর্শনে যখন কোনো সঙ্কট দেখা যায়, তা সামাজিক সঙ্কটের প্রকাশ। ইতিহাসের গতি সকল পর্যায়ের মানুষের সংগ্রামবন্দী চিন্তাকে মুক্ত ক'রে এই সঙ্কট দূর করতে পারে। সার্ত্র মনে করেন, মার্কসবাদের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় যে-সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা এই জাতীয় সঙ্কট। প্রত্যেক বিরাট দর্শনের পর্বে এমন কোনো কোনো মতবাদ দেখা যায়, যা মূল দর্শনকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে। অস্তিবাদ এমনি একটি

মতবাদ, যা মার্কসবাদের সমালোচনা করলেও তার মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হতে চায়।

হেগেল এবং কিয়েরকেগার্ডের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে সার্ত্র বলেছেন, হেগেল ব্যক্তিকে বাস্তব এবং জ্ঞানের দ্বন্দ্বের মধ্যে বিকশিত করতে চাইলেও, তাকে সার্বিক সত্তার প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। ফলে, ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, একাকিত্ব, মানব-অস্তিত্ব প্রাধান্য পায় নি এবং তাই কিয়েরকেগার্ড বোঝাতে চেয়েছেন। ব্যক্তি-অস্তিত্বকে যুক্তির কাঠামোয় নিঃশেষিত করা যায় না। মানুষের অস্তিত্বকে যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞান দিয়ে বোঝা যায় না। আমাদের যুগে মানুষ যখন উৎপাদন-সম্পর্ক এবং উৎপাদন-যন্ত্রের দ্বন্দ্বে তার উৎপাদিত পণ্য থেকে বিযুক্ত, তখন তাকে বুঝতে গেলে এই দ্বন্দ্ব সে কিভাবে জীবনে উপলব্ধি করছে, তা জানতে হবে। হেগেলের যে-ধারণায় মানুষ বাস্তব জগতে নিজেকে পরিবর্তিত করতে চায়, সেখানে ভুলটা হল এই যে, বাস্তব জগত এবং ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বটা তিনি বুঝতে পারেন নি। মার্কস হেগেলের এই ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মার্কসের ধারণায়ও, ব্যক্তি-জীবনকে জ্ঞানে পরিণত করা যায় না। ব্যক্তির প্রতিটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন গড়ে উঠছে এবং তার প্রত্যেক পর্বই বাস্তব। অস্তিবাদও যখন ব্যক্তির মূর্ত জীবন-দর্শনের কথা বলতে চায় এবং মার্কসও যখন ব্যক্তির জীবনকে তার উদ্দেশ্য ও সংগ্রাম দিয়ে বুঝতে চান, তখন অস্তিবাদের পৃথকভাবে টিঁকে থাকবার দরকার কি ?

হাঙ্গেরির মার্কসবাদী দার্শনিক লুকাকস্ মনে করেন, বুর্জোয়াশ্রেণী ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ভাববাদকে বর্জন ক'রে তার ফলগুলিকে আঁকড়ে থাকছে একটি 'তৃতীয় পথ' খুঁজে পাবার জন্য। সার্ত্র মনে করেন, আগে থেকে গড়ে নেওয়া এই ধারণা মার্কসবাদের ক্ষতি করছে। কিন্তু আজকের দিনে বহু দার্শনিক যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে মেনেও অস্তিবাদকে প্রয়োগ করতে চাইছেন, তার কারণ একটি সামাজিক দ্বিমুখী আকর্ষণ, যা লুকাকস্ ধরতে পারেন নি। বুর্জোয়া চিন্তাধারাকে বিনষ্ট করলেও, যে-পরিবেশে আজকের মানুষ অবস্থিত ; তাকে মার্কসবাদ ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারছে না, কারণ তার গতি আজ অবরুদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়নের গঠনের পর্যায়ে, প্রয়োগের প্রাধান্যে তত্ত্ব থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে, ফলে তত্ত্ব-বিহীন অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং প্রয়োগ-বিহীন তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। আজকের মার্কসবাদীদের কাছে, সার্ত্রের অভিযোগ, তাঁরা বাস্তব সমগ্রকে বর্জন করেন। কিন্তু সজীব মার্কসবাদ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তত্ত্বের মিলন ঘটায়, প্রত্যেকটি বিশেষের সঙ্গে

সমগ্রের যোগ কোথায় ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু আজকের মার্কসবাদ বিশেষ বাস্তব ঘটনাকে অগ্রাহ্য ক'রে একটি তত্ত্বের বা ধারণার কাঠামোর ছোট-খাট ঘটনাকে বিবেচনা করতে চায়, যা মার্কস কখনও করেন নি। মার্কস নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানের সময় মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকার যে-আলোচনা করেছেন, তা থেকেই একথা স্পষ্ট হয়। কিন্তু হাঙ্গেরির ঘটনার বেলায় আধুনিক মার্কসবাদীরা 'সোভিয়েত আমলাতন্ত্র' 'শ্রমিক সঙ্ঘ' এই সব শব্দের উপর এত জোর দিয়েছেন যে মনে হয় তাঁরা যেন আকার-গত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করছেন। মার্কসবাদের মুক্ত ধারণাগুলিকে আজকের দিনে চরম জ্ঞানে পরিণত মনে করা হচ্ছে। বিশেষের মধ্যে সমগ্রকে না খুঁজে বিশেষকে বর্জন করা হচ্ছে।

মার্কসবাদের একটি তত্ত্বগত রূপ আছে, যা মানুষের সমস্ত কর্মজীবনকে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তা না ক'রে তত্ত্বগত ধারণাগুলি ঘটনাকে যেন পরিকল্পিত ধারণা অনুযায়ী একটি বিশেষ রূপ নিতে আদেশ করছে। আমেরিকান সমাজতত্ত্বে অভিনব ঘটনাসংগ্রহ থাকলেও তত্ত্বগত নিশ্চয়তা নেই, মনঃসমীক্ষণেও তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠা নেই। এই অবস্থায় অস্তিবাদ নতুন কিছু করতে চাইছে। মার্কসবাদ মানুষকে ধারণায় সীমাবদ্ধ রেখেছে কিন্তু অস্তিবাদ সব জায়গায়—রাস্তায়, বাড়িতে, তার কাজের মধ্যে—তাকে খুঁজছে। কিন্তু মার্কসের মূল বক্তব্য তা নয়। মার্কসবাদ আজ ইতিহাসকে অন্ধকারে পাঠিয়ে, পরিবর্তনকে যুক্তিগত অচলতায় পরিণত করেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, মার্কসবাদ স্থবির হয়ে পড়েছে, বরং তার তারুণ্য এখনও অক্ষুণ্ণ। যে-পরিস্থিতিতে এই দর্শনের জন্ম, তা এখনও অতিক্রান্ত হয়নি। অস্তিবাদও মার্কসবাদের মতো দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার মধ্যে বাস্তব সমন্বয়কে পেতে চায়, যার মধ্য দিয়ে সত্য গড়ে ওঠে। বিশেষ ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে অর্থহীন, আংশিক সমগ্রতার মাধ্যমে তা সমগ্রতার গতিশীল ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। সার্ত্র বলেন, মার্কসবাদের মতো তিনিও মনে করেন "অস্তিত্ব চেতনার পূর্বে"। আজকের দিনের যথার্থ জ্ঞানতত্ত্ব বলতে চায়, বৈজ্ঞানিক তার পরীক্ষা-রীতির অংশ। এ-থেকে বোঝা যায়, মানুষ জগতের মধ্যে অবস্থিত এবং বিশেষ কোনো পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধির জন্য যে উদ্দেশ্য তাকে পরিবর্তিত করছে, তা জানা দরকার। তার অর্থ এই নয়, চেতনাই কাজের উৎস, কিন্তু কাজের রূপায়ণে তার একটি অনিবার্য ভূমিকা আছে। সার্ত্রের ধারণা, জ্ঞানতত্ত্ব মার্কসবাদের দুর্বল অংশ। কারণ মার্কস

যখন বলেন, জড়বাদে প্রকৃতি যেমন, অন্য কোনো উপাদান ব্যতীত, তেমনভাবে জানাই ঠিক জ্ঞান, তখন প্রকৃতি থেকে মানুষ বাদ চলে যাচ্ছে, যদিও বাস্তব জগতে মানুষ রয়েছে। লেনিন অবশ্য বলেছেন, "চেতনা বাস্তবের প্রতিফলন, সবচেয়ে ভালো জায়গায় যতটা সম্ভব যথার্থ প্রতিফলন।" সার্ত মনে করছেন, একদিকে মার্কসবাদ জগতে যৌক্তিকতার তত্ত্ব বিশ্বাস ক'রে গঠনকারী চেতনায় বিশ্বাস করছে; অন্যদিকে, চেতনাকে প্রতিফলন বলে মনে করছে। প্রথমটি যদি ভাববাদ হয়, দ্বিতীয়টি সংশয়বাদ। এতে মানুষ ও ইতিহাসের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। চেতনা ও বাস্তবকে পারস্পরিক সম্পর্কে ঠিকমতো বজায় রাখতে হলে মনে রাখতে হবে, চেতনা বাস্তব ইতিহাসের একটি পর্যায়, যেখানে বহি-র্জগতকে অন্তরীকরণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ বাস্তব ঘটনা চেতনার বিশেষ গ্রহণে যে-রূপ পাচ্ছে, তাই বাস্তব। 'শ্রেণীচেতনা' শুধু যে-দ্বন্দ্ব শ্রেণীকে বিশিষ্ট করছে, তার বাস্তব-জীবন রূপায়ণ নয়; যে-উদ্দেশ্য এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে চাইছে, তাও; তাই সেখানে শ্রেণীদ্বন্দ্বও আছে, তার অস্বীকৃতিও আছে। মার্কস যখন বলেন, "বাস্তব জীবনে উৎপাদন-পদ্ধতি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের উপর সাধারণত প্রাধান্য বিস্তার করে"; তখন বাস্তব ও চেতনার দ্বন্দ্বের পারস্পরিক সম্পর্কের কথাই বলেন। সার্তের মতে, এই হল মার্কসীয় জড়বাদ। মার্কস বলেছেন, "প্রয়োজন এবং বাস্তব কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাজ যতদিন চলবে, ততদিন স্বাধীনতার যুগ আসবে না; অতএব, তা বাস্তব উৎপাদনের গণ্ডীর বাইরে।" সার্তও মনে করেন, এখনও মানুষ অভাবের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়নি।

মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে জড়বাদের যে সংজ্ঞা আছে, সার্ত তা গ্রহণ করলেও তিনি মার্কসবাদী নন; কারণ এঙ্গেলস ও ফরাসী মার্কসবাদী গারোদি জড়বাদের মূল সূত্রগুলিকে নির্দেশক নিয়ম হিসেবে ব্যবহার করেছেন, অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। এরই ফলে, লুকাকস্ হাইডেগারের দর্শনকে নাৎসিবাদের প্রেরণায় কর্মবাদ বলে বিচার করেন; অথচ ফরাসী অস্তি-বাদের মধ্যে জার্মান বিরোধের সময় মধ্যবিত্তের বিদ্রোহকে তিনি দেখতে পান নি; কিন্তু ইয়াসপার্সের অস্তিবাদ তো নাৎসিবাদের সঙ্গে আপোষ করে নি। সার্ত যখন তাঁর বই লিখছিলেন, তখনও জার্মানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হয়নি। সার্ত মনে করেন, ব্রেনটানো থেকে হুসার্ল ও হাইডেগার পর্যন্ত একটি বিশেষ "দেশ ও কালগত ইতিহাস" আছে, যার অন্তর্দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করা যায় না।

হুসার্লের প্রবর্তিত বস্তু-বিজ্ঞান পদ্ধতি হাইডেগারের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েও কিভাবে টিঁকে আছে, তার জটিলতাকে বুঝতে হবে। মার্কসবাদীরা একটি উদ্দেশ্যগত ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে ইতিহাসের স্বরূপ বুঝতে পারছে না। বিশেষ ঘটনাকে বিমূর্ত সামান্যের মধ্যে নিঃশেষিত করা হচ্ছে। আধুনিক মার্কসবাদীরা বুর্জোয়া চিন্তার মূর্ত রূপকে না বুঝে তাকে একটি ভাববাদে পর্যবসিত করছেন।

তবে অন্তত একজন মার্কসবাদীকে সার্ত্র পেয়েছেন, যিনি ইতিহাস ও সমাজবিদ্যাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে বুঝতে পেরেছেন, তিনি হচ্ছেন হাঁরি লেফেব্‌। তিনি দুই ধরনের জটিলতার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হল সমতলীয় জটিলতা—যার মধ্যে একটি মানব-গোষ্ঠীর কৃষি-উৎপাদন-পদ্ধতি, তার সঙ্গে সম্বন্ধ এবং তারা যে-সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে—সবই আছে। গোষ্ঠী যে সামাজিক কাঠামোর দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাও বাদ যায়নি। এর সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর যোগ আছে। আর একটি জটিলতা ঊর্ধ্বমুখী, তার মধ্যে গ্রাম-জীবনে বিভিন্ন যুগের এবং বিভিন্ন স্থায়িত্বের গঠনের সহাবস্থান রয়েছে। এই দুই জটিলতা একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই সমগ্র জটিলতাকে বুঝতে হলে ত্রি-স্তরীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। প্রথমে, অভিজ্ঞতায় যা পাওয়া যায়, তার বর্ণনা দিতে হবে এবং তা করতে যে-সব সাধারণ নিয়ম আছে, তা মানা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, পশ্চাদ্‌মুখী বিশ্লেষণে বিষয়ের ইতিহাস আলোচনা করতে হবে পূর্বের পর্যায়গুলিকে বুঝে তার একটি যথাযথ সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য। তৃতীয়ত, সংশ্লেষক প্রগতিমুখী পদ্ধতিতে অতীত থেকে বর্তমানের ধারা আলোচনা ক'রে বর্তমানকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে, যাতে পশ্চাদ্‌মুখী এবং প্রগতিমুখী বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের পদ্ধতিতে বিষয়ের পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। সার্ত্রের মতে, নৃতত্ত্ববিদ্যার সমগ্র বিভাগে এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মূর্ত সম্পর্কে এই পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা প্রয়োজনমতো মাঝে মাঝে সংশোধন করা যায়।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী মধ্যবিত্তের একটি বাস্তব গোষ্ঠী থেকে কিভাবে ভ্যালেরির উদ্ভব হল, তা অর্থনৈতিক কাঠামো এবং মধ্যবিত্তের ধনিকের সঙ্গে দোলায়মান সম্পর্ক দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। সমসাময়িক সমাজের সাধারণ ব্যাখ্যা হিসেবে এই তত্ত্ব সত্য হতে পারে, কিন্তু আমরা ব্যক্তি ভ্যালেরিকে বুঝতে চাই।

ভ্যালেরির মতাদর্শকে ভাববাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলছে এমন একজন ব্যক্তির মূর্ত ও একক সৃষ্টি হিসেবে দেখতে হবে. কিন্তু তার বিশেষ-ব্যক্তিত্বকে যে-মূর্ত-গোষ্ঠী থেকে তার উদ্ভব, তার সম্পর্কে বুঝতে হবে। ভ্যালেরি একজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী নিশ্চয়ই, কিন্তু যে কোনো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীই তো ভ্যালেরি নয়। মার্কসবাদে যা অনুপস্থিত, তা হল মাধ্যমগুলির স্তরবিন্যাস ; যা কী প্রক্রিয়াতে একজন ব্যক্তি ও তার সৃষ্টি ইতিহাসের বিশেষ কালে একটি বিশেষ সমাজে উদ্ভূত হয়, তা বুঝবার জন্য দরকার। কিন্তু এই বিশেষ ব্যক্তির উদ্ভবের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী বলবেন, বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় ও-রকম ব্যক্তি যে কেউই হতে পারে। ঐ ব্যক্তি যে ভ্যালেরি হয়েছেন, সেটা আকস্মিক। যেমন এঙ্গেলস বলেন, নেপোলিয়ঁর স্থান আর যে কেউ নিতে পারত। কিন্তু অস্তিবাদ বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকাকে বোঝবার জন্য বিভিন্ন স্তরগুলিকে উপলব্ধি করতে চায়। আধুনিক মার্কসবাদীরা দেখান, ফ্লবেয়রের বাস্তবতায় মধ্যবিত্তের সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনার একটি দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি কি ক'রে হল, তা তাঁরা ব্যাখ্যা করেন না। ফ্লবেয়র যে বুর্জোয়া ভাবপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন, তার কারণ শৈশব থেকেই না জেনেই তাঁকে বুর্জোয়ার ভূমিকা নিতে হয়েছে। কিন্তু সব পরিবারের মতো তাঁর পরিবারেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, যা তাঁকে বুর্জোয়া আদর্শে শিক্ষানবিশি করিয়েছিল। তাঁর পরিবারের বিশিষ্টতা ছিল, রাজতন্ত্রের পুনরুত্থানের ধর্মীয় জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁর পিতার ধর্মে অবিশ্বাস—তিনি ছিলেন বিপ্লবের মধ্যবিত্ত সন্তান।

সার্ত্রের মতে, মনঃসমীক্ষণই শিশু কি ক'রে তার উপরে ন্যস্ত মাতা-পিতার ভূমিকাকে গ্রহণ করে, তা ব্যাখ্যা করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে পুরো ইতিহাসটা খুঁজে পাওয়া এভাবেই সম্ভব হয় এবং এর সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরোধ নেই। মধ্যবর্তী স্তরগুলিকে বুঝতে পারলেই জানা যাবে, কি ক'রে সামান্য বিমূর্ত সূত্র থেকে একক ব্যক্তিতে উপনীত হওয়া যায়। মনঃসমীক্ষণ একটি মানুষ তার শ্রেণীতে কোন অংশে অবস্থিত, তা আবিষ্কার করতে পারে ; কারণ যে-পরিবারে শিশু বড় হয়, তা শ্রেণী ও ব্যক্তির মধ্যবর্তী। মানুষ নিজের আত্মবোধ কি ক'রে হারিয়েছে, আজকের দিনে তা অস্তিবাদ ও মনঃসমীক্ষণের সাহায্যেই মার্কসবাদ বুঝতে পারে। শৈশবের প্রথম দিকে মানুষ অবস্থার যে অন্তরীকরণ হয়, তাতে একদিকে বাস্তব পরিবেশ ও অন্যদিকে শৈশব যা গ'ড়ে

তোলে তার প্রভাবের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব চলে। মনঃসমীক্ষণ দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে, তাই ফ্লবেয়ার-এর রচনাকে তাঁর শৈশবের বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে বুঝতে হবে।

সমাজ-বিদ্যায় সমগ্রীকরণের কথা বলা হয়, কিন্তু সেখানে শুধু বাস্তব-অবস্থার যোগফলকেই গণ্য করা হয়, যা থেকে সমাজতাত্ত্বিক বহিষ্কৃত। সমাজ-বিদ্যায় গোষ্ঠীকে একটি স্বতন্ত্র ঐক্য মনে করা হয়, সমগ্রকে সমাপ্ত ভাবা হয়, দ্বান্দ্বিক সংঘাতকে বাদ দেওয়া হয় এবং সমাজতাত্ত্বিক ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক বর্জন করা হয়। আসলে কিন্তু, সমাজতাত্ত্বিক ও তার বিষয় একটি যুগ্ম এবং একটিকে বুঝতে হলে ইতিহাসের বিশেষ কালে অপরটিকেও বুঝতে হবে। সার্ত্রের কাছে গোষ্ঠীর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, মার্কসবাদের মতো তিনি মনে করেন, গোষ্ঠী বিভিন্ন সম্পর্কের সমবায় এবং বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যবর্তী সম্পর্ক। গোষ্ঠীজীবনের আলোচনায় দেখা যায়, পূর্ণ সমগ্রতা কখনও পাওয়া যাচ্ছে না ; যতটুকু সমগ্রতা পাওয়া যাচ্ছে, আবার তা অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সার্ত্র মার্কসবাদে নতুন কোনো পদ্ধতি আনতে চাইছেন না, বরং তাঁর ধারণা একটি সমন্বয়েই সমতলীয় ও ঊর্ধ্বমুখী সমগ্রতা পাওয়া দ্বান্দ্বিক দর্শনের লক্ষ্য। মার্কসবাদ যেদিন সমাজ-গবেষণায় এই বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকাকে স্বীকার ক'রে মানবিক রূপ লাভ করবে, সেদিন অস্তিবাদের আর থাকবার দরকার হবে না।

সার্ত্র এঙ্গেলসের বক্তব্য "মানুষ একটি পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে" মোটামুটি গ্রহণ করেন। এই বক্তব্যের অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়। যান্ত্রিক মার্কসবাদের ধারণা মানুষ পরিবেশের নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি এবং যে-সমস্ত ঘটনা তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক। যেভাবে জড়বস্তুর পরিবর্তন ঘটে, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে, মানুষ সেইভাবে সমাজকে পরিবর্তিত করে। সার্ত্রের মতে, যথার্থ মার্কসবাদ বলতে চায়, ইতিহাসের বিশেষ পর্বে মানুষ পরিবেশের সৃষ্টি, কিন্তু সে-পরিবেশ মানুষের সৃষ্টি। মানুষ প্রাক্ অবস্থার ভিত্তিতে (যার মধ্যে অর্জিত বৈশিষ্ট্য, কর্মপদ্ধতি, আত্মবোধশূন্যতা ইত্যাদি আছে) ইতিহাস রচনা করে, কিন্তু ইতিহাসের স্রষ্টা মানুষ, প্রাক্ অবস্থা নয়। পূর্ববর্তী অবস্থা অবশ্য একটি বিশেষ দিক এবং বাস্তব অবস্থা নির্দেশ করে, যার উপর নির্ভর ক'রে পরিবর্তন হয়। কিন্তু সমাজে পরিবর্তনকে চালিত করে যে মানবিক উদ্দেশ্য, তা এই সমস্ত বাস্তব অবস্থাকে গ্রহণ ক'রেও তাকে নিঃশেষিত

হয় না। অবশ্য সব সময় মানুষ তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয়, আমি ইতিহাসে কোনো ভূমিকা নিচ্ছি না। মার্কসের চিন্তায়, বহির্নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে প্রগতিমুখী সমন্বয়ের ঐক্যের সংযোগ ঘটেছে এবং এই ঐক্যই মানবিক উদ্দেশ্য। বহির্নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্দেশ্য যা বহির্পরিবেশকে অন্তরীকৃত করছে, তাকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। মানুষ যে ইতিহাস সৃষ্টি করে, তা সকল মানুষের কর্ম-সমষ্টি; কিন্তু এই সামগ্রিক বাস্তব সৃষ্টির সঙ্গে নিজেদের সঙ্কল্পের যোগ সাধিত না হলে, তাকে অপরিচিত শক্তি মনে হয়। শ্রেণীসচেতন হয়েই শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসের স্রষ্টা হয় এবং শোষিতশ্রেণীর ঐক্যের ভিতর দিয়েই শ্রেণী-দ্বন্দ্ব কমে আসবে। আজ বিভিন্ন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাকে বড় ক'রে দেখে তাদের ঐক্যকে তুচ্ছ করা ভুল হবে। আমাদের কালে সব জায়গায় হয়তো ইতিহাস-সচেতনতা নেই, কিন্তু ইতিহাস বা বাস্তব অবস্থা আমাদের বিরোধী শক্তি নয়। ভবিষ্যতের সমগ্রতার লক্ষ্যেই ইতিহাসকে পুনরাবিষ্কার করা যেতে পারে এবং তা হল ইতিহাসের বিভিন্ন অর্থকে এক সমগ্রের দিকে নিয়ে যাওয়া, যেখানে বাস্তব মানুষ একযোগে ইতিহাস রচনা করবে, আর ইতিহাস বলতে বাস্তব মানুষের সমবেত কাজকে বোঝাবে।

মানুষ বাস্তব পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বাস্তব অবস্থার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সে জড় বস্তু নয়, তার বিশেষ কাজ সমাজের দেহে প্রবিষ্ট হয়ে প্রদত্ত অবস্থার ভিত্তিতে পরিবর্তন আনে। সে পরিবেশকে অতিক্রম করতে পারে, যদিও যে-পরিবেশ সে গড়ে তুলেছে, তা তার নিজের বলে মনে না হতে পারে। এই অতিক্রান্তির মূলে রয়েছে মানুষের প্রয়োজন। মার্কেসান আদিম-জাতিদের মধ্যে রমণীর সংখ্যা কম হওয়ায়, সেখানে এক রমণীর সঙ্গে বহু পুরুষের বিবাহ হয়। কিন্তু এই যে অভাব, এটাও একটি সামাজিক অবস্থা, যার সমাধান মানুষ করতে চায়। প্রত্যেক কাজকে বুঝতে হবে যে বর্তমান অবস্থা তা নিয়ন্ত্রণ করছে তার এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের দ্বারা। এইটেই হল উদ্দেশ্য। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উদ্দেশ্য নঙর্থক, কিন্তু বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় বলে তা নঙর্থকের অস্বীকৃতি। তাই উদ্দেশ্য একই সঙ্গে অপ্রাপ্তি এবং প্রাপ্তি। অতএব মানুষকে বুঝতে হলে বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে সে যে সম্ভাবনার দিকে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তাকে যুক্ত ক'রে বুঝতে হবে। তবে বাস্তব অবস্থার সম্ভাবনার গণ্ডিকে নির্দিষ্ট ক'রে দেয়। তার সম্ভাবনা

সীমাবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তা সব সময়ই আছে। বর্তমান অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে অনেক সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে সাধিত ক'রে মানুষ ইতিহাস-গঠনে অংশ নেয়। এই উদ্দেশ্য ব্যক্তি না জানতে পারে, কিন্তু তা থেকে যে সংঘাত গ'ড়ে ওঠে, তাই ঘটনাপ্রবাহকে গতি দেয়। সম্ভাবনার দুটি দিক আছে, একদিকে তা অজানা লক্ষ্য, যা এখনও সাধিত হয়নি ; আর একদিকে তা বাস্তব ভবিষ্যৎ বলে গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে। আবার, কিছু সম্ভাবনা আছে যা মানুষের কাছে রুদ্ধ। সামাজিক সম্ভাবনাগুলি ব্যক্তির ভবিষ্যতের মূলসূত্র এবং তাকে অন্তরীকৃত ক'রেই ব্যক্তি ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলে। কি ক'রে বাস্তব এবং ব্যক্তির এই দ্বন্দ্ব চলে, তা সার্ত্র আলোচনা করছেন না। তার জন্য বহিঃপরিবেশের অন্তরীকরণ এবং অন্তঃপরিবেশের বহির্করণের যুক্ত প্রয়োজনীয়তা দেখানো দরকার। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল বাস্তব অবস্থা থেকে অন্তরীকরণের মধ্য দিয়ে আবার বাস্তবে যাত্রা। বাস্তব অবস্থা অতিক্রম ক'রে বাস্তবে যাওয়ার মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য পরিবেশের বাস্তব অবস্থা এবং সম্ভাবনাসমূহের বাস্তব কাঠামোর মধ্যে ধৃত। বাস্তব প্রক্রিয়াতে ব্যক্তি একটি আবশ্যিক ক্ষণ, আবার ব্যক্তি-চেতনায় বাস্তবও একটি অবশ্যম্ভাবী ক্ষণ।

বাস্তব ঘটনা সব সময়ই অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত। দ্রব্য-মূল্যের বৃদ্ধিতেই শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানায় না, তাদের দৈনন্দিন জীবনে অসুবিধা হলেই তবে জানায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা হওয়া মাত্রই বাস্তব পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা ওঠে। জীবন-অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব থাকে না, বাস্তব পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই হতাশা থেকে বাঁচা যায়। তাই ব্যক্তিচেতনায় যে-বাস্তব থাকে, তাকে অস্বীকার ক'রে নতুন বাস্তব গড়া হয়, যার মধ্যে উদ্দেশ্যের অন্তরীকৃত সত্তা বহিঃপ্রকাশিত হয়ে বাস্তব ব্যক্তিচেতনায় রূপ পায়। দুটি বাস্তব অবস্থার মধ্যে যে মানবিক উদ্দেশ্য থাকে, তাই ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে। মার্কসবাদ প্রকৃতি ও মানুষের এই দ্বন্দ্বকে বুঝতে চেষ্টা না ক'রে মানুষ ও পরিবেশকে এক সরলরেখায় একই প্রকৃতিতে অবস্থিত বলে ধরে নিয়েছে। এই দ্বন্দ্বই Critique-এর বিচার্য বিষয় ; কিন্তু তা করবার আগে সার্ত্র তিনটি কথা বলতে চান যা আমাদের অস্তিবাদের সমস্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবে।

১। যে-বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে আমরা প্রতি মুহূর্তে বাঁচি, সার্ত্র মনে করেন তাকে আমাদের অস্তিত্বের বাস্তব উপাদান দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না ; কারণ তার মধ্যে আমাদের শৈশবের পারিবারিক অভিজ্ঞতা আছে,

এবং সেই স্তরেই আমাদের সামাজিক ভূমিকাগুলি আমরা শিখে নিই। শৈশবের বিদ্রোহ এবং যে-পরিবেশ আমাদের জীবনকে অবরুদ্ধ করতে চায়, তা থেকে বেরিয়ে আসবার প্রচেষ্টায় আমাদের চরিত্র অঙ্কিত হয়। এই স্তর থেকে মুক্ত হতে চাইলেও তা মানস-জীবনে থেকে যায় এবং অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে রূপ দিতে গিয়ে পুরাতন দ্বন্দ্বগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমরা নতুন কোনো সম্ভাবনা গ'ড়ে তুলতে গিয়ে শ্রেণী-চরিত্রকে অতিক্রম করতে চাই, কিন্তু আমাদের আচরণের মধ্যে শ্রেণী-চরিত্র রূপ পায়। যে সামাজিক ব্যবস্থার স্তরে আমাদের এই দ্বন্দ্ব, তার মধ্যে আমাদের আত্মবোধশূন্যতা প্রকাশিত। মার্কস-বাদীরা মানুষের আত্মবোধশূন্যতাকে জড় বস্তুর নামান্তর ভেবেছেন। কিন্তু মার্কস যা বলতে চান, তা হল অস্তিত্বের বাস্তব উপাদানগুলিকে মানব-জীবনের ভিত্তিতেই আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য। কৃপণতাকে ম্যালথুসীয় অর্থ-নীতির ফল হিসেবে বিচার না ক'রে এটাও দেখা উচিত কৃপণভাবের মধ্য দিয়ে জগতে ব্যক্তি নিজের পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করছে। অর্থনৈতিক ঘটনার পরি-প্রেক্ষিতে বিশেষ আচরণগুলির বাস্তব প্রকাশকে ভুললে চলবে না। শৈশবে ভবিষ্যতকেও আমরা জীবনে নিয়ে থাকি, কারণ আমরা যা করি, তার ব্যাখ্যা হতে পারে কি হবে তার ভিত্তিতে। উদ্দেশ্যে তাই "কেন" এবং "যে-বিশেষ আচরণে তা রূপ পাচ্ছে",—তা-ই উপাদান হিসেবে যুক্ত হচ্ছে। ব্যক্তির জীবনে যে-অবস্থা অতিক্রান্ত হচ্ছে, তা পরবর্তী স্তরে একীকৃত হচ্ছে। তাই তার জীবন ঘোরানো সিঁড়ির মতো উপর দিকে চলেছে। ফ্লবোয়্-এর জীবনে দেখা যায়, বড় ভাই পিতার স্নেহ পাওয়ায় তাঁর ব্যর্থতাবোধ জেগেছে। পিতার স্নেহ পেতে ফ্লবোয় বড় ভাইকে অনুকরণ করেছেন, যদিও তা করেছেন অনিচ্ছায় ও ক্রোধে। বড় ভাই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভালো করেছেন, ফ্লবোয় নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে খারাপ করেছেন এবং শৈশবের সঙ্কট কাটাতে এক-একটা স্তরে পূর্বের অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে সাহিত্যব্রত গ্রহণ করেছেন। তাই সার্ত বলতে চান, আমরা ভবিষ্যতে যা চাই, তা-ই অতীতকে অতিক্রম ক'রে আমাদের কাজের ভিতর দিয়ে রূপ পেতে চায়। যে-কোনো সামাজিক সমগ্রতার ব্যাখ্যায় এই বহুধা-বিভক্ত আচরণ সমূহের ব্যাখ্যা ক'রে তাদের ঐক্যকে খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু এই সমগ্রতা ব্যাখ্যায় নতুন যুক্তিবাদ দরকার।

২। ফ্লবোয় অনেক সময় বলেছেন, "মাদাম বোভ্যারি, আমিই।" তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়, তিনি মেয়েদের মতোই অস্থিরচিত্ত ও ভীরু ছিলেন।

কিন্তু এই যে নিজেকে রমণী-অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভেদীকরণ, তা শুধু তাঁর জীবনী আলোচনা ক'রে বোঝা যাবে না। বরং তাঁর সাহিত্যকীর্তি ও জীবনীর উপাদানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যাবে। জীবনের ঘটনাসমূহ তার সাহিত্যকে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সাহিত্যও জীবনের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। জীব ও সাহিত্যের মধ্যে ব্যবধান আছে। ফ্লবের-এর সাহিত্যে তাঁর যে-আত্মরতি পাওয়া যায়, তা আমাদের কাছে যে-প্রশ্ন তোলে—তার উত্তর খুঁজতে হলে যে-পারিবারিক জীবন তিনি অতিবাহিত করেছিলেন, তা পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু সেখানেও তাঁর ব্যক্তিগত বিচারকে না উপলব্ধি করলে তাঁর জীবনকে বুঝব না। আবার জীবনকে বুঝতে তাঁর সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, যদিও সাহিত্যে জীবনের প্রতিরূপ পাওয়া যায় না, কতকগুলি সূত্র পাওয়া যায়, যা দিয়ে জীবনের রহস্যকে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা যায়। কিন্তু এই বিশ্লেষণের দিক ছাড়া আর-একটি সংশ্লেষক দিক আছে, যা ভবিষ্যদ্‌গামী। ফ্লবের শৈশবের অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে নিজেকে সাহিত্য-রচনায় নিমগ্ন করেন এবং বাস্তব অবস্থা থেকে তাঁর বিচ্ছিন্ন সত্তা মাদাম বোভ্যারিতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখার উদ্দেশ্য নিজেকে বাস্তব জগতে প্রকাশ করা এবং বাস্তব ও সামাজিক অবস্থার স্তরের ভিতর দিয়ে যে-সাহিত্য শেষ পর্যন্ত তিনি রচনা করেছেন, তার মধ্যে বহুবিধ গঠনের সমন্বয় হয়েছে। এই অতীতমুখী ও ভবিষ্যদমুখী বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক পদ্ধতি দ্বারা অস্তিবাদ ব্যক্তি ও যুগের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে চাইছে, যে-সম্পর্ক শুধু পাশাপাশি অবস্থানের নয়, সজীব দ্বন্দ্বের সম্পর্ক।

৩। প্রত্যেক মানুষ উদ্দেশ্য দ্বারা নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করে। যাকে আমরা অস্তিত্ব বলি, তা হল বাস্তব জগতে উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করা। কিন্তু উদ্দেশ্যকে নানাভাবে রূপায়িত করা যেতে পারে, কারণ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পথ বেছে নেয়। আর সেখানেই রয়েছে স্বাধীনতা। যে-দর্শনে এই স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয় না, তা মানুষের সকল কর্ম-প্রচেষ্টাকে বাস্তব অবস্থায় রূপান্তরিত করতে চায়। কিন্তু তাতে মানুষের জীবনের জটিলতাকে অগ্রাহ্য করা হয়, পরিবর্তনশীলতাকে অচলতায় দাঁড় করানো হয়। মানুষ প্রত্যেক অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে সম্ভাবনার দিকে এগুচ্ছে। এইভাবে অবস্থা ও সম্ভাবনার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে, তা পরবর্তী স্তরে সমন্বিত হচ্ছে। অতএব, মানুষের সাংস্কৃতিক সত্তাকে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এক করা যায় না, কারণ বাস্তব অবস্থাকে কাজে

লাগিয়ে নতুন স্তরের সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের আচরণকে বুঝতে হলে বাস্তব অবস্থা থেকে অতিক্রান্ত হয়ে চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের সাহায্যেই তা বুঝতে হবে।

আচরণ-উপলব্ধির একটি উদাহরণ সার্ত দিয়েছেন। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ এই বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে আমার বন্ধুর জানালা খোলাটা বুঝতে পারি তখনই, যখন গরম লাগার অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে যুক্ত হয়। দরজা-জানালার একটি বিশেষ উপকরণগত অর্থ আছে, সেগুলি শুধু জড় পদার্থ নয়। বন্ধুর আচরণে যে-ব্যবহারিক জগত প্রকাশিত হচ্ছে—তার দেশ-গত আকার, অভিজ্ঞতা-লব্ধ দেশ এবং জড় বস্তুতে যে উপকরণগত অর্থ সন্নিবিষ্ট হয়েছে—তাই দিয়ে বন্ধুর উদ্দেশ্য বোঝা যায়। বন্ধুর আচরণ ঘরের অভ্যন্তরকে এবং ঘর বন্ধুর আচরণকে বুঝতে সাহায্য করে। আচরণ-উপলব্ধি আমার বাস্তব জীবনের সমগ্রীকরণ যাতে আমি নিজেকে, প্রতিবেশীকে ও পরিবেশকে একটি সমন্বিত ঐক্যে ধরবার চেষ্টা করি। বাস্তব পদার্থের অর্থ আছে, কারণ আমরা অর্থপ্রদান-কারী সত্তা। যে-কোনো সামাজিক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লক্ষ্যের প্রতি সম্পর্ক মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার ভিত্তিতে তার আচরণ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝা যায়। আর, লক্ষ্য হল বাস্তব অবস্থা অতিক্রম ক'রে ভবিষ্যতের দিকে যাওয়া।

Problem of method-এর শেষে Critique of Dialectical Reason-এর মূল গ্রন্থ শুরু হচ্ছে। প্রথমে সার্ত একটি ভূমিকাতে গোঁড়া দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও বিচারমূলক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির তুলনা করেছেন। তাঁর মতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে কিভাবে ইতিহাস গ'ড়ে ওঠে, তাই দেখাতে চায় এবং এই তত্ত্বে প্রতিটি মুহূর্তের এমন একটি স্বকীয়তা আছে যাকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করা চলে না। তাই এর নীতিগুলির মধ্যে কোনো যান্ত্রিকতা নেই। সার্ত চান, বস্তুর বিকাশের মধ্যেই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং তার জন্য শুধু বিশ্লেষক যুক্তি বা দ্বান্দ্বিক যুক্তির যে-কোনো একটি গ্রহণ করলে চলবে না। সমস্যা হল, মানুষের জগতকে বুঝতে হলে কিভাবে বুঝতে হবে কিংবা জগত যখন আমাদের কাছে বোধ্য, তখন আমরা কিভাবে চিন্তা করছি? মার্কসবাদ এই উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ইদানীং অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মার্কসবাদের গতি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। দ্বান্দ্বিক যুক্তিতে বস্তুকে জানা যায়, কিন্তু বস্তুর গতিও দ্বান্দ্বিক। তাই আমাদের জানার পদ্ধতি এবং বাস্তবের গঠন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। দ্বান্দ্বিক যুক্তি একটি স্তরকে অতিক্রম ক'রে সমগ্রতার দিকে এগিয়ে যায়। দ্বান্দ্বিক যুক্তিকে বুঝতে

হলে তার বিচার করা দরকার, তার সীমা ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা দরকার, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয় নি। কিন্তু এই বিচার সম্ভব হয় নি গোঁড়া মার্কস-বাদের জন্য। মার্কস বলেছেন, মানুষের বাস্তব অস্তিত্বকে যুক্তি-জ্ঞানে নিঃশেষিত করা যায় না। কিন্তু যুক্তি একই সঙ্গে বাস্তব এবং বাস্তবের জ্ঞান। যুক্তি দ্বান্দ্বিক নিয়মে চলে, যেভাবে ইতিহাস চলে। বাস্তবের জ্ঞান এবং জ্ঞানের বাস্তবের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব আছে, তা দূর হতে পারে যদি একথা মানা যায় যে যুক্তি বাস্তবের দ্বারা গঠিত হচ্ছে এবং বাস্তবকে গঠন করছে। মার্কস তত্ত্বগত একবাদ বিশ্বাসে এবং বাস্তবকে যুক্তিতে পর্যবসিত করতে না চেয়ে যুক্তিকে বাস্তবে পর্যবসিত করেছেন। একবাদী জড়বাদ বাস্তব ও চিন্তার দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে। মার্কসবাদ চিন্তার ক্ষেত্রে এই দ্বান্দ্বিকতা অস্বীকার ক'রে মানুষকে জাগতিক বস্তুতে পরিণত করেছে। মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে মানুষ বর্জিত।

কিন্তু জ্ঞানের অর্থ বাস্তবের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা দেখাতে গিয়ে শুধু বস্তুর সমাবেশের কথা বলেছে। কিন্তু যে-জগত কোনো মানুষের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে না, তার কথা বলা এক ধরনের প্রাক্-জ্ঞানীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এতে মানুষকে প্রকৃতির মাঝখানে অন্য বস্তুর মতো দ্বান্দ্বিক নিয়মের অধীন বলে মনে করা হয়েছে। প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা এতে প্রাক্-জ্ঞানীয় হয়ে পড়ছে এবং মানুষ প্রকৃতির বাইরে অবস্থিত। এর ফলে চিন্তার উদ্দেশ্যগত রূপকে বোঝা যায় না। চিন্তা বস্তুর অপটু নিষ্ক্রিয় প্রতিচ্ছবি হয়ে পড়ে, কিন্তু বাস্তবচিন্তা ইতিহাসের গতিতে অংশ গ্রহণ ক'রে বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে যায়। যাকে চিন্তার অধিকারী বলা হয়, সে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র একটি বস্তুতে পরিণত হলে চিন্তার আসল বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রকৃতি যে দ্বান্দ্বিক নিয়মে চলছে, তার সত্যতাকে বিশ্বাস করতে হয় এবং তার ফলেই সার্বিক চেতনায় বিশ্বাস করতে হয় এবং তার ফলেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ গোঁড়া ভাববাদে পরিণত হয়।

'প্রকৃতি দ্বান্দ্বিক'-এর কোনো পরীক্ষাগত প্রমাণ নেই, কারণ বস্তুর দ্বন্দ্ব বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে, কিন্তু প্রকৃতির সব অবস্থায় তো বৈজ্ঞানিকের উপস্থিতি নেই। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে দ্বান্দ্বিকতা সম্বন্ধে দ্বান্দ্বিক যুক্তির কিছু করবার নেই। তবে ইতিহাসে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক যুক্তির প্রয়োগ বোঝা যায়। যে-বস্তুবাদ বস্তুর প্রকৃত সম্পর্ক

বিচার করে না, তা বস্তুগত ভাববাদ। চিন্তা ব্যক্তি-মানুষের চিন্তা এবং বাস্তব জগত বিশেষ পরিবেশে মানুষের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে প্রকাশিত। এঙ্গেলস হেগেলের মতোই বস্তুর উপর চিন্তার নিয়ম চাপিয়েছেন। দ্বান্দ্বিক যুক্তির প্রকৃত বিচরণক্ষেত্র হল ইতিহাস এবং সমাজ। যে প্রকৃতি থেকে বৈজ্ঞানিক নির্বাসিত, তার উপরে দ্বান্দ্বিকতা চাপানো যুক্তিহীন। কারণ দ্বান্দ্বিকতা মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বেই গ'ড়ে ওঠে।

অবশ্য, সার্ত বলতে চান না, জড় জগতে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নেই। তাঁর মত হল দ্বান্দ্বিক যুক্তি দিয়ে প্রকৃতিকে আমরা পরিচালিত করতে চেষ্টা করি, কিন্তু তা জড় প্রকৃতির সাংগঠনিক রূপ নয়। মানুষের উদ্দেশ্য এবং বাস্তব অবস্থার দ্বন্দ্বে দ্বান্দ্বিক যুক্তি জন্ম নেয়। অতএব, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলে যদি কিছু থাকে তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এই বস্তুবাদ সামাজিক শ্রেণীবিন্যস্ত জগতে রূপ পেতে পারে, কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একটি তত্ত্বগত প্রকল্প; কারণ ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশে উদ্দেশ্যের দ্বান্দ্বিক যৌক্তিকতা আবিষ্কার ক'রে তাকে শর্তহীনভাবে জড় জগতে আরোপ করা হয় এবং সেখান থেকে তাকে সমাজে প্রেরণ করা হয় এই ধারণায় যে প্রাকৃতিক নিয়মই অলৌকিকভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃত দ্বান্দ্বিকতা বুঝতে হলে আমাদের একথা জানতে হবে যে মানুষ অন্যান্য বাস্তব পদার্থের মতোই কোনো বিশেষ অধিকার ভোগ করে না এবং প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা একদিন হয়তো আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু দ্বান্দ্বিক যুক্তি মিলবে ইতিহাসের বাস্তব উপাদানে। দ্বান্দ্বিক যুক্তিকে বুঝতে হবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি দিয়ে এবং বাস্তব ও জ্ঞানের যে-পার্থক্য, তাতে এক অন্যে পরিণত হয় না। দ্বান্দ্বিকতার ক্ষেত্রে বাস্তব জ্ঞানের অস্বীকৃতি এবং জ্ঞান বাস্তবের অস্বীকৃতি; দ্বান্দ্বিকতার জ্ঞান দ্বান্দ্বিক গতির মধ্যে মেলে। "মানুষ প্রাক্-অবস্থার ভিত্তিতে ইতিহাস সৃষ্টি করে।" প্রথম স্তরে মানুষ দ্বান্দ্বিকতার অধীন, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে সে দ্বান্দ্বিকতা সৃষ্টি করে। এই দ্বান্দ্বিকতাকে জীবনে ভোগ করাই আমাদের নিয়তি। দ্বান্দ্বিকতা সমগ্রীকরণের নীতি। গোষ্ঠী, সমাজ, ইতিহাস ব্যক্তির উপর আধিপত্য করে, কিন্তু এ-সবই তো ব্যক্তিদের সৃষ্টি। সমাজের অভাব এবং প্রয়োজনেই মানুষের জীবনযাত্রা দ্বান্দ্বিক নিয়মে বোঝা যায়। বহু একক সমগ্রীকরণ যে বাস্তব সমগ্রীকরণ রচনা করে, তার ভিত্তিতে দ্বান্দ্বিকতা বোঝা যায়। দ্বান্দ্বিক যুক্তি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়, কারণ দ্বান্দ্বিকতা

কর্মের সজীব যুক্তি। উদ্দেশ্য, সমগ্রীকরণ এবং সামাজিক অগ্রগতি দ্বান্দ্বিকতা দ্বারা বোঝা যাবে। তাই দ্বান্দ্বিকতার অভিজ্ঞতা উদ্দেশ্যের দ্বান্দ্বিকতা। সার্ত্র আলোচনা করতে চাইছেন: ইতিহাসের জ্ঞানকে বুঝতে হলে কি কি শর্ত জানা দরকার? দ্বান্দ্বিক যুক্তির ভিত্তি ও সীমা কি?

এমন একটি চিন্তার কাঠামো দরকার যা উদ্দেশ্য এবং সমগ্রীকরণের জটিল সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করবে। তা হল, দ্বান্দ্বিক যুক্তি এবং তা জীবনের অভিজ্ঞতাতেই পাওয়া যায়, কারণ তা স্বচ্ছ। দ্বান্দ্বিক যুক্তিতে বিভিন্নকে একটি সমগ্রে সন্নিহিত করা হয় এবং জ্ঞানের বেলায় সমগ্র জানার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। আমাদের দেখতে হবে, বাস্তবের কোথায় কোথায় এই সমগ্রীকরণ হচ্ছে। সমগ্রীকরণের বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত অংশে তা প্রতিফলিত এবং জ্ঞাত ও জ্ঞাত বিষয়ের দ্বান্দ্বিক অভিজ্ঞতা। মানুষের ইতিহাসেই সমগ্রীকরণ ঘটছে। এর ভিতর দিয়ে সাধারণ বৈশিষ্ট্য একক রূপ পাচ্ছে। ব্যক্তি সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, আবার সমগ্রকে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে। ইতিহাস ব্যক্তিকে সমগ্রের সঙ্গে যেভাবে যুক্ত করছে, তার ভিত্তিতে ব্যক্তি স্বীয় উদ্দেশ্যের দ্বারা সেই সমগ্রতাকে নিজের ক'রে ইতিহাসকে গ'ড়ে তুলছে। তাই, বাস্তব পরিবেশকে স্বচ্ছভাবে বুঝতে হলে যে উদ্দেশ্যগুলি তাকে সংগঠিত করছে তা জানা দরকার। ইতিহাস যদি বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যের সমষ্টি থেকে সমগ্রীকরণের দিকে যাত্রা করে, তবে প্রশ্ন হতে পারে বিভিন্ন সমগ্রীকরণের মাধ্যমে এক ধরনের উদ্দেশ্য কিভাবে সৃষ্ট হয়। আমাদের দেখতে হবে, পারস্পরিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-মানুষ, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী কিভাবে ইতিহাসকে গ'ড়ে তোলে। আমাদের পদ্ধতি হল সংশ্লেষক প্রগতিক্রম যা সম্ভব করতে বিভিন্ন ব্যবহারিক সংঘাতের গঠনকে দ্বান্দ্বিক যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে। সার্ত্রের গ্রন্থের দুটি ভাগ একত্রে দেখাতে চেষ্টা করবে, বহির্জগতকে জানাবার বেলায় বাস্তবকে অন্তরীকরণের একটি স্তর আছে, যা অনতিক্রম্য; আবার পুরোপুরি সব বাস্তবকে অন্তরীকৃত করা যায়না; কিছু অনতিক্রম্য বাস্তব থেকে যায়। উদ্দেশ্যকে যেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, তা-ই বোধ্য। কিন্তু এমন কোনো কোনো কাজও আছে, যেখানে উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাদের যুক্ত করা যাচ্ছে না।

দ্বান্দ্বিকতা বাস্তব হতে হলে চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। (ক) আবশ্যিকতা এবং স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা হিসেবে উদ্দেশ্যের প্রকৃতি কি? (খ) সমগ্রসমূহ কিভাবে সাধিত হয়? (গ) ঐতিহাসিক ভবিষ্যত কি? (ঘ) উদ্দেশ্য এবং

অন্তসব বাস্তবতার বাস্তব ভিত্তি কি ? মানুষ এবং বাস্তব অবস্থা পরস্পরের দ্বারা যুক্ত। যখন বিভিন্নতা মিলে সমগ্র হয়, কে তা করে থাকে ? প্রাথমিক সমগ্রীকরণের সম্পর্ক হল মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে বাস্তব জগতের সঙ্গে আবদ্ধ ; বাস্তবে যা নেই, তা মানুষের দ্বারা অন্তরীকৃত হয়ে প্রয়োজন হিসেবে অনুভূত হয়। প্রয়োজন সমগ্র বাস্তবতায় একটি শূন্যতার সৃষ্টি করে এবং যে বাস্তব জড়, তা উদ্দেশ্যের পটভূমিকায় সম্ভাবনার যন্ত্র হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্যই জড় ও অজড় সমন্বিত হয়। উদ্দেশ্য ও বাস্তবতার প্রতি স্তরের সংঘাত দ্বান্দ্বিক যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়। একা মানুষ প্রয়োজনের দ্বারা জড় পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত, এ-রকম হয়না। যে-কোনো বাস্তবের সঙ্গে বহু মানুষের সম্পর্ক যুক্ত, যার ফলে বাস্তব বহু-অর্থ-যুক্ত। বাস্তবতা উদ্দেশ্যের শর্ত, কিন্তু উদ্দেশ্য বাস্তবতাকে নতুন অর্থ দেয় ; কিন্তু ঠিক তার অর্থ কি আমি ধরতে পারিনা, কারণ অনেকেই তো বাস্তবকে অর্থ দেয়। আমি বাস্তব নিয়ে যে-সমগ্র গড়তে চাই, অন্যের উদ্দেশ্যের কাছে আমি-সহ তা তার সমগ্রীকরণের অংশ। আবার দুজন মানুষ একটি বাস্তবকে কেন্দ্র ক'রে কিছু গড়তে চাইলে, তাদের ঐক্য কোথায় তা তারা বুঝতে পারে না। তৃতীয় কোনো ব্যক্তি তা বুঝতে পারে। পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য আদর্শ রাষ্ট্রে হতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগত তো আদর্শ রাষ্ট্র নয়। পারস্পরিক সম্পর্ক ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক হতে পারে। প্রথমটিতে একজন আর-একজনের উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করতে পারে কিংবা দুজনে কোনো যুগ্ম উদ্দেশ্যে একজোটে কাজ করতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে একজন আর-একজনকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে এবং তাতেই সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এই সংঘর্ষের ভিত্তি হল অভাব এবং লক্ষ্য হল অপরের উপর জয়। সাধারণ কর্মপ্রচেষ্টা, পারস্পরিক স্বার্থ—সবই সত্য ; কিন্তু যে-বস্তু তাদের প্রয়োজনে লাগে, তারই জন্য পারস্পরিক ঐক্য নষ্ট হতে পারে ; কারণ উদ্দেশ্য যাই হোক, দুইয়ের প্রয়োজন একই বস্তু। কিন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঐক্য সাধিত হতে পারে তৃতীয় কোনো সমগ্রতায়, যেখানে তাদের ঐক্য নেহাতই জড় বস্তুর ঐক্য। সাধারণ কাজের মাধ্যমেও দ্বন্দ্ব আবৃত থাকতে পারে, যেমন একসঙ্গে দাঁড় টানায় ; কিন্তু সেখানে ব্যক্তিদের স্বাতন্ত্র্য অনুপস্থিত।

ইতিহাস মৃত অতীতের নয়, বরং ভবিষ্যত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে তার সমগ্রীকরণ হয়। জড় বস্তু মানুষের বিরোধী, কিন্তু তাই ইতিহাসের

ঐক্যের ভিত্তি এবং মানুষ মানুষের সঙ্গে বিরোধের মাধ্যমে মিলিত হয়। বাস্তব পরিবেশ মানুষের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ শক্তি হয়ে লক্ষ্যকে বানচাল ক'রে দেয়। মানুষের উদ্দেশ্যই যেন উদ্দেশ্যহীনতায় পরিণত হয়। বাস্তব থেকে এই বিচ্ছিন্নতা আরও অনেক বিচ্ছিন্নতায় প্রকাশিত হয়। ইতিহাসে আসল সম্বন্ধ হল প্রয়োজন ও অভাবের। বাস্তব জগতে অভাব গঠিত হচ্ছে প্রয়োজনের ভিত্তিতে। আমাদের ইতিহাসের ভিত্তি হল অভাব, এবং সমাজের সর্বস্তরে সাম্যের অভাব থেকেই ইতিহাস গঠিত হচ্ছে। অভাব থেকে বোঝা যায়, সমস্ত পৃথিবীই সব মানুষের ভোগ্যবস্তু এবং যথেষ্ট পরিমাণে মানুষের প্রয়োজন জগত মেটাতে পারে না বলেই, সেদিক দিয়ে সমস্ত মানুষের মধ্যে একটি অভাবব্যঞ্জক ঐক্য আছে, যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অপর মানুষের চোখে ভীতিপ্রদ। পারস্পরিক সম্পর্ক অভাব দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই অপর ব্যক্তি আমার কাছে অ-মানুষ যার, একমাত্র লক্ষ্য অন্য মানুষের ধ্বংস। আমি যদি অপর ব্যক্তির অ-মানবিকতা ধ্বংস করতে চাই, তার মানবিকতাও আমাকে ধ্বংস করতে হবে, আমার লক্ষ্য হবে তার স্বাধীনতা বিনষ্ট করা। যতদিন অভাব আছে, অশুভকে দূর করা যাবে না। অভাব অন্তর্ভুক্ত হয়ে যে-অভাবাত্মক ঐক্য সৃষ্ট হয়েছে, তা পারস্পরিকতার মানবিকতাকে নষ্ট ক'রে পুনরায় মানুষের মধ্যে বিরোধের রূপে বাস্তব জগতের একই ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। অভাব মানুষকে মানুষের বিরোধী ক'রে তোলে। বাস্তব জগতে মানুষ দুভাবে বিচ্ছিন্ন—বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের কাজের ছাপ পড়ে, তা হল মানুষের বাস্তবীকরণ; কিন্তু বাস্তব পরিবেশ কাজটিকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষ অন্য মানুষের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বারা শাসিত, কারণ তার উৎপাদনই গণ্য, সে নয়; আবার মানুষ বাস্তবকেও নিয়ন্ত্রিত করছে।

বাস্তবকে উদ্দেশ্যের দ্বারা মানুষের কাজে লাগানো এবং কিভাবে কাজে লাগানো হয়—তার উপর সমাজের ভালোমন্দ নির্ভর করে। দুরকমের মানবিক উদ্দেশ্য দেখা যায়—একটি সাধারণ পরিকল্পিত লক্ষ্য থাকতে পারে, যাতে সাধারণ শ্রেণীগত ঐক্য আসে; আর একটি সারিগত ঐক্য: যাতে পারস্পরিক সংঘাতই প্রধান। উদ্দেশ্য জড় বস্তুর বিভিন্নতায় ঐক্য এনে একটা ব্যবহারিক ঐক্য গ'ড়ে তোলে। শুধু অভাবই মানুষকে কাজ করায় না, জড় বস্তু তার প্রয়োজনে কে

অনুভূতি সৃষ্টি করে, তাই কাজের সূচনা করে। মানুষের উদ্দেশ্য বাস্তব থেকে কতখানি ভ্রষ্ট হয় এবং অন্য মানুষের উদ্দেশ্য তা কতখানি নষ্ট করে, তারই ভিত্তিতে শ্রেণী স্বার্থ গড়ে ওঠে, কারণ মানুষ নিজেকে স্বাধীন উদ্দেশ্য-প্রণেতা হিসেবে আবিষ্কার করতে চায়।

ইতিহাসের দ্বন্দ্বের ভিত্তি হল ব্যক্তিদের কর্মপ্রচেষ্টার দ্বান্দ্বিক ভিত্তি। আবশ্যিকতা এবং বাধার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং কাজ এক হতে পারে না। ব্যক্তিভেদে কাজের পরিবর্তন হয়, তাকে বলা হয় পরি-বর্তায়ন; যে-বাস্তব ক্ষেত্রে কর্ম ঘটছে, তা উদ্দেশ্যকে জড়ীভূত করে. কর্মফলকে পরিবর্তিত করে দেয়। মানুষের দলগত কর্ম-প্রচেষ্টায়—যথা দলে, ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীতে, সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীতে, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে মানুষ যে বিচ্ছিন্ন হয়, তার কারণ বাইরের বাধা নয়। প্রত্যেক মানুষ বস্তু এবং অপর মানুষের উপর নিজের মূর্তি অঙ্কিত ক'রে দেয়, তা সত্ত্বেও সে যা করতে চায়, তা হয় না। এইটেই জীবনের প্রাথমিক বিচ্ছিন্নতা।

মানুষের উদ্দেশ্য জড়ের অধীনে তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মানুষের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। গোষ্ঠীর ভিতর দিয়ে বিভিন্ন মানুষের উদ্দেশ্য ঐক্য পেতে চায়, কিন্তু গোষ্ঠীর মধ্যে কেমন একটা জড়ত্ব আছে, যা ব্যক্তির উদ্দেশ্যকে গ্রাস করে। গোষ্ঠির মধ্যে একটা পারস্পরিক অন্তরীকরণ চলে, যার ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন গ'ড়ে ওঠে, তেমনি সংঘাতও দেখা দেয়। এ-ধরনের সম্বন্ধকে বলা যায় সারিগত ঐক্য, যেমন বাসের জন্য অপেক্ষমান এক সারি মানুষ, তারা নির্জন ব্যক্তিদের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। পারস্পরিক অন্তর্জগতের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই। নির্জনতা ছাড়া সারিগত ঐক্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল একজন অপরজনের স্থান গ্রহণ করতে পারে। যে-বস্তুটি এই ঐক্য নির্ধারণ করছে, তাতে সকলের পক্ষে স্থান না হতে পারে, তাই প্রত্যেকেই প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। সারিগত ঐক্যের মধ্যে একটি ব্যবহারিক জড়ত্ব আছে, কারণ সকলেই সারি অনুযায়ী আচরণ করছে। যেসব ঐক্য সারিগত নয়, তাতেও এই জড়ত্ব আছে, সার্ত্র মনে করেন। সারির ঐক্যের কারণ অন্য স্থানে অন্য ব্যক্তিও এর কারণ হতে পারে, যেমন ইহুদীদের সারিগত ঐক্যের কারণ, যারা ইহুদী নয় তারা। সারিগত ঐক্যে কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সম্ভব নয়। এর ঐক্য একটি নেতিবাচক সমগ্রতা। মার্কস দেখিয়েছেন,

ব্যক্তিদের সমষ্টিগত কাজ সারিগত ঐক্যে রূপ পেতে পারে না, কারণ সারির বৈশিষ্ট্যে একটা ব্যবহারিক জড়ত্ব আছে, যা অতিক্রম করতে পারলে দ্বান্দ্বিক অভিজ্ঞতা শুরু হবে।

ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং গোষ্ঠী উদ্দেশ্যের মাঝে আছে ব্যবহারিক জড় পরিবেশ, যা দুটি উদ্দেশ্যরই বিরোধী। নিম্ন প্রদর্শিত উপায়ে এদের সম্পর্ক বুঝতে হবে।

(১) স্বাধীন উদ্দেশ্যের পরিবেশকে একীকৃত করার চেষ্টা (২) বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টায় এক অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট করে (৩) স্বাধীন উদ্দেশ্য অচলতায় পর্যবসিত হয় (৪) জড় অবস্থায় অন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি করে (৫) প্রত্যেকে বস্তুর নিষ্ক্রিয় প্রভাবে নিষ্ক্রিয় কর্মে পরিণত হয়।

গোষ্ঠীতে যে জড়তার সৃষ্টি হয়, তাই মানুষের অ-মানবিকতা। কিন্তু এই জড়ত্বকে দ্বান্দ্বিক জীবনের মাধ্যমে মানুষ অতিক্রম করে।

সারির মধ্যে যে বিরোধ আছে, তা-ই গোষ্ঠীগত ঐক্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সারিতে যে-পারম্পরিকতা নষ্ট হয়, তা পুনরুদ্ধার ক'রে গোষ্ঠীর ঐক্য গ'ড়ে ওঠে। প্রথম পর্যায়ে তা হল মিলিত হবার গোষ্ঠী। প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই সার্ত্র একজন তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলছেন, যে অপর দু-ব্যক্তিকে তার সমগ্রতার অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়ে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা সমগ্রীকৃত হতে পারে। মিলিত হবার গোষ্ঠীতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উদ্দেশ্য আমার বলে মনে করে। গোষ্ঠীর সর্বত্রই ঐক্য দেখা দেয়। এই ঐক্য উদ্দেশ্যগত কর্মের ঐক্য এবং যে-সর্বব্যাপক ঐক্য গ'ড়ে ওঠে, তা সর্বব্যাপক স্বাধীনতা এবং তার মধ্যে আমার একাকীত্ব এবং সর্বব্যাপকত্ব আছে। কিন্তু সারি থেকে গোষ্ঠীতে পরিবর্তন আশা, ভয়, স্বাধীনতা এবং অত্যাচারকে নিয়ে আসে। গোষ্ঠী একটি সমগ্র উদ্দেশ্যকে সাধিত করবার প্রচেষ্টায় ব্যবহারিক জড় পরিবেশকে দূর ক'রে সাধারণ কাজের ক্ষেত্রে একটা সমষ্টি গ'ড়ে তোলে। কিন্তু গোষ্ঠী গ'ড়ে ওঠার পর দুটি সম্ভাবনা দেখা যায়, ঐক্য অথবা অনৈক্য, স্থায়িত্ব অথবা বিনষ্ট। গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রত্যেকের মধ্যে সাধারণ ঐক্যের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তা করা যেতে পারে শপথের মাধ্যমে। এই শপথের ভিতর দিয়ে আমি অন্য সকলের কাছে গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি। কিন্তু এইভাবে যে গোষ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে, তার দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হচ্ছে। সকলের সব সময় একটা উৎকণ্ঠা থাকে যে গোষ্ঠী ভেঙে যাবে। ব্যক্তির মনে ভয়

থাকে যে সঙ্কল্প ঠিকমতো পালিত না হলে তার স্বাধীনতা বিনষ্ট হবে। আমার শপথ অন্যকে যেমন নিরাপত্তা দেয়, তেমনি আমি কর্তব্যচ্যুত হলে তারা যে শাস্তি দেবে, সেই ভয়ও আছে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গোষ্ঠীর ভিত্তি তাই ভয় এবং অত্যাচার। আবার গোষ্ঠীতে একই অধিকার, দায়িত্ব-সচেতনতাও আছে। গোষ্ঠী যখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তখন বিভিন্ন পারস্পরিক কর্মক্ষেত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু গোষ্ঠীর যে কাঠামো, তার মধ্যেই মূর্ত উদ্দেশ্য কর্ম-প্রচেষ্টায় বাস্তব রূপ পায়।

প্রত্যেক ব্যক্তিই সঙ্কল্পবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মে দেখে, আগে থেকেই কিছু সঙ্কল্প তার উপর ন্যস্ত রয়েছে। সামাজিক যে-সমস্ত প্রথা, অঙ্গীকার, শপথ রয়েছে; তাই ব্যক্তির স্বাধীনতার ভিত্তি, যার উপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্যকে প্রয়োগ করার কথা ভাবে। সামাজিক কাঠামোর একটা জড়তা আছে, তা উদ্দেশ্যগত ঐক্যের দ্বারা দূর করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি সমাজের অংশ বলে এই জড়তারও সে অংশীদার। সামাজিক কাঠামোর দুটো দিক আছে: জড়ত্বের দিক এবং সমষ্টিগত গতিশীলতার দিক। এখানেই প্রশ্ন ওঠে: সামাজিক কাঠামোর দ্বান্দ্বিকতা কি? সমাজগত ব্যক্তি হিসেবে গোষ্ঠীর সমস্ত পারস্পরিক সম্বন্ধ, অধিকার, শক্তি ও অত্যাচার এবং ত্রাস সবই ব্যক্তি গ্রহণ করেছে। নিজের উদ্দেশ্যকে সুগঠিত করার মধ্য দিয়ে সে গোষ্ঠীকে গ'ড়ে তোলে। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ব্যক্তির থেকে অনেক বৃহৎ। যে উদ্দেশ্য গোষ্ঠীর সাধারণ উদ্দেশ্য—তাকে সাধিত করতে বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম করতে হয়। ব্যক্তিও গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি ক'রে তার প্রয়োগের ভিতর দিয়ে গোষ্ঠীকে অতিক্রম করতে পারে।

ব্যক্তি গোষ্ঠী থেকে আলাদা হয়েও একযোগে যে-কাজ করে, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আদেশ-বক্তৃতার শাসনের যন্ত্রে। একটা চুক্তির ভিত্তিতে শাসন চলে, যার দ্বারা বিভিন্নতাকে একের পর্যায়ে দাঁড় করানো হয়। চুক্তিটা আমরা করি, যে-আমরা সমগ্রতার পারস্পরিকতায় নিবদ্ধ। গোষ্ঠী-ব্যক্তি নিজেকে রূপায়িত করতে এমন একটা হিংসার পরিবেশে নিজেকে গ'ড়ে তুলছে, যা সে আগে থেকে বুঝতে পারে না। কিন্তু এই হিংসার পরিবেশ, সমগ্র গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যের শক্তি। সেই শক্তিতে ব্যক্তির উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা হারিয়ে যায়! এ-রকম কি ক'রে ঘটে? গোষ্ঠীর সঙ্কল্পে আমরা আমাদের বিভিন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে ঐক্য আনতে চাই। যে-অধিকার এবং দায়িত্ব সৃষ্টি হয়, তা আমাদের স্বাধীনতা

যারা স্বষ্ট বিচ্ছিন্নতা। এর ফলে আবার বিভিন্নতা আসতে পারে এবং তা দূর করা যেতে পারলে গোষ্ঠীর হিংসা-ত্রাস এবং ভ্রাতৃত্বকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে! এইভাবে যে গোষ্ঠী গ'ড়ে ওঠে, তা বস্তু বিশেষ এবং তা উদ্দেশ্যকে গঠিত করতে পারে না। গোষ্ঠীর জড়ত্ব ব্যক্তিদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, কিন্তু তারাই তা গ'ড়ে তুলেছে। সার্ত্র উদ্দেশ্য এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা পার্থক্য ক'রে দেখিয়েছেন, সামাজিক উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত একটা নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়, যা ব্যক্তিদের স্বাধীন উদ্দেশ্যের বিপরীতে যায়। গোষ্ঠীর মিলিত উদ্দেশ্য গোষ্ঠীর সঙ্ঘ-জীবনকে গড়ে তুললেও গোষ্ঠীর জীবন এবং ব্যক্তির জীবনে একটি অপ্রতিরোধ্য বৈপরীত্য আছে। গোষ্ঠীবদ্ধতায় দুরকমের ব্যর্থতা আছে—যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সম্মতি দিয়েছে: ব্যক্তি গোষ্ঠীকে ছাড়তে পারছে না, আবার গোষ্ঠীর সঙ্গে এক হতে পারছে না। গোষ্ঠী জীবনে যখন আরও জড়ত্ব আসে, তখন সঙ্ঘবদ্ধতা বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যায় এবং যে পারস্পরিকতা সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীতে ছিল, তার পরিবর্তে আবার প্রতিষ্ঠানগত সারিবদ্ধতা দেখা দেয়। সঙ্ঘ সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় ব্যক্তি যে শক্তি হারায়, তা একটি কেন্দ্রীয় শক্তিতে গুপ্ত হয়। যে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, তা স্থায়িত্ব বজায় রাখতে আইনের আশ্রয় নেয়। প্রতিষ্ঠান সারিবদ্ধ ব্যক্তি-বিভিন্নতার ঐক্য। সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি নিজের উদ্দেশ্যের মধ্যে মিলিত-গোষ্ঠীর শক্তিকে সঞ্চিত করে। প্রতিষ্ঠান নিষ্ক্রিয় মানুষের মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে কাজ করে। সার্বভৌম শক্তি মৃত উদ্দেশ্যসমূহের সমষ্টি। অক্ষম সারির উপর তার শক্তি আরোপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, সার্বভৌম শক্তি এবং সারিগত জনতার মধ্য দিয়ে আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকতর বিচ্ছিন্নতা প্রকাশিত হয়।

গোষ্ঠী যে উদ্দেশ্য সাধিত করতে চায়, তার প্রয়োগে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

(১) গোষ্ঠীকে নিজের বাইরে কাজ করতে হয় বলে, নতুন ব্যবহারিক ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। অন্য গোষ্ঠীর ঐক্য এর কাছে ভয়ের বস্তু। (২) অন্য গোষ্ঠীর কর্ম-প্রচেষ্টায় বিচ্ছিন্নতা আসে। তার কর্ম-প্রণালীর বহু অর্থ-সম্ভাবনা থাকতে পারে। একমাত্র ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি সমন্বিত হতে পারে। গোষ্ঠী যে জড়ত্বকে দমন করতে চায়, তা বাইরের জগতে চাপিয়ে দেয় এবং এই ভাবে আবার জড়ত্বকে গ্রহণ করে। গোষ্ঠীর

বাইরের কাউকে প্রভাবিত করতে গিয়ে ব্যক্তি ভুলে যায়, গোষ্ঠী-বহির্ভূত ব্যক্তিও তাকে প্রভাবিত করছে।

গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির বিভিন্ন সম্পর্ক আলোচনা ক'রে সার্ত শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করছেন, মানুষ অভাবের পরিবেশে তার সদৃশ অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বাস করে। পরিবেশগত অভাব নেতিবাচক ভাবে প্রত্যেক মানুষকে, মানবিক বিভিন্নতা এবং অমানবিক বাস্তবতাকে রূপ দেয়। প্রত্যেক মানুষই আমার প্রয়োজনের সামগ্রীতে অংশীদার এবং সেই হিসেবে সে আমার বিরোধী। মানুষ হিসেবে বাস করতে তাই মানুষকে অমানুষ হতে হয়। পারস্পরিকতা এবং অন্তর্পরিবর্তনের মাধ্যমে আমি অন্যদের দ্বারা অ-মানবিক বাস্তবতায় পরিণত হতে পারি। অন্যের উদ্দেশ্য আমার কাছে ত্রাসের সঞ্চার করে এবং তার স্বাধীন কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে যে উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়, তা ধ্বংস করেই আমি বাঁচতে পারি। মানুষের মধ্যে এইটেই হল আদি বন্ধন, যা পরিবেশের দ্বারা তার কাছে স্পষ্ট। যে-হিংসা মানুষের মধ্যে দেখা দেয়, তা একদিকে যেমন স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে, তেমনি স্বাধীনতাকে স্বীকারও করে। শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে সার্ত তিন পর্যায়ের মানবিক কর্মপ্রচেষ্টার কথা বলেছেন—তা হল—ব্যক্তি, গোষ্ঠী, উদ্দেশ্য গত প্রয়োগ-পদ্ধতি। তাই শ্রেণী-দ্বন্দ্বে উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির সংঘর্ষ চলে। ব্যক্তিদের মধ্যে যে উদ্দেশ্যগত প্রয়োগ ও প্রক্রিয়ার বিরোধ আছে, শ্রেণীর বেলায়ও তাই। উদ্দেশ্যের লক্ষ্য এবং উপায়ের চেতনা যখন অদৃশ্য হয়, তখন তা অপর শ্রেণীর লক্ষ্য এবং উপায়কে সূচিত করে এবং সেই শ্রেণীর কর্ম-প্রচেষ্টার অন্ধ সহায়ক হয়ে শ্রেণী-স্বার্থকে বিরোধী শক্তি হিসেবে আঘাত করে। উদ্দেশ্যের যে-সংঘর্ষ শ্রেণীতে শ্রেণীতে এবং ব্যক্তিতে রয়েছে, তাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে অন্যের উদ্দেশ্যের কাছে তার সত্তা বস্তুর মতো। এই অবস্থাটা না বুঝলে, সে অন্যের দ্বারা চালিত হবে। বাস্তব সংগ্রামে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বস্তু-সত্তা অতিক্রম ক'রে অন্যকে আত্মসাৎ ক'রে নিজের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করে এবং এইটেই তার নেতির নেতি। এটা অস্তিত্বের কলঙ্ক, কিন্তু এর কারণ হল প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বাস্তব জগতের অভাবের ক্ষেত্রে বড় বেশি মনে করায় যে হিংসা অনুভূত হচ্ছে, তাই। অভাব-বোধকে অন্তরীকরণ করার ফলেই এই হিংসার উৎপত্তি। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে-ভাবাত্মক পারস্পরিকতা আছে, তা কি তৃতীয় কোনো পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে?

এ-প্রশ্নের উত্তর হতে পারে : তা সম্ভব ইতিহাসের সমগ্রতায়, কারণ ইতিহাসই সকল প্রকার প্রয়োগগত বিভিন্নতা এবং তাদের সংঘর্ষের সমগ্রীকরণ। ইতিহাসকে যতটা বোঝা যেতে পারে, তা-ই বিভিন্ন প্রয়োগগত কাঠামোর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির এবং যে-সমস্ত বিভিন্ন সক্রিয় প্রচেষ্টা সেখানে বর্তমান, তাদের দ্বান্দ্বিকতার সীমা।

[লেখকের বক্তব্য : Critique of Dialectical Reason-এর দেড় শতাধিক পৃষ্ঠার প্রথম প্রবন্ধটি Problem of method ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। বাকি বৃহৎ অংশের পরিচয় বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া গেছে। সেগুলির মধ্যে যে-বই থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়া গেছে, তা হল Laing ও Cooper রচিত Reason and violence : A decade of Sartre's Philosophy 1950—1960. এই গ্রন্থের গোড়ায় সার্তের একটি ভূমিকা আছে, যেখানে তিনি বলছেন তিনি খুবই আনন্দিত যে লেখকরা তাঁর চিন্তার একটি স্বচ্ছ এবং বিশ্বস্ত বিবরণ দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু আমার প্রবন্ধের বহু বক্তব্য স্পষ্টতর করবার সুযোগ মেলে নি, কারণ একটি বৃহৎ পুস্তকের পরিচয় একটি রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হয়েছে, যার ফলে বহু স্থানেই হয়তো সার্তের বক্তব্যের প্রতি যথার্থ বিচার করা হয় নি। সার্তের চিন্তার নব রূপায়ণের বিশদ বিচার করার সময় তাঁর বক্তব্যগুলিকে আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যেতে পারে।]

এই বিতর্কমূলক রচনাটি সম্পর্কে আমরা পাঠকদের আলোচনা আহ্বান করছি.

—সম্পাদক

যে কোনও লোকের গল্প

কার্তিক লাহিড়ী

অ এসে আ-কে বলল, 'কি ভাই, কাজের কদ্দুর?' কিছু লেখায় মগ্ন ছিল বলে আ অ-র কথা বুঝতে পারল না, তাই লেখা থামিয়ে কলম পেন-স্ট্যাণ্ডে গুঁজে অ-র দিকে তাকাল। সহজ হওয়ার জন্য মুখটা হাসি হাসি করতে আ-র সমগ্র মুখমণ্ডল ঋজু রেখাঙ্কিত লক্ষ্য ক'রে অ প্রায়-চেনা মানুষটার কাছে কোনোমতে প্রশ্ন ছুঁড়ে অচেনা লোকের মতো দূরত্ব রাখতে বাধ্য হল। গভীর ঘুম থেকে উঠে ধীরে সম্বিত ফিরে পাওয়ার সময় কণ্ঠস্বরে জড়তা যেমন স্বাভাবিক, তেমন জড়িয়ে যাওয়া ধরা গলায় আ কিছু বলতে অ মুহূর্তমাত্র ক্ষয় না ক'রে আবার প্রশ্নটা পেশ করল। 'হ্যাঁ কেন', বলতে সমস্ত গলা যথেষ্ট সাফ হলে আ 'আমি তো ই-কে ব'লে দিয়েছি' ব'লে কাজের সমুদ্রে ডুব দিতে দিতে 'নিশ্চিন্তে থাকো, কাজ হয়ে যাবে' ব'লে অ-র কানে প্রতিধ্বনি তুলে তালা লাগবার উপক্রম করল এবং আ-কে প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে দেখে অ আ-নির্দেশিত ই-র সন্ধানে যেতে উচাটন হল। তবু বেরুবার সময় 'ই-র কাছে যেতে স্লিপ লাগবে কিনা' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আ-র ঘুমন্ত অবস্থা ও সেই অবস্থায় লেখার কাজ চলছে দেখে সে কি করবে ঠিক করতে না করতেই সটান হাজির হল ই-র ঘরে। ই তখন একটা কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে লাল-নীল পেন্সিল মধ্যে মধ্যে কাগজে ঠেকিয়ে ও তুলে কখনো দাঁতের ফাঁকে চালিয়ে গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট, বলা-কওয়া ছাড়া হঠাৎ ঢুকে পড়া অনধিকার প্রবেশের সামিল, ফলে নিজেকে অপরাধী মনে হতে অ পিছিয়ে আসতে 'কে' প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে 'আমি অ, আমি অ' বলতে বলতে হাঁফিয়ে উঠল, ততক্ষণে তার হৃদপিণ্ড দুম-দাম শব্দ ক'রে চলেছে। ই কাগজ থেকে চোখ তুলে ও নামিয়ে কাগজে দৃষ্টি রেখে 'কি চাই?' জিজ্ঞেস করলে 'আমাকে আ পাঠিয়েছে' ব'লে অ যখন ই-র শুভ প্রতিক্রিয়া (যেমন হাসি, আগ্রহ ইত্যাদি) দেখার জন্য উদগ্রীব, তখন সেই সময় ই-র প্রশ্ন 'কেন? আমার

কাছে কেন ?' অ-কে প্রায় হতচেতন করে দিল। 'আপনি নাকি ঐ বিষয়ের ইনচার্জ, তাই' বাক্য শেষ না হতে 'কি নাম' প্রশ্ন শুনে 'আমার নাম জিজ্ঞেস করছেন ?' বলতে 'তবে কার'—এমন একটা প্রচণ্ড ধমক খেলো। প্রথমে থতমত খেয়ে পরে সামলে নিয়ে 'আমার নাম অ' বলার পর ই-র দিকে তাকাতে দেখল ই-র ঠোঁঠ দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত, 'আমি ঈ-কে পাঠিয়ে দিয়েছি।' কথা শুনে অ কিছু অবাক, 'ঈ-র কাছে ?' প্রশ্নটা মুখ থেকে ফসকে গেলে 'অবাক হচ্ছেন ? সটান ঈ-র কাছে যান।' যেন আদেশ প্রচারের ভঙ্গিতে ই সেই মুহূর্তে অ-কে ঘর থেকে চলে যাবার ইঙ্গিত করল। অ অসহায়ের মতো ই-র দিকে তাকাতে ই-কে আবার কাগজ ও লাল-নীল পেন্সিলের কারুকার্যে ডুবে যেতে দেখে 'এখানে আর সুবিধে হবে না' বুঝতে পেরে হতাশায় ও কথঞ্চিত ক্লান্তিতে ঈ-র ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধা পেতে 'আমি ই-র কাছ থেকে আসছি' বললে বাধা অপসারিত হওয়ায় সে ঈ-র ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঈ-র ঘর পরিপাটি সাজানো, তার সাজ-সজ্জায় আভিজাত্যের ছাপ। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, চশমার কাঁচের রং ঈষৎ নীলাভ হওয়ায় ঈ-র সমস্ত মুখ কেমন অস্বাভাবিক দেখায়, ফ্রেমের ছায়া চোখের নিচে নীল, তার উপর ডান দিকের চিবুকে বিরাট আঁচিল থাকায় ঈ-র চরিত্র কি ধরনের বলা মুস্কিল। মুখ মনের মুকুর হলে ঈ নিশ্চয়ই নিষ্ঠুর নির্মম, কিন্তু মুখে লম্বা চুরুটের অস্থির স্থিতি ও মধ্যে মধ্যে প্রায় নার্ভাস হয়ে ধোঁয়া ছাড়ার মধ্যে অ ঈ-কে সাধারণ গোছের ভেবে কিছু এগিয়ে এলে ঈ-র মুখে মৃদু হাসির রেখা লক্ষ্য ক'রে সে সেই অবস্থায় জবুথবু ; ঈ-র মুখে রাশিকৃত ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে হারিয়ে গেলে 'আমি, আমি অ' ব'লে কোনোক্রমে নিজেকে সহজ করতে চাইলে 'তাতে আমার কি' জবাব শুনে অ-র হৃদপিণ্ডের দুলুনি থেমে যাওয়ার উপক্রম। অ এবার ঈ-র শারীরিক ভার বোধ করতে সক্ষম, যদিও ঈ তখন চেয়ারে উপবিষ্ট। এই ভারই এবার অ-কে সচেতন ক'রে দিল যে এমন ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না,। ঈ-কে ব্যাপারটা বললে একটা সুরাহা হতে পারে মনে হতে সে সমস্ত দুর্বলতা মোচন ক'রে বলতে চাইল যে সে ই-র কাছ থেকে এসেছে, অথচ বলার সময় বাক্‌ভঙ্গ হল না, শুধু একটা অর্থহীন শব্দ, তৎক্ষণে ঈ-র রকিং চেয়ারে ক্যাচকোঁচ প্রভৃতি নানারকম শব্দ। 'মানে ই বললেন কিনা, তাই' অ-র কথা শেষ না হতেই 'তাই সটান আমার কাছে' ঈ-র এহেন বাক্যে সমস্ত ঘর-জানালা-দরজা কেঁপে উঠতে অ সাবধানে নড়ে

পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল অনড়। ঈ চুরুটে টান দিয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া উগরে চুরুট এ্যাশট্রের উপর নামিয়ে একবার অ-কে আপাদমস্তক দেখে স্বর যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে এনে বললেন, 'ওই ঘরে যান।' শব্দগুলো দূরাগত ব'লে ক্ষীণ, সেজন্য অ দাঁড়িয়েই থাকল। ঈ আবার 'ওই ঘরে যান' বলতে এবং শব্দটা তার কানে পৌঁছতে অ ডাক ক'রে লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দে ছুট। সেই ছোটার সময় একজনের ঘাড়ের উপর পড়তে 'আজ্ঞে' কানে যেতে সে থেমে পড়ল। 'এত ভয় কিসের, আসুন' ভদ্রলোকের ডাকে অ থাতস্থ হয়ে থামকা হেসে আগন্তুককে অনুসরণ করতে চাইল। 'কাজে এসেছেন?' প্রশ্ন শুনে অ খুশিতে ডগমগ এবং ভদ্রলোকটি বেশ ভালো মনে ক'রে সেই ভদ্রলোকের পিছু পিছু যে-ঘরে ঢুকল, সে-ঘরে তিনজন তখন দাবার ছকে প্রায় আকণ্ঠ নিমগ্ন। তাই 'ত্মাখো তো ভদ্রলোক কি জন্যে এসেছেন' তিনজন খেলোয়াড় বা দর্শকের শ্রুতিগ্রাহ্য হল না দেখে আগন্তুকই তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার নাম?' অ বিগলিত হয়ে 'আমার নাম অ, আমাকে ঈ পাঠিয়েছেন' বলতে দেখল তিনজন চমকে তার দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে অ-র মুহূর্তখানেক ব্যয় হলে আবার বলল, 'হ্যাঁ, আমার নাম অ, আমাকে ঈ পাঠিয়েছেন। আমার কাজের কন্দুর।'

'ঈ পাঠিয়েছেন!' একসঙ্গে চারজন।

'হ্যাঁ.' গর্বে বুক ফুলল অ-র। তখন যার সহানুভূতিতে অ বিগলিত হয়ে বেশি কথা বলেছিল, এবার তিনি বললেন. 'উ, তোমার কাছে নাকি?' উ-র জবাব তৎক্ষণাৎ, 'না, আমার কাছে নেই উ।' উ মানে সেই ভদ্রলোক হেসে নম্র কণ্ঠে বললেন, 'দেখো না, যদি ভদ্রলোকের একটু উপকার হয়।' উ ব্যাপারটা গুরুত্ব দিচ্ছে না দেখে উ এবার গম্ভীর হলেন. 'ঈ-র লোক।' এবার উ-র কানে যেন জল গেল. সে তৎক্ষণাৎ উঠে নিজের টেবিলে এসে কাগজপত্র এলোমেলোভাবে নাড়াচাড়া শুরু করল। 'আপনি একটু বসুন।' উ-র মুখ হাসি-হাসি, 'বুঝতেই পারছেন আমাদের কাণ্ড. সতেরো বছর।' উ-র মতো লোক থাকলে ভাবনা ছিল না, এমন লোকই একমাত্র উপযুক্ত লোক ইত্যাদি চিন্তায় যখন ভরপুর, সেই সময় একটা ক্যাক ক্যাক হাসি শুনে অ দেখল জনৈক রোগা পাতলা হালহেলে ছোকরা মাতব্বরি চালে একটিপ নস্যি টেনে চোখ পিটপিটচ্ছে, 'দেখি আমার কাছে আছে কিনা?'

'তোমার কাছে থাকবে কেন?' উ-র প্রশ্নে ঐ বিন্দুমাত্র বিচলিত না

হয়ে 'আপনাদের কাণ্ডকারখানা, হয়তো দেখবেন আমার কাছেই আছে' ব'লে কাগজ দেখতে তৎপর হলে উ আবার আদেশের সুরে ব'লে উঠলেন, 'ঊ. একটু হাত চালিয়ে। ঋ. তোমার টেবিলও দেখো।'

ব'সে ব'সে কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হতে হতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়বে পড়বে এমন সময় অ শুনল সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, 'না নেই।'

'নেই!' উ-র চোখে বিস্ময়. 'তবে গেল কোথায়' ব'লে নিজের কাগজপত্র দেখতে যাবার মুহূর্তে 'আপনার নাম যেন কি বললেন. অ' প্রশ্ন এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রে হাঁটতে শুরু ক'রে বললেন, 'ওহো, এই দেখেছেন, আপনাকে মিছিমিছি এতক্ষণ কষ্ট দিলাম।' থেমে একটু দম নিলেন. 'আপনার নাম যেন'—

'অ।'

'হয়ে গেছে, হয়ে গেছে' উ-র কথা কানে যেতে অ আনন্দে ডগমগ অবস্থায় শুনল, 'আমি সেটা এ-র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।' সঙ্গে সঙ্গে অ-র ফানুস চুপসে এতটুকু। 'চিন্তা করবেন না. আমি আপনাকে এ-র ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি। বুঝতেই পারছেন. সদিচ্ছা থাকলেই হয় না, যে অবস্থায় মানে—' উ হঠাৎ থেমে অ-কে একবার ভালো ক'রে দেখে 'আসুন' বলে বাইরে এসে আঙুল দিয়ে একটা সুইং ডোর দেখিয়ে দিল. 'ওই ঘর। ভয় নেই, স্লিপ লাগবে না. বলবেন উ পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

অগত্যা অ এসে এ-র ঘরের সামনে কিঞ্চিৎ ইতস্তত ক'রে গলা খাঁকরি দিয়ে নিজেকে উদ্দীপ্ত ক'রে এ-র ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ আপন অজান্তে কাঁপতে থাকল, তখন এ একটা কাগজ সই ক'রে পরেরটায় কলম ছোঁয়াচ্ছেন। রোগা পাতলা গড়ন. সমস্ত মুখ থেকে তাবৎ হাসি কে যেন ব্লটিং দিয়ে শুষে নিয়েছে, অ অবাক হল চেহারা দেখে। এ একপলক অ-কে দেখে একটা বিরাট খাতা টেনে সেই খাতার একটা বিরাট পাতায় ডুবে গিয়ে কয়েকটা অদ্ভুত শব্দ করতে থাকলেন। অ শব্দগুলির অর্থ অনুধাবন না করতে পেরে আপন মনে বলে চলল, 'আমার নাম অ। আ আমাকে ই-র কাছে পাঠিয়েছিল, ই ঈ-র কাছে, সেখান থেকে উ হয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। উ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।' কোনও উত্তর নেই, নিস্তব্ধ ঘর, নিশ্চুপ এ। অ এবার ঘাড়টা লম্বা ক'রে অতি নিঃশব্দে এ সত্যি সত্যি পাতার ভিতর ঘুমিয়ে পড়ল কিনা পরখ করতে চাইল, এবং নিঃসংশয় হয়ে খানিক কেশে গলা ঝেড়ে ব'লে উঠল, 'আমার নাম অ,

আমার কাজটা—', বলা শেষ না হতেই 'বিরক্ত করবেন না, ঔ-র ঘরে যান', এ-র কণ্ঠে যেন আদেশ, তারপর 'ঐ আর ও সাইকার, ওদের দিয়ে কিছু হবে না' এমন কথায় অ সাহস সঞ্চয় ক'রে বলতে চাইল, 'ঔ-র কাছে গেলে হবে কি ?' তখন এ কোনো বাক্য ব্যয় না ক'রে একটা কাগজ হাতে তুলে দিয়ে 'ঔ-কে দেবেন' ব'লে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হলেন।

অতএব অ এবার দুটি ঘর পেরিয়ে ঔ-র ঘরের সামনে হাজির হল। বাইরে ভিজিটিং আওয়ার্স থ্রি—ফাইভ এবং বাই এ্যাপয়েন্টমেন্ট কথাগুলো লেখা, সেই লেখার নিচে একটা ছোট পেরেকে কয়েকটি কাগজ ঝুলতে দেখে এগিয়ে গিয়ে একটা কাগজ তুলে এগুলো স্লিপপেপার জেনে উপরের কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে অ ঝট ক'রে নাম লিখে ফিরে চারধারে তাকিয়ে দেখল, কেউ নেই। 'নিশ্চয় বেয়ারা আছে।' অতএব ঘরের বাইরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে যখন পায় ব্যথা অনুভব করল, তখন বুঝতে পারল, এখানে কোনও বেয়ারা নেই বা থাকে না। কিন্তু স্লিপ নিয়ে ঘরে ঢুকতে যাওয়ার মুহূর্তে একটা হাত হঠাৎ কোথা থেকে উঠে এসে বাধা দিল। অ প্রথমে চমকে এবং পরে স্বাভাবিক হতে দেখল, হাতটির মালিক স্বয়ং আ এবং সে-হাত-অর্থ প্রত্যাশী। আ-র এমন আচরণে অবাক বনতে আ-র মুখে হাসি এবং 'সব জায়গার রীতি, তাই—' শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা নোট বের করতে 'এ-টাকায় কি হবে ? সবাইকে দিয়ে থুয়ে—' শুনে অ দেখল, নোটটা পাঁচ টাকার। অগত্যা আর-একটা নোট বের ক'রে আ-র হাতে নোট দুটো গুঁজে দিয়ে স্লিপ হাতেই ঢুকে পড়ল ঔ-র ঘরে। আশ্চর্য, ঔ হাত বাড়িয়ে স্লিপ টেনে নিলেন।

ঘরটা দারুণ সাজানো। ঘরের পর্দা থেকে শুরু ক'রে টেবিল-চেয়ার এমনকি বিদ্যুৎ-আলোর মধ্যে একটা স্বপ্নের পরিমণ্ডল, অথচ এই পরিমণ্ডলের যিনি মধ্যমণি, তাঁর চোখ মুখ দেহ সবকিছু অ-র সম্পূর্ণ চেনা—মোটা গোঁফ ও পুরু ফ্রেমের চশমার সঙ্গে ছোট্ট কপাল ও পুরু ঠোঁট, এবং সেই ঠোঁটের নিচে একটা গভীর ক্ষতের চিহ্ন ঔ-কে অস্বাভাবিক ক'রে তুলেছে। 'হু আর ইউ ?' ঔ-র কণ্ঠস্বরে সমস্ত ঘর কেঁপে উঠলেও সেই স্বর স্পষ্ট নয়, কথাগুলো জড়ানো ও অস্পষ্ট, তাই 'হু আর'-এর পর 'ইউ' বোঝা যে কোনো লোকের পক্ষে অসাধ্য। অ ঔ-র কথা বুঝতে চেষ্টা না ক'রে শুধু দেখতে থাকল।

'হু আর ইউ', ঔ কণ্ঠ নামিয়ে নিলেন, 'কে পাঠিয়েছে।'

এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অ এ-লিখিত চিরকুটটা টুক ক'রে ঔ-র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অবাক হয়ে ঔ-র মৌখিক রেখাগুলোর সঙ্কোচন ও প্রসারণ দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে গেছে, এমন সময় ঔ-র 'ও, আই সি' কানে যেতে সটান খাড়া হয়ে উঠল।

'আপনি ঐ এবং ও-র সঙ্গে দেখা করেন নি?' ঔ অ-র উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে 'দ্যাটস ইমপ্রপার, মাস্ট কাম থ্রু প্রপার চ্যানেল, তাছাড়া—' বাক্য শেষ না ক'রে ফোন তুলে 'ঐ' ব'লে ফোন নামিয়ে রেখে আবার ফোন তুলে 'ও' ব'লে অ-র দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালেন। পলক পড়তে না পড়তে ঐ এবং ও ঘরে হাজির। অ ভেবে কুল পেল না কি ক'রে এত তাড়াতাড়ি ঐ এবং ও ঔ-র ঘরে হাজির হল। 'একে চেনেন?' ঔ-র আঙুল অ-র প্রতি উত্তোলিত।

ঐ এবং ও একসঙ্গে অ-র অপাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, 'না তো।' তারপর একটু সরে এসে উভয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'রেফারেন্স নাম্বার কত?'

'দেন হোয়াই হি হ্যাজ কাম হিয়ার।' ঔ-র কথা বোঝা গেল না, তিনি সেই অবস্থায় ফোন তুলে বললেন, 'এ।' তৎক্ষণাৎ এ ঔ-র ঘরে উপস্থিত।

'আপনি একে চেনেন?' জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে 'উইথ রেফারেন্স টু ইওর লেটার নাম্বার ডাব্লু. বি. টোয়েনটি থ্রি ডেটেড সেভেন-টেন-সিক্সটি-ওয়ান আই হ্যাভ রেকম্যানডেড হিজ কেস ফর—'

কথা শেষ না ক'রে কিছু দম নিয়ে আবার আরম্ভ করতে যাবার মুখে বাধা পেলেন, ঔ ফোন তুললেন, 'আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ।'

সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মতো টক-টক ক'রে সকলে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ঔ-র আদেশের প্রতীক্ষায় অধীর। ঔ সকলকে একবার দেখে নিয়ে কি চিন্তা ক'রে বললেন, 'কাজ কদ্দুর?'

সকলের দৃষ্টি তখন আনতভূমি।

'আই সে, আই অ্যাম কলিং এক্সপ্ল্যানেশন ফ্রম অল অব ইউ। বলুন, কে পাঠিয়েছিলেন?'

এ দৃষ্টি তুলে ঐ এবং ঔ বাদে সকলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দিশেহারা ও ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'কে ফরওয়ার্ড করেছিল?'

সকলে নিরুত্তর, ঔ ততক্ষণ একটা ফাইল টেনে দেখতে থাকলেন বলে ঈ সাহস সঞ্চয় ক'রে বলল, 'বাই লেটার নাম্বার সিক্স অবলিক ডি. আই, ফরওয়ার্ডেড

দি সেম টু ইউ ফর ইওর কাইণ্ড কনসিডারেশন।'

এ কিছু বলার আগে ঔ বলে উঠলেন, 'কিসের কনসিডারেশন।'

সকলের পুনরায় নত দৃষ্টি।

ঔ এবার ফাইল থেকে চোখ তুলে ঈ-র দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় ক'রে বললেন, কেউ বুঝল না, ততক্ষণে ই ব'লে উঠল, 'অ আমার কাছে কেস-টা রেফার করেছিল।'

'অা করেছিল?'

অা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে একটা ফাইল খুলে দেখাল, 'আণ্ডার দিস সারকামসটানসেস হিজ কেস মে বি—'

'স্টপ!' ঔ ফাইলটা প্রায় ছিনিয়ে পূর্বের খোলা ফাইলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে দেখতে বলে উঠলেন, 'ইয়েস ইয়েস।' ঔ-র চোখ জ্বলজ্বলালে সবার চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকল। 'হ্যা, এই তো,' ব'লে ঔ একটা কাগজ টেনে নিয়ে এসে টেবিলের উপর রেখে একবার কাগজ দেখে চোখ তুলে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'বাট ওয়াট ইজ দি কেস। এখানে শুধু রেফারেন্স নাম্বার আছে, কিন্তু অরিজিন্যাল অ্যাপলিকেশানে কি ছিল তার কিছুই--' বলতে বলতে তিনি অা-কে কাছে ডাকতে অা সামান্য একটু ন'ড়ে ওই অবস্থায় জবাব দিল, 'স্যার ওর নিচের কাগজেই বোধ হয়—'

'এক মিনিট প্লিজ,' ঔ ফাইল পড়তে শুরু করলেন। ঔ পাতার পর পাতা পড়ে চললেন প্রায় একখানা মহাভারত, ততক্ষণ সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষমান, এখুনি একটা কিছু হওয়ার সম্ভাবনা, সকলের নিঃশ্বাসের শব্দ সামান্যতম ধ্বনি তুলতে ভুলেছে, শুধু একটা টিকটিকি টিক টিক ক'রে উঠে এরা সকলে জীবন্ত তা মনে করিয়ে দিয়ে আবার সকলকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে গেল। অ তখন নানারকম চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে 'সফল হব, নিশ্চয় এবার—' এমন আশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্তে নিশ্চিত মন হয়ে ঔ কখন পড়া থামিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে সেই মুহূর্তের জন্য উন্মুখ হয়ে রইল।

সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে মিনিট, মিনিটে মিনিটে ঘণ্টা। সকলের প্রতীক্ষা তখন বিরক্তিতে পরিণত, 'এখন ছেড়ে দিলে বাঁচি' অ-র মনে যখন এমন অবস্থা তখন ঔ-র দীর্ঘশ্বাস মোচনের শব্দ সকলকে হঠাৎ চাঙ্গা ক'রে তুলল। ঔ কোনো কথা না ব'লে ইশারায় এ, ঐ এবং ও-কে ফাইলের একটা জায়গা দেখতে নির্দেশ দিয়ে সকলকে একবার ভালোভাবে দেখে এ, ঐ, ও-র দিকে দৃষ্টি ফেরাতে তিনজনের

সামান্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়া লক্ষ্য ক'রে সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের মতো প্রায় জালের আড়ালে রাজার মতো দূরাগত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, 'আপনি মৃত।'

সঙ্গে সঙ্গে 'আপনি মৃত' কথাটি ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে ভীষণ শব্দ তুলে অ-কে ভাসিয়ে ভেঙে চুরে একাকার করতে উপক্রম হলে সে হাত তুলে বোঝাতে চাইল যে সে জীবিত। কিন্তু নিজের সমস্ত প্রাণশক্তি থাকা সত্বেও অ জোর দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে পারল না, 'আমি জীবিত।' সে অবাক হয়ে প্রথমে ঔ-র দিকে পরে সকলের দিকে তাকিয়ে নিজের সজীবত্ব ঘোষণা করতে চাইল, তখন একটার পর একটা ফাইল টেবিলের উপর পাহাড়ের মতো জমতে থাকল, আর সেই ফাইলের আড়াল থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়েই ও গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করলেন,' 'সি বাই থ্রি ফাইল বলছে যে আপনি অ ১৯১৮ সালে মৃত।'

'কি বলছেন! আমার জন্মই হয়েছে ১৯৩০ সালে। আমি কেন ১৯১৮ সালে মরতে যাব?' কিন্তু বলতে গিয়ে আপন মনে হোঁচট খেয়ে 'সত্যি আমি কি মৃত' ভাবতে কেমন দিশেহারা হয়ে 'আপনি এখন যেতে পারেন' শুনতে পেয়ে কিছু চিন্তা করার আগেই দেখতে পেল, সকলে তাকে জোর ক'রে ধ'রে টেনে হিঁচড়ে কামড়ে আঁচড়ে বাইরে বের ক'রে দিচ্ছে। অ নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝল, বৃথা: অতএব হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে শিকারের কিল্ হয়ে গেল।

আবার সে চেষ্টা করতে চাইল, কিন্তু তার দেহ এদের কবল থেকে মুক্ত হয়েই সশব্দে মেঝেয় পড়ে গেল।

চাল-চিত্র

চিত্ত ভট্টাচার্য

নতুন পালকে ভর ক'রে পাখি যেদিন প্রথম আকাশে ওড়ে সীতানাথ বোধহয় তেমনি এক হাল্কা আনন্দ সেদিন বিকেলে অনুভব করল মাসের তখনও সাতদিন বাকি। তেইশে জানুয়ারি—আগের দিন ছুটি ছিল অফিসে। সীতানাথ ধ'রে নিয়েছিল ওর অফিসের যখন ছুটি তখন অন্যান্য সব অফিসেই ছুটি থাকবে। কিন্তু পোস্টাফিস বন্ধ ছিল না। আর ছিল না বলেই রক্ষে, নইলে একদিনের ব্যবধানেই চার বস্তা চালে একশ কুড়ি টাকা বেশি লেগে যেত।

এই একশ কুড়ি টাকাটা যে বেশি লাগল না, সেটাই নানান দিক থেকে হিসেব কষে মল্লিকাকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রে সে একপ্রকার পুলক অনুভব করছিল। মল্লিকা কতটা পুলকিত হচ্ছিল, হাবে-ভাবে খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। সীতানাথ সেই অস্পষ্ট হাবভাবটিকে স্পষ্ট খুশি হওয়ার উচ্ছ্বাসে পরিণত করার প্রয়াসে নিজের মনেই বলে যাচ্ছিল—বুঝলে, চার বস্তা চাল, মানে তিনশ কেজি। প্রতি কেজি আমি পেলাম একশ চল্লিশ দরে। তাতে পড়ল চারশ কুড়ি। আসলে পড়ত কত জানো? চারশ তেইশ। কিন্তু রবি, বলরাম পালের ছেলে, আমাকে খাতির ক'রে একশ একচল্লিশের জায়গায় একশ চল্লিশ করে দিল। এক পয়সা ছাড়া মানে বোঝ—সলিড তিন টাকা প্রফিট।

মল্লিকা হাসি হাসি মুখে বলল—তুমি কিন্তু এখনও অফিস থেকে এসে হাত পা ধোওনি। পায়ের ধুলোগুলো অন্তত ধুয়ে এসে বসো। আমি চা আনি।

—প্লিজ, মল্লিকা, আমাকে আর দুমিনিট সময় দাও। আজ একটু পরেই খাব। তুমি ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝবার চেষ্টা করো। একটু স্থির হয়ে বসো।

মল্লিকা বসল না। মিটসেফের ওপর থেকে কেটলি নামিয়ে চা চাপাবার জন্তে 'জনতা' ধরাতে গেল। সীতানাথ অসহায় বোধ করল। খানিকটা রাগও

হল। রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। অফিস, অফিস-ক্যানটিন, সর্বত্র চালের দর নিয়ে আজ সারাদিন যে-আলোচনা হয়েছে, তার পটভূমিকায় সে নিজেকে স্থাপন করেছে। সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব সকলেই তার প্রশংসা করেছে। মোট কথা যেখানেই সে গেছে, চালের দরের কথা উঠেছে, সেখানেই সীতানাথ বেশ কায়দা ক'রে কখনও বা নাটকীয় ভঙ্গিতে কখনও সহজ অনায়াসে নিজের চাল কেনার কথাটি সবিস্তারে বলে গেছে। বিশেষ ক'রে যারা চাল কিনে খায়, যাদের সংখ্যা বেশি, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তারা সীতানাথের দিকে তাকিয়ে বলেছে: খুব ভালো করেছ। সীতানাথের চাল কেনার ব্যাপারটিকে তারিফ করতে যাওয়ার সময় তারা যেন নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়েছে। তাদের যে এখনও কেনা হয় নি, একথা ভুলে গিয়ে সীতানাথের কার্যকলাপের সঙ্গে এক-প্রকার আত্মীয়তা বোধ ক'রে তারা উল্লসিত হয়ে উঠেছে। সীতানাথের দূরদর্শিতার কথা স্মরণ ক'রে একবাক্যে স্বীকার করেছে—সীতানাথ খুব বাহাদুর ব্যাটাছেলে। কারণ গতকাল তেইশে জানুয়ারি চালের দর ছিল একশ একচল্লিশ, আজ একশ আশি।

দুপুরে ক্যানটিন থেকে চা খেয়ে আসতেই পাশের সিটের পরমেশ জানাল—বড়বাবু তোমার খোঁজ করছিলেন দাদা।

সীতানাথ চিন্তিত হল। অনুচ্চ স্বরে বিড় বিড় ক'রে উঠল—হঠাৎ আবার বড়বাবুর তলব কেন?

অবস্থাটা বোধহয় বুঝল পরমেশ। বলল—দাদা, তোমাদের ওই এক দোষ। বড়বাবু শুনলে তোমরা একেবারে কেঁচোর মতো হয়ে পড়ো।

সীতানাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। কারণ ও জানে এরপর অফিস ইউনিয়নের সেক্রেটারি পরমেশ ওকে স্বাধিকার, স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতার বিষয়ে অন্তত ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা শোনাবে।

পাশের দুটো ঘর পেরিয়ে সীতানাথ বড়বাবুর ঘরের দিকে পা বাড়াল। বড়বাবু রমণীকান্ত ঘোষ ভালোও নন খারাপও নন, কেমন একটা হিজিবিজি-মার্কা ব্যক্তিত্বহীন হাবা-গোবা টাইপের ভদ্রলোক। ওঁর হাসিটা অদ্ভুত ধরনের। যে কোনো কথা বলার আগে—তা সিরিয়াস হোক বা নর্মাজই হোক—উনি হাসেন। হাসেন মানে ওপর নিচের ঠোঁট দুটো ক্রমশ কানের কাছে গিয়ে নিঃশব্দে ঠেকে, আর ওপরের বাঁধানো দাঁতের

পাটিটা বের হয়ে পড়ে। চোখ দুটি এমনিতেই ছোট। নিঃশব্দ ওই আকর্ণ বিস্তৃত হাসির প্রাক্‌কালে চোখ দুটি সম্পূর্ণ বুজে যায়। এই অবস্থাটি থাকে প্রায় মিনিট খানেক।

সীতানাথ পুরনো লোক, তাই।* নতুন কেউ যখন বড়বাবুর কাছে আসে কোনো কাজে, তখন দেখা যায় তারা ঐ হাসি দেখে অজ্ঞাতসারে নিজেরাই হঠাৎ সশব্দে হেসে ফেলেছে। হেসেই অবশ্য সামলে নেয়। কারণ, অফিসের খোদ কর্তার সামনে হেসে ফেলা গর্হিত একটা অপরাধ।

সীতানাথ বড়বাবুর ঘরের পর্দার একপাশে টুলে ব'সে থাকা আর্দালি হরিপদকে জিজ্ঞেস করল নিচু গলায়--স্যার রয়েছেন? বুড়ো হরিপদ উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিয়ে পর্দাটা তুলে ধরল। সীতানাথ প্রবেশ করল।

--স্যার আমাকে ডেকেছেন?

সীতানাথের স্যার রমণীকান্ত ঘোষ, পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী মিনিট খানেক হেসে চোখ বুজে রইলেন। পরে চোখ খুলে সীতানাথকে বসতে বললেন — বসুন, বসুন। সীতানাথের তর সইছিল না -- স্যর কিছু বলছিলেন?

—শুনলাম আপনি চার বস্তা চাল কিনেছেন একশ চল্লিশ দরে? আপাদমস্তক শিহরিত হয়ে বলল সীতানাথ—হাঁ স্যার। গত বছরের শেষের কয়েক মাস প্রায় ভিখিরীর দশা হয়েছিল। ঠোঙায় ক'রে কখনও তিন, কখনও সাড়ে-তিন টাকা দরে প্রতিদিন এক-আধ কেজি যোগাড় করতে করতে মারা যাবার উপক্রম। তাই গত বছরেই স্যার ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, নতুন চাল উঠলেই···।

—শুনুন সীতানাথবাবু, আমাকেও চাল কিনে খেতে হয়। আমারও মতলব ছিল দর পড়লে বস্তা কয়েক চাল কিনে ফেলব।

—তাহলে আর দেরি করবেন না স্যার। এই বেলা যোগাড় করে ফেলুন। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আজকের দর একশ আশি। কাল যে দুই হবে না, কে বলতে পারে। তাই বলছিলাম যা দিন কাল পড়েছে, টাকা ফেললেও হয়তো···।

—সে-কথা একশ বার। আপনি কিন্তু ঠিক মওকা বুঝে একশ চল্লিশে পেয়ে গেছেন। কোন দোকান থেকে কিনলেন?

—সে আপনি চিনবেন না স্যার। বলরাম পালের ছেলেকে বলে রেখে-ছিলাম। সন্ধে বেলায় ওদের বাড়িতে দুটো ছেলেকে পড়াতে যাই। ও-ই

আমাকে সব ঠিকঠাক ক'রে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

—ওকেই একটু বলুন না সীতানাথবাবু। যদি বস্তা দশেক চাল পাইকারি দরে একটু সুবিধা ক'রে দিতে পারে। দামটা হঠাৎ যে একেবারে আগুন হয়ে উঠল। সীতানাথ প্রচণ্ড অস্বস্তি অনুভব করল। পাইকারিই হোক, খুচরোই হোক, চালের দাম এখন সোনার দরের মতোই একেবারে বাঁধা। দিনকের দিন দর পাল্টিয়ে উর্ধ্বমুখী। মুখে বলল—বলব স্যার, নিশ্চয়ই বলব।

শুনে বড়বাবু আর-একবার হাসলেন। চোখ দুটি বুজে গেল। সীতানাথ তারই মাঝখানে বের হয়ে আসবা'র অনুমতি চাইল। বড়বাবু হাসির সিঁড়িটি সময় উত্তীর্ণ হয় নি বলে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দিলেন। সীতানাথ গুটি গুটি বের হয়ে এল।

হরিপদ টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সীতানাথের পায়ের ধুলো নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে জিভে ঠেকাতে গেল। সীতানাথ স্তম্ভিত।

হরিপদ সেলাম যে মাঝে মাঝে করে না তা নয়, তবে একেবারে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে বুকে ঠেকানোটা সম্পূর্ণ নতুন মনে হল। এবং ভালো লাগল না। ওর কাঁধে এক হাতের চাপ দিয়ে বলল—ধুলো-টুলো জিভে ঠেকানো ভালো নয়। ওতে অনেক রোগের জীবাণু থাকে। জীবাণু কথাটা বলবার আগে ব্যাকটিরিয়া শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে ঢোঁক গিলে সে শব্দটাকে খেয়ে নিল। এবং এই আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার জন্য তার সামান্য হাসি পেল। ভাবল হরিপদকে বিতরিত এই বৈজ্ঞানিক উপদেশটি বৃথাই ব্যয়িত হলো। কারণ হরিপদরা জন্মাবধি ধুলো খেয়ে খেয়ে ইমিউনড হয়ে গেছে।

চলে আসতে গিয়ে থেমে গেল সীতানাথ। জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার চাল কেনার টাটকা সংবাদটি বড়বাবু জানল কি ক'রে। তবে কি হরিপদ··· এই পর্যন্ত ভাবতেই হরিপদর কথা মনে এসে গেল বলেই সীতানাথ হরিপদকে ইশারায় ডাকল।

সামান্য একটু গম্ভীর হবার কায়দা নিয়ে সীতানাথ প্রশ্ন করল—আমি চাল কিনলাম বড়বাবু জানলেন কি করে? তুমিই বোধহয় বলেছ?

হরিপদ ঘাবড়ে গিয়ে অপরাধীর ও নতুন বৌয়ের লজ্জা নিয়ে ঘাড় হেলিয়ে হাত জোড় করল।

—হ্যাঁ হুজুর, বলে ফেলেছি। আপনারা যখন ক্যান্টিনে···। ওর গলাটা

এ'রে আসছিল দেখে সীতানাথ মৃদু শব্দে হাসল ! কারণ পুনরায় গম্ভীর স্বরে কিছু বললে হরিপদ ওই একই পোজে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, অন্তত সীতানাথ যতক্ষণ না স্থান পরিত্যাগ করে। তাই বলল—বেশ করেছ হরিপদ। তাতে আর খারাপ কি ?

হরিপদ সেই দশা থেকে মুক্তি পেয়ে ফের প্রবল খুশিতে সীতানাথের পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকাতে যেতেই সীতানাথ ওর হাতটা খপ ক'রে ধরে ফেলল—ছিঃ, ধুলো খেওনা।

হরিপদ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। সীতনাথ পা বাড়াল।

চার বস্তা চাল কেনার ব্যপার নিয়ে এই ধরনের অনেকগুলো ছোট-বড় ঘটনা ও আলোচনার আবর্তে হাবুডুবু খেয়ে সীতানাথ তাই যখন বাড়ি ফিরল, তখন ও নিজেকে সামলাতে পারছিল না। মাঝে মাঝে একটা উজ্জ্বল আরাম ও আনন্দের আমেজ আসছিল যে সারা বছরটায় আর তাকে 'চাল' 'চাল' ক'রে হন্তে হয়ে ঘুরতে হবে না।

গতকাল চাল কেনার সময় সীতানাথ এতটা গুরুত্ব অনুভব করে নি, যতটা আজ করছে। আজকের সারাদিনের ঘটনাপুঞ্জকেই এর জন্য দায়ী বলা চলে। উত্তেজনার আবেগে তাই সীতানাথ অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মল্লিকার উল্লাসহীন আচরণে ও খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়ল। তবে হাল ছাড়ল না। পুরুষের গলায় যতটা কোমলতা আসে সেই রকম ভাব নিয়ে করুণকণ্ঠে ডাকল—মলি শোনো। তোমার চা হল ?

—ছাকছি।

—আদা দিয়েছ ?

—না, আজ খেজুর গুড়ের।

—ফাইন, তা তুমি এতক্ষণ বলোনি যে।

সীতানাথের মোলায়েম কণ্ঠস্বর শুনে মল্লিকা বুঝল তা'র আজ নিস্তার নেই। চালের ব্যাপার নিয়ে সারাদিন যা যা হয়েছে সবকিছু শুনতে হবে—বক বক মানুষটা করবেই। হাসতে হাসতে চায়ের কাপ নিয়ে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—সারাদিন বুঝি হৈ চৈ হল তোমার চাল কেনা নিয়ে ?

ব্যাস, আর যায় কোথায়। শুধু এইটুকু শুনেই আহ্লাদে মূর্ছিত হবার উপক্রম। হাতে চা না থাকলে হয়তো সীতানাথ···। যাই হোক, সেই আদিম

আবেগের প্রাথমিক বেগ সামলিয়ে সে আপ্লুত স্বরে বলল—জানতাম, মহারাণী না শুনে থাকতেই পারবেন না। শোনো. তাহলে প্রথম থেকেই বলি।

—শুনছি। কিন্তু আমি বলছিলাম, চাল কেনার ফুর্তিতেই তো আছো। এদিকে বস্তাগুলো যে ডাং হয়ে পড়ে রইল দালানের মেজের। ওগুলো রাখার ব্যবস্থা কিছু ভেবেছ?

—ভাবাভাবির কি আছে? খানকয়েক ইঁটের ওপর পাটা রেখে তার ওপর বস্তা কখানা চাপিয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যাবে।

মল্লিকা চোখ গোল গোল ক'রে বলল—শোনো কথা, অত সহজ নয় মশাই। দুপুরে বোসগিন্নী বেড়াতে এসেছিলেন। ওঁদের তো আর চাল কিনে খেতে হয় না। চাষের চাল—চালের কারবার।

—তাতে কি?

—উনিই বলছিলেন। চাল তো কিনেছ বৌমা। রাখতে জানো তো? আমিও তোমার মতো বলেছিলাম। শুনে উনি হেসে খুন। ও হরি, তোমায় বলা হয়নি। বোসগিন্নী একজোড়া এমন ফাইন বাউটি গড়িয়েছে।

সীতানাথের তর সইছিল না।

—বাউটি-মাউটির কথা রাখো। চালের কথা কি বলছিলে বলো।

—বলছিলেন যে চালকল থেকে এক বস্তা কুঁড়ো কিনে এনে চালের সঙ্গে মিশিয়ে বস্তায় রাখতে হবে। নইলে সুরুই লেগে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

—এক বস্তা কুঁড়ো! সীতানাথ অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল।

—শুধু কুঁড়োর কথা শুনেই তো ঘাবড়ে গেলে। এত সকাল সকাল চাল কেনা হল। নতুন চাল। এখনো রস মরেনি। মাঝে মাঝে ছাদে নিয়ে গিয়ে রোদ লাগাতে হবে। আর সেই সময় মাসে যেটা লাগবে, কুঁড়ো খুদ পাছড়ে নিতে হবে। হরিমতীকে বলেছি। জলতোলা বাসনমাজার জন্যে তো দশ টাকা দিই। এর জন্যে বাড়তি আরো একটা টাকা দেবো। ও রাজি হয়েছে।

—কিন্তু ছাদে তোলা, নামানো—এসব, প্রতি মাসে এত ঝঞ্জাট। মল্লিকা আমি মারা যাব।

—আহ্‌হা, তুমি একলা করবে কেন? আমিও যতটা পারি সাহায্য করব।

—পাগল হয়েচ।

—না, না মল্লিকা, তুমি বিশ্বাস করো ; এমন জানলে কোন শালা চাল কিনত।

—অনর্থক রাগ না ক'রে তুমি বরং তোমাদের আড্ডা থেকে একটু ঘুরে এসো।

—দূর তোর আড্ডার নিকুচি করেছে। মেজাজটাই বদি···। সীতানাথ আর একবার পূর্বোক্ত অশ্লীল শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মল্লিকা হাসল।

—ঘুরে এসো না। তোমাকে তো এ মাসেই কিছু করতে হচ্ছে না। ঘরে মা-লক্ষ্মী রয়েছেন। দেখবে, মেজাজ এমনিতেই কত নরম হয়ে গেছে। কত উদ্যম আসবে।

মুখ ভার ক'রে সীতানাথ দরদালান ছাড়িয়ে উঠোনে নামল।

তখন ঘরে রেডিয়ো খোলা ছিল। কড়া নাড়ার শব্দ শুনে মল্লিকা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে এল। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সবেমাত্র 'সংবাদ-পরিক্রমা' শেষ করলেন। সীতানাথ ঘরে ঢুকে অনুশোচনাসূচক একটি শিসধ্বনি প্রয়োগ ক'রে বলল—ভীষণ দেরি হয়ে গেল।

—তাতে কি হয়েছে। মল্লিকার গলায় অন্তরঙ্গতার সুর। আড় চোখে দেখল। দেখে স্বস্তি পেল।

সীতানাথের মেজাজ সত্যিই পাল্টিয়ে গেছে। মল্লিকাকে কাছে ডাকল—ভাগ্যিস তুমি বেড়িয়ে আসতে বললে। তবে আজ আর আড্ডা জমেনি। সারাক্ষণ ওই চাল-সংরক্ষণ-প্রণালী সংক্রান্ত বিবিধ আলোচনা হল। এবং বক্তারা প্রত্যেকেই বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তাঁর যুক্তিটি বিজ্ঞানসম্মত।

—আমি একটা কথা বলব ?

—বলো।

—বলছিলাম, আমার রান্না হয়ে গেছে। খাওয়ার পাট চুকিয়ে তাড়াতাড়ি বিছানায় গেলে হতো না ? ওখানে মশারি খাটিয়ে শুয়ে শুয়ে তোমাদের আলোচনার কথা শুনতাম। সেই কখন থেকে একলাটি বসে থেকে থেকে মশার কামড়ে পা চুলকে চুলকে মারা গেলাম।

—বেশ তা রাজি আছি। তবে এক শর্তে। নতুন কিছু নয়, কিন্তু শর্ত পালনে তুমি প্রায়ই গাফিলতি করো।

—বিশ্বাস করো, আজ অনেকক্ষণ জেগে থাকব।

মশারির চালের উপরে বেডল্যাম্পের মায়াবী আলোয় পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে শুয়ে শুয়ে ওরা গল্প করছিল—সীতানাথ আর মল্লিকা। সীতানাথ ভাবছিল আর বলছিল—ভাখো, পৃথিবীতে কত সমস্যা। ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলছে তো চলছেই। উ থানট বলেছেন—এই যুদ্ধে আমেরিকার যেখানে হারজিতের কোনো প্রশ্ন নেই, তখন কেন এই মানুষ-মারার বিশাল আয়োজন। ওদিকে সুয়েজ ক্যানেল বন্ধ থাকার দরুন নাকি গমের জাহাজকে ঘুরে আসতে হচ্ছে। আমরা নাজেহাল। কচ্ছ ট্রাইবুনালের রায় নিয়ে সংসদে হৈচৈ। প্রত্যেকটাই সমস্যা, বিশাল সমস্যা।

মল্লিকা ছোট্ট একটা হাই তুলে অনেকটা ঘন হয়ে সীতানাথের বুকে মুখ ঘষল। ওর বড়ো বড়ো চোখের পাতায় তখন অদ্ভুত একটি আকুতি। বলল—তুমি অনেকটা দূর থেকে আরম্ভ করেছ লক্ষ্মীটি। আমাদের চাল রাখার কথাগুলো চটপট ব'লে ফেলো, নইলে রাত কাবার হয়ে যাবে।

সীতানাথ সাগ্রহে বলল—সেই কথাতেই তো আসছি মলি। বলছিলাম এই সব হাজারো চরম সমস্যার মধ্যে আমাদের এই ছোট্ট দুজনের সংসারে ঠিকমতো চাল রাখার সমস্যাও একটি সমস্যা। এবং গুরুত্বের দিক থেকে বিশ্ব-সমস্যার চেয়ে কোনো অংশে কমতি নয়। এইটি ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি। যাক গে, আমাদের আলোচনার কথায় আসি। জানো মল্লিকা, চাল রাখার সবশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পেট্রোলের বা সরষের তেলের খালি বড়ো ড্রামে ভর্তি করে রাখা। এতে সুরুই পোকা ধরবে না বা ইঁদুর-চিঁছুয়ে চাল নষ্ট করতে পারবে না। অবিনাশদারা এইভাবেই গত বছর রেখেছিলেন।

মল্লিকাকে উৎফুল্ল দেখাল—বেশ তো, তাহলে গোটা কয়েক ড্রাম নিয়ে এলেই তো ভালো হয়।

সীতানাথ মল্লিকার মুখের ওপর থেকে আলগোছে একগুচ্ছি চুল সরিয়ে দিয়ে বলল—হ্যাঁ, ভালো নিশ্চয় হয়। কিন্তু ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে। এক-একটা ড্রামের দাম জানো। বলো তো কত?

মল্লিকা ঘাড় নাড়ল।

—জানো না, আন্দাজমাফিক বলো।

—কতো আর, গোটা দশেক।

—বাট। একটায় ধরবে না, অর্থাৎ দুটো স্ল্যাবে হানড্রেড টোয়েন্টি।

মল্লিকা আর-একবার-হাই তুলবার জন্যে হাঁ করেছিল। হাই উঠল না বটে, তবে সেই হাঁ-করা অবস্থাতেই বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে সীতানাথের মুখাবয়বে এমনভাবে তাকাল যেন ও আর কোনোদিনই চোখের পাতা বা ঠোঁট দুটো বুজতে পারবে না।

দেখে সীতানাথ খুক খুক ক'রে হাসতে গিয়ে ঘর কাঁপিয়ে নিস্তব্ধতাকে ছাপিয়ে হো হো ক'রে হেসে উঠল। ফলে সীতানাথের বুকের ওপর রাখা মল্লিকার মাথাটা দোল খেয়ে ওর বাঁ হাতের বাহুর ওপর গড়িয়ে পড়ল।

—এ্যাই, কি অসভ্যতা হচ্ছে। আমার ভয় করছে, চুপ করো। মল্লিকা সীতানাথের মুখ চাপা দিল।

—অত জোরে বুঝি এত রাত্রে হাসে। আশেপাশের কেউ যদি জেগে থাকে, কী ভাববে বলো তো ?

—সত্যি মিথ্যে কিছু একটা বললেই হবে। অবশ্য তারা যা ভাববার আগেই ভেবে নেবে। বললেও রেহাই নেই। যাই হোক, ড্রামের সাজেশান তা-হলে নাকচ হয়ে যাচ্ছে আলোচনার আগেই। ড্রামটা থাকলে সুবিধা হতো কি জানো,—অই কুঁড়ো মেশানো, রোদে দেওয়া, পাছড়ানো, ছাদে তোলা, নামানো—এসব কিছু করতে হতো না। শুধু খানিক শুকনো নিমপাতা চালের মধ্যে রেখে দিলেই ল্যাটা চুকে যেত।

—ড্রাম যখন হচ্ছে না তখন, ও নিয়ে ভেবে লাভ কি !

—ঠিক, কিন্তু নিমপাতার ব্যাপারটা !

—মনে পড়েছে বটে। কোথাও যেন আমিও কথাটা শুনেছি। একটা আবিষ্কারের উল্লাসে মল্লিকাকে খুশী দেখাল।

ঠিক হল নিমপাতা আসবে। তারো আগে মল্লিকা সীতানাথকে এক প্যাকেট গ্যামাক্সিন ও দু-প্যাকেট র‍্যাটকো আনবার কথা মনে পড়াল।

ঘরে ইঁদুরের উৎপাত এমনিতেই বেশি। চালের বস্তা থাকলে তো কথাই নেই।. মচ্ছব লেগে যাবে। আর পাটার তলায় দেওয়ালের ধারে ধারে গ্যামাক্সিন ছড়িয়ে দিতে হবে. নইলে পোকা-টোকা লেগে যাবে।

সীতানাথ মনোযোগ দিয়ে মল্লিকার কথাগুলো শুনছিল। শেষ হলে শুধাল—আর কি ?

—উঁহু, এখনো আছে। দরদালানের কড়িবরগার ফাঁকে ফাঁকে ওরা যে স্বামী-স্ত্রী রয়েছেন, ওঁদের কথা তো একবারও ভাবলে না। বোর্ডিং ফ্রি, কিন্তু এই দুর্মূল্যের বাজারে···। টুকরে টুকরে চাল খাবে এবং ছড়াবে। কাজেই এর প্রতিকারের উপায় হিসেবে ঠিক হল যে সীতানাথের বাতিল হওয়া ধুতি-গুলো ভাঁজ ক'রে চালের বস্তার ঢাকা দেওয়া হবে।

সব মিলিয়ে ওরা ঠিক করল—চাল এক দানাও নষ্ট হতে দেবে না। মল্লিকাও ঘোষণা করল যে এমনভাবে রান্নার সময় চাল নেবে যাতে এক মুঠো বরং কম হয়, কিন্তু কোনোক্রমে ফেলা না যায়।

আলোচনা শেষ হতে ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমোবার চেষ্টা করল। মল্লিকা আর না হেসে থাকতে পারল না। বলল—আজ কিন্তু আমি আমার প্রতিশ্রুতি ঠিক মতো পালন করছি। সে নিয়ে বাবু একটি বারও কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

—তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় আমি একবারও যে ভাবিনি তা নয়।

—বাহবা, মিথ্যে কথা জিভের ডগায় সব সময় তৈরি থাকে, না? শুনে শরীর জুড়িয়ে গেল। আমি কিন্তু এখন ঘুমোব না।

—মানে!

—মানে ঘুম আসছে না। ভাতঘুম চটিয়ে···।

সীতানাথ মল্লিকাকে একটু ঠেলা দিল—তুমি একবার উঠবে?

—হঠাৎ?

—তেষ্টা পেয়েছে।

—আমি এমনিতেই উঠতাম। কানের পাশে একটা মশা ভোঁ ভোঁ করছে।

—মেরো না যেন।

—কেন?

—জানো মলি, একটা জাপানি, কিংবা ঠিক মনে পড়ছেনা, মোট কথা বিদেশী কবিতায় পড়েছিলাম—বন্দনা করি ওই মশকীকে, যে তোমার আমার মধ্যে দংশনের মাধ্যমে রক্তপান ক'রে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করতে অলস উল্লাসে।

—হরি, হরি। আমি তোমায় জল এনে দিয়ে ওটাকে মারব। নির্বিকার

গলায় কথা কটি ব'লে মল্লিকা বিছানা থেকে নেমে নিয়নের সুইচ নামাতেই উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে গেল। সীতানাথ উঠে বসল এবং নেমে পড়ল।

—তুমি নামলে যে?

—একটা সিগারেট খাব, অবশ্য তুমি পারমিশন দিলে।

—রাতদুপুরে সিগারেট পাবে কোথায়? আজকাল বুঝি আমার লুকিয়ে লুকিয়ে প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট কেনা হয়?

—দাঁড়াও কথাটা বলি। নইলে সিগারেটের নাম শুনলে তোমার আবার যে এলার্জি আছে, শেষে একটা রাগারাগি ক'রে বিছানায় উঠবে।

—মোটেই আমার কোনো এলার্জি নেই। যাই হোক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই সিগারেট পাওয়ার গল্পটা বানানো হয়ে গেছে।

—বানানো নয় মল্লিকা। তুমি চিনবে না। একজন ও বেলায় একটা গোল্ড ফ্লেক অফার করেছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম।

সীতানাথ কেমন অবোধ বালকের মতো মল্লিকার দিকে তাকাল। দেখে শুনে মল্লিকা রাগ করতে গিয়েও পারল না। হেসে ফেলল—ভুলেই গিয়েছিলে? ড্রেসিং টেবিল থেকে দেশলাই ও পকেট থেকে সিগারেটটা এনে সীতানাথের হাতে দিল—নাও, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করো। আমার আর কি। কাগজে পড়ি ক্যানসারের কথা, তাই।

—মাঝে মাঝে এক-আধটা খেলে কিছু হয় না মলি। বরং মন প্রফুল্ল থাকে। মল্লিকা কথা বাড়াল না। জল এনে দিয়ে বলল—তুমি এসো, আমি উঠছি।

খানিক পর সীতানাথ আলো নিভিয়ে এল।

—একটা কথা বলব? অবশ্য তোমার চোখে ঘুম নেই দেখেই বলতে ইচ্ছে জাগছে।

—একটা কেন, জেগে যখন রয়েছি তখন যা মনে আসছে বলে ফেলো।

—দ্যাখো, আমার সিগারেট খাওয়া নিয়ে মনে কোনো রাগ-রোষ নেই তো? কারণ কথাটা সিগারেট খেতে খেতে মাথায় এল। ঠিক কথা নয়—একটা প্ল্যান।

—ভণ্ডামি রেখে বলো।

—না, তুমি রেগে রয়েছ।

—বলছি রাগি নি।

—তবে একটু হাসো ···। শুভ, এইবার শোনো। বলছিলাম যে, আর দু-চার বস্তা চাল কিনলে হয় না ?

—কি হবে ? সারা বছরের চাল তো হিসেব করে কেনা হল।

—ব্যবসা করব।

এইবার মল্লিকা শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল—তুমি প্রলাপ বকছ। এত রাত জেগে থাকলে এমনি আবোল-তাবোল চিন্তা মাথায় আসে।

—মলি শোনো।

—ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষীটি। নাও, আমি পাশ ফিরছি।

সীতানাথ আশা ছাড়ল না। ওকে বলল—আহ্‌া, প্রলাপটাই শোনো না। চার বস্তায় দেখলে তো তিন শো কেজি ধরে। একশ আশি ক'রেও যদি কিনে এখন স্টক করি তো চার-পাচ মাস পর সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকা লাভ।

—সব বুঝলাম। কিন্তু অত টাকা পাবে কোথায় ? এ-চাল কিনতেই তো সেদিন পো'স্টাফিসের টাকা প্রায় সব শেষ হল। শ খানেক পড়ে থাকল মাত্র।

—সে-কথাও ভাবা হয়ে গেছে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ম্যাক্সিমাম লোন নেব। আর তুমি যদি রাজি থাক, চার বস্তার জায়গায় আট-দশ বস্তা কিনে ফেলতে পারলে তো কথাই নেই। হাজার টাকার একখানি কড়কড়ে নোট তোমার পার্সোন্তাল্‌ ফাণ্ডে বাড়তি জমবে। ইচ্ছে করলে পুজোর দীঘা অথবা দার্জিলিং। কত লোকই তো যায়, কত লোকই তো যাচ্ছে। আমাদেরও কি মন যায় না ? তোমারও কি সাধ যায় না ? চলো না একবার ঘুরে আসি। আর যদি কোথাও যেতে মন না যায়, বলো, বোসগিন্নীর মতো বাউটির অর্ডার দিয়ে আসি স্তাকরা বাড়ীতে।

বলতে বলতে সীতানাথ কাঁপছিল আবেগে। মল্লিকা নিথর পাথর হয়ে শুনছিল। যেন চারিধারে অনেক লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, তাই তাদের কানে যাতে না যায়, সেইভাবে ফিসফিসিয়ে বলল মল্লিকা—এতে যে পাপ হবে।

—পাপ ! কিসের পাপ মলি ?

—এত এত বাড়তি চাল কিনে রাখা। দেশের লোক যখন খেতে পাচ্ছে না, তখন আমরা অনর্থক এত বাড়তি চাল কিনে···

—আমি ভেবেছি মনি। এ-চিন্তা আমারও এসেছিল। কিন্তু তুমি ছাখো। আমরা যদি কয়েক বস্তা চাল বাড়তি কিনে স্টক না করি, তাহলেই কি দেশের লোকের অন্নাভাব দূর হবে? অথচ কিনে রাখলে প্রায় হাজার টাকা লাভ।

—ঠিকই। তবে আমি অন্ত কথাও ভাবছি। ঘরে যেদিন আড্ডা বসে—পরমেশ ঠাকুরপো, গোকুলবাবু, শীতলদারা আসেন—ব'সে যে মুনাফাখোরদের শ্রাদ্ধ করো, লাজার গাল পাড়ো, তখন তোমার কোনো মেণ্টাল স্ট্রেন হবে না? তাছাড়া অত চাল দর-দালানে পাহাড় হয়ে বস্তাবন্দী পড়ে থাকলে ওঁরাও তো শুধোতে পারেন। কী বলবে?

সীতানাথ অকূল দরিয়ায় যেন খড়-কুটো ধ'রে ভাসবার চেষ্টা করছে। বলল—বলব আমাদের এক আত্মীয় কিনে এখানে রেখে গেছেন। তাঁদের ঘরে রাখবার জায়গা নেই। হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে। এখন বলো রাজি কিনা?

—আমার বাপু ভয় লাগছে। এ ধরনের কথা, আগে কই কখনও বলে নি তো!

—বলছি কি সাধে। চারদিকে তো দেখছি, শুনছি। দুমাস পর যদি কোনো রাস্তা দিয়ে যাই তো চোখে পড়ে আপ-টু-ডেট প্যাটার্নের বাড়ি ছবির মতো ভুঁই ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। খোঁজ নাও, দেখবে কালোবাজারের পয়সা। একটু চোখ মেলে তাকাও। ছাখো। পৃথিবীর প্রাক্তন মূল্যবোধ সব তছনছ হয়ে গেছে। মরালিটি ইজ নাথিং বাট ওয়াণ্ট অব অপারচ্যুনিটি। আমরা যারা মধ্যবিত্ত, সাধারণ, তারাই শুধু আঁকড়ে ধরে রয়েছি মূর্খের মতো। তুমি অস্বীকার করতে পারো?

—সব বুঝছি। কিন্তু ভেবে ছাখো, এর মধ্যেই তোমার মানসিক প্রতিক্রিয়া কি রকম আরম্ভ হয়েছে। এসব ভালো নয়, একদম ভালো নয়।

—ভালো, আলবৎ ভালো। তুমি শুনবে? আমাদের হেডক্লার্ক সেদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন—এবছর আর দেশ থেকে ধান ভানিয়ে চাল করে আনব না। এখন দর শস্তা। কিনে খাব। পরে দর উঠলে-ধানগুলো বেচে দিয়ে আসব। গত বছর চল্লিশ দরে বিক্রি ক'রে প্রতি বস্তায় সত্তর টাকা ক'রে মার খেয়েছি। এবার তার শোধ তুলব।

—এবার নেমেও তো যেতে পারে। গতবার খরা ছিল।

—শোনো কথা, এগারো-হাত কাপড়েও যারা কাছা দিতে পারে না, তাদেরকেই না মেয়েছেলে বলে! দশগুণ কসল কলালেও কোনো লাভ নেই। একবার রক্তের স্বাদ পেলে বাঘের বাচ্চার অন্য রক্তে তৃপ্তি আসে না, শোনোনি?

—শুনেছি। কিন্তু তাহলে আমরাও যে এক হয়ে যাব। কোনো তফাৎ থাকবে না। হাজারো সমস্যার মাঝে এই যে বেঁচে রয়েছি, এর মধ্যে একটা গর্ব আছে।

—ঐ ভুয়ো গর্বটি আপাতত কয়েক বছর শিকেয় তুলে রাখলে ধরণী রসাতলে যাবে না মল্লিকা। তবে যদি ঘোরতর আপত্তি না থাকে, তাহলে অন্তত ওঞ-বছরটা কিছু বাড়তি কামিয়ে নিতে পারো।

সীতানাথ হাসতে হাসতে বলল—আর কয়েক মাস পরেই বেবিফুড কিনতে হবে ব্ল্যাকে। ব্ল্যাকের জিনিস ব্ল্যাকের টাকায় কিনব। এই ডামাডোলের বাজারে কোনো পাপ নেই মল্লিকা। বরং আমরা ভালোভাবে বেঁচে, যে আসছে তাকে ভালোভাবে বাঁচাব—এতেই চরম পুণ্য।

মল্লিকা শিউরে উঠে সীতানাথকে জড়িয়ে ধরল—বলতে নেই, আর বলে না এসব কথা।

অজানা আশঙ্কায় মল্লিকার দু-চোখের কোল ছাপিয়ে তখন ঘন অশ্রুর বন্যা।

রোরুদ্যমানা মল্লিকার চুলে বিলি কাটতে কাটতে সীতানাথ মল্লিকার এই ভাবান্তরে সহসা বিব্রত হয়ে পড়ল। এবং ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেখল কোনো কথাই গলা থেকে বের হচ্ছে না। তাই কেমন একটা বোবা যন্ত্রণায় অস্থির ঘোরে মল্লিকার পাশে ক্রমশই ক্লান্ত হতে হতে অবশেষে নিঃসঙ্গ সীতানাথ ঘুমিয়ে পড়ল।

দরজা ছেড়ে দাঁড়াও

প্রভাকর মাঝি

দরজা ছেড়ে দাও : হাওয়া আসুক।
এক ঝলক দক্ষিণের তাজা হাওয়া।
ও তোমার বয়স্ক-অলিন্দে মালতী ফুলের গন্ধ এনেছে।
ওকে খোলা মন নিয়ে স্বাগত জানাও।
সময় স'রে দাঁড়াক,
নতুন ক'রে বাঁচো।

একরাশ প্রথম বসন্তের রঙ মাখানো
দুরন্ত হাওয়ার হিল্লোল...
উদ্দাম উতরোল।
তোমার পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো এলোমেলো হয়ে যাক।
ওখানে বড়ো বেশি তত্ত্ব আর পণ্ডিতি প্রলাপ,
মানুষকে-ভালোবাসবার ভান,
এবং সেই সঙ্গে দেবতা বানাবার।

আমরা দেবতা হতে চাই নে,
জীবনের জটিলতা আর কুটিলতা নিয়ে
মানুষ হয়েই বেঁচে থাকতে চাই।
তুমি দরজা থেকে স'রে দাঁড়াও।
ভেজা মাটির গন্ধ মাখা দুঃসাহসী হাওয়ার সওয়ার হয়ে
আমরা দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ি।

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা

মুকুল গুহ

সমস্ত সময়ই সুসময়, এখনই নির্দিষ্ট ক্ষণ সুসময় ;
অন্যথায় প্রহর খুঁজলে
ক্রমাগত সদর দরোজায় প্রভু তুমি নেই, চুম্বকের মতন মৃত্যুটান—

রাসস্টাণ্ডে নারীর হাওয়ায় প্রশ্ন ওড়ে—তুমি কি পুরুষ
ওহে তুমি কি পুরুষ,
তবে কেন প্রত্যহের দান ক্লান্ত বিছানায়
তবে কেন ভালোবাসা নেই
আপন ইচ্ছায় প্রভাতের জন্ম দিতে পারো না

পা বাড়িয়ে দেখ জল খুব শীতল নয় হিম নয়
ভয় নেই,
পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রে এখনই সময় হল আমাদের
শস্য বলো ভালোবাসা বলো অপেক্ষা করলে কিছু নেই

সমস্ত সময়ই সুসময়
তাকিয়ে দেখ
ক্রমাগত সদর দরোজায় প্রভু দাঁড়িয়ে রয়েছ কৃপাপাত্র।

কয়েকটা অনিবার্য কারণে

তুলসী মুখোপাধ্যায়

কয়েকটা অনিবার্য কারণে পৃথিবীর সঙ্গে আমার
বনিবনা হচ্ছে না মোটে
দিনরাত খিটিমিটি লেগেই আছে
একেকদিন ইচ্ছে হয়—একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক
কিন্তু বাবার মুখের দিকে তাকালেই
কারফিউ ঘোষণা হয় সকল চৈতন্যে
সোনারিল ট্যাবলেটের মতো
ইচ্ছেগুলি শরীরে শয্যা পেতে শোয়
কয়েকটা অনিবার্য কারণে পৃথিবীকে আমি সইতে পারছি না ॥

এদিকে সকাল থেকেই আমাকে দেখতে হচ্ছে—
ভিয়েৎনামের মাটিতে রক্তের হোলিখেলা
মার্টিন লুথার কিং-এর শবাধারে জনসনের মুখ
প্রকাশ্য রাজপথে চোর-পুলিশের প্রবল দোস্তি
কলকাতার ফুটপাতে পাঁচ লক্ষ ন্যাংটো বিছানা
এবং নেপথ্যে
পোকায় কেটে ঝাঁঝরা ক'রে দিচ্ছে বাংলার চিত্রশালা
বাংলার আকাশে ফংফং করছে বাদুড়! বাদুড়!

এইসব অনিবার্য কারণে পৃথিবীর সঙ্গে আমার
মোটেই বনিবনা হচ্ছে না
একেকদিন মনে হয় দুম্ ক'রে ফেটে যাই
এসপার-ওসপার যাহোক একটা হয়ে যাক
কিন্তু বাবার চোখে চোখ পড়লেই
চুরমার হয়ে আমি শরীরে বিছানা পেতে বসি
ভয় হয়—কেবল ভয় হয়—কোনোদিন আমিও হয়তো
বাবার মতন হয়ে যাব
বাবার মতোই সহাবস্থানে হিম হয়ে যাব।
কয়েকটা অনিবার্য কারণে পৃথিবীর সঙ্গে আমার
মোটেই বনিবনা হচ্ছে না ॥

বীজের চিন্তা

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় পড়ব আমি, কোথাকার মাটি ঠেলে
উঠতে হবে জানি না এখনো
শরীরে কেমন তেজ আছে ? কে জিতবে কে মাটি
না কি আমি ?
মাটি সহায়ক হবে ? না কি তার অনুর্বরতা
ধঞ্চের বীজের মতো আমাকেই ভাঙতে হবে আপন প্রকাশ ভেঙেচুরে
কান্নাহীন শরীরের অনমুভূতির মরা ত্বকে
স্পর্শকাতরতা আনতে হবে
জানিনা,
কার ফুলে জন্ম হয়েছিল ?
কেন সে ফুলের শিরা এখনো স্মরণে ফুলে ওঠে
একান্তে নিভৃতে
আমার আদিম ভূমি সে ফুলের, সবুজের
দিগন্তবিসারী ঘণ্টা বাজে
থেকে থেকে ফিরে চোখ ফেলি
আমি কোন হাতে হাতে ঘুরি
বাজার সে এড়াতে পারি নি
নিজের সুচেনা মাটি, তাতে যদি পড়া হ'ত
আমি তো নিশ্চিন্ত হয়ে তার বুকে আশ্রয় নিতাম
এখন কোথায় যাব কোন বা পাথরে লিপ্ত হব
জন্ম হবে অথবা হবে না
এখন মরার ভয় জন্ম-আকুলতা
মাটিতে পড়ার আগে মন শুধু উৎপীড়িত করে।

ট্রেন

অনন্ত দাশ

সবুজ ট্রেনের পথে সন্ধ্যা নামে স্টেশনে স্টেশনে
দূরে যাচ্ছি—তবু
স্মৃতিহীন মণিবন্ধ, জন্মান্ধের জটিল বাতাস
অন্ধকারে পাখা মেলে—ঐ ট্রেন দূরে চলে যায়॥

রেখেছিলে বহুদিন রক্তের গভীর নিচে, ছায়া
তবু মন্দিরের কাছে যেতে ভয়
আজও কোনো বাদুড়-আঁধার প্রাচীন অশ্বথে
মরণ দেখেছি আমি, মৃত্যু তবু কেমন জানি না॥

এক-একটি জন্ম ঘিরে সহস্র আলোকবর্ষ নাচে
চড়াই-উৎরাইয়ে ছোটে ট্রেন
যদিও জেনেছি সন্ধ্যা—সকাল—বিকেল
বয়সের মধ্যজানু জটিল, অস্থির।

ধমনীর রক্তজালে সোঁদামাটি, বিস্ফুরিত ক্লেদ
হে সময় সবুজ পতাকা
প্রান্তরে হঠাৎ ট্রেন থেমে যায় যদি

অবিশ্বাস্য তেলকুচো লতা

বাসুদেব দেব

লক্ষ লক্ষ এরোপ্লেন আকাশ ছেয়ে ফেলে
যেন জটায়ুর পাখার তলায়
সীতা চুরি যাচ্ছে
লক্ষ লক্ষ বিমান-বিধ্বংসী কামান পাতা হয়
বাংকারের গা বেয়ে অবিশ্বাস্য সবুজ তেলকুচো লতা
তেলকুচো লতার মতো তোমার স্পর্শ
বারুদভরা বুকে
অতীত ঐতিহ্যের মেঘচ্ছায়া
মেঘের বদলে এরোপ্লেন
এ্যান্টি-এয়ারক্রাফটগান তালীবনের বদলে
প্রতীকের বদলে দুঃখিত সত্য
একমাত্র প্রার্থনা আজ বর্মের আড়ালে নরম বুক

আমার দুঃখের পথে দীর্ঘজীবী বিশ্বাস এসো
এরোপ্লেন নিলামে উঠছে
হাজার হাজার ঠাণ্ডা কামানের ওপর শিশুদের খেলা
সৌখিন ক্যামেরাম্যানের মতো বিকেলের সূর্য
আর সেই পাখি সবুজ তেলকুচো লতা
তোমার অব্যর্থ স্পর্শ
কোনো প্রতীক ছাড়াই বেঁচে থাকে

ছুঁতে হবে মধ্যরাত্রে সূর্য

প্রভাত চৌধুরী

এর থেকে অনিশ্চয়তা নিয়ে জেগে ওঠা ভের ভালো
ঝুঁকি নেওয়া মধ্যরাত্রে সূর্যের শরীর ছুঁতে যাওয়া
পরিচ্ছদহীন এ-রকম নীরবতা চাইনা এখন
এখন কাটিঙ দিয়ে ভেঙে দাও সব নিস্তব্ধতা
আর কোনো স্বপ্ন নয়
স্বপ্নের ডুবুরি হয়ে সম্ভাবনা তুলে আনা নয়

ঘুঁইখালে ঢোকা চাঁদের জ্যোৎস্না হারাবার কথা
ভুলে যেতে হবে
ছুঁতে হবে মধ্যরাত্রে সূর্য
চাঁদের শরীরে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই
সুস্বপ্নে মধ্যরাত্রি তুমি নক্ষত্র সরিয়ে নাও

আমি অনিশ্চয়তা নিয়ে জাগ্রত হয়েছি
চন্দ্রনীলিমার অন্ধকার ধুয়ে দেবো সূর্য জ্বেলে দিয়ে

সীমানা খুঁজি

কাননকুমার ভৌমিক

আমি বন্ধুর পথে প্রত্যয় মাঝে
কত কি বীজ রোপণ করেছি
আমি উপকণ্ঠ ধ'রে অনাবাদী অঞ্চলে
সীমানা চিহ্নিত করেছি,
আমি কৃপাণের হ'য়ে পাথরের গা-য়ে
অস্ত্র খোদিত করেছি, যখন
অশোক অথবা মহাভিক্ষু
সমগোত্র হ'য়ে মসৃণ হরিৎ পত্রে
রৌদ্ররেখার বার্তা বহন করে, যখন
প্লাবিত খর-স্রোতে ভবিতব্যেরা
গুণ গুণ স্বরে মাঝদরিয়ার গান গায়, আর
জলের শব্দে বিস্ফোরণের চিহ্ন ধ্বনিত ক'রে মহাকোলাহল করে.
যখন সোনালী রোদের চড়া গন্ধে
ক্রূর আত্মারা পুড়ে থাক
উধাও জলের গভীরে
আমি চিহ্নিত ভূমিতে চরণ স্থির ক'রে
পরমতম সীমানা খুঁজি—
ধ্বংসাবশেষের দাবি-দাওয়া আমার কোথায় আছে ?
সে কখন কোথায়
কোন তীক্ষ্ণনখ মহাতান্ত্রিকের কাছে কাছে

প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

[বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি দীর্ঘ দিন বিচরণ করেছি, মাতব্বরী করেছি বেশ কিছু দিন, বর্তমানে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় ভাবে সব দেখে যাচ্ছি, যতি-অবস্থা আগতপ্রায়।

সাহিত্যের এই চতুরাশ্রমে প্রবেশ করেছিলাম যাঁর আচার্যত্বে, তিনি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি আবার আমার তীর্থগুরুও, তাঁকে পাণ্ডা ধরেই রবীন্দ্র-সংযোগ ও ঠাকুরবাড়িতে অবাধ বিচরণের অধিকার লাভ করেছিলাম। আর তাঁর গৃহে অবস্থানের সুবাদেই বাঙলার বিস্তৃত বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত হয়েছিলাম।

বর্ণাশ্রম ধর্মমতে আচার্যের মৃত্যুতে অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্তব্য। অনেক বর্ণাশ্রমী কর্তব্যের মধ্যে এ-ক্ষেত্রেও আমার প্রত্যবায় ঘটেছে।

অগত্যা তাঁর জন্মশতবর্ষে কর্তব্যহানির গ্লানিটা বড় বেশি বোধ হতে লাগল। অতএব আচার্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদনের এই সুযোগ গ্রহণে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেও বয়সাধিক্য জনিত কর্মে অনীহা ও স্মৃতি-বিভ্রম বাধা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু 'পরিচয়' সম্পাদক আমার অবস্থা বিবেচনা করে আমাকে সুযোগ করে দিলেন, বছর কয়েক আগে বাঙলার বাইরে জামশেদপুর 'চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদ'-এর কোনো অনুষ্ঠানে পঠিত ও তাঁদেরই রিপোর্টে প্রকাশিত চৌধুরী মহাশয় সম্পর্কিত রচনাটি প্রকাশের জন্য গ্রহণ করে।

রচনাটি এ-পর্যন্ত মুষ্টিমেয় লোকেরই দৃষ্টিগোচর হয়েছে, 'পরিচয়' পত্রিকার মাধ্যমে বৃহত্তর সুধীসমাজে তার প্রচার-ব্যবস্থা করে দিয়ে আমাকে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী আচার্যের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে সাহায্য করলেন। তার জন্য আমি বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করছি।]

প্রমথ চৌধুরীর মুখে যে-কথাটা সবচেয়ে বেশিবার শুনেছি, তা হল : cultivate your garden, আর এই গার্ডেন বলতে তিনি শাক-শব্জি, আনাজ-তরকারি, ফল-মূল, পাম-ক্রোটন-ইউকেলিপটাস-এর বাগান বুঝতেন না। বাগান মানেই তাঁর কাছে ফুলের বাগান। ফলের উপযোগিতা যথেষ্ট বেশি এবং উপযোগিতাকে অস্বীকারও তিনি কোনোমতেই করতেন না। কিন্তু ফুল সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রকাশ। অথচ সেই ফুলেরও পরিণতি ফলে। তাই ফুলই তাঁর কাছে ছিল সাহিত্য-সাধনা ও জীবন-সাধনার প্রতীক। আমার মনে হয়, "ফুলের চাষ করো"—এই একটি উক্তির মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ নিহিত আছে।

জন্ম, শিক্ষা ও বৈবাহিক সূত্রে তিনি পরিপূর্ণ বনেদি ও বিদগ্ধ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ জীবনকে নানা রূপে সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য করে দেখবার যেমন তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁর মানসিক প্রবণতাও তেমনি সেদিকে ধাবিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল কৃষ্ণনগরে, প্রাক্-কলকাতা-যুগের সংস্কৃতি-কেন্দ্র হিসেবে যার ঐতিহ্য তখনো মরে যায়নি। সে যুগের কৃষ্ণনগর আধা-শহর আধা-পাড়াগাঁ, কিন্তু বাঙলার নাগরী সভ্যতা যে সেখানেই জন্মগ্রহণ করেছিল সে সম্বন্ধে সে নগরের অন্যান্য বাসিন্দাদের মতো প্রমথ চৌধুরীও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী যখন বড় হয়ে উঠলেন, অর্থাৎ বয়সে বড়, শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে সম্পূর্ণ বড় ; যখন রাজধানী নগর কলকাতায় পুরোপুরি নাগরিকতাবোধ নিয়ে সাহিত্য-জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তখন আমরা তাঁকে দেখতে পাই মেহনতী সমাজ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু সেখানেও তিনি পুরো-পুরি নাগরিক, তাঁর চোখে বা মনে পল্লীবাঙলার সবুজের ছোঁয়া নয়, রাজপথের আলোর মিছিলই ঝলমল করছে।

কলকাতা তখন নতুন চিন্তা ভাব ও কর্মধারার উৎস, নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিমিত হলেও তা-ই তখন দেশের জীবনকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রধান শক্তি। প্রমথ চৌধুরী এই নাগরিকতাকেই জীবনের সিংহদ্বার বলে মেনে নিলেন। যে বহুনিন্দিত নাগরিকতা সমাজ-বিবর্তনের অনিবার্য গতিতে গ্রামীণ-সভ্যতা-পুষ্ট বাঙলার উপর এসে চেপে বসেছে, প্রমথ চৌধুরী হলেন সেই নাগরিকতার ভাষ্যকার।

ভাষ্যকার, কিন্তু চিত্রকার নন। তাই নাগরিক মানুষের বহু বিচিত্র আলেখ্য

সজীব হয়ে তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠে নি। ধনীর বিলাস-কক্ষের বহু নিচে কানাগলির মধ্যে কুলি-মজুরের ডেরায় যে দুর্নীতি ও ব্যাভিচার, নীচতা ও দীনতা জমে থাকে; প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে তা চিত্রিত হয়নি। তিনি নিজেই বলেছেন, লেখাপড়া তাঁর পেশা, নেশা, কাজ আর খেলা। তাই লেখা-পড়ার পরিবেশেই তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে গৃহকোণে, পথে পথে তিনি ঘুরে বেড়ান নি। নানা শ্রেণীর মানুষকে জানবার যে সুযোগ তিনি বাল্যে লাভ করেছিলেন, যৌবনে তা থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। সমজাতের এক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করেছেন।

পাষাণকায়া বিরাট রাজধানীর মধ্যে হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায় না, হৃদয়বৃত্তিকে আমল দেওয়ার মতো অবসর সেখানে কারো নেই, বুদ্ধির নিকষ পাথরে যাচাই করেই ভালোমন্দ ন্যায়ান্যায় যোগ্য-অযোগ্য বিচার হয়ে থাকে।

বুদ্ধির নিকষ পাথরে সব কিছু যাচাই করার এই যে নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি, এইটেই প্রমথ চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্যকে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী যে জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, তাতে তিনি দেখেছেন বুদ্ধির নিরিখে মস্তিষ্কের দর্পণেই তা রূপায়িত হয়েছে, মননের দীপ্তি-প্রাচুর্যে তা ঝলমল করে উঠেছে। তাই সেখানে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এক শ্রেণীর মানুষের জীবনের এক ভগ্নাংশই সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে। কিন্তু সে সাহিত্য গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত সুরুচিসম্পন্ন ও বুদ্ধি-দীপ্ত। মজলিশী প্রমথ চৌধুরী সাধারণ জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সামান্যই অর্জন করেছিলেন। তাই তাঁর বুদ্ধির মুকুরে বৃহত্তর জীবন ধরা দেয় নি, কিন্তু যেটুকু দেখেছিলেন তার অন্তস্তল পর্যন্ত তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অন্যের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব পুরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি নিজের জীবন সম্বন্ধে গূঢ় অনুভূতি দিয়ে। একথা সত্য যে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত, কিন্তু যেটুকু তিনি দেখেছেন তার মধ্যে ফাঁকির কোনো অবকাশ ছিল না এবং কোনো কিছুর প্রতি সমীহ রক্ষা করে বা কারো মুখ চেয়ে নিজের সত্যানুভূতিকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা তাঁর সাহিত্যে বা জীবনে—কোথাও দেখা যায় নি। এই কারণেই আমি প্রমথ চৌধুরীকে জীবনবাদী সাহিত্যিক বলতে কুণ্ঠিত নই।

প্রমথ চৌধুরীর কাছে সবচেয়ে বড় ছিল ছিল তাঁর নিজের জীবনের আদর্শ। তাঁর সবচেয়ে বড় শিল্পসৃষ্টি ছিল তাঁর স্বকীয় মনন ও রুচি। সাহিত্যের মধ্যেও

তিনি সেই নিজস্ব জীবন-শিল্পকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর ব্যক্তি-পুরুষ ও শিল্পী-পুরুষ ছিল সমধর্মী। প্রমথ চৌধুরীর জীবনে হৃদয়ের স্পন্দন বেশি দোলা দেয় নি, মস্তিষ্কের দাবিকে কোনোদিন ছাপিয়ে ওঠে নি এবং তাঁর সাহিত্যেও স্বভাবত মননধর্মের নিচে হৃদয়ধর্ম চাপা পড়েছে। যে নাগরিক সভ্যতা ও যন্ত্র-শিল্পের যুগ মানুষের হৃদয়বৃত্তির এতটুকু দাম দেয় না, প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি সমাজকে বিচার করে সাফল্যের মূল্য দিয়ে; সেই যুগের চারণ ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তাই তাঁর কাছে মনের মূল্য নয়, মননের মূল্যই ছিল প্রধান সত্য।

জীবনের সেই বিশিষ্ট সহানুভূতির ফলেই প্রমথ চৌধুরীর জীবনধর্ম যুগধর্মের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। যুগটা বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান বুদ্ধিপ্রসূত, তাই যুগধর্মই হৃদয়ধর্মবর্জিত ও বুদ্ধিগত। বস্তুত যুগধর্মের সঙ্গে মননকে সমান কদমে চালিত করা—এইটেই ছিল প্রমথ চৌধুরীর সচল মনের হৃদয়ধর্ম। শাশ্বত সনাতনের প্রতি তাঁর কোনো দুর্বলতা ছিল না, কারণ পরিবর্তনকেই তিনি জীবন ও জগতের প্রধান সত্য বলে উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের দৃষ্টি থাকবে ভবিষ্যতে, কর্মক্ষেত্র হবে বর্তমানে, আর অতীতের স্থান হল মিউ-জিয়ামে ও আরকাইবসে—এক কথায় বলতে গেলে এই ছিল প্রমথ চৌধুরীর চলমান মনের দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো শাশ্বত সত্যে তাঁর বিশ্বাস ছিল কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। নতুন ও পুরাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সমাজের উন্নতি দেশ-কাল-পাত্র সাপেক্ষ, সুতরাং দেশ-কালের অতীত, কিংবা সর্বদেশে সর্বকালে সমান বলবৎ কোন সত্যের দ্বারা সে উন্নতি সাধন করবার চেষ্টা বৃথা।"

যুগধর্মকে তিনি এতখানি মূল্য দিয়েছেন যে, নতুন যুগে সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি নতুন আইডিয়ালের প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। বলেছেন—"সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশিষ্ট ধর্ম আছে। সেই যুগধর্ম অনুসারে চলতে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে।" "দেশের সঙ্গে দেশের অবশ্য স্পষ্ট প্রভেদ আছে, কিন্তু কালের চাইতে কালের প্রভেদ তার চাইতেও স্পষ্ট।"

যুগধর্মের পূজারী প্রমথ চৌধুরী স্বভাবতই নবীনতারও পূজা করেছেন। তাই তিনি যখন 'সবুজপত্র' প্রকাশ করলেন, তা শুধু নামে এবং মলাটের রঙেই সবুজ হল না, রসে এবং প্রাণের অভিব্যক্তিতে নবীন পত্রের বর্ণকে সার্থক করে তুলল। তিনি নিজে বলেছেন: "সবুজ হচ্ছে বর্ণমালার মধ্যমণি এবং নিজগুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে। বেগুনী কিশলয়ের রং—জীবনের পূর্বরাগের রং। নীল আকাশের রং—অনন্তের রং। পীত শুষ্ক-

পত্রের রং—মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং—রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যাপ্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্ব্ব সীমায় বেগুনী আর পশ্চিম সীমায় লাল। অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম।”

রস ও প্রাণের প্রতীক সবুজ আর তার পূর্ণ অভিব্যক্তি যৌবন, তাই ইন্দ্রিয় বর্জিত প্রমথ চৌধুরী তাঁর সচল মনকে সবুজের উপাসনায় পর্যবসিত করেন নি, যৌবনকে রাজটিকা পরিয়েছেন এবং ব্যক্তি-যৌবনের চেয়ে সমাজ-যৌবনকে অধিকতর মূল্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন “দেহের যৌবনের অন্তে বার্দ্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ থেকেই সংগ্রহ করতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না, কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজের নূতন প্রাণ নূতন মন নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখ-দুঃখ নূতন আশা নূতন ভালবাসা নূতন কর্তব্য নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশা নেই এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।”

যৌবনের পূজারী বলেই তিনি ছিলেন শক্তির পূজারী এবং সে শক্তি দৈহিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়। মনের এবং চরিত্রের যে শক্তি, কর্ম শক্তি ও মনন শক্তি, জীবনকে যা জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে গতিশীল করতে পারে—সেই শক্তিই ছিল তাঁর উপাস্য এবং সেই শক্তি সঞ্চার করাই তাঁর মতে সাহিত্যের প্রধান কর্তব্য। “আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্যকে ঔদাস্য বলে, শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্ব্বলের বল, যে দুর্ব্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্ম-রক্ষার জন্য আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্ম-প্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।”

“সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোন কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোন কোন কথায় মন ভেজে এবং সেই জাতির

কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য।" এখানে "মন ভেজা" কথাটাকে অবশ্য বিশিষ্ট অর্থে ধরতে হবে।

কারণ কি সাহিত্যে কি জীবনে চিরকাল তিনি বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেছেন, সর্বদা হৃদয়কে বিদ্রূপ করতে ইতস্তত করেন নি। লিখেছেন, "করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে।" হৃদয়বৃত্তিকে তিনি অনেক সময় আমলের মধ্যেই আনেন নি। এক জায়গায় বলেছেন, "হৃদয়ের দোহাই দিলে এ-দেশে নির্বুদ্ধিতার সাত খুন মাপ। হৃদয়টা আমাদের এত্তোবড় জিনিস। যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথার কথা শুনলে আমরা অবশ্য হাসি, কিন্তু যার বুক নেই তার বুকের ব্যথার কথা শুনলে আমরা কাঁদি। এই আমাদের স্বভাব, আর এই জন্যেই তো এদেশে কোন কাজের কথা বলা কঠিন। হৃদয় পদার্থটা অবশ্য খুব ভাল জিনিস এবং উদরের চাইতে ঢের উঁচুদরের জিনিস এবং উদর যে অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে মস্তক বলে পরিচয় দিতে চায়, তাও অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। মানুষের চোখে দুটো চোখ আছে, বুকে একটাও নেই। হৃদয় অন্ধ, অতএব যে যত অন্ধ সে তত হৃদয়বান—এই হচ্ছে লোকমত।" প্রমথ চৌধুরীর হৃদয়-ধর্ম-বর্জিত বৈজ্ঞানিক-সুলভ নির্লিপ্ততা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য। সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মনন-ধর্ম মনের সঙ্গে সেই তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে, যেটা ভাবালুতার বাষ্প-স্পর্শহীন।" কাজেই "মন ভেজে" বলতে প্রমথ চৌধুরী যা বলতে চেয়েছেন আমার মতে, তা মননকে ধাক্কা মারার কথা।

দেশবাসীর জড়তা তাঁকে সবচেয়ে বিব্রত করেছিল এবং সেইজন্যেই তিনি ইউরোপীয় সভ্যতাকে সর্বান্তঃকরণে বরণ করে নিয়েছিলেন। "ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন মনের গায়ে হাত বুলায় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক, মদিরাই হোক, আর হলাহলই হোক, তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরেজী শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আমরা দেশশুদ্ধ লোক যেদিকে হোক কোন একটা দিকে চলবার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আকুবাকু করছি। কেউ পশ্চিমের

দিকে এগোতে চান, কেউ পূর্ব্বের দিকে পিছু হটতে চান, কেউ আকাশের উপরে দেবতার আত্মার অনুসন্ধান করছেন, কেউ মাটির নীচে দেবতার মূর্ত্তির অনুসন্ধান করছেন। এক কথায়, আমরা উন্নতিশীলই হই আর অবনতিশীল হই, আমরা সকলেই গতিশীল,—কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা আর কিছু না হোক, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ—মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি।"

তা বলে একথা মনে করবার কারণ নেই যে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন। 'সবুজপত্র' প্রকাশের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন: "ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্ত্তমানের চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে।" অর্থাৎ "একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নতুনত্ব এসে পড়েছে, তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য" 'সবুজপত্র'-র প্রতিষ্ঠা।

তাঁর বাইরের খোলসকে অনেক সময়েই তিনি প্রশ্ন করেছেন। কারো কারো মতে প্রমথ চৌধুরী রাজনীতি-নিরপেক্ষ ছিলেন। নিজেই এক জায়গায় বলেছেন যে, পলিটিকাল পরমহংস হবার শক্তি বা ইচ্ছা, কিছুই তাঁর নেই। কিন্তু পলিটিক্স যেখানে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের প্রধান চালক-শক্তি, সেখানে আধুনিক জীবন-সচেতন প্রমথ চৌধুরী তাঁর চিন্তায় পলিটিক্সকে এড়িয়ে চলেন নি; বলেছেন, "আমরা কল্পনারাজ্যে সংসার পাততে পারিনে, আর পলিটিক্সের বিষয় হচ্ছে জাতীয় ঘর-করণার বিষয়, সুতরাং পলিটিক্স সম্বন্ধে আমরা মুখে মৌন থাকলেও মনে আলগা থাকতে পারিনে......শুধু একালে নয়, কোন কালেই সাহিত্যিকেরা পলিটিক্স এড়িয়ে যেতে পারেন নি।"

এই পলিটিক্স প্রসঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা সবচাইতে বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী পলিটিক্স, যুদ্ধোন্মত্ততা, শক্তির দম্ভ তাঁকে শুধু পীড়িত করেছে তাই নয়, ইউরোপীয় সভ্যতার এই লোভপরায়ণতাকে তিনি ধিক্কৃত করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী ভাঙাগড়া তাঁকে রীতিমতো পীড়িত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। যুদ্ধ প্রসঙ্গে একদিন আমার সঙ্গে

যে আলোচনা হয়েছিল তা থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্যক উপলব্ধি করা যায়। যুদ্ধের সময় ইংরেজরা আমাদের অনেক আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু তার কিছুই হল না—এই কথা বলেছিলাম আমি। প্রচুর নৈরাশ্যের সঙ্গে তিনি একটানা যা বলে গেলেন তাতে তাঁর মনের নৈরাশ্য এবং বিক্ষোভ উদ্‌গীরিত হল।

"সারা দুনিয়ায় যুদ্ধের উপসংহার দেখে নিরাশ হয়েছি। এই কুরুক্ষেত্রে সমগ্র পঞ্চপাণ্ডবের হাড়-গড়া সন্ধিপত্রে যা আছে, সে শুধু দেনা-পাওনা, হিসেব-নিকেশ, আর পৃথিবীর জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা—এক কথায়, শুধু জ্যামিতি আর পাটিগণিত। কবিতার বদলে মিলল অঙ্ক। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম সভ্যতার একটি নূতন প্রাণচিত্র, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর একখানি নূতন মানচিত্র। মুশকিল কি জানো, মাটিকে আমরা যেমন ইচ্ছে ভাগ করতে পারি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ-বিয়োগ করা নিয়েই তো যত মুশকিল। যুদ্ধ মাটি নিয়েই হয়, শান্তি কিন্তু মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেখছ না জার্মান বলছে, তোমাদের যা সন্ধি হল তা তো আসলে বিচ্ছেদ। ওদিকে ইতালি বলছে সন্ধি হল কিন্তু সমাস কই!"

"কিন্তু মুখে তো ওরা প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতার দাবি মেনে নেয়," আমি বললাম।

"কিন্তু সেখানেও গোলমাল আছে যে! কারণ জাতির ইংরেজী প্রতিশব্দ নেশন আর ন্যাশন্যালিটিতে রয়েছে বিরোধ। একটা জমি-গত আর একটা রক্তের সম্পর্ক। এ দুটো বিরোধী অর্থের সমন্বয় করতে গিয়েই হয় বিরোধ। এক চৌহদ্দির ভিতর যেমন নানা জাত বাস করে, তেমনি এক জাতের লোকও নানা দেশে বাস করে।"

"কিন্তু সে তো ইউরোপের সমস্যা, ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখার সে যুক্তি খাটে না।"

"খাটালেই খাটে। শান্তির দরবারে তো ঠিক হয়ে গিয়েছে যে, সমগ্র আফ্রিকা এবং এশিয়ার বেশির ভাগ জাতিই নাবালক। যত দিন তারা সাবালক না হয়, তত দিন তাদের শাসন-সংরক্ষণ করবে কয়েকজন অছি। আর জানোই তো ইউরোপের মত—নাবালকদের শিক্ষার একটি মোটা কথা—Spare the rod and spoil the child. আমাদের অবস্থাটা আর একটু বেশি গোলমেলে। আমরাই হচ্ছি মানব-সমাজে একমাত্র living contradiction: একসঙ্গে সাবালক ও নাবালক। লীগ অফ নেশন্‌স-এর

হিসেবে আমরা হলাম সাবালক আর নেশন হিসেবে আমরা থেকে গেলাম নাবালক।"

"তারা বললেই তো আমরা মেনে নেবো না যে আমরা নাবালক।"

"সেইখানেই তো আমাদের গোল। আমরা যারা নাবালকত্ব স্বীকার করি না, সাবালকত্বের স্বপ্ন দেখি, তারাই রাজনীতিতে extremist। আর যাঁরা হিসেব-নিকেশ করে সাবধানে পা ফেলতে চান, তাঁরা মডারেট।"

"আপনি এঁদের কোন দলের?" আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

চৌধুরী মহাশয় জবাব করলেন, "তুমি তো জানো, আমার কলমের মুখ দিয়ে যা বেরোয় তা রেখাও নয়, সংখ্যাও নয়, সে সেরেফ অক্ষর। কাজেই গোল পৃথিবীকে চৌকোণ করার চেষ্টায় আমি কি করতে পারি?"

কিছু করতে পারেন না বলে যে নৈরাশ্য প্রকাশ করেছিলেন, তা সাময়িক, অন্তত উদাসীনতা তাকে কোনোমতেই বলা চলে না। কারণ, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নতুন সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠনের গুরুত্বের ইঙ্গিত তাঁর বহু লেখায় বহু কথায় বহু গল্পে বহু সময়ে পাওয়া গেছে।

অর্থ নৈতিক বা রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না, নিজেকে বলতেন 'ism-নাস্তিক', কিন্তু অর্থের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক না থাকলেও অর্থনীতির সঙ্গে সাহিত্যিকদের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ, এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন; যদিও 'সাহিত্য বনাম পলিটিক্স'-এর আলোচনায় সাহিত্যের ও পলিটিক্সের ধর্মের পার্থক্য তিনি খুব জোরের সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাছে পলিটিক্সের দাম ছিল জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। কিন্তু যেহেতু সামগ্রিক জীবনকে তিনি পলিটিক্সের চেয়ে বড় করে দেখেছেন, মনকে মতের চেয়ে উচ্চস্তরের বলে গণ্য করেছেন, সেইজন্যই পলিটিক্সের কোনো বিশিষ্ট প্রচলিত মতবাদ তাঁর মধ্যে কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য মুখ্যত আলোচনা, তর্ক ও বক্তৃতার ঝড়। এমন কি, তাঁর গল্পও আলোচনা-বাহুল্যে প্রবন্ধ-ধর্মী। সে ক্ষেত্রে জীবনের প্রকাশ যে তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি আছে। সেইজন্যই ism-নাস্তিক হয়েও তিনি ছিলেন individualism ও liberation-এ জোরতর বিশ্বাসী। এক কথায়, গাঢ় গণতান্ত্রিক। গণতন্ত্র তাঁর কাছে রাজনৈতিক সংজ্ঞা নয়, শাসনব্যবস্থার বিশিষ্ট রূপও নয়, ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যেই তিনি গণতন্ত্রকে খুঁজে পেয়েছেন। সে গণতন্ত্রকে শুধু দেশের মধ্যেই দেখতে চান নি,

দেখতে চেয়েছেন সাহিত্যের মধ্যে। তিনি বলেছেন, "নব সাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্য-জগৎ যখন দু-চারজন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক, পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্য-রাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন এবং তাঁরা কাব্য দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে অট্টালিকা স্তূপ স্তম্ভ গুহা প্রভৃতির আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোন রূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে তোলা অসম্ভব, এই জ্ঞানটুকু জন্মালে আমাদের কারো আর সাহিত্য-রাজা হবার লোভ থাকবে না এবং শখের কীর্তিস্তম্ভ গড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত করব না। এর জন্য আমাদের কোনরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই। বস্তু জগতের ন্যায়, সাহিত্য জগতেরও প্রাচীন কীর্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভাল কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য নয়।... নবযুগের ধর্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা,—কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে কোন জিনিস মহৎ হয় না— এরূপ ধারণা আমাদের নেই; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে; আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে।... এক কথায়, বহু শক্তিশালী স্বল্প সংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহু সংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্তত ষষ্টি সহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন।"

উপরের উদ্ধৃতি থেকে প্রমথ চৌধুরীর গণতান্ত্রিকতাই শুধু নয়, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর মত ও সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি তিনি আরো জোরের সঙ্গে ধ্বনিত করেছেন, যখন বলেছেন, "এযুগে মানুষের উপরমানুষের কোন অধিকার নেই। প্রতি লোকেই নিজের ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে পারে। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত। ধর্ম সম্বন্ধে, চিন্তা সম্বন্ধে, মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে সকলেরই সমান স্বাধীনতা আছে।... একথা নির্ভয়েই বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসির গোড়ার কথা, আর তার শেষ কথা। এবং ঐ স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসির ভিত্তি ও চূড়া।"

ব্যক্তিস্বাধীনতা যে উচ্ছৃঙ্খলতায় গিয়ে পৌঁছতে পারে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ

সচেতন ছিলেন তিনি ; ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারক হয়েও সমাজ-কল্যাণের প্রয়োজনে তার কিছু সীমারেখা টেনে দেওয়া তিনি ক্ষেত্রবিশেষে সমর্থন করেছেন। প্রবৃত্তির স্বাধীনতা আর ইচ্ছার স্বাধীনতা যে এক নয়, একথা বলেছেন। স্পষ্ট-ভাবে, যেমন "drunk-স্বাধীনতার উপর যদি হস্তক্ষেপ করা না যায় তো তা sober-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবে।"

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন দর্শনের ছাত্র, তাই মনের জড়তা ও সঙ্কটমুক্তির ভিতর দিয়ে তিনি জীবনের মুক্তির সন্ধান করেছেন ; বাস্তব সমস্যাগুলির মূল কারণ হিসেবে মনের সমস্যাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই বাস্তব সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করতে বসেও তিনি অনেক সময় সমাধানের সন্ধানে মনোজগৎ পরিক্রমা করেছেন ; দৈনন্দিন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যাও সোজাসুজি না দেখে তার মূলের সন্ধান করেছেন ; বিশ্বাস করেছেন, "সাময়িক ব্যাপারকে কেবলমাত্র সাময়িকভাবে দেখলে তার স্বরূপ আমাদের চোখে পড়ে না।"

বাস্তবধর্মী যেসব সমস্যার আশু সমাধানের নির্দেশ-প্রত্যাশায় সাধারণের মন উন্মুখ ও অধীর, প্রমথ চৌধুরীর দার্শনিকমানস তার তত্ত্ব আলোচনা করে মূল সন্ধানের প্রয়াসে। বোধহয় এই কারণে প্রমথ চৌধুরী জনপ্রিয় লেখকের পর্যায়ে পৌছন নি।

কিন্তু দার্শনিকতা কেবলমাত্র সবকিছু তলিয়ে দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তব সমস্যা প্রণালী পেরিয়ে জীবনের ধারা ও বিকাশ সম্বন্ধে তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যাকে বার্গসঁ-র Creative Evolution বা সৃজনধর্মী বিবর্তনবাদের সগোত্র বলা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে তিনি বোধহয় বার্ণাড শ-রও সমধর্মী। অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহরায় প্রমথ চৌধুরীর এই দিকটার প্রভূত আলোকসম্পাত করেছেন বলে দেশবাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

তিনি বলেছেন, "প্রবাহই হচ্ছে পবিত্রতা, স্রোত মানেই শক্তি," "জগৎ গতির লীলা।" "জীবন ও মনের সহজ গতিরোধ করে সমাজকে অটল করলেই তা অচল হয়ে পড়ে।" তাঁর মতে evolution ক্রমবিকাশও নয়, ক্রমোন্নতিও নয়— 'কোন পদার্থকে প্রকাশ করবার শক্তি জড়প্রকৃতির নেই এবং তার প্রধান কাজই হচ্ছে সকল উন্নতির পথে বাধা দেওয়া। Evolution জড়জগতের নিয়ম নয়, জীবজগতের ধর্ম। Evolution-এর মধ্যে শুধু ইচ্ছা-শক্তিরই বিকাশ পরিস্ফুট ;

Evolution অর্থে দৈব নয়, পুরুষকার।" আর-এক জায়গায় বলেছেন, "এমন কোন জাগতিক নিয়ম নেই যে, মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেও তার উন্নতি হবে। হ্রাস বৃদ্ধি ও বিপর্যয়— এ তিনই জীবনের ধর্ম ; সুতরাং জীবনের উন্নতি ও অবনতি মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়। মানবের ইচ্ছাশক্তি, মানবের উন্নতির মূল কারণ। তাঁর সব কথার শেষ কথা, "cultivate." মানুষ যখন পাঁচশের সাতপো ঘাস তুলে ফেলে ধান বোনে, তখন সে পৃথিবীর সংস্কার করে। মানুষের জীবনে এক কৃষি ব্যতীত অন্য কোন কাজ নেই। এই দুনিয়ার জমিতে সোনা ফলাবার চেষ্টাতেই মানুষ তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। চাষিব কাজও কৃষিকাজ, শুধু সে কৃষির ক্ষেত্র ইদং নয়, অহং।" বিংশ শতাব্দীর বিদগ্ধ নাগরিকতার প্রধান ধারক প্রমথ চৌধুরীর মুখে নতুন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে বাঙলার রামপ্রসাদী সুর, যখন তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশে যা দেবার জমি পড়ে রয়েছে, সে হচ্ছে মানব জমিন। আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই, তাহলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানব জমিনের আবাদ করা।"

উনবিংশ শতকের বাঙলায় যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রথম প্রকাশ ও ব্যাপ্তি, সেই শতকের সীমানা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ তাকে এনে ফেলেছেন বর্তমান শতাব্দীতে। রবীন্দ্রনাথের মার্তণ্ড প্রতিভার দীপ্তিতে কথঞ্চিৎ ম্লান বলে প্রতিভাত হলেও, জীবনদর্শনে ও জীবনবোধে প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে যে স্বকীয়তা দেখা গিয়েছে, তাকে বোধহয় অনন্য বললেও অত্যুক্তি হবে না।

দুই

প্রমথ চৌধুরীর জয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "যখন থেকে তিনি সাহিত্যপথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন, আমি পেয়েছি তাঁর সঙ্গচর্যা এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিপ্রদীপ্ত প্রতিভা। আমি যখন সাময়িক পত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্র 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনায় একটি নতুন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও

কুণ্ঠিত হইনি।"

এই কথাগুলিকে রবীন্দ্রনাথের পিঠ-চাপড়ানি বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তা বিচার ও আলোচনার বিষয়। যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রমথ-প্রতিভা আগাগোড়া সমুজ্জ্বল, সেখানে প্রত্যক্ষ রবীন্দ্র-প্রভাব খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। পক্ষান্তরে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব যে রবীন্দ্রনাথে পড়েছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনারীতি। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির রচনারীতিতে পুষ্ট রবীন্দ্র-মানস সাধু এবং সংস্কৃত ঘেঁষা গুরুগম্ভীর তথাকথিত লেখা ভাষাকেই গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছিল। 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র রবীন্দ্রনাথ একদিন যে 'শেষের কবিতা'র রবীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত হলেন, এই পরিবর্তনের প্রথম প্রেরণা এসেছিল প্রমথ চৌধুরীর ভাবাদর্শ থেকে।

বস্তুত, বাঙালীর জড়জীবনে চিন্তার প্রবহমানতা প্রবর্তন করার চেয়েও ভাষাকে লেখাভাষার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েই প্রমথ চৌধুরী বাঙলা সাহিত্যে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন। এবং আজ যে শান্তিপুর, কৃষ্ণনগরের মুখের ভাষা পূর্ব পাকিস্তানে পর্যন্ত বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ভাষা বলে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে, তার পথিকৃৎ প্রমথ চৌধুরী। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর এই অসামান্য দান আজও যথাযথ স্বীকৃতি পায় নি—এটা কম দুঃখের নয়।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, প্রমথ চৌধুরীরও অনেক আগে আলাল ও হুতোম কথ্যভাষাকে সাহিত্যে বাহন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন; কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পণ্ডিতী ভাষার প্রতিক্রিয়ারূপে টেকচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন যে মৌখিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন—তার মধ্যে প্রাণস্পন্দন থাকলেও রূপের অভাব ছিল। কাজেই সে ভাষা সাহিত্যের স্বাভাবিক ভাষা হয়ে উঠতে পারে নি। কারণ শুদ্ধ সংযত শ্রী, গভীর গম্ভীর ধ্বনি, মার্জিত শিল্প-সৌন্দর্যের অভাবে; সারল্য ও সরসতা, প্রাণধর্ম ও সজীবতা সত্ত্বেও তা সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তুচ্ছ কথাগুলিকে রূপায়িত করার যোগ্যতা সে ভাষার ছিল। কিন্তু উচ্চস্তরের অনুভূতি, গভীর চিন্তা, নিগূঢ় তত্ত্ব ও জটিল সমস্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাকে অনুপযুক্তই মনে হয়েছে। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র যখন নানা

গভীর বিষয়ে তত্ত্ব আলোচনা শুরু করলেন, তখন তাকে সর্বজনগ্রাহী করবার জন্ম বিদ্যাসাগরীয় ও আলালী ভাষার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করতে হল ; বিশেষ করে, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে তিনি মানুষের মৌখিক প্রকাশ থেকে দূরেই থেকে গেলেন ; রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্কিমী ঢং-য়েই তাঁর গদ্যসাহিত্যকে পরিচালিত করেছিলেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ভাষাকে যখন ভাবাবেগের তরঙ্গোচ্ছ্বাস ছেড়ে বুদ্ধিগত আলোচনার নতুন খাতে প্রবেশ করতে হল, নতুন চিন্তা নতুন ভাবধারা প্রকাশের জন্য যখন নতুন ভাবাদর্শ ও রচনারীতি অনিবার্য হয়ে উঠল ; সেই যুগসন্ধিক্ষণের শুভলগ্নে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব।

যে অবস্থায় সর্বগ্রাসী রবীন্দ্রপ্রতিভার তাঁকে গ্রাস করার কথা, তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরীর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ও দীক্ষিত হলেন। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কলমে বাঙলা গদ্যের যে নব নব রূপায়ণ বাঙলা ভাষাকে এক যুগে বহু যুগান্তর পার করে এগিয়ে দিয়েছে, তার মূল প্রেরণা প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকেই এসেছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভাষার নতুন পথে পদক্ষেপ করতে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও অনুমোদন এবং সমর্থনকেই প্রধান পাথেয় করেছিলেন। কিন্তু সর্বত্র জয়কামী রবীন্দ্র-প্রতিভা শিষ্যের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করে নি। বরং তাতেই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতি অবলম্বন করেছেন— এমন কথা বলছি না ; কারণ তাঁর অনন্যসাধারণ স্বকীয়তা তাঁকে নিজের পথে চালিত করেছিল এবং অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি ভাষাকে বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করেছিলেন ; কিন্তু বন্ধদুয়ার খুলে দেবার কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরীর। আগল তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন, তারপর রবীন্দ্রনাথের ভাষা "কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা, পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া" শিখর থেকে শিখরে ছুটেছে, ভূধর থেকে ভূধরে লুটেছে। কিন্তু চারিধারের কারাগার যে ভেঙেছিল, তার প্রথম আঘাত এসেছিল প্রমথ চৌধুরীর কলম থেকে।

প্রমথ চৌধুরীর লেখার ভাষা ঠিক যে বাঙালীর মুখের ভাষা, এমন কথা বলা যায় না ; বিশেষ করে যে যুগে প্রমথ চৌধুরী ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, সে যুগে তো বটেই, এ যুগে পর্যন্ত বাঙলার মুখের ভাষা অনেকগুলি আঞ্চলিক রূপে বিভক্ত। কাজেই প্রমথ চৌধুরীকে সাহিত্যের প্রয়োজনে একটা সর্বজনীন

কথ্য বাঙলা তৈরি করে নিতে হয়েছে।

এই ভাষা তৈরি করবার ব্যাপারে প্রধান অভাব ছিল তাঁর কৈশোরের পরিবেশ। প্রমথ চৌধুরী মানুষ হয়েছেন কৃষ্ণনগরে। সে কালের নদে-শান্তিপুরের ভাষা ছিল অন্যান্য অনেক অঞ্চল থেকে উন্নত। বাঙালী সংস্কৃতির এক পীঠস্থান নবদ্বীপ, আর তারই সংলগ্ন কৃষ্ণনগর মার্জিত নাগরিক সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। কাজেই কৃষ্ণনগরের কথ্যভাষার মধ্যে মানুষ হয়ে তিনি সর্বজনীন কথ্যভাষার বনিয়াদ হিসেবে তাকেই গ্রহণ করেছিলেন।

মৌখিক ভাষার শব্দ-সম্পদ সাহিত্যের উপযুক্ত, মার্জিত ও রুচিসঙ্গত কিনা—এ-প্রশ্নও তিনি আলোচনা করেছেন। বলেছেন, "আমরা মৌখিক ভাষা ব্যবহার করতে চাই; সুতরাং যা ভদ্রলোকের মুখে চলে না, এমন কোন শব্দ সাহিত্যে স্থান দেবার পক্ষপাতী" আমরা কখনই হতে পারি না।" ভাষার শুদ্ধতা কাকে বলে, অলঙ্কার শাস্ত্র থেকেই বচন উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, "সেই সেই দেশে কথিত ভাষা সেই সেই দেশের বিশুদ্ধ অপভ্রংশ" এবং এই বচনের জোরেই বিশুদ্ধ অপভ্রংশ নিয়ে গঠিত মৌখিক ভাষাকে বাঙলা সাহিত্যে ব্যবহার করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে, গতানুগতিক ভাবের বাহন ভাষাকে চলমান বিশ্বজীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলার যোগ্য করতে হলে, তাকে যেমনটি আছে তেমনটি রেখে দেওয়া যায় না—এ বোধ না থাকলে ভাষাসম্পদ বাড়ানো কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "এ কথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নূতন কথা আনার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিনের খোরাক যোগাতে হবে, আর আমাদের ভাষার দেহপুষ্টি করতে হলে প্রধানতঃ অমরকোষ থেকেই নূতন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গ সরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে।· ভাষার এখন শানিয়ে ধার বের করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটি নিতান্ত না হলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার মধ্যে তাকে খাপ খাওয়াতে পার।··· ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, 'কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেননি।"

ভাষাকে মৌখিকতার রূপ দিতে প্রমথ চৌধুরী সবচেয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে যে রীতি পালন করেছেন, সে হল "বাঙালীর মুখে মুখে প্রচলিত শব্দের আকার এবং বিভক্তির যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটা মেনে নিয়ে যথাসম্ভব তাদের বর্তমান আকারে ব্যবহার করা এবং ক্রিয়াপদের প্রয়োগে 'ইট্' প্রত্যয় বর্জন এবং তার ফলে ক্রিয়ার আকার হ্রস্ব" করা।

কেউ কেউ অবশ্য এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, শুধু ক্রিয়ার পরিবর্তনেই ভাষা মৌখিক হয়ে ওঠে না। ওঠে না তা সত্য। বিশিষ্ট উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় পরিবর্তিত ক্রিয়া ও সর্বনাম একটি অংশ মাত্র। কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে ব্যবহারের উপযুক্ত করে দেওয়ার জন্য তাকে যে শিল্পোচিত রূপ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, প্রমথ চৌধুরী তার বেশি কিছু সংস্কার করেন নি। অন্য সব দেশেই লেখার ভাষা ও মুখের ভাষার মধ্যে পার্থক্য নগণ্য। তবুও সাহিত্যিক ভাষা মৌখিক ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক। তা অনেকটা সাহিত্যিকের নিজস্ব দৃষ্টি এবং সেই অর্থে কিছুটা কৃত্রিমও। কিন্তু ইচ্ছা বা চেষ্টা করলেই প্রমথ চৌধুরী তাঁর ভাষার বা রচনারীতির পরিবর্তন করতে পারতেন। কারণ, এই দুটিই তাঁর দেহমনের চিরসঙ্গী এবং তাঁর মননশক্তিরই মতো তা প্রদীপ্ত। সে যুগে যারা তাঁর ভাষাকে 'কিষ্কিন্ধ্যার ভাষা' 'পেত্নী ভাষা' 'চণ্ডালী ভাষা' 'ইঙ্গবঙ্গ ভাষা' ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করেছে, তারা নিজেদের কুরুচিরই পরিচয় দিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে যে তাঁর রচনারীতি অন্য ধরনের করা সম্ভব ছিল না, তার কারণ চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির এতখানি স্বকীয়তা বাংলা সাহিত্যে তো দুর্লভ বটেই, বিশ্ব সাহিত্যেও তা ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যায় না। আমার সামান্য জ্ঞান নিয়েও একথা বলার স্পর্ধা আমি রাখি। Style is the man —একথা প্রমথ চৌধুরীর সম্বন্ধে যতটা খাটে তা আর কারু সম্বন্ধে খাটে কিনা সন্দেহ। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবিরত বিকাশশীল ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশ করবার জন্য তাঁর style-কেও রূপ থেকে রূপান্তরিত করেছেন সারা জীবন ধরে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর স্বকীয়তায় অটল, যদিও অচল ছিলেন না। বরং বলতে হবে—তাঁর এই স্বকীয়তার উপর নির্ভর করেই তাঁর ব্যক্তিত্ব একই রীতিতে পরিস্ফুট হয়েছে।

মননশীল মানুষ, মনের তলোয়ার খেলার জন্য যাদের ডেকে এনেছেন,

তাঁরাও তাতে আনন্দ পেয়েছেন এবং সেই এলোপাথাড়ি তলোয়ার ঘোরানোর শুধু যে উপস্থিত খেলোয়াড়দের মনন ও বুদ্ধির বাঁধ কেটেছে তা-ই নয়, সেই তলোয়ারের আঘাত বালিগঞ্জ 'কমলালয়'-এর শান্ত গৃহকোণ থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে বাঙলার সমগ্র শিক্ষিত সমাজে এবং রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতার ফলে তিনি সমগ্র জাতির মনের বাঁধন কেটে দিতে সমর্থ হয়েছেন। পরবর্তী যুগে আর একটিমাত্র সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যা আজ 'কল্লোল'-গোষ্ঠী নামে পরিচিত। সেখানকার সংস্কারমুক্তি অন্ত ধরনের হলেও তার মূল প্রেরণা এসেছিল 'সবুজপত্র' ও 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠী থেকে এবং আশীর্বাদ এসেছিল প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে। এক বিষয়ে আমি নিজেকে বাঙলাদেশের সবচেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ বলে মনে করি, কারণ বাঙালী সংস্কৃতির এই দুটি ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল।

বৈঠকী কথার তলোয়ার খেলা যখন লিখিত রচনার রূপ নিল, তখন প্রমথ চৌধুরীর ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গি ঘূর্ণায়মান শাণিত তলোয়ারেরই মতো ঝকঝক করছে প্রমথ চৌধুরীর মননশীলতার রৌদ্রদীপ্তিতে। নতুন কিছু বলেই তিনি ক্ষান্ত হতে পারেন নি, বক্তব্যের নতুনত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বলার ঢং-এও এমন এক নতুনত্ব দিয়েছেন যে, সেই ঢং আজো বীরবলী ঢং বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এই 'বীরবলী' ঢং শুধু লিপিস্বাতন্ত্র্য-নির্ভর ছিল না, চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের উপর সমান নির্ভরশীল ছিল। এই স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি বলেছেন, 'অহং'-বর্জিত সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, আর ইংরেজীতে তাকেই বলে— Style is the man.

একটি উদাহরণেই তাঁর কবিতারীতি বোঝা যাবে : "জরিতে জড়িত বেণী কপালে তাম্বুল—বাদশার ছিলে তুমি খেলার পুতুল" কবিতাটি তাজমহল শীর্ষক। রচনারীতির এই স্বকীয়তা তাঁর প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায় সমান পরিস্ফুট। এই রচনারীতিকে যতই বিদগ্ধজনবোধ্য বলে শ্লেষ করা হোক না কেন, প্রমথ চৌধুরী অলঙ্কার সংগ্রহ করেছেন শুধু বিদগ্ধ জীবন থেকে নয়, মালো-মাঝিদের জীবন থেকে, শহরে নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের ঘুড়ি ওড়ানো ও রসজীবনের অন্য ক্ষেত্র থেকে, ফুটবল ক্রিকেট টেনিস খেলার মাঠ থেকে, যদিচ খেলার মাঠ থেকে দূরেই থেকেছেন তিনি সারাজীবন।

সাহিত্য কি, আর তার উদ্দেশ্যই বা কি, এ-নিয়ে প্রমথ চৌধুরী যে মত

ব্যক্ত করেছেন, তাঁর সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে হলে সেই মত সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার বলে তারই কিছু উদ্ধৃতি করে আজকের বক্তব্য শেষ করছি :

"সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুল মাস্টারির ভার নেয়নি। এতে দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুল মাস্টাররা এ যুগে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন। ··· সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেন না, মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তারপর তার শবচ্ছেদ করা এবং ওই উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। · কারো মনোরঞ্জন করা সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়া নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।"

তবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি? এর জবাবে তিনি বলেছেন, "সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দু'য়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরী করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলা দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের নেকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেপু এবং ধর্মের জয়-ঢাক- এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যের রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গ'ড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। কারণ, পাঠক-সমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে। সে প্রাচ্যই হোক, আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জার্মেনীরই হোক, দুদিন ধরে তা কারুরই মনোরঞ্জন করতে পারে না।"

এই আনন্দ ও মনোরঞ্জনের পার্থক্যের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল নিহিত আছে। "আনন্দ খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই বিশ্বসৃষ্টির মূল আনন্দ আর তার আধারও আনন্দ এবং সেই কারণেই তা কল্যাণধর্মী। মনোরঞ্জন কল্যাণ অকল্যাণের ধার ধারে না। সাহিত্যের মূল কথা যে কল্যাণ, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যসৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ডোরাকাটার অভিসারে

শের জঙ্গ

[গত সংখ্যার পর]

ভূত সাহসের বলি

আগে ছিল পল্টনে ; ঘোড়সওয়ার সেপাই। বেশ লম্বাচওড়া ; হাতে কাঠ। টায়েটুয়ে চলা সংসারের একমাত্র সংস্থান ছোট এক টুকরো জমি ; হলে হবে কি, মেজাজ দিলদরাজ ; বাড়িতে অতিথি এলে খাওয়ানোর ধুম পড়ে যাবে।

সে ছিল এমন এক রসের রসিক, আফিম ব'লে লোকের কাছে যার অখ্যাতি। নাম তার সদারাম ; সই করতে গিয়ে তার এই নামের আগে সব সময়ই সে যোগ করত 'নম্বরদার' (গাঁয়ের মোড়ল) কথাটা।

যমুনা নদীর খাড়ি থেকে বড় একটা জলা সৃষ্টি হয়ে যেখানে থিক থিক করছে নলখাগড়ার বন আর বালিহাঁস অন্দর কুমির, সেখানে সদারামের গ্রাম। আমি একবার তার কাছেই শিকারের জন্যে তাঁবু খাটিয়ে ছিলাম। বেশ কিছুদিন সেবার আমাদের একসঙ্গে খুব আনন্দে কেটেছিল।

সদারাম আমার সঙ্গে বড় একটা শিকারে যেত না। ভোরবেলায় শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে চললে তার লাল টুকটুকে জুতো আর ধবধবে সাদা পোশাক মাটি হয়ে যাবে এই তার ভয়। কিন্তু আমাদের তাঁবুতে রোজ তার হাজিরা ছিল বাঁধা ; লোকটা ছিল মজার। এমন কি যখন ওকে নিয়ে আমরা হাসিঠাট্টা করতাম, তখনও সদারামের মুখে লেগে থাকত একগাল হাসি। তাছাড়া চোখ-জ্বলজ্বল-করা সদারামের আফিমের কৌটোটা সব সময় সামনে ধরাই থাকত, যার খুশি তা থেকে নিতে পারে।

সে শুধু আমারই বিলক্ষণ বন্ধু ছিল না, যেই তার সংস্পর্শে এসেছে—বেড়াল কুকুর গরু ঘোড়া ইঁদুর—সকলের সঙ্গেই গলায় গলায় ভাব। তার ওপর সদারাম ছিল একাধারে দার্শনিক, কবিরাজ এবং পথপ্রদর্শক।

এক গ্রাম্য মেলায় সদারামের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। মেলা হয়ে আমরা যাচ্ছিলাম শুয়োর শিকারে। গাঁয়ে বউঝিদের মনহরণের জন্যে দোকানীরা রকমারি মনোহারি জিনিস সাজিয়ে রেখেছিল; তার চারপাশে মেয়ের দল ঘুর ঘুর করছিল আর গাঁয়ের নওজোয়ানরা তৃষিত হৃদয়ে দল বেঁধে এ-দোকান সে-দোকান করছিল—ছেলেদের দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সেই বুকভরা মধু গাঁয়ের বধূরা।

আমার কাথিয়াবাড়ি নওজোয়ান ঘোড়া মোতি নিজের অপরূপ সৌন্দর্যে ডগমগ হয়ে দুলকি চালে নেচে কুঁদে চলেছে—সে বেশ বুঝে নিয়েছিল উৎসবের আনন্দে সারা গ্রাম মাতোয়ারা।

রোগা ডিগডিগে একটা লোক, তার সদ্য মাড়-দেওয়া সাদা ধবধবে পাগড়ির গায়ে ঝিকমিক করছে আবীর, ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আদর-মাখা চোখে আমার ঘোড়াটার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। ঘোড়া বলতে যে সে অজ্ঞান তা তার দেখবার ধরন থেকেই বোঝা যায়। ঘোড়াটা কোন্ জাতের, সে সম্বন্ধে লোকটা আমাকে কয়েকটা প্রশ্নও করল। আমি নেমে প'ড়ে ওর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। নাম ওর সদারাম। মোতির সূত্রে আলাপ। সদারাম সেই থেকে আমার চিরদিনের বন্ধু হয়ে গেল।

•

একবার সদারামকে আমি আমাদের গ্রামে ধরে নিয়ে এসেছিলাম। ঠিক করলাম দুজনে মিলে বড়সড় গোছের জানোয়ার শিকারে যাব। বাঘ বা চিতার মহড়া নেওয়ার প্রস্তাবে দেখলাম সদারাম নারাজ। আমাকে দিয়ে সে হলফ করিয়ে নিল যে বাঘ শিকারে আমি যেন কখনই তাকে সঙ্গে না নিই। তার কাছে ভারী গোছের শিকার বলতে হরিণ, শিঙ্গেল এবং, খুব বেশি হলে, বনশুয়োর মারা।

শিবলিকের পাহাড়তলীতে সেকালে ছিল এক দেশীয় রাজ্য। তার একাংশে বেলওয়ালী ফরেস্ট। সেখানে বিনা অনুমতিতে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমরা সেই জঙ্গলে শিকার ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছিলাম। পুবদিকটাতে জঙ্গলটির দুটি ভাগ। একটা ভাগ সোজা সামনে গিয়ে রোগা রোগা টিলা আর

টানা টানা দুন ভিড়ভারাক্রান্ত ক'রে তারপর হঠাৎ ডানদিকে বেঁকে যমুনা নদীর এই দিককার পাড়ে গিয়ে নেমেছে। বনের যে জায়গায় আমরা ছিলাম, তার বিশ মাইল দূর দিয়ে গেছে যমুনা নদী। জঙ্গলের আরেকটা ভাগ পাশের পাহাড় বেয়ে উঠে বেঁকে একফালি মালভূমির ওপর দিয়ে ছুটে ওপাশে ছত্রাকার হয়ে নেমে পাহাড়তলীর চষা ভুঁইতে গিয়ে পড়েছে।

আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম এই মালভূমিতে। বনটা ছিল সংরক্ষিত; এর মধ্যে গুলি ছোড়ার একমাত্র অধিকার মহারাজার এবং তাঁর ইংরেজ লাট-বেলাট অতিথিকুলের। অন্য হেঁজিপেঁজিদের এ বনে ঢোকাও বারণ। অনধিকার প্রবেশের শাস্তিও খুব গুরুতর—অপরাধীর প্রচুর টাকা জরিমানা, প্রচুর দিনের কারাবাস এবং অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত হবে।

আমরা শিকার করছিলাম লুকিয়ে চুরিয়ে। নিষিদ্ধ ফল ব'লে শিকারের মজাটাও তাই ঢের বেশি।

ও জায়গা থেকে বনপুলিশের ফাঁড়ি কম ক'রে মাইল চারেক দূরে। তাছাড়া সশস্ত্র শিকারীকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঘাঁটাতে যে সে যাবে, তাতে কী এমন তার কায়দা? তবে তাদের এতই যৎসামান্য যে, এক টুকরো মাংস কিংবা টাকাটাক দক্ষিণা দিলেই শিকারীর সাত খুন মাপ হয়ে যাবে—এমন কি যদি হাতেনাতে ধরা পড়ে তাহলেও। শিকার জিনিসটা আমাদের যাদের রক্তে, আমরা যারা বনচণ্ডীর উপাসক—জঙ্গলে চুরি ক'রে শিকার করাটা ছিল আমাদের কাছে নিয়মভঙ্গ নয়, নিয়মসিদ্ধ ব্যাপার।

সদারামের আরও বেশি মন খুঁত খুঁত করছিল ব্যাপারটা আপত্তিকর ব'লে। কিন্তু জায়গাটাতে গিয়ে সে এত রকমের এবং এত অজেল জংলী জানোয়ার প্রাণ ভ'রে দেখতে পেল যে, তার মনে আর কোন ক্ষোভ রইল না।

বেলা প'ড়ে আসতে আমি ফিরে এলাম। আমাদের গাঁয়ের ডাকাবুকো যে ছোকরা আমার খিদমত করত, তার ছিল পেটে পেটে শয়তানি। সে একদিন বেশ রসিয়ে রসিয়ে আমাদের ধড়দরটির মৃগয়াভিযানের বর্ণনা দিচ্ছিল:

"লক্ষ্যবস্তু হল নট-নড়নচড়ন-নট-কিচ্ছু এক ধাড়ি হরিণ, তাও—কী বলব—মাত্র হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে। অত কাছ থেকে টিপ ফসকানো

মোটেই সোজা ব্যাপার নয়। এই নয়কে হয় করতে সদারামের কম কেরামতির দরকার হয় নি। আপনি তো বলেন, 'গুলি ক'রে মারো'—ও তাতে বিশ্বাসই করে না। ওর নীতি হল, 'গুলি ক'রে বাঁচাও'।"

আমরা দুজনে হাসছিলাম। সদারামও সে হাসিতে যোগ দিল।

ছোকরা ব'লে চলল: "সদারামের হাতে রাইফেল—ওঃ, সে এক দেব-দুর্লভ দৃশ্য! আফিমের কৌটোটা নিয়ে যেভাবে সে সমস্তক্ষণ খসর মসর করে, রাইফেল হাতে নিয়েও তার হুবহু সেই একই ব্যবহার। তফাৎ একেবারে নেই তা নয়: কৌটোর আফিম মুখে পুরবার পর তবে সদারাম চোখ বুঁজে বোম হয়; কিন্তু রাইফেলের বেলায় অন্য—ভেতরের জিনিস নলের মুখ দিয়ে বেরোবার আগে, এমন কি ঘোড়া টেপবারও আগে সদারামের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। সদারামের বন্দুকও ফুটল আর হরিণটিও মৌমাছির হুল-খাওয়া ঘোড়ার মত একলাফে হাওয়া হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে সদারাম ভায়া চোপ্সানো বেলুনের মত মাটিতে চিৎপটাং। হরিণ আর সদারাম—এ ওঠে তো ও পড়ে।"

"বলিস্ কী? হুল-খাওয়া ঘোড়ার মত হরিণটা ঠিক্‌রে পড়ল? তাহলে গুলি লেগেছে, বল্।"

"উঁহু, সে ভয় নেই। হরিণের গায়ে সদারাম কোনরকম আঁচড় কেটেছে বলতে চান? আজ্ঞে, না—সদারাম অত বোকা নয়। একবার দেওয়ানী আদালতে তার দস্তুরমত শিক্ষা হয়ে গেছে। এক বন্ধকীপত্রে তার সই থাকায় মহাজনের কাছে মামলায় সে হেরে যায়। সেই থেকে সদারামের নীতি হল—শতং বদ, মা লিখ। কোন্ আঁচড়ে কখন কী হয় কে বলতে পারে?"

বললাম, "পেজোমি ছাড়্। বল্ তো, মাটিতে দাগ দেখেছিলি?"

"দেখেছি বৈকি! তার ধারে বাতাসে রক্তের ছিটেফোঁটাও ছিল না।" জিভে চুক্ চুক্ শব্দ তুলে ছোকরা বলল, "চোখ বুঁজে বলা যায়, স্রেফ ফস্কেছে। যেমন চোখ বুঁজেই বলা যায়, সদারামের পাগড়ির নীচে আছে স্রেফ টাক।"

আমি কিন্তু ঠিক নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না। হরিণের ব্যবহার থেকে আঁচ করা যায় যে ওর গায়ে গুলি লেগেছে। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারদের সটান ওপরের দিকে লাফিয়ে উঠতে আমি দেখেছি—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পেটে গুলি লাগলে এই রকমটা হয়ে থাকে।

জানোয়ারদের পঙ্গু করা এবং তিলে তিলে যন্ত্রণাকর মৃত্যুর দিকে ঠেলে

দেওয়া—এ আমার কখনই ধাতে সয় না। সদারামকে গালাগাল দিয়ে ওকে ওর কৃতকর্মের কথা বললাম। সদারাম কিছুতেই মানতে চাইল না; আমার চাকরটির ঠাট্টাবিদ্রূপে আরও জোর পেয়ে ও আমাকে বোঝাতে চাইল যে, নেশায় অমন বুঁদ-হয়ে-থাকা অবস্থায় তার পক্ষে হরিণটার গায়ে কোনরকম আঁচড় দেওয়া সম্ভবই নয়।

হয়ত অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল ক'রে হরিণটার গায়ে ওর গুলি লেগে গেছে—এ কথা হাজার যুক্তি দিয়েও আমি ওকে বোঝাতে পারলাম না। যাই হোক, গাঁই গুঁই ক'রে সদারাম শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে সরজমিন তদন্তে বেরোতে রাজী হল।

অকুস্থল খুব বেশি হলে হাত চল্লিশ দূরে। হরিণ যেখানটাতে চরছিল সেটা একটা বাধাবন্ধহীন ফাঁকা জায়গা। আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাটিতে দাগ দেখার চেষ্টা করছিলাম। হরিণ যে জায়গাটায় পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় সদারাম গুলি ছুঁড়েছিল, সেই জায়গাটা আমরা খুঁজে পেলাম। হরিণ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলি খেয়েছে এবং যে ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে গেছে, কোথাও রক্তের কোনো দাগ নেই। ঘাস আর শুকনো পাতা মাড়িয়ে যে পথ দিয়ে সে পালিয়েছে, সেই পথটি পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিল।

সেই পথ ধ'রে আন্দাজ একশো হাত যাওয়ার পর প্রমাণ হল আমার অনুমান ঠিক—হরিণের পেটে লেগেছে সদারামের গুলি। যে পথ দিয়ে হরিণ গেছে, সেখানে ঘাসের উঁচু ডগার গায়ে লালচে প্যাচপেচে কি সব লেগে রয়েছে। পেট ফুটো না হয়ে থাকলে ও জিনিস চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরোতে পারে না। খুব সম্ভবত হরিণের ফুসফুস নিশানা ক'রে সদারাম গুলি করেছিল, হাত ফসকে গুলিটা আসলে লেগেছে প্রায় চার পাঁচ ইঞ্চি পেছনে। সেক্ষেত্রে ১,২০০ ফুট গতিবেগসম্পন্ন ১২০ গ্রেনের বুলেট হরিণকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করতে পারে নি—রাস্তার শুধু একটা দিকেই ঘাস প্যাচপেচে হয়ে থাকায় সেটা বোঝা যায়।

আমাদের তাঁবু থেকে আধ মাইলটাক দূরে একটা শুকনো নালা বেয়ে দাগে দাগে এগিয়ে দেখি ঝাঁকড়া বনকুলের ঝোপে ঢাকা একটা কোহরের পাশে দাগটা ছেতরে গেছে। বেশ ক্লান্ত লাগছিল, খুব খিদেও পেয়েছে—পাকা পাকা টোপাকুল দেখে জিভে আমার জল এসে গিয়েছিল। আমার

'৪০৫ উইনচেস্টার ম্যাগাজিন রাইফেলটা একটা গাছের গায়ে রেখে টপাটপ কুল পাড়তে লেগে গেলাম। আমি যখন টকটক-মিষ্টিমিষ্টি কুলগুলো উদরস্থ করতে ব্যস্ত, সদারাম সেই ফাঁকে আমার রাইফেলটা হস্তগত ক'রে মাটিতে দাগ দেখে দেখে খানিকটা রাস্তা এগিয়ে গিয়েছিল (আফিমখোর মাত্রই টক্ জিনিসে অনাসক্ত)। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, তার হাত বিশেক দূরে আরও একটু ঘন ঝোপঝাড়। সদারাম সেখানে গিয়ে একপাশে ব'সে পড়েছিল। মাটিতে ব'সতে না ব'সতে ঝোপের নীচে ঝটপট শব্দ আর তৎক্ষণাৎ ঝুলন্ত জিভ বের ক'রে ল্যাজ উঁচিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল সেই হরিণ।

কী এমন ব্যাপার, হেসে উড়িয়ে দিলেই হয়। তা নয়, সদারাম হাউমাউ ক'রে ব'লে উঠল—হরিণ না হয়ে বাঘও তো হতে পারত এবং কী দরকার ছিল ওকে এই অংশে অঞ্চলে আমার টেনে আনবার?

খানিকটা ছুটে ছোট একটা গড়ানে জায়গার ধারে গিয়ে আমি S-আকারের একটা ঢালের মাথায় থমকে দাঁড়ালাম। ওপাশে কিসের একটা গোলমাল। ঘাসের ওপর দিয়ে হুড়মুড় ক'রে নেমে আমি ওপরে ঠেলে উঠলাম। সরু গিরিপথের তলদেশ থেকে তখনও গোলমালের আওয়াজ শোনা আসছিল। তবে আওয়াজটা তখন আর তত জোরালো নয়। S-আকারের গহ্বর কেন্দ্রস্থলটি এমন বিরক্তিকরভাবে দীর্ঘায়িত হয়ে ছিল যে সামনের দিকে পুরোটাই আমার দৃষ্টির অন্তরালে। ওখানে দাঁড়িয়ে আমি কিছুই ঠাহর করতে পারছিলাম না।

ঠাণ্ডার প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। আমার পেছনে উঁচু পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে যাবার পর গোটা তল্লাট জুড়ে লাল-নীলের ছোঁয়াচলাগা নীলসঞ্চরমান ছায়া।

ঢালের গা বরাবর নেমে কাছের উঁচু জায়গাটাতে মোড় নিয়ে আবার উঠে এলাম।

আলো যত প'ড়ে আসছে, সান্ধ্য হাওয়ার বেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও তত বাড়ছে। আমি সেই কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘেমে যেন নেয়ে উঠছি। পিঠের সঙ্গে শার্ট সেঁটে গেছে, তার ওপর ভিজে জামাকাপড়ের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকায় আমার অস্বস্তির মাত্রা আরও বেড়ে যাচ্ছে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে দীর্ঘ পথ গুঁড়ি মেরে চলতে হওয়ায় আমার শরীরে কাঁপুনি ধরেছিল। একটু দম নেবার জন্যে এক জায়গায় ব'সে আমি এদিক

ওদিকে তাকিয়ে সদারামের খোঁজ করতে লাগলাম। দেখলাম সদারাম আধশোয়া হয়ে ব'সে আফিমের কৌটোটা আঙুল দিয়ে খুঁড়ছে। ক্ষোভ, অনুযোগ, ধন্দ আর হতভম্বের ভাব—একাকারে সব তালগোল পাকিয়ে সদারামকে দেখাচ্ছিল সুররিয়ালিস্ট ছবির মতন।

একটা জায়গা ছিল যেখান থেকে দেখবার সুবিধে হয়। খুব কষ্টে গুঁড়ি মেরে মেরে নিজেকে কোনরকমে সামলে সুমলে আমি সেখানটাতে গেলাম। কিন্তু অমন ঘাড় নীচু-করা অবস্থায় তখনও আমি ঠাহর করতে পারছিলাম না ঠিক কোথা থেকে শব্দটা ভেসে আসছিল। ছোট একগোছা ঘাস আমার দৃষ্টি আড়াল ক'রে রেখেছিল। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলে দেখবার চেষ্টা করলাম, তাতেও ঘাসের আড়াল পড়ল। এবার আমি চেষ্টা করলাম পায়ে ভর দিয়ে সটান উঠে দাঁড়াতে। একটা শুকনো পাতা মাড়িয়ে ফেলায় মড়মড় ক'রে শব্দ হল। ফলে, এতক্ষণের লুকোচুরি, পা টিপে টিপে সন্তর্পণে হাঁটা—সব মাঠে মারা গেল।

অনধিক ছ'ফুট দূরে ঘাসের যে ঝোপটাতে আমি চোখ রেখেছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়ে এল আমি যার পিছু নিয়েছিলাম সেই হরিণ নয়—তাজা রক্ত মাখা ভয়ঙ্কর বিকৃত মুখে এক ক্রুদ্ধ বাঘ। কুকুরের তাড়া খেয়ে বেড়াল যেভাবে ঘাড়ে কান চেপে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে থাকে, বাঘটা সেই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। কখন যে বাঘের বরাবর বন্দুকটা তুলে ঘোড়া টিপেছি আমি নিজেই জানি না। বন্দুকে গুড়ুম ক'রে একটা আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফাটানো মর্মভেদী এক গর্জন আমাকে প্রকম্পিত ক'রে তুলল। ঝট্ ক'রে ফোটা গুলিটা বার ক'রে নিয়ে সে জায়গায় একটা নতুন তাজা কার্তুজ মুহূর্তে আমি ভ'রে নিলাম। কিন্তু তার আগেই সেই বাঘটা লাফ দিয়ে মাঝখানের ঢালের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

আমার গায়ের মধ্যে পাক দিচ্ছিল এবং শরীরও আর বইছিল না। শত চেষ্টা ক'রেও পা দুটো আমি খাড়া রাখতে পারছিলাম না। মাটিতে ব'সে প'ড়ে আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

বাঘ বোধহয় সারাটা দিন সরু গিরিপথটাতে ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে ছিল। ভয় পেয়ে হরিণ বেচারা লাফ দিয়ে জম ক'রে পড়বি তো পড় অজান্তে একেবারে সেই বাঘের মুখে। হরিণ পালাতে চাইছে, ক্ষুধার্ত বাঘই বা ছাড়বে কেন—একটু আগে সেইজন্যেই ওখানে অত হুড়মুড় ঝটাপটি।

ভ্যালা মুস্কিলে পড়া গেছে। ঘা-খাওয়া বাঘকে এখন খুঁজে বার করতে হবে। একেই আমার তখন নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা, তার ওপর পেটের ভেতর কেবলি পাক দিচ্ছে। সন্ধ্যে এদিকে ইতিমধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। ঘনায়মান এই অন্ধকারে আমার কিছুই করবার নেই।

পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়াগুলো থেকেও সূর্যাস্তের শেষ আলোটুকু লম্বা লম্বা আঙুলে মুছে নিয়েছে ঘনকালো ছায়া। সেই ছায়াই আমার আচ্ছন্নতা ভেঙে ঠেলে তুলে দিল। হঠাৎ সদারামের কথা আমার মনে পড়ে গেল। কী হল তার? গেল কোথায় সে?

শেষ যে জায়গায় সদারামকে মাটিতে আধশোয়া হয়ে বসে থাকতে দেখেছিলাম সেই জায়গায় এলাম। সদারামের কোন পাত্তা নেই। মাটিতে পড়ে আছে শুধু ওর পাগড়িটা। মনে মনে খুবই ভয় হল। যত সব অলক্ষুণে চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করতে লাগল।

গোড়ায় আস্তে তারপর খুব জোরে শিস্ দিয়ে সদারামকে ডাকতে লাগলাম। কোন সাড়া নেই। কাছেপিঠে জখম-হওয়া বাঘ; এ অবস্থায় ন'ড়ে চ'ড়ে শব্দ ক'রে বা দর্শন দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দেওয়া মানে বিপদ ডেকে আনা—এসব জেনেও শেষটায় নিরুপায় হয়ে সদারামের নাম ধ'রে আমাকে চেঁচিয়ে ডাকতে হল। বার কয়েক ডাকবার পর দূরে একটা উঁচু গাছের মগডাল থেকে চিঁ চিঁ-করা তার কণ্ঠস্বর কানে এল। গাছের খুব কাছে এসে তবে সদারামকে দেখতে পেলাম। একেবারে মগডালের ওপর খুব বিপজ্জনক অবস্থায় সে ব'সে। জীবনে এর আগে কদাচ সে গাছে চড়ে নি।

ওকে নিরাপদে বহালতবিয়তে থাকতে দেখে আমারও ধড়ে প্রাণ এল। ওর এই অসামান্য কেরামতির জন্যে তখন আমি বাহবা না দিয়ে পারলাম না। দুঃখের বিষয়, সদারামের কাছে সেটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ব'লে বোধ হল। আমি, শিকারপর্ব, বাঘ, বাঘের পূর্বপুরুষ, বিশেষ ক'রে তার মাতৃকুল—সবাইকে জড়িয়ে এমন সব বাছাই-করা বিশেষণ সে ছাড়ল যে সেসব কহতব্য নয়। আর কক্ষনো সে আমার সঙ্গে বার হবে না, এই ব'লে সে নাকে কানে খৎ দিল। মানুষের কানে বাঘ শিকারের কুমন্ত্র দেবার অপরাধে দেবতাদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার ক'রে ছাড়ল। তার ওপর, গাছ থেকে নেমে আসবার প্রস্তাবেও সে রাজী হল না। আমি তাহলে তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছি, কাল সকালে এসে

তোমাকে নিয়ে যাব—এই ব'লে যখন ভয় দেখালাম তখন সে নামতে রাজী হল। নামতে গিয়ে পড়ল মুশকিলে। ওঠবার সময় দিব্যি উঠে গিয়েছিল, কী ক'রে তা সে জানে না। এখন নামবার সময় বুঝতে পারছে কাজটা তার অসাধ্য। অকপটেই সে বলল। প্রথম মহাযুদ্ধে সে লড়েছে ; লড়াইতে তার বীরত্বের কত গল্পই না সে আমাদের শুনিয়েছে। ভয় কী জিনিস তা সে জানে না। তবে তার এই গাছ থেকে এখন নামার ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা—ঘা-খাওয়া বাঘটা যে কাছেপিঠেই আছে। অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে, অনেক রকম অভয় দিয়ে তবে তাকে আমি গাছের মগডাল থেকে নেমে আসবার প্রচেষ্টায় রাজী করাতে পারলাম। সদারাম প্রথমে তার গা থেকে কোট খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর একটি একটি ক'রে পা থেকে জুতো খুলল, তারপর মোজা। এইবার ঝাড়াঝাপ্টা হয়ে গাছের গুঁড়িটা দুহাতে জড়িয়ে গড় গড় ক'রে সে নেমে আসতে লাগল। ফলে, তার বুক আর পেটের চামড়া ছেঁচে গেল। মাটি ছোঁবার আগেই তার কামিজ আর কুর্তার হল ফর্দাফাঁই। সামনের দিকটা তখন হয় নেই, নয় নিশানের মত শুধু লেগে থেকে তাকে দেখাচ্ছে আফ্রিদী লড়াকুর মতন। মাধ্যাকর্ষণের গতিপথে এই অবতরণের ফলে দুর্ভাগ্যক্রমে সদারামের হাঁটু গেল মচকে। মাটিতে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই সে চেয়ে বসল তার আফিমের কৌটো। ওর কোটের পকেট হাতড়ে আমি তক্ষুনি কৌটোটা বার ক'রে দিলাম। মন্ত্রপূত দুবাটি ডবল ডোজে ঠেসে নিয়ে সদারাম খালিপায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে টেকো মাথাটা নিয়ে দূর পাল্লায় ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। জুতো, মোজা, পাগড়ি—কোনোটাই অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া গেল না। একশো হাত দূর থেকে তাঁবুর সামনে যখন অগ্নিকুণ্ড জ্বলতে দেখা গেল,' একমাত্র তখনই সদারামের গলায় স্বর ফুটল। ওর গলা শুনে বোঝা গেল ও খুব ধাঁধায় পড়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করল, যে প্রাণীটাকে ঝোপের তলা থেকে সে ধাঁ ক'রে বেরিয়ে আসতে দেখেছে সেটা কি সেই বাঘ, যার গায়ে আমি গুলি ছুঁড়েছি ?

এতক্ষণ যে স্নায়বিক উত্তেজনায় টান টান হয়ে ছিলাম, সদারামের একটা প্রশ্নে আমি ঢের সহজ হলাম। হো-হো ক'রে আমি হাসতে লাগলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, "ছুটন্ত জানোয়ারটার মাথায় শিং দেখেছিলে ?"

"হ্যাঁ, তা, দেখেছি ব'লেই মনে হয়। দেখ কাণ্ড, শিঙের কথাটা বেমালুম

ভুলেই গিয়েছিলাম। হুঁ, এইবার মনে পড়েছে—শিং ছিল বটে। কিন্তু যে জায়গা, বলা যায় না—বাঘও তো স্বচ্ছন্দে হতে পারত।"

"হতে তো পারতই। তবে একটা জিনিস তোমাকে ব'লে দিই। আমাদের এদিকে বাঘের মাথায় শিং গজায় না, শিঙের কোনো দরকার নেই ব'লে।"

হাসতে হাসতে পরস্পরের পিছনে লেগে আমরা আমাদের তাঁবুতে পৌঁছে গেলাম। সদারাম এবার তার কৌটো খুলে সর্বার্থসাধক আরও একটা ডবল ডোজ সেঁটে নিল।

চোট-খাওয়া বাঘের খোঁজে আমাকে যেতে হবে—এই ভাবনায় রাত্রে প্রহরের পর প্রহর আমাকে ঠায় জেগে কাটাতে হল। যখনই একটু তন্দ্রা মতন এসেছে, আমার আর বাবের মধিখানে নেতিয়ে থাকা কালো অজগরের মত জংলী রাতের অন্ধকার আমার মগজের মধ্যে অমনি রাগে ফুঁসে উঠে আমাকে আচমকা জাগিয়ে দিয়েছে। আর বাঘের স্মৃতিপুরাণগুলো কালনাগের জট খোলার মত ক'রে একে একে আমার মনে প'ড়ে গেছে।

বহুদিন আগের দেখা একটি দৃশ্য আমার মানসপটে উদয় হল। আমার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়ানো একটি লোককে আহত বাঘ এসে ঘাড় মটকে দিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল আমার শৈশবে; কিন্তু সেই ব্যথার দাগ আজও আমার মন থেকে মেলায় নি। চল্লিশোর্ধ্ব বছর পরেও সে কথা মনে পড়লে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

১৯১৮ সাল। শীতের মরশুম। আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় মড়ি খেতে এসে একটা বাঘ আমার বাবার হাতে জখম হয়েছিল। বাবার হাতে ছিল ·৫০০ বোরের এক্সপ্রেস রাইফেল; ৫৭০ গ্রেনের ছুঁচলোমুখ গুলিটা বাঘের পাঁজর যে ভেদ ক'রে গিয়েছিল এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। বুলেটের ৫,৮৫০ ফুট-পাউণ্ড ওজনের প্রচণ্ড ধাক্কায় বাঘ একেবারে পপাত ধরণীতলে। মাটিতে প'ড়ে খানিকক্ষণ আছাড়ি পিছাড়ি খাওয়ার পর হুঙ্কার ছেড়ে বাঘ ঠিক্‌রে উঠে রাত্রের ঘনায়মান অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিল।

বাবার স্থির বিশ্বাস ছিল বাঘটাকে কোথাও মরা অবস্থায় পাওয়া যাবে। পরদিন ভোর হতে না হতেই তিনি বাঘের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। বাবার সঙ্গে

গেলাম আমি এবং তাঁর বন্দুকবরদার আর নিহত মোষের মালিকসহ তাঁবুর আরও তিনজন লোক।

সকাল সাতটা নাগাদ আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। পাহাড়তলীতে ধূসর পুরু গদিতে তখনও আরামে গা এলিয়ে আছে শীতের সকাল। সারা রাত হিম প'ড়ে গাছগুলো ভারী হয়ে আছে।

একটি সরু উপত্যকা নল্কা। তার পুবধারের পাহাড়ে জলবিভাজিকার ওপারে সেই মাঝবরাবর জায়গাটা পাওয়া গেল যেখানে আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় বাঘটাকে গুলি করা হয়েছিল।

সরাসরি না গিয়ে আমরা গেলাম একটু ঘুরপথে। জলবিভাজিকার ওপারে গিয়ে আমরা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠলাম যাতে সটান ওপর থেকে নেমে ঘটনাস্থলে যেতে পারি। আহত জন্তুর পিছু নেবার সময়— বিশেষত জন্তুটি যদি বিপজ্জনক হয়—এই রকমের সাবধানতা সব সময় বিধেয়। চোট-খাওয়া জানোয়ার সাধারণত চড়াই ভেঙে পাহাড়ের ওপরে ওঠে না। যাতে ব্যথার কষ্ট বাড়ে এমন জিনিস তারা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে।

ঘুরে উল্টোদিক থেকে আমরা পাহাড়ের চূড়োয় উঠলাম। একে অনেকটা পথ, তার ওপর চড়াই ভাঙার কষ্ট, ফলে, আমরা এমন লবেজান হয়েছিলাম যে জায়গামত সব সময় সজাগ থাকার কথাটা আর আমাদের মনে থাকে নি। আমরা ধ'রে নিয়েছিলাম '৫০০ এক্সপ্রেস বুলেটের চোট বাঘ কিছুতেই সামলাতে পারবে না, সুতরাং সে না মরে পারে না। আমাদের অসাবধান হওয়ার এও একটা কারণ ছিল। এতে প্রমাণ হয়, বাঘের শক্তিসামর্থ্য আমরা কমিয়ে দেখেছিলাম। আসলে যদি মোক্ষম জায়গায় না লাগে, তাহলে অমন ডজন ডজন '৫০০ এক্সপ্রেস বুলেটও বাঘ হজম ক'রে ফেলতে পারে। একবার একটি প্রচণ্ড গুলিতে হৃদযন্ত্র উড়ে যাওয়ার পরেও আহত বাঘের শরীরে এমন শক্তি ছিল যে, সে হাতির পিঠে চড়াও হয়ে তার আততায়ীকে মেরে তবে নিজে মরেছিল—এ ঘটনার লিখিত প্রমাণ আছে।

শৈলশিরায় পৌঁছে আঁকাবাঁকা রাস্তায় আমরা পাহাড়ের মাঝবরাবর নেমে এলাম। বাবা ছিলেন সকলের আগে, তাঁর ঠিক পেছনেই ছিল বেচারা ভুদু—আগের দিন বাঘ যার মোষটাকে মেরেছিল। হাত বিশেক তফাতে আমরা বাকি সবাই পরের পর সার বেঁধে আসছিলাম—আমি ছিলাম সকলের

প্রায় চল্লিশ হাত বেড়যুক্ত মালসা-আকারের একটা ঢালু জায়গায় এসে পৌঁছুনো গেল। গড়ানে জায়গাটার ঠিক ধারে একটা শাল গাছ। খুব ঝাঁকড়া এবং খুব লম্বা। তার আওতায় একপাশে একটা বাঁশঝাড়। বাবা যখন গাছটার কাছে পৌঁচেছেন—কী ভাগ্যিস, এগোবার জন্তে তখনও তিনি গাছটাকে বেড় দেন নি—গাক্ ক'রে একটা ছোট্ট তীক্ষ্ণ হুঙ্কারে বাঁশঝাড়টা কেঁপে উঠল।

আমার বাবা ছিলেন শালগাছটার পেছনে। বাকি আমরা সবাই ঘাসের জঙ্গলের আড়ালে। পরক্ষণেই একটা লোক আমার পাশ দিয়ে ছুটে গেল আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার পেছন থেকে দ্রুত ধাবমান একটা হলুদ রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠে লোকটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। তখন একটা গুলির তীক্ষ্ণ আওয়াজ পেলাম, তার ঠিক পর পরই আরেকটা আওয়াজ। পোড়া বারুদের ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে লাগল আর ধোঁয়ায় চোখে অন্ধকার দেখলাম।

বাবা কী একটা কথা বললেন আমার বোধগম্য হল না; তাঁর গলার আওয়াজে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। বাবার কাছাকাছি যাবার জন্তে আমি আমার জায়গা ছেড়ে নড়তেই বাবা চিৎকার ক'রে আবার আমাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিলেন—যে যার জায়গা ছেড়ে আমরা যেন কেউ না নড়ি। আমরা যে যেখানে ছিলাম একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট দশেক পরে বাবা একটু একটু ক'রে এগিয়ে এলেন—যেখানে সেই লোকটা আমার খুব কাছে মাটিতে সটান পড়ে ছিল। আমার জায়গাটায় এসে জন্তুজানোয়ারদের একটা সরু পায়ে-চলা-পথের দিকে বাবা পা বাড়ালেন। যাতায়াতী পথটা গেছে একটা অগভীর খোঁদাইয়ের ভেতর দিয়ে। না জানিয়ে আমি তাঁর পিছু নিলাম। আমার দাঁড়াবার জায়গাটা খুব বেশি হলে পাঁচ-ছ'ফুট দূরে—ইস্, তেলুর ক্ষতবিক্ষত দেহটা প'ড়ে। আর তার ঠিক পাশেই বাঘটা ম'রে প'ড়ে রয়েছে।

লোকটার মাথা দু ফাঁক হয়ে আছে। বাঘের থাবার প্রত্যেকটা নখ লোকটার মাথার খুলি ভেদ ক'রে গেছে। ভুরু থেকে কপাল পেরিয়ে পেছনদিকের ঘাড় পর্যন্ত পরিষ্কার ফালা ফালা ক'রে কাটা। কেউ যেন ধ'রে ধ'রে ছুরি দিয়ে চিরেছে। কাঁধের কাছে এমনভাবে কামড়েছে যে, লোকটার বুক আর পিঠ একাকার হয়ে গেছে। দাঁত কোটানোর জায়গাগুলো হাঁ হয়ে গিয়ে সেখান থেকে ফুসফুসের অংশগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসছে আর রক্তের

স্রোতে গাজলা উঠছে।

দেখে আমার গায়ের ভেতর এমন গুলিয়ে উঠল যে, হড় হড় ক'রে আমি বমি ক'রে ফেললাম। ফলে, বাবা কট মট ক'রে আমার দিকে তাকালেন।

আট বছর বয়সে বনের রাজার ডাকতের সঙ্গে সেই আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। প্রথম পরিচয়টা মোটেই সুখের হয় নি।

৬

সঙ্গী দুজন ওঠবার আগেই আমি খুব ভোর-ভোর উঠে পড়লাম। উঠে রাইফেলটা আত্তোপান্ত সাফ ক'রে নিলাম। আমি জানতাম একটা কঠিন শ্রমসাধ্য কাজে হাত দিতে চলেছি। অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে না দিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের দখল রাখব।

চোট-খাওয়া বাঘের মত ভয়ঙ্কর জিনিস দুনিয়ায় দুটি নেই। এদেশের বনেজঙ্গলে আরও দুটি ভয়ঙ্কর প্রাণী আছে—হাতি আর মোষ। তারা একবার চোট খেলে আর রক্ষা নেই; তাদের মাথায় এমন ভাবে খুন চেপে যাবে যে, ছলেবলেকৌশলে যে ভাবেই হোক তারা শোধ তুলে ছাড়বে। কিন্তু যত যাই হোক, মারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে এরা কেউই বাঘের নখের যুগ্যিও নয়। এদের দৈহিক স্থূলত্ব আর আক্রমণের পদ্ধতি এমন যে, শিকারী তুখোড় হলে হয়ত আত্মরক্ষার সুযোগ এবং চূড়ান্ত মার দেবার মওকাও মিলে যেতে পারে। কিন্তু চোট-খাওয়া বাঘের বেলায় কোনো জারিজুরি খাটবে না—সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবার মতন তার তখনও রাগ।

আহত বাঘের সন্ধান করবার সাধারণত চারটি পৃথক পদ্ধতি আছে।

এক, শিক্ষিত হাতির পিঠে চড়ে যাওয়া। উপায় হিসেবে এটাই সবচেয়ে নিরাপদ। যেখানে বাঘের সন্ধান করা হবে সেই এলাকাটি কত বড় এবং কি রকম, তার ওপর নির্ভর করবে এ কাজে ক'টা হাতি ব্যবহার করা হবে। সব সময় একটির বেশি হাতি ব্যবহার করা ভালো; কারণ, একা একটি হাতি হলে চরম মুহূর্তে তার ঘাবড়ে যাবার ভয় থেকে যায়।

দুই, জায়গাটাতে এক পাল গরু খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া। ওদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হওয়ায় বাঘের আস্তানা খুঁজে বার করা সহজ হবে। তাছাড়া বাঘ যদি বিরক্ত হয়ে আক্রমণও ক'রে বসে, তাহলে গরু বেচারাদের ওপরই সে গায়ের ঝাল ঝাড়বে। সেই ফাঁকে গুলিবন্দুকবাজ শিকারী, আসল যে

দোষী—সে পার পেয়ে যাবে। তবে এ পন্থায় দুটো মুশকিল আছে। প্রথমত, যে জায়গায় বাঘ আছে সে জায়গায় গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত কাজ। হাওয়া উজানে বইলে বহু দূর থেকে—কখনও কখনও এমন কি আধ মাইল দূর থেকেও—গরুর পাল বাঘের গায়ের গন্ধ পেয়ে যাবে। সে অবস্থায় এক সঙ্গে অনেক লোক মিলে জোরসে তাড়া না দিলে ওদের ওমুখো একচুলও নড়ানো যাবে না।

এবং দ্বিতীয়ত, বাঘের ডেরার দিকে কেউ যদি ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেও, বাঘের এক হুমকিতেই ওরা হুড়মুড় ক'রে এমন ভাবে পালাবে যে তার ফলে বেশ কিছু লোক হয় ওদের পায়ের খুরের নীচে বিশ্রী ভাবে থেঁৎলে যাবে, নয় ওদের শিঙের গুঁতোয় অক্কা পাবে।

তিন নম্বর পদ্ধতি হল, বাঘের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া। মাইলের পর মাইল দূর থেকে কুকুরেরা যদি ঘুণাক্ষরেও বাঘের গন্ধ পায়, ল্যাজ গুটিয়ে চোঁ চা দৌড় দেবে। একমাত্র তালিম-দেওয়া সাহসী কুকুরদেরই এ কাজে লাগানো যেতে পারে।

চতুর্থ পদ্ধতি হল, আহত বাঘকে খোঁজার জন্যে সটান তার ডেরায় গিয়ে হানা দেওয়া। এই উপায়টি প্রয়োগ করার সময় যেতে হবে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে এবং যথাসম্ভব কম লোক সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গী হিসেবে থাকবে বড় জোর দুজন কি তিন জন লোক; নিতে হবে ভালোভাবে যাচাই ক'রে, যারা একটুতে ঘাবড়াবে না। এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করবার জন্যে আবার বলছি, এ কাজে সঙ্গে লোক বেশি থাকলে তাতে সাহায্য তো হয়ই না—বরং ঘাড়ের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়; এ ব্যাপারে যত বেশি খুঁতখুঁতে হওয়া যায়, শিকারে বিপদের সম্ভাবনাও তত কমে।

লুকিয়ে চুরিয়ে শিকার করবার অনেক হ্যাপা। তাই শেষের পদ্ধতিটি বেছে নেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য বরাবর এই পদ্ধতিই আমার পছন্দ।

সদারামকে আমি তাঁবুতে রেখে গেলাম—ওর মচ্‌কানো হাঁটুর যাতে শুশ্রূষা হয় এবং ও যাতে ওর সর্বার্থসাধক আফিম সেবন ক'রে শরীরমনে বল ভরসা পায়। চাকরটাকে সঙ্গে নিলাম; এ জাতীয় কাজে মোটেই সে আনাড়ি নয়। চোট-খাওয়া বাঘের পিছু নেওয়া আমারও এই প্রথম নয়। মোটামুটি একই রকমের অবস্থার মধ্যে আগেও আমি এ কাজ করেছি। কিন্তু যত বারই

এ কাজ হাতে নিয়েছি গলা শুকিয়ে গিয়ে আমার ভয়-ভয় করেছে। আমার অথবা আর কারো গুলি ছোড়ার দোষ হয়ে থাকলে সব সময় গালমন্দ করেছি—কেননা তার ফলেই তো আমাকে এমন ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছে।

আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় বাঘ আমাকে তার ল্যাজে খেলাবার বিলক্ষণ সুবিধে পেয়েছে; সুস্থির হয়ে তাক করবার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয় নি। আমি ক্ষণিক উত্তেজনাবশে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিয়েছি মাত্র—কী করছি না করছি সে সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ পাই নি। আমার ক্রিয়াকলাপ হয়েছে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিবশে। অথবা আমার সেই অর্থহীন মূঢ় আচরণের পিছনে ছিল হয়ত ভয়ের তাড়না। সহজাত যে তাড়নাই হোক, কাজটা যে অর্থহীন মূঢ় হয়েছে—এ বিষয়ে এখন আর আমার সন্দেহ নেই।

ঠাকুমা-ঠান্‌দিদিরা বাঘকে নিয়ে হাঁউ-মাউ-খাঁউ গোছের যে গল্পই বলুন, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় বাঘ কিন্তু আদতে মহাশয় প্রাণী। আমার ত্রিশ বছরের আরণ্যক জীবনে এমন একটি দৃষ্টান্তও আমি দেখি নি যেখানে বাঘ অকারণে মানুষের ওপর চড়াও হয়েছে। উলুবনে যেই সর্ সর্ আওয়াজ হয় অমনি বাঘ শুধু যে খোঁজ নিতে যায় তাই নয়, শিকার ধরবার মতলবেও যায়। আওয়াজ উৎপাদনকারী জীবটি যদি ঘাসের আড়ালে গা ঢাকা দেওয়া মানুষ হয়, বাঘ সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে এবং তাকে মেরে ফেলবার পর হয়ত টের পাবে—সে যেটা মেরেছে সেটা তার স্বাভাবিক শিকার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঘটি যদি মানুষখেকো না হয়—মরা মানুষটাকে ফেলে রেখে ভয়ে চোঁ চা দৌড় দেবে।

আমার এই বাঘটা আচমকা ধরা পড়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এমন নয় যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে যাবার তার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আমার দৃঢ় ধারণা মুখবিকৃত ক'রে চাইলেও আসলে সে আমার কোনো ক্ষতি করতে চায় নি। দুজনেই দুজনকে দেখে আমরা চমকে গিয়েছিলাম এবং তার মুখবিকৃতিটা ছিল, যত দূর মনে হয়, তার সেই চমকানো ভাবেরই লক্ষণ। আমি নিছক ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে বন্দুকের গুলি ছুঁড়লাম—তাও ভালোমত তাক্ পর্যন্ত না ক'রে।

আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় সদারাম যে জায়গায় বনকুলের ঝোপের নীচে হরিণ দেখতে পেয়েছিল, সেই জায়গায় এসে আমার চাকরটাকে বললাম পাথরের টুকরো আর নুড়িতে পকেট আর কাঁধের ঝোলা ভর্তি ক'রে নিতে।

আমাদের সামনে তিরিশ গজ এলাকার মধ্যে যত ঝোপঝাড় আছে, ওকে ব'লে দিলাম প্রত্যেকটা ঝোপে ঝাড়ে ইঁট ছুঁড়ে মারতে। বাঘ যদি এই এলাকাটুকুর মধ্যে থাকে তাহলে ঢিল পড়তে দেখলে চটে মটে সে বেরিয়ে আসবে এবং আমি তখন তাকে গুলি করবার আরেকটা সুযোগ পাব—এই ভেবে বন্দুক নিয়ে আমি তৈরি হয়ে থাকলাম। বাঘ এতে অতিষ্ঠ হবে, কিন্তু কে তাকে কোথা থেকে জ্বালাতন করছে জানতে না পেরে তেড়ে আসতে পারবে না। রাগে গরগর করতে করতে বাঘ তখন আস্তানা বদলাতে গিয়ে হয় আমার বন্দুকের নিশানার মধ্যে এসে যাবে, নয় আমি তার হদিশ পেয়ে যাব।

কিন্তু ঢিল ছুঁড়ে বাঘের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আমরা তখন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে সামনে আরও তিরিশ গজ এলাকা জুড়ে ঢিল ছুঁড়তে লাগলাম। তাতেও কোনো ফলোদয় হল না। ক্রমশ সাবধানে গোটা উপত্যকাটা আমরা চষে ফেললাম। তারপর এসে পড়লাম একেবারে সেই গড়ানে জায়গাটায়---যেখানে আগের দিন সাক্ষাৎ বাঘের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছিল।

খোয়াইয়ের পাড় থেকে বিশ হাত তফাতে একটা গাছ গড়ানে জায়গাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আমার লোকটাকে তার ওপর চড়ে বসতে বললাম। যখন দেখলাম গাছের মগডালের ওপর নির্বিঘ্নে ও বেশ যুৎ ক'রে বসেছে, তখন আমি বুকে হেঁটে খোয়াইয়ের পাড়ে চলে গিয়ে ওকে বললাম—এইবার ঢিল ছুঁড়তে থাকো। ছ'টা আটটা ঢিল ছুঁড়তে না ছুঁড়তেই ওপাশের গড়ানে জায়গাটার নীচে থেকে চাপা গলায় গর্‌র্ গর্‌র্ আওয়াজ ভেসে এল। আমি আমার জায়গা থেকে পরিষ্কার ঠাহর করতে পারছিলাম বাঘ ঠিক কোথায় ব'সে গাঁইগুঁই করছে। কিন্তু খোদ্ মালিককে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

যে জায়গা থেকে আমি প্রথম গুলিটা চালিয়েছিলাম, সেখান থেকে বাঘের ডেরা হাত চল্লিশেক দূরে। আমার গুলিতে বাঘ যে গুরুতরভাবে জখম হয়েছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হলাম ; কেননা তা নাহলে এতক্ষণে সে বহু দূরে চলে যেত—অন্তত প্রায় সিকি মাইল দূরে সবচেয়ে কাছের জলের জায়গায় তো যেতই।

আমার লোকটিও বাঘের ডাক শুনতে পেয়ে কেল্লা মার দিয়ার ভঙ্গিতে

হাসি হাসি মুখ ক'রে ইশারায় জায়গাটা দেখিয়ে দিল। যখন দেখল আমি একেবারে চোখকান খাড়া ক'রে তৈরি হয়ে আছি, তখন বেশ টিপ ক'রে ক'রে, ঘাসের যে ঝোপে বাঘ গা ঢাকা দিয়ে ছিল, সেখানে টপাটপ কয়েকটা ঢিল ছুঁড়ল। গোটা কয়েক ঢিল বাঘের গায়ে লেগে থাকবে—এবার শোনা গেল তার ভয়ঙ্কর হুঙ্কার। আমার মনে হল, তার আওয়াজে আমার বুকের নীচেকার মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

যারা বাঘ দেখেছে শুধু চিড়িয়াখানায় আর সার্কাসে, যারা কখনও ক্রুদ্ধ বাঘ রাজার বাজখাঁই গর্জন শোনে নি—তারা কখনই ধারণা করতে পারবে না সে একটা কী হৃদ্‌কম্পজাগানো ভয়াবহ ব্যাপার।

খোয়াইয়ের পাড়ে একটা শিরালের আড়ালে বাঘ তখনও লুকিয়ে থেকে ক্রমাগত গজরাচ্ছে আর চারদিকের ঘাসের ওপর ল্যাজের বাড়ি মারছে।

একেকটি মুহূর্ত যাচ্ছে আর আমার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। আমি ঠিক করেছিলাম বাঘের মুণ্ডু কিংবা কলিজার দিকটা স্পষ্টাস্পষ্টি যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি, ততক্ষণ কিছুতেই গুলি ছুঁড়ব না। কিন্তু দেখে মনে হল ওদিকে বাঘও যেন আমার অভিরুচি অনুযায়ী তার গুপ্তস্থান ছেড়ে আসতে এবং তার শরীরের মোক্ষম জায়গাগুলো মেলে ধ'রে আমাকে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করতে দিতে রাজী নয়। এদিকে আমার চাকরটিও যেন বাঘের ইচ্ছেমত নিজের মন বেঁধে নিয়েছে। কেননা সেও ওদিকে ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করেছে। আমি এখন কী করি।

এদিক ওদিক তাকালাম—কোথাও পাথরের টুকরো প'ড়ে আছে কিনা। কোথাও কিছু নেই। মাটির একটা ঢেলা পর্যন্ত নয়। আমার লোকটিকে ইশারা করব ব'লে গাছের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। কিন্তু গজরানো বাঘের দিকে তাকিয়ে লোকটা এমন সম্মোহিত হয়ে আছে যে, আমার পক্ষে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হল না।

বাঘের মুহুর্মুহু গর্জনে এমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম যে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। আমার পক্ষে আর কিছুতেই চুপ ক'রে ব'সে থাকা সম্ভব হল না। পকেট থেকে একটা ফালতু কার্তুজ বার ক'রে নিজেকে পুরোপুরি গোপন রেখে আমি আধা-গোপন বাঘটার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। কার্তুজটা শক্ত জায়গায় প'ড়ে খট্‌ ক'রে আওয়াজ হল। বাঘটা ক্ষেপে গিয়ে তক্ষুনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নিজের অর্ধপঙ্গু শরীরটা ঘাসবনের ভেতর থেকে টেনে

হেঁচ্‌ড়ে বার ক'রে আনল। আমি তার মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। হাত তিরিশেক দূর থেকে আমার হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। সাহস হারিয়ে যাকে আমি জখম করেছিলাম, কষ্টের হাত থেকে এতক্ষণে সে মুক্তি পেল।

আমার আগের গুলিটা—তামার পাতে মোড়া ৩০০ গ্রেনের ধাতুপিণ্ড—বাঘের বুকের সামান্য নীচে ইঞ্চি দুই ডাইনে বিঁধেছিল। গুলিটা তার কাঁধের হাড় সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিয়ে সটান তার অন্ত্রে গিয়ে ঘা দিয়েছিল। তার জন্যে বেচারা উঠে দাঁড়াতে এবং খানিকটা পথও হাঁটতে অপারগ হয়ে পড়েছিল।

সদ্য যৌবনে-পা-দেওয়া বাঘটা বড় সুন্দর দেখতে ছিল। তার গায়ে ছিল পুরু পশমের ওপর ফ্যাকাশে কালোয় আর ম্যাড়মেড়ে সোনার জলে ছাপানো ভাঙা ভাঙা ডোরাকাটা দাগ।

বয়সের তুলনায় বেশ বড় সড়। মেপে দেখা গেল, আপাদমস্তক দৈর্ঘ্যে সে ন' ফুট আট ইঞ্চি।

['ডোরাকাটার অভিসারে' বই আকারে ছাপা হচ্ছে 'পরিচয়'-এ ধারাবাহিক প্রকাশ তাই এ-সংখ্যায় সমাপ্ত হল।]

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ-বিজ্ঞানী ল্যান্দাউ

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিজ্ঞানী অ্যাকাডেমিশিয়ান লেভ ল্যান্দাউ এ-বছরের পয়লা এপ্রিল মস্কোতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিজ্ঞানজগতে ল্যান্দাউ এমন একটি নাম, যা প্রতিটি বিজ্ঞানকর্মীর মনে এক গভীর আবেগকে জাগিয়ে তোলে।

ছ-বছর আগে ল্যান্দাউ এক মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁর বাঁচবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। মৃত্যুর হাত থেকে এই মানুষটিকে ছিনিয়ে আনবার জন্যে প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে সেদিন এক অসাধারণ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পৃথিবীর বহু দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মস্কোতে সমবেত হয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা ধরনের বিচিত্র ওষুধপত্র এসে জড় হয়েছিল মস্কোর সেই হাসপাতালটিতে, যেখানে ল্যান্দাউর অচৈতন্য দেহটা মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। তারপর শুরু হল চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পরপর চারবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ল্যান্দাউ। চারবারই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মৃত্যুকে জয় করলেন। ল্যান্দাউকে মরতে তাঁরা দেন নি।

ল্যান্দাউকে বাঁচাবার জন্যে সেদিন এই যে একটি অসাধারণ ঘটনা শুরু হয়েছিল, তার প্রধান কারণটা ছিল এই, তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তখন ল্যান্দাউ ছিলেন বোধহয় সবচেয়ে প্রতিভাবান মানুষ। অকালমৃত্যুর ফলে বিজ্ঞানজগত ল্যান্দাউর প্রতিভার অবদান থেকে বঞ্চিত হবে, এটা পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল কোনোমতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই পৃথিবীর মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে একটি মানুষকে বাঁচানোর মহৎ মানবিক ঘটনাকে সেদিন প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল।

ছ-বছর আগের গুরুতর দুর্ঘটনার হাত থেকে ল্যান্দাউ বেঁচে উঠলেও, তাঁর স্বাস্থ্যটা পুরোপুরি সেরে উঠতে পারে নি। যদিও তাঁর আহত মস্তিষ্কের সমগ্র প্রতিভাকে তিনি আবার কাজে নিয়োগ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর দুর্বল শরীরটার ওপরে ছ-বছর বাদে মৃত্যুর অভিযানকে আর বাধা দেয়া গেল না।

১৯০৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাকুতে লেভ ল্যান্দাউর জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। মাত্র তের বছর বয়েসে তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। চোদ্দ বছর বয়েসে তিনি বাকু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং একসঙ্গে পদার্থবিদ্যা, গণিত ও রসায়ন এই তিনটি বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে আসবার আগেই মাত্র আঠের বছর বয়েসে ল্যান্দাউ তাঁর কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কিত প্রথম গবেষণা-নিবন্ধ 'দি অ্যানালিসিস অফ স্পেকট্রা অফ ডাইঅ্যাটমিক মলিকিউলস' প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত বিজ্ঞানী মহলে ল্যান্দাউকে নিয়ে সাড়া পড়ে যায় এবং তাঁকে ঘিরে এক নতুন বিজ্ঞানীগোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

উনিশ বছর বয়েসে ল্যান্দাউ উচ্চতর গবেষণার জন্যে ইওরোপ গমন করেন এবং সে সময়কার প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ, পাউলি, ব্লক প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন এবং কোপেনহাগেনে অধ্যাপক নীলস বোরের গবেষণা-গারেও কাজ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে আসেন এবং খারকভ টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার স্বীকৃতিতে ১৯৩৪ সালে তাঁকে ডকটরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

খারকভেই ল্যান্দাউ তরুণ তত্ত্বীয় পদার্থবিদদের জন্যে তাঁর বিখ্যাত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের খ্যাতি সোভিয়েত ইউনিয়নের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং যে কোনো তরুণ পদার্থবিদ এই ইনস্টিটিউটে কাজ করার সুযোগ পাওয়াকে তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন বলে গণ্য করতেন।

১৯৩৭ সালে ল্যান্দাউ খারকভ থেকে মস্কোয় চলে আসেন এবং সেখানকার ইনস্টিটিউট অফ ফিজিকাল প্রব্লেমস-এর তত্ত্বীয় বিভাগের প্রধান রূপে নিযুক্ত হন।

প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী পিওতর কাপিত্জা ছিলেন তখন সেই ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ। কাপিত্জা ও ল্যান্দাউ ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী রুমার-এর সঙ্গে যৌথভাবে 'ইলেকট্রন কণিকার ধারাবর্ষণ' সম্পর্কে ল্যান্দাউর গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে পদার্থ-বিজ্ঞানে জটিল বিষয়বস্তু ইলেকট্রনিক গ্যাসের আচরণ সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সুপারফ্লুয়িডিটি সম্পর্কিত গবেষণা বিজ্ঞানজগতে ল্যান্দাউর সবশ্রেষ্ঠ অবদান। হিলিয়াম হলো একটি অদাহ্য, অতি লঘু ও রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণের অনুপাত হলো দু-লক্ষভাগের একভাগ মাত্র। হিলিয়ামকে যখন প্রায় পরম শূন্য ডিগ্রী তাপমাত্রায়(—৪৫৯·৬৯° ফারেনহিট) নামিয়ে আনা হয়, তখনই সুপারফ্লুয়িডিটি রূপ ব্যাপারটি দেখা দেয়। এই অবস্থায় তরল হিলিয়ামকে একটি পাত্রে রেখে দিলে হিলিয়াম সেই পাত্রটির গা বেয়ে ওপরে উঠে আসতে আরম্ভ করে। বহুদিন পর্যন্ত এই ধারণাটাই প্রচলিত ছিল যে, পরম শূন্য ডিগ্রীতে পদার্থের সমগ্র আণবিক ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে আসে। যে কয়েকজন সর্বপ্রথম এই ধারণাটি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করেন, ল্যান্দাউ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ল্যান্দাউ হিলিয়াম-দুই নামে বিস্ময়কর তরল পদার্থটি সম্পর্কে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর আগে কেউ এই পদার্থটির বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। তরল হিলিয়াম সংক্রান্ত তাঁর অনন্যসাধারণ গবেষণার জন্যে ১৯৬২ সালে ল্যান্দাউকে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। কিন্তু তখন তিনি গুরুতর মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। নোবেল কমিটি হাসপাতালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেখানেই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন।

আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে ল্যান্দাউর অবদান অবিস্মরণীয়; এর স্বীকৃতিতে তিনি দেশ-বিদেশ থেকে অজস্র সম্মান ও উপাধি পেয়েছেন। এ-বছরের গত ২২শে জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অফ লেনিন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ল্যান্দাউ তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা। ইয়েভ্‌গেনি লিফ্‌শিত্‌জের সঙ্গে ল্যান্দাউ তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার ওপর

ছয় খণ্ডে যে সুবৃহৎ রচনাটি লেখেন, তা বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে এক ক্লাসিকসের সম্মান লাভ করেছে। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর একটি মনোজ্ঞ লোকরঞ্জক পুস্তিকা রয়েছে।

ল্যান্দাউ ছিলেন অত্যন্ত পরিহাসপ্রিয় ও আমুদে মানুষ। ছাত্র ও সহকর্মীদের সম্বন্ধে তাঁর অজস্র ঠাট্টার গল্প প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। ল্যান্দাউ আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে বিজ্ঞানজগতকে সমৃদ্ধ করবেন, পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের এই আশা আর পূরণ হয়ে উঠল না।

অটো হান

পারমাণবিক গবেষণার জগতে অটো হান একটি অবিস্মরণীয় নাম। গত ২৮এ জুলাই ৮৯ বছর বয়েসে দীর্ঘ রোগভোগের পর এই মানুষটির মৃত্যু ঘটেছে।

১৯৩৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর হান এবং তাঁর সহকর্মী ফ্রিত্‌জ্ স্ট্র্যাসমান প্রমাণ করেছিলেন যে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে পারমাণবিক বিভাজন (ফিসন) ঘটানো সম্ভব। তাঁদের এই গবেষণার ফলাফল পারমাণবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লবকে সূচিত করে তুলেছিল।

অটো হানের এই আবিষ্কারের পেছনে একটু ইতিহাস রয়েছে। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস শহরে সলভে কংগ্রেস উপলক্ষে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা সমবেত হয়েছিলেন। আইরিন জোলিও কুরি, তাঁর স্বামী জোলিও কুরির সাহায্যে প্যারিসে তাঁর গবেষণাগারে বিভিন্ন পদার্থের, বিশেষ করে থোরিয়ামকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে তা থেকে আলফা রশ্মি নির্গমনের যে-ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তারই এক বর্ণনা কংগ্রেসে উপস্থিত সদস্যদের কাছে রাখলেন। কিন্তু কংগ্রেসে উপস্থিত বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই ঘটনাটা বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না। বার্লিনে কাইজার উইলহেলম ইনস্টিটিউটে অটো হানের সহকর্মিণী লিজা মাইটনার আইরিন কুরির পরীক্ষার সমালোচনা করে বললেন যে তিনিও একই ধরনের পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু ঐ ধরনের কোনো ফলাফল পান নি।

আইরিন ও জোলিও কুরি প্যারিসে ফিরে এসে তাঁদের পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং এই পরীক্ষাই তাঁদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার ভিতস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

বার্লিনে অটো হানের গবেষণাগারে কুরিদম্পতির গবেষণার খবর এসে পৌঁছয়, কিন্তু তাঁদের পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক-যাথার্থ সম্বন্ধে হানের গোড়া থেকেই সন্দেহ থাকায় তিনি গবেষণাপত্রগুলো পড়েও দেখেন না।

সময়টা ১৯৩৮ সাল। জার্মানিতে তখন হিটলারী নাজিদের তাণ্ডব চলেছে। অটো হানের গবেষণার কাজে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের সহকর্মিণী লিজা মাইটনার ছিলেন অস্ট্রিয়ার মানুষ। বিশুদ্ধ আর্য না হওয়ার ফলে তিনি জার্মানি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অটো হান ও ম্যাক্স প্লাংক এ-ব্যাপারে হিটলারের কাছে দরবার করেও কিছু করতে পারেন নি। লিজা মাইটনারের জায়গায় স্ট্র্যাসমান হলেন হানের প্রধান সহকর্মী।

ঐ বছরই শরৎকালে আইরিন কুরি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত তাঁর আগেকার সমগ্র কাজের বর্ণনাসহ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। স্ট্র্যাসমান লেখাটার ওপর চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলেন যে, কুরি-গবেষণাগারের পরীক্ষায় কোথাও কোনো ভুল নেই বরং তাঁর মনে হলো, সমস্যাটিকে বিচার করবার এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পথই যেন খুলে যাচ্ছে।

স্ট্র্যাসমান উত্তেজিতভাবে হানের ঘরে গিয়ে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তাঁকে বললেন যে আইরিন কুরির লেখাটি তাঁকে পড়ে দেখতেই হবে। হান টলবার পাত্র নন। তিনি জবাব দিলেন যে তাঁদের মহিলা বান্ধবীর সর্বাধুনিক কাজ সম্বন্ধে তাঁর আদৌ কোনো আগ্রহ নেই। স্ট্র্যাসমানও ছাড়বার পাত্র নন। হান অন্য কোনো কথা বলবার আগেই তিনি আইরিন কুরির গবেষণাপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে তাঁকে বলে ফেললেন। হান পরে বলেছেন যে কথাগুলো যেন ঠিক বজ্রের মতো তাঁর ওপরে এসে পড়ল। তিনি তাঁর সিগারটাকে শেষও করতে পারলেন না। তিনি সোজা স্ট্র্যাসমানের সঙ্গে নিচে ল্যাবরেটরিতে দৌড়ে এলেন।

হান বুঝতে পারলেন, সারা পৃথিবী জুড়ে আরো বহু বিজ্ঞানীর মতোই তিনি এতদিন একটা ভুল পথে চলছিলেন। নিজের তরফ থেকে এগুলো ভুল স্বীকার করার কাজটা খুব সহজ ছিল না। কিন্তু সেই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়েই তিনি কিছুকাল পরে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্যকে অর্জন করতে পেরেছিলেন।

কয়েক সপ্তাহ ধরে হান ও স্ট্র্যাসমান রেডিয়াম রসায়নের সবচেয়ে সূক্ষ্ম পদ্ধতির দ্বারা কুরি-গবেষণাগারের পরীক্ষাগুলো যাচাই করে চললেন। এভাবে

দেখা গেল, প্যারিসে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে তাঁরা যেমন ল্যানথেনামের কাছাকাছি একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে পাচ্ছিলেন, ঠিক সেরকম একটা ঘটনাই ঘটছে। হান ও স্ট্র্যাসমানের আরো সূক্ষ্ম পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে ইউরেনিয়াম পরমাণুটি নিউট্রনের আঘাতে ভেঙে গিয়ে যে দুটি টুকরোয় পরিণত হচ্ছে, তাদের মধ্যে একটি কুরি-গবেষণাগারের অনুমানমতো ল্যানথেনাম নয়—বেরিয়াম এবং অপরটি হলো ক্রিপটন।

ইউরেনিয়ামের মতো একটি ভারী পরমাণুকে নিউট্রনের আঘাতে যে সমান ভারী দুটো অংশে ভেঙে ফেলা যাচ্ছে, এই ঘটনাটি যে একটি অসাধারণ আবিষ্কার—তা হান ও স্ট্র্যাসমান দুজনেই বুঝতে পেরেছিলেন।

পরমাণুবিজ্ঞানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্যে অটো হান ১৯৪৪ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্যে এই পুরস্কার তাঁকে দেয়া হয় ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে। অটো হান তখন ইংরেজদের হাতে যুদ্ধবন্দীরূপে রয়েছেন। খবরের কাগজে তিনি তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরটা পান। এই পুরস্কার তিনি তাঁর ছাড়া পাবার পর ১৯৪৬ সালে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

অটো হান বরাবর হিটলারের বিরোধী ছিলেন। হিটলার এ-কথা জেনেও কিছু করতে পারে নি, যেহেতু মানুষটা ছিলেন অটো হান। অটো হান তাঁর সহকর্মী বন্ধুদের বলেছিলেন যে, তাঁর আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে যে পরমাণুবোমা তৈরির প্রচেষ্টা জার্মানিতে চলেছে, তার ফলে যদি কোনোদিন হিটলার পারমাণবিক বোমাকে লাভ করে বসে তাহলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। অটো হান বহু ইহুদী বিজ্ঞানীকে হিটলারের রোষানল থেকে বাঁচিয়ে জার্মানির বাইরে যেতে সাহায্য করেছেন।

শুধু একজন মহান বিজ্ঞানীরূপে নয়, একজন মহান মানুষরূপেও অটো হানকে আমরা চিরদিন স্মরণ করব।

শঙ্কর চক্রবর্তী

বাঙলা চলচ্চিত্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক সঙ্কট

হালফিল কলকাতা শহরে দেখা যাচ্ছে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। রূপালী পর্দার ছায়া-মানুষেরা—বাঙলা সিনেমার পরিবেশক-প্রযোজক, কলাকুশলী, অভিনেতৃবর্গ—এসে দাঁড়িয়েছেন কলকাতার লক্ষ মানুষের ভিড়ে, কায়ার জগতে, রাস্তায় রাস্তায়, ফুটপাতে ফুটপাতে।

ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে যতই অভিনব মনে হোক না কেন, একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এটাই তো স্বাভাবিক! সামাজিক-অর্থনৈতিক অধঃপতনের যে-বাঁধ-ভাঙা বন্যায় সমস্ত বাঙলাদেশ ভেসে চলেছে এক সর্বনাশা ভবিষ্যতের দিকে, বাঙলা সিনেমাই বা তা থেকে বাদ যাবে কোন দেব বলে? বাদ যায় নি।

কিন্তু বাঙলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির আর পাঁচটা ব্যাপারের মতোই, ভেতরে ভেতরে ফাঁপা হয়ে গিয়েও, একটা সংস্কারের কাঠামো খাড়া করে রেখে বাঙলা সিনেমার মানুষেরাও যেন নিজেদের মনকে চোখ ঠেরে এসেছেন এতদিন। কিন্তু আজ সেই সংস্কার কাটতে শুরু করেছে। এখন "রাস্তাই একমাত্র রাস্তা।"

গত দশ বছরের বাঙলা সিনেমার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এ দশ বছরে কী ব্যবসায়িক কী নন্দনতাত্ত্বিক দু-দিক থেকেই বাঙলা ছবি ক্রমশ অবনতির দিকেই নেমে এসেছে। বলা বাহুল্য অর্থনৈতিক সঙ্কটই এসেছে প্রথম, তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে উন্নত শিল্পমানের ছবিকে হটিয়ে স্থূলরুচির বিকট চলচ্চিত্র-পণ্য।

১৯৬৮-তে বাঙলা ছবির যে সঙ্কট প্রকাণ্ড রূপ নিয়েছে—একদিকে তা যেমন দুশ্চিন্তার কারণ, অন্যদিকে তা-ই আবার এক সুযোগও এনে দিয়েছে। সুযোগ এই কারণে যে, এই প্রথম বাঙলা ছবির সঙ্কটকে

বাঙলাদেশের মানুষ এত স্পষ্টভাবে জানতে পারল। এবং এই সঙ্কটে বাঙলাদেশের সমস্ত মানুষেরই যে কিছু করণীয় আছে, এই সত্যও তাদের কাছে ধরা পড়ল। আমি বলতে চাইছি, এই প্রথম বাঙলা ছবির সঙ্কটকে একটি বিচ্ছিন্ন সঙ্কট হিসেবে বিচার না করে, বাঙলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সঙ্কটের দৃষ্টিকোণ থেকেও ভেবে দেখবার সুযোগ ঘটল। এবং এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া বাঙলাদেশের কোনো সঙ্কটের সমাধানই আজ আর সম্ভব নয়।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে গণতন্ত্রের যে বিকাশ ছিল কাম্য, সংবিধানে ছিল যার স্বীকৃতি ; বাস্তবে তার প্রতিরূপ খুঁজে পাওয়া গেল না। কী উৎপাদন-পদ্ধতিতে, কী বণ্টন-ব্যবস্থায়, একটাই ঝোঁক দিন দিন প্রবল হয়ে উঠল—কে না জানে সেই ঝোঁকটি একচেটিয়া পুঁজির। মানুষের মুখের ভাত পরনের কাপড় থেকে চলচ্চিত্র পর্যন্ত একই মারাত্মক অতিমুনাফার ঘোড়দৌড় ; মানুষের বেঁচে থাকার নিম্নতম প্রয়োজনকেও উপেক্ষা করে, মানুষের সুকুমার বৃত্তির গলা টিপে, মানবজীবনের একটা 'আদর্শ'-কেই উচ্চে তুলে ধরা হল—টাকা, আরো টাকা !

এই সামগ্রিক সত্যটিকে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে বাঙলা ছবির আজকের সঙ্কট-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে।

বাঙলা ছবির জগতেও টাকার খেলা চলছে। অবশ্য সে খেলার খেলোয়াড় মাত্র গুটিকয়েক লোক। এতদিন যে সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছিল অস্পষ্ট ভাবে, অন্তরালে—যেখানে সঙ্কটের প্রধান উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না—আজ সেই উৎস খুঁজে পাওয়া গেছে। বাঙলা ছবির জগতের সর্বস্তরের কর্মীরা এক বাক্যে বলছেন, প্রদর্শকেরাই বাঙলা ছবির সঙ্কট সৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী।

এই প্রসঙ্গে বাঙলা ছবির প্রচলিত উৎপাদন ও প্রদর্শন-পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার।

বাঙলা ছবি তৈরি করেন প্রযোজক ও প্রদর্শক মিলে। প্রথমে টাকা খরচ করেন প্রযোজক, পরে পরিবেশক তাঁকে টাকা ধার দেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলা-কুশলী, স্টুডিও-ল্যাবরেটরি ও আনুষঙ্গিক যাবতীয় খরচ তো বটেই ; তা ছাড়া ও ছবির বিজ্ঞাপন এবং একাধিক প্রিন্টের খরচও বহন করতে হয় পরিবেশককে। এইভাবে প্রযোজক ও পরিবেশক ছবি তৈরি

করে ছাড়ির জন্ম প্রদর্শকের দরকার। প্রদর্শক, যিনি ছবি তৈরির জন্ম একটি পয়সাও খরচ করেন না, শুধু সিনেমা-হাউসের মালিক হয়ে সেই ছবি দেখিয়ে মোট বিক্রির শতকরা ৭০।৭৫ ভাগই (পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র-শিল্প-সংরক্ষণ সমিতির হিসেবে) নিয়ে নেন। বাকি টাকা প্রথমে পরিবেশক, পরে প্রযোজক ফেরত পান। ছবি 'হিট' না করলে কোনো বাঙলা ছবি থেকে পরিবেশক সামান্য কিছু টাকা ফেরত পেলেও, প্রযোজক এক পয়সাও পান না। এবং 'হিট' বাঙলা ছবির সংখ্যা গত কয়েক বছরে খুবই কম। এই কারণে বছর বছর পুরনো প্রযোজক-পরিবেশকরা ছবি তৈরির সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছেন, নতুন প্রযোজক ছবি তৈরি করতে এগিয়ে আসছেন না।

এর পরেও আছে, তৈরি ছবির মুক্তির সমস্যা। গত পাঁচ বছরে প্রায় ৮০টি বাঙলা ছবি তৈরি হয়ে পড়ে আছে, মুক্তির আশা প্রায় নেই। কারণ, এক তারকাচিহ্নিত ছবি ছাড়া প্রদর্শকেরা ছবি দেখাতে উৎসাহী হন না; দ্বিতীয়ত, ছবি 'রিলিজ'-এর কোনো নিয়ম মানা হয় না বলে 'গোপন ব্যবস্থা'য় পর-তৈরি-ছবি আগে রিলিজ হয়ে যায়। তা ছাড়াও আছে হিন্দি ছবির দাপট।

হিন্দি ছবির বাজার ভারতজোড়া। তাই বাঙলাদেশে তারা অপেক্ষাকৃত কম লাভেও অসম প্রতিযোগিতায় বাঙলা ছবিকে হারিয়ে দিচ্ছে। এবং নিশ্চিত মুনাফার লোভে বাঙলার প্রদর্শকরাও 'হিন্দি ছবি' নামক বিকৃতরুচির পণ্যে বাজার ছেয়ে ফেলছেন। সমাজের মধ্যে এই ছবিগুলি সৃষ্টি করছে আর-এক নৈতিক সঙ্কট। বিশেষত তরুণদের ওপর এই সব ছবির বিষক্রিয়া কী ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে, তা চোখকান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। এখানে কেউ প্রাদেশিকতার প্রশ্ন তুললে ভুল করবেন। কারণ প্রশ্নটা ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে—ভাষা নিয়ে বা শিল্প নিয়ে নয়।

হিসেব-নিকেশের জটিলতার ভেতর প্রবেশ না করেও যে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হবার নয় যে, বাঙলাদেশে ১৯৫৭য় ৫৭ টি ছবির জায়গায় যখন ১৯৬৭ তে ২৮ খানা ছবি তৈরি হয় এবং তৈরি ছবি মুক্তি না পেয়ে বছরের পর বছর পড়ে থাকে ; তখন, সেই শিল্পের সঙ্কট কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে !

ভরসার কথা এই সঙ্কটের মোকাবেলা করতে এগিয়ে এসেছেন চলচ্চিত্র-জগতের লোকেরাই ; পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র-শিল্প-সংরক্ষণ-সমিতির আহ্বানে

কলা-কুশলী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক-পরিবেশক, স্টুডিও-ল্যাবরেটরির কর্মী সবাই এক হয়ে লড়ছেন কলকাতার 'রিলিজ চেন'এর মালিকদের বিরুদ্ধে। তাঁরা ১২ জুলাই ৬৮ থেকে কলকাতার বাঙলা ছবির 'রিলিজ চেন'গুলির সামনে সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় হলগুলি কার্যত অচল করে রেখেছেন! তাঁদের দাবি—ছবি বিক্রির মোট টাকার সমবণ্টন, সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে বাঙলা ছবির জনসংখ্যানুপাতে আবশ্যিক প্রদর্শন এবং রিলিজ কমিটি মারফত বাঙলা ছবি মুক্তির ব্যবস্থা করা এবং কলা-কুশলী ও স্টুডিও ল্যাবরেটরির কর্মীদের ন্যায্য পাওনা আদায়।

শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি অর্ডিনেন্স করে প্রতিটি 'হল'-এ নির্দিষ্ট সপ্তাহের জন্য বাঙলা ছবি প্রদর্শন আবশ্যিক করবেন। এই প্রসঙ্গে সরকারের দায়িত্বের কথাও বলা দরকার। সরকার কর-বাবদ প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা বাঙলাদেশে চলচ্চিত্র-শিল্প থেকে নিয়ে থাকেন; অথচ এই শিল্পের উন্নতির জন্য তাঁরা কিছুই খরচ করেন না। 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করে তাঁরা নানাভাবে বাঙলা ছবির উন্নতিতে সাহায্য করতে পারেন। অথচ এ-ব্যাপারে তাঁদের কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

অধিকাংশ 'হল' মালিকই এখনো সমিতির দাবি মেনে নেন নি। এমন কি, সমিতিকে স্বীকৃতি দিতেই তাঁরা নারাজ। সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক, সর্বস্তরের কর্মীদের ঐক্য। সঙ্কটের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁরা এক হয়ে লড়তে পারছেন, এটাই আন্দোলনের প্রথম সার্থকতা। অবশ্য কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন—এই আন্দোলনে সত্যিই বাঙলা ছবির কলা-কুশলী ও কর্মীরা উপকৃত হবেন কিনা। এ-প্রশ্নের উত্তরে সংরক্ষণ সমিতি বলছেন কলা-কুশলী ও কর্মীদের ন্যায্য দাবির জন্যও তাঁরা লড়ছেন। কিন্তু বর্তমানের প্রধান কাজ বেশি বাঙলা ছবি উৎপাদনের রাস্তা পরিষ্কার করা। ছবি বেশি হলে তবেই অন্যান্য দাবি আদায়ের প্রশ্ন বিবেচিত হতে পারবে। একথা ঠিকই যে বাঙলা ছবির জগতে এই কলাকুশলী এবং কর্মীরাই সবচেয়ে বঞ্চিত। তাঁদের বাঁচার দাবিকে উপেক্ষা করে কিছুতেই চলচ্চিত্র-শিল্পের সত্যিকার উন্নতি সম্ভব নয়। তাছাড়াও আছে সিনেমা-হাউসের কর্মীদের কথা। তাঁদের সঙ্গে সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনেরও কোনো বিরোধ থাকার কথা নয়। আন্দোলনেরও প্রথম কথাই হচ্ছে যত বেশি মানুষকে দাবির সমর্থনে সামিল করা যায় তার চেষ্টা করা। এবং সেই

অধিকাংশ মানুষের দাবি-আদায়ের আন্দোলনই সঠিক আন্দোলন।

বাঙলা ছবির সঙ্কটের অতিসরলীকরণ করে লাভ নেই। বছরের পর বছর জট পাকাতে পাকাতে অবস্থা এমন জটিল হয়ে উঠেছে যা কাটাতে বহু সময় এবং পরিশ্রম লাগবে। কিন্তু সে পরের কথা। বাঙলা ছবিকে বাঁচতে হলে বেশি বাঙলা ছবি তৈরি হওয়া দরকার। প্রদর্শকের মনোপলি ভাঙতে পারলে তবেই সেই সম্ভাবনা দেখা দেবে। তাই সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়কে সমর্থন জানাতে কোনো বাধা নেই।

লেখা শেষ করবার আগে আমি বাঙলাদেশের জনসাধারণ—শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক—তথা শিক্ষিত মানুষের চোখ ফেরাতে চাই বাঙলা ছবির এই সঙ্কটের দিকে। ছবির লোকরা যেমন এগিয়ে এসেছেন জনসাধারণের কাছে, তেমনি বাঙলাদেশের মানুষেরও কর্তব্য তাঁদের প্রতি সমর্থন জানানো, সহযোগিতা করা। কারণ এই সঙ্কট একদিকে যেমন বাঙলা ছবির, অন্যদিকে সেটা বাঙলাদেশে সামগ্রিক সামাজিক-অর্থ নৈতিক এমন কি নৈতিক সঙ্কটও বটে।

কয়েক বছর আগে যে কয়েকজন পরিচালক বাঙলা ছবিকে স্থূল রুচিবিকারের হাত থেকে বাঁচিয়ে উঁচু দরের শিল্পের পর্যায়ে তুলে এনেছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকার সৃষ্টির সম্ভাবনাও তখনই দেখা দেবে, যখন ছবি করার সুযোগ বাড়বে। বাঙলা ছবির সংখ্যাগত পরিবর্তন ধীরে ধীরে গুণগত পরিবর্তনে রূপ নেবে।

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্কট অনেক দিনের। তার সমাধানের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই একাধিক মত থাকা সম্ভব। সুধী পাঠকবৃন্দ, বিশেষত চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুণীজন আলোচনায় যোগ দেবেন—এই আশায় আমরা বর্তমান নিবন্ধটি প্রকাশ করলাম।　—সম্পাদক

নাটক-বিষয়ে কয়েকটি কথা

নাটক যদি জীবনের দর্পণ হয়, তাহলে ইদানীংকালের অপেশাদার নাট্যকর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আপনাকে যুগপৎ দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। এক. বাঙলাদেশে কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নেই; দুই. বাঙলাদেশে রাজনীতি ছাড়া কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু একই বিষয়ের উপর পরস্পর-বিরোধী দুটি সিদ্ধান্ত মাথায় নিয়ে সুস্থ মানুষের পক্ষে যেহেতু সুস্থভাবে বিচরণ করা অসম্ভব, তাই আর-একবার এই আলোচনার সূত্রপাত। অবশ্যই প্রসঙ্গটি পুরনো; তাত্ত্বিক আলোচনাও হাতে-কলমে করে দেখানোর প্রচেষ্টা বহুকাল আগে থেকেই শুরু হয়েছে; কিন্তু শেষ কথা এখনও বলা হয় নি— হয়তো কোনোদিনই বলা যাবে না। তবু মাঝে মাঝেই প্রসঙ্গটির অবতারণা প্রয়োজন, আত্মসমীক্ষার তাগিদে। অন্যথায় নাট্য-আন্দোলনের শরিকদের দিক্‌ভ্রষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা এবং তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হব আমরা—অর্থাৎ দেশবাসী তথা দর্শককুল।

বাঙলাদেশে কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নেই: বাঙলা নাট্যজগতে তত্ত্বে ও কর্মে এই মতের মূল প্রবক্তা যাঁরা, তাঁরা কিন্তু কেউ উটকো নন; হঠাৎ খেয়ালের বশে তাঁরা নাটক করতে আসেন নি। খোঁজ নিলে দেখা যাবে কেউ এসেছেন গণনাট্যের মঞ্চ থেকে, কেউ বা সরাসরি রাজনীতি অথবা রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত অন্য কোনো সংগঠন থেকে। চিন্তাগতভাবে রাজনীতি-বিবর্জিত তাঁরা কোনোদিনই ছিলেন না; আমার বিশ্বাস— আজও নেই। তবে কেন তাঁদের নাট্যকর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে দর্শকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে, বাঙলাদেশে কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নেই? অতীতের দিকে তাকালে মনে হয় এ-প্রশ্নের একটা উত্তর মিলতে পারে।

গণনাট্য আন্দোলনের একটা যুগে এটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, শিল্প ও সমাজের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিষয়ে পূর্ণ সচেতনা নিয়ে যে-আন্দোলন শুরু

হয়েছিল, তা থেকে যেন আন্দোলনের বিচ্যুতি ঘটেছে। গণনাট্যকে মুখ্যত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে না দেখে, তাকে সরাসরি রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে। প্রচারে আপত্তি ছিল না। 'নবান্ন' নাটকে প্রচার করা হয়নি? তেতাল্লিশের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে মানুষের করুণ কাহিনী বিবৃত করেই তো 'নবান্ন' থেমে থাকেনি, চিৎকার করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে: তোমরা ভাখো. চিনে রাখো—এদের লালসা, এদের শয়তানিই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বাঙালীর অপমৃত্যুর কারণ। ঘৃণা জাগানো হয়েছে সমাজের পরগাছাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বক্তৃতা দিয়ে নয়, দুঃখ-বেদনা-স্নেহ-ভালোবাসা-নীচতা-মহত্ব—সব নিয়ে যে গোটা মানুষগুলো—তাদের কাহিনীর মধ্য দিয়ে। উদ্দেশ্য কি সফল হয়নি? কেউ অস্বীকার করবে? হাজারটা বক্তৃতায় যে-কাজ হয়নি, এক 'নবান্ন' সেই কাজে সফলতার গৌরব অর্জন করেছিল।

এমন প্রচারে সেদিন কারুরই আপত্তি ছিল না। আপত্তি হল, যখন ব্যক্তিমানুষের কথা বাদ দিয়ে বৃহত্তর সমাজের ধুয়া তুলে সংস্কৃতির নামে ছল-চাতুরি শুরু হল। রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন গণনাট্য-কর্মীদের একাংশের উৎসাহ উদ্দীপনা শ্রদ্ধার্হ, কিন্তু তাঁরা যখন নাটককে পিছনে সরিয়ে রাজনীতিকে বড় আসন দিতে চাইলেন, তখনই শুরু হল অপরাংশের প্রতিক্রিয়া। কেন হবে না? নাটক দুর্বল হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু বক্তব্য বলিষ্ঠ হওয়া চাই; শ্রমিক-চরিত্র হলেই তাকে প্রায় দেবতার আসনে বসাতে হবে; পাত্র-পাত্রীরা হবে এক-একটি রাজনৈতিক মতের প্রতিভূ; এবং বক্তব্য মানে কোনো একটি পজিটিভ চরিত্রের মুখ দিয়ে রাজনৈতিক প্রস্তাবের ভাবাম্বর আবৃত্তি। তাহলে কাহিনীর কি হবে? অপ্রধান। চরিত্রের কি হবে? অপ্রধান। তথাকথিত রাজনীতির ভূত যখন একাংশের ঘাড়ে চেপে বসল, তখনই দেখলাম 'নবান্ন'র প্রধান সমাদারেরা ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগলেন। এ বিষয়ে সময়ে হস্তক্ষেপ করে গণনাট্য আন্দোলনকে একটি সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারতেন যাঁরা, তাঁরাও তা করে উঠতে পারলেন না। গণনাট্য-মঞ্চে শুধুই রাজনীতির দাপাদাপির প্রতিক্রিয়ায় অন্য চিন্তা বাইরে এসে অন্য কর্মে লিপ্ত হল।

সে যুগে গণনাট্য-মঞ্চের বাইরে ভালো নাটক কম হয় নি। কিন্তু অচিরেই এটা লক্ষ্য করা গেল যে, নাটকে ব্যক্তিমানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার নাম করে একদল নাট্যকর্মী একেবারে উল্টো মুখে যাত্রা শুরু করেছেন; এবং এমন

সময় এল, যখন—এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা গণনাট্য-মঞ্চের বাইরে এসে বাঙলা নাট্যকর্মে এক সুস্থ ধারার প্রবর্তন করতে চাইছিলেন—তাঁদের পিছনে ফেলে এ-ক্ষেত্রেও অক্ষমতার অগ্রগমন শুরু হয়েছে। এঁদের "ব্যক্তি" বর্তমানে প্রায় সমাজ-নিরপেক্ষ। নাটকে রাজনীতির গন্ধ পেলে তাঁদের মত—ওটা তাহলে নাটকই নয়। অতিরিক্ত রাজনীতির প্রতিক্রিয়া কি না, জানি না ; কিন্তু এই অরাজনীতিকতার পিছনে অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থ গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

সুতরাং সেদিন যাঁরা গণনাট্য তথা অপেশাদার নাট্যকর্মকে বদ্ধ জলা থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আজ তাঁরা পিছিয়ে পড়লে সকলেরই সমূহ ক্ষতি। আপনাদেরই দায়িত্ব সেদিনের সেই বক্তব্যকে জোরের সঙ্গে দর্শকের সামনে উপস্থিত করা। অন্যথায় নাট্যপ্রয়াস দিক্‌ভ্রষ্ট হতে পারে।

আর-এক কথা। বর্তমানের এ-অরাজনীতিকতার অতি-উৎসাহী সমর্থক কারা, তা চোখ মেললেই দেখা যায়। "রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায়" নিজেদের প্রগতিশীল বলতে যাঁদের আপত্তি নেই, তাঁরা একটু তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে হয়তো লাভবান হবেন। দর্শকও অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবে।

বাঙলাদেশে রাজনীতি ছাড়া কোনো সমস্যা নেই—এও এক ধরণের প্রতিক্রিয়া। ক্রমশ এটা যখন স্পষ্ট হতে লাগল যে, নাটকে ব্যক্তি-সত্তাকে প্রকাশ করার নামে একটি অংশ নির্দিষ্টভাবে 'সমাজ-নিরপেক্ষতা'র দিকে যাত্রা শুরু করেছে ; রাজনীতিই সব নয়, এই কথা বলতে বলতে—রাজনীতি কিছুই নয়, এই কথা বেরিয়ে আসছে ; তখন সঙ্গত কারণেই এর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য একদল কর্মী সচেষ্ট হলেন। কিন্তু যেহেতু সমাজ ও ব্যক্তি, নাটক তথা শিল্প ও রাজনীতির পরস্পর-সম্পর্কটি এঁদের কাছেও অস্পষ্ট ; সেহেতু এঁরাও বেতালে পা ফেলতে লাগলেন। এবং বর্তমান অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যবনিকা পতনের পর দর্শক রীতিমতো ভাবিত হন—আমি কি নাটক দেখলাম, না, মিটিং শুনলাম। কর্মীদের মুখে সেদিনের সেইসব কথার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল—নাটক কিছু না, বক্তব্যটাই আসল। বক্তব্য মানেই সেদিনকার মতো রাজনৈতিক প্রস্তাবের ভাবান্তর-আবৃত্তি।

অরাজনীতিকতার প্রতিক্রিয়া ঠিকই ; কিন্তু এর পিছনে রাজনৈতিক দলের উস্কানি ও নির্বুদ্ধিতা যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। তবু এ-ও তো সত্যি, যাঁরা কোনো কিছুর প্রত্যাশা

না করে কোনো এক আদর্শের তাগিদে নাটকের জন্য প্রাণপাত করছেন, তাঁদেরও নিজস্বতা থাকা উচিত। উস্তানির মন-ভোলানো কথায় নিজেকে হারিয়ে বসব, দলের তথাকথিত শৃঙ্খলার কাছে আত্মসমর্পণ করে উল্টো-কীর্তন গাইতে থাকব, নিজে কিছু ভাবব না, সব ভাবনার দায় দল-নেতাদের হাতে তুলে দিয়ে পুতুলনাচের পুতুল হয়ে ঘুরে বেড়াবই—এ-বা কেমন কথা? 'নবান্ন'র কথা স্মরণ করুন না; অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

অবশ্য "সমস্যা নেই," এই যদি বক্তব্য হয়, তাহলে ভবিষ্যতটাও বলে দেওয়া যায়—আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। তাহলে কি নাটক এগোবে না? একই বৃত্তে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ানোই কি নাট্য-আন্দোলনের ভবিতব্য? দর্শক হিসাবে একথা মানতে মন চায় না. কারণ সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি যে! যাঁদের মতে সোজা কথা ঘোঁরাটে করে বলার মধ্যেই শিল্পের পরাকাষ্ঠা, দর্শকে কাছে তাঁদের নাট্য-প্রযোজনার কৃতিত্ব কিন্তু অনেক সময় কেশনা নয়। আবার যাঁরা নাট্য-প্রযোজনাকে উপলক্ষ করে দর্শককে পার্টি-প্রোগ্রাম গিলিয়ে দেবার পবিত্র দায়িত্ব পালন করছেন, ঘোঁরাটে কথার প্রতিবাদে সোজা কথা সোজা করে বলার চেষ্টায় শিল্পের সীমা ছাড়িয়ে ভালগারিটিরও আশ্রয় নিচ্ছেন—অনেক সময় ওঁদের উৎসাহ এবং সততাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাই দর্শক হিসাবে আবেদন জানাই, উপরোক্ত দুটি ধারার মধ্যে শত্রুতা ও লড়াইয়ের সম্পর্কের কথা ভুলে দুপক্ষই নিজের নিজের জায়গা থেকে আর একটু সরে আসুন। আমাদের একটু বুঝতে দিন, আপনারা একটু কম বোঝান এবং নিজেরাও একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। সাম্রাজ্যবাদের দালাল, সি-আই-এর চর, মুচলেকা, কংগ্রেসের বি-টিম—পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত এইসব বিশেষণগুলি না-হয় কিছুদিন না-ই শুনলাম। দর্শকের মতে প্রায় কেউই আপনারা অসৎ নন; তাই ওতে আমাদের উৎসাহ নেই। আমরা যা চাই, তা হল—দুই ধারাতেই আত্মসমীক্ষা শুরু হোক। যা করছি, বেশ করছি; এর বাইরে কিছু করার নেই—যারে বলবে একথা, মানুষ ন। আপনারা শিল্পী, আমাদের মতো আর পাঁচজনের থেকে আপনারা জাতে আলাদা; দেশ ও মানুষের সেবা করার অঙ্গীকার করে মাঠে নেমেছেন; সেবা ঠিকমতো হচ্ছে কি না, যাচাই করতে পারবেন না? দর্শকের বিশ্বাস, নিশ্চয় পারবেন। এবং তাহলেই নাট্য-আন্দোলনে ভেদ-বিভেদের পালা-শেষে একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

দর্শকও সেদিন একই বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী একাধিক সিদ্ধান্তের বোঝা মাথায় বয়ে বেড়ানোর বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবে।

রুচিগঠনের পক্ষে

একবার কল্পনা করুন তো—সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখেন কোথাও সাড়াশব্দ নেই। রোজকার মতো জানলার ধারে এসে বসা চড়াইগুলোর কিচিমিচি, রাস্তা থেকে ভেসে আসা রিকশার ঠুংঠাং, মোটরগাড়ির গোঁ গোঁ শব্দ, ফিরিওয়ালাদের নানা বিচিত্র সুরেলা ডাক, পাশের বাড়ির বাচ্চা কুকুরটার ঘেউ ঘেউ, সদ্য জাগা শিশুর কান্না, রেডিয়ো-পরিবেশিত প্রভাতী রাগের কয়েকটি কলি, খাবার ঘর থেকে ভেসে আসা গৃহিণীর চুড়ির ঠনঠন শব্দ— আর পেয়ালা-চামচের সুমধুর টুংটাং শব্দ— কোথাও কিছু নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। ব্যাপারটা যে মোটেই সুখকর হবে না এ-কথা কাউকে বলে দিতে হবে না।

রোজকার জীবনে এই যে নানা বিচিত্র শব্দ ও স্বর আমাদের ঘিরে রেখেছে, কান এরই ভেতর থেকে সঙ্গতি খুঁজে বার করে এবং সব মিলিয়ে একটা হার্মনি, যাকে বাঙলায় বলা যেতে পারে সুস্বনতা, অজান্তেই আমাদের মর্মে গিয়ে পশে। সমস্ত ব্যাপারটা এত সহজ ও স্বাভাবিক যে এ-সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই। কিন্তু একবার এর ব্যতিক্রম হলেই জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ছন্দটাই যেন নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ তখন হাঁপিয়ে ওঠে। বাইরের কোলাহল থেকে হঠাৎ চারদিক-বন্ধ-করা এয়ারকণ্ডিশণ্ড ঘরে ঢুকলে প্রথমটা যেমন হয়। এই নিঃশব্দ, শুষ্ক আবহাওয়ায় স্নায়ুগুলি যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আপাতবিরোধী অসংখ্য শব্দ ও স্বর থেকে সঙ্গতি খুঁজে বার করার কাজে কানের প্রধান শরিক হল মন। কান যদি হয় টেপরেকর্ডার—সবরকম শব্দ যেখানে ধরা পড়ছে, মন হল শিল্পী—ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকুই শুধু গ্রহণ করছে; তারপর তাই দিয়ে মালা গাঁথছে হার্মনির, সুরসঙ্গতির। মনের মণি-কোঠায় পলে পলে এই হার্মনি জমা হচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটছে আমাদের অবচেতনে। এই যে শব্দের সঙ্গে শব্দ গেঁথে নিঃশব্দে সুরের মালা তৈরি হচ্ছে মনের গহনে, সঙ্গীত তারই প্রতিধ্বনি।

সঙ্গীতসৃষ্টি সকলের ক্ষমতায় কুলোয় না। কারুর কারুর মনে নানান সুরের

ও ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, তখন তাকে সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে প্রকাশ না করে তাঁরা পারেন না। এঁরাই সুরকার, শিল্পী। মনের আবেগ এঁরা সুরের জাল বুনে হালকা করেন। কেউ গানের মাধ্যমে, কেউ বা যন্ত্রের সাহায্যে।

সঙ্গীত-রচনার ক্ষমতা স্বল্পসংখ্যক লোকের থাকলেও, সঙ্গীতের মাধুর্য উপভোগ করবার ক্ষমতা সকলেরই আছে; গান-বাজনা ভালো লাগাটাই সুস্থ মনের লক্ষণ। যদি কারুর তা না লাগে, তবে বুঝতে হবে কোথাও গলদ আছে। কথায় বলে, গান যে ভালো না বাসে সে অনায়াসে মানুষ খুন করতে পারে। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। অতএব শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে একেবারে ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের সঙ্গীতে দীক্ষা দেওয়া দরকার। এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তারা সাড়া দেবে এবং তাদের মনে একটা স্থৈর্য আসবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের রুচি ও সৌন্দর্য-বোধও উন্নত হবে। আগেই বলেছি সঙ্গীতসৃষ্টির প্রতিভা সকলের থাকে না। তেমনি থাকে না গাইবার বা বাজাবার ক্ষমতা। এতো হামেশাই দেখা যায় যে একই পরিবারের ৩।৪ টি ছেলেমেয়ের মধ্যে হয়তো একটি বা দুটি গাইতে বাজাতে পারে। কিন্তু তাই বলে বাকি ক-জনার যে সঙ্গীতে অনুরাগ নেই এমন নয়। শুধু তাই নয়, এদের গাইবার বা বাজাবার ইচ্ছেও হয়তো পুরোমাত্রায় থাকে, কিন্তু তুলনামূলক বিচারে ক্রমাগত বিরূপ সমালোচনা শুনে শুনে শেষটায় এরা পেছিয়ে পড়ে। নিজে গাইতে বা বাজাতে না পারলেই যে সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গান-বাজনা শোনার এবং উপভোগ করবার ক্ষমতা সকলেরই অল্পবিস্তর আছে। মানুষের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে যদি সঙ্গীতের কোনো প্রভাব থেকে থাকে, তবে সেটা মুখ্যত সঙ্গীত উপভোগ করার উপরেই বেশি নির্ভর করে, গাইতে বা বাজাতে জানার উপর নয়। সুতরাং সঙ্গীতচর্চা শুধু গাইয়ে বাজিয়েদেরই একচেটিয়া নয়। সঙ্গীতরসিক শ্রোতার ভূমিকাও এ-ব্যাপারে সমান উল্লেখ-যোগ্য। আর দশটা জিনিসের মতো বিজ্ঞানের দৌলতে সঙ্গীতচর্চাও এখন সহজ ও অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সঙ্গীতচর্চা বলতে অবশ্য শোনা এবং উপভোগ করার কথাই বলছি। রেডিয়ো মারফৎ লক্ষ লক্ষ লোক এখন সঙ্গীত উপভোগ করছে। এছাড়া আছে সিনেমা। বলতে গেলে আজকের দিনে সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা প্রধানত সিনেমার দৌলতেই। কিন্তু সর্বপ্রথম

যার জন্ত সঙ্গীত জনসাধারণের উপভোগের সামগ্রী হতে পেরেছিল, সে হল গ্রামোফোন রেকর্ড। সে আমলে বলা হত কলের গান। রেডিয়ো এবং সিনেমার তখনো তেমন চল হয়নি। রেকর্ড বাজালে লোকের ভিড় লেগে যেত। নাম-করা গাইয়ে বাজিয়েদের রেকর্ড সবাই শুনতে পাচ্ছে—এ কম কথা নয়। এমনিতে এইসব শিল্পীদের গান বা বাজনা শোনার ভাগ্য ক-জনেরই বা ছিল। তখনকার দিনে, সেই চোঙাওয়ালা গ্রামোফোন (বা ফোনোগ্রাফ) আর ২।১ মিনিটমাত্র বাজাবার মতো রেকর্ডই আসর মাৎ করে রেখেছিল। তারপর ধীরে ধীরে রেডিয়ো এবং সিনেমা এসে গ্রামোফোন রেকর্ডের জনপ্রিয়তার অনেকখানি দখল করে বসল। এর ফলে সাধারণভাবে দেখতে গেলে সঙ্গীত জিনিসটা আরো বেশি জনপ্রিয় হল বটে, কিন্তু লোকের ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা যে আগের তুলনায় অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এখন তো সবই 'রেডি-মেড'-এর যুগ। সুতরাং নিজের পছন্দ-অপছন্দ, রুচি—এসবের বিশেষ বালাই নেই। যখন যা পাওয়া যাচ্ছে, সবাই সেটাকেই দুহাতে গ্রহণ করছে। এতে ফল হচ্ছে এই যে ক্রমে লোকের বিচারবোধটাই ভোঁতা হয়ে আসছে। হয়তো আজকের ম্যাস্ প্রডাক্সান-এর যুগে এ-ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু রসিক মন এটা মানতে চায় না।

রেডিয়ো সিনেমার জয়জয়কার সত্বেও রেকর্ডসঙ্গীতের চাহিদা কিন্তু কমেনি। সৌভাগ্যের বিষয় এখনো এমন অনেকেই আছেন যাঁরা পররুচির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি। এঁরা জানেন যে এইভাবে নিজেদের রুচিকে জলাঞ্জলি দিলে অচিরেই দেশের শিল্প-সংস্কৃতির অপমৃত্যু অনিবার্য। এ-যুগের ছেলে-মেয়েদের দিশেহারা রুচিই তার প্রমাণ। অথচ বড় বড় শিল্পীর ভালো গান বা বাজনার রেকর্ড সংগ্রহ করে বাড়িতে বসে সবাই শুনতে পারেন, বাড়ির ছেলেমেয়েদের শোনাতে পারেন। এইসব রেকর্ড শুনতে পেলে ছেলেমেয়েদের রুচি ধীরে ধীরে তৈরি হবে। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা খাঁটি কোনটা মেকি তারা বুঝতে শিখবে। অন্ধের মতো সৃষ্টিছাড়া দেশী ও বিদেশী সিনেমা ও 'পপ্' সঙ্গীত নিয়ে মেতে থাকবে না। হয়তো শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রসগ্রহণ করতে তাদের কিছুটা সময় লাগবে। অনেকের পক্ষে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মর্মে প্রবেশ করাই আদৌ সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু সহজ স্বতঃস্ফূর্ত লোকগীত, পল্লীগীতি, ভজন, কীর্তন, বাউল,

গজল, গীত বা রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান, নজরুলগীতি—এসবের রস সকলেই সহজে গ্রহণ করতে পারবে। আয়ত্তও করতে পারবে অল্প আয়াসেই। একবার যদি ছেলেমেয়েদের রুচি এদিকে মোড় নেয়, তবে আর তাদের রুচিবিকারের আশঙ্কা থাকবে না। তখন ধীরে ধীরে অনেকের পক্ষে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের মাধুর্য উপভোগ করাও সহজ হবে।

শ্রোতাদের রুচি যত উন্নত হবে—সত্যিকার ভালো, শুদ্ধ সঙ্গীতের প্রসারও হবে সেই অনুপাতে। তখন জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়ে যেসব উদ্ভট ও শস্তা গানের রেকর্ড বাজার ছেয়ে গেছে সেগুলো বন্ধ হবে।

কিন্তু নবীন-নবীনাদের রুচিবদলের এই দায়িত্ব কেবলমাত্র অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দিলে অন্যায় করা হবে। স্কুলে এবং সম্ভব হলে কলেজেও সঙ্গীত অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে থাকা উচিত। ছেলেমেয়েরা যাতে একেবারে প্রথম থেকেই ভালো, শুদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে তার জন্য স্কুল-কলেজে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। সাহিত্যের প্রকৃত রস যেমন ক্লাসিকস না পড়ে পাওয়া যায় না, তেমনি ক্লাসিক্যাল বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় না হওয়া অবধি সঙ্গীতের রসাস্বাদন পূর্ণ হতে পারে না। গান বা যন্ত্রসঙ্গীত—যার যেটা বেশি ভালো লাগে, তারই মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মূল সুরটি ধরিয়ে দিতে হবে। এ জন্য একদিকে যেমন বাছাই করা রেকর্ডের সাহায্য নেওয়া চলবে, তেমনি ভালো সঙ্গীতশিক্ষকের তালিমেরও প্রয়োজন হবে।

সুভাষ সেন

পুস্তক-পরিচয়

নাট্যশাস্ত্র

The Natyaśastra : A Treatise on ancient Indian Dramaturgy and Histrionics ascribed to Bharata-Muni, translated and edited by Dr. Manomohan Ghosh.

Vol. 1 (Chapters 1-XXXVII) : Manisha Granthalaya Calcutta 12 : Price Rs. 40 and Rs. 60.

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে এই অতি মূল্যবান অবদানের জন্য সুধী-সমাজ ডঃ মনোমোহন ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। তিনি যে রকম অসীম ধৈর্য ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে 'নাট্যশাস্ত্র'র সটীক সংস্করণ সম্পাদনা ক'রে সুপাঠ্য ইংরেজি অনুবাদ বৃহত্তর পাঠকসমাজকে উপহার দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড (২৮-৩৬শ অধ্যায়) ডঃ ঘোষের দ্বারা সম্পাদিত ও অনূদিত হয়ে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। মূলপাঠ প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, অনুবাদ ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে।

বর্তমান সম্পাদকের আলোচনা অবশ্য শুধু প্রথম খণ্ডের পাঠ ও অনুবাদে সীমাবদ্ধ। অতীতে যেসব নিষ্ঠাবান গবেষক নাট্যশাস্ত্র-চর্চায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, ডঃ মনোমোহন ঘোষ সেই গৌরবময় ঐতিহ্যেরই উত্তরসাধক। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম সম্পূর্ণ পাঠ প্রকাশ করেন পণ্ডিত শিবদত্ত এবং পণ্ডিত কাশীনাথ পাণ্ডুরং। এটি 'কাব্যমালা' সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পোল রেনো (Paul Regnaud)-এর ছাত্র জে. গ্রসে (J. Grosset) লিয়ঁ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'নাট্যশাস্ত্র'র প্রথম চতুর্দশ অধ্যায়ের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তারপর প্রকাশিত হয় এম. আর. কবি-র সম্পাদনায় বরদা সংস্করণ (১৯৩৬-৬৪ খ্রী.)।

এছাড়া বারাণসী থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থমালায় আমরা 'নাট্যশাস্ত্র'র অল্প-বিস্তর পূর্ণাঙ্গ পাঠ পাই। এইসব প্রচলিত পাঠের

ভিত্তিতে এবং আরো অনেক পাণ্ডুলিপির সাহায্যে ডঃ ঘোষ এই নির্ভরযোগ্য সংস্করণটি সম্পাদনা করেছেন, যদিও তিনি কোথাও দাবি করেন নি যে এই পাঠই চূড়ান্ত।

মূল পাঠ এবং অনুবাদ, দুটি খণ্ডেই সম্পাদকের বিস্তৃত ভূমিকা আছে। বিষয় সমূহের সাযুজ্যের জন্য আমরা দুটি ভূমিকাকে এক সঙ্গে আলোচনা করব। ডঃ ঘোষ সংস্কৃত এবং গ্রীক নাটকের পার্থক্য বিষয়ে ঠিকই বলেছেন যে গ্রীক নাটক যেহেতু "জীবন এবং ঘটনার অনুকরণ", সেজন্য এর প্রধান লক্ষ্য প্লটের বিবর্তন। বাইরের অঙ্গসজ্জা ও প্রসাধনের ওপর স্বভাবতই এখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। মুখোশ ব্যবহারের রীতি থেকে এটা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় : আঙ্গিক-প্রসাধন এখানে অসুবিধাজনক। ভারতীয় নাটকে প্লটকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হলেও দৃশ্য উপস্থাপনার দিকে অধিকতর প্রবণতা দেখতে পাই : নৃত্য, সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন, মুখভঙ্গি প্রভৃতি সব কিছুই নাট্য উপস্থাপনায় অপরিহার্য। গঠনশৈলির দিকেও বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক নাটক প্রথমত ও প্রধানত সাহিত্যসৃষ্টি—'কথা' এখানে অপরিহার্য উপকরণ। অন্যদিকে সংস্কৃত নাটকে সংলাপ ছাড়াও অঙ্গভঙ্গি, বাদ্য সঞ্চালন, নৃত্য এবং সঙ্গীত সব কিছুরই সমান উপযোগিতা আছে। এইসব নাটকীয় অভিব্যক্তির বিবিধ উপকরণ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় 'নাট্যশাস্ত্র'-এ, যাতে ক'রে দেবগণ-দেবযোনি অথবা মানুষের জীবনের ঘটনাবলীর নাটকীয় 'অনুকরণ' দর্শকের কাছে 'দৃশ্যকাব্য' হয়ে ওঠে। সেই কারণেই দেখতে পাই সব শিল্পকর্মের মতো এখানেও বাস্তবের রূপণে অনেক বেশি স্বাধীনতা—মঞ্চসজ্জার বহুবিধ রীতি-নীতি। কেননা বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়, মূক বাস্তবের ব্যঞ্জনাময় রূপান্তরই তার লক্ষ্য। সামগ্রিক ভাবাবেশ (ইউনিটি অফ ইম্প্রেশন) ছাড়া সংস্কৃত নাটকে স্থান-কালের ঐক্যের কৃত্রিমতা নেই। এই সাহিত্যে নাটক স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে চলে—ঘটনা নাটকের ধারাকে অনুসরণ ক'রে কখনো ধীরভাবে কখনো দ্রুততালে অগ্রসর হয়।

সুতরাং সংস্কৃত নাটক কেবল শ্রব্য সংলাপ মাত্র নয়—তার অতিরিক্ত আরো কিছু। এটা দৃশ্যকাব্যও বটে। এই দৃশ্যকাব্যে জীবনের সব দিকেরই প্রকাশ ঘটে—কোনো কঠোর শ্রেণীবিভাগ এখানে সম্ভব নয়। দর্শকেরা এখানে সবই পান : আমোদ-প্রমোদ, হিতকথা, শোকে সান্ত্বনা, শিক্ষা এবং জ্ঞান। দর্শকের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা শুধু নাটকের সফল অভিনয় দর্শনেই

সন্তুষ্ট নন—তাঁরা নাটকীয় উপভোগ্যতার ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনাতেও উৎসাহী। 'নাট্যশাস্ত্র'-এ নাটক উপভোগের মনস্তাত্ত্বিক রূপ সম্পর্কেও আলোচনা আছে। ফলে বহু ভাষ্যকার সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের জটিলতা নিয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন।

দশ ধরনের নাটকের গঠন ও শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে সম্পাদকের ভূমিকাতে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আছে। এখানে তার সারাংশ দেয়া নিষ্প্রয়োজন।

'নাট্যশাস্ত্র'র কালনির্ণয় প্রসঙ্গে ডঃ ঘোষ অনেকগুলি যুক্তি উপস্থিত করেছেন। তিনি অবশ্য নিজেই স্বীকার করেছেন যে, "taken individually the different data may not be considered strong enough to warrant any definite conclusion." আমাদের ধারণা সামগ্রিকভাবেও সেগুলি খুব গ্রহণযোগ্য নয়। অনেকের মনে হতে পারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তও অজ্ঞাতসারে এই বিতর্কের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তকে সিদ্ধান্ত না ব'লে বরং বলা যায় প্রমাণসাপেক্ষ অনুমান। তার মানে এই নয় যে আরো যুক্তিগ্রাহ্য কোনো তারিখ আমাদের জানা আছে—তবে ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ তারিখটি হলেও হতে পারে। আমাদের বিনীত মত এই যে, 'নাট্যশাস্ত্র' জাতীয় কোষগ্রন্থ যখন পূর্বলিখিত রচনাবলীর ওপর অনেকটা নির্ভর এবং পরেও যখন এতে অনেক সংযোজন ও প্রক্ষেপ ঘটেছে, তখন নির্ভুলভাবে এর কালনির্ণয় অসম্ভব।

পরিশেষে বলব ডঃ মনোমোহন ঘোষের সম্পাদিত গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রচর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই অনুবাদ আমাদের মূল পাঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন করে, আর সেই সঙ্গে আমরা পাই প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের নিদর্শন—যার সৃষ্টিশীলতার প্রমাণ 'নাট্যশাস্ত্র' জাতীয় গ্রন্থ।

আর. খাতোয়ান

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাক-সোভিয়েত অস্ত্রবিক্রয় চুক্তি

সোভিয়েত সরকার পাকিস্তানকে কিছু অস্ত্রবিক্রয় করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের পূর্ণ বয়ান বা প্রাসঙ্গিক বিস্তৃত বিবরণ এখনো এদেশে এসে পৌঁছয়নি। শুধু জানা গেছে—এই অস্ত্রবিক্রয়ের চুক্তি কোনো বৃহদাকার চুক্তি নয়। এই চুক্তিকে দীর্ঘস্থায়ী মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টাও এখনো পর্যন্ত করা হয়নি। তথাপি সঙ্গত কারণেই সোভিয়েতের এই সিদ্ধান্ত আমাদের উপমহাদেশে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এবং অনেকের মনেই অস্বস্তির কারণও ঘটিয়েছে। কারুর কারুর ক্ষেত্রে এই অস্বস্তি আন্তরিক। কিন্তু বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই তা কৃত্রিম। কৃত্রিম বলছি এই কারণে যে—চুক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত না হয়ে, এর কার্যকারণ সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তা না করে, অনেকেই তারপরে সোভিয়েত-বিরোধী শ্লোগান দেওয়া শুরু করেছেন। স্বভাবতই এঁদের পুরোভাগে রয়েছেন জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি আর কংগ্রেসের ভেতর লুকিয়ে থাকা কিছু জনসংঘী বা স্বতন্ত্রী সদস্য। এঁদের দেশপ্রেম প্রবল সন্দেহ নেই! কিন্তু ১৯৬৫ সালে যখন এঁদের পরম বন্ধু আমেরিকার প্যাটন ট্যাঙ্কের ঘায়ে ভারতীয় জওয়ানরা নিহত হচ্ছিলেন এবং যখন আমেরিকান সেবার জেট-বিমান ভারতীয় গ্রামে আগুন ঝরাচ্ছিল, তখন বোধহয় গভীর দেশপ্রেমেই এঁরা আমেরিকা সম্পর্কে চুপ করে ছিলেন। ফ্রান্স পাকিস্তানকে বিমান সাহায্য দিলো। একথা জেনেও কিন্তু দিল্লী বা কলকাতায় ফরাসী দূতাবাস কি কন্‌স্যুলেটের সামনে এঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন নি। আর সোভিয়েত পাকিস্তানকে কিছু অস্ত্র বিক্রয় করবে শুনেই (তাও দান নয়) এঁরা দেশময় সোভিয়েত-বিরোধী বিক্ষোভের প্লাবন বইয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বুঝতে কষ্ট হয় না এই চেঁচামেচি রীতিমতো উদ্দেশ্যমূলক। ভারত সোভিয়েত মৈত্রীর মূলে আঘাত করবার এবং তারও আড়ালে এদেশের প্রগতিশীল শক্তিকে বিধ্বস্ত করবার জন্য দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র দীর্ঘকাল ধরে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী—১৯৬৫ সালে পাক-ভারত

সংঘর্ষে ভারতকে সোভিয়েতের একনিষ্ঠ সমর্থন, কাশ্মীরের ব্যাপারে পূর্বাপর একই বক্তব্য বজায় রাখা ; ভারতকে সামরিক ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জামের সাহায্য এবং সর্বোপরি ভারতকে অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে বাঁচানোর জন্ত সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েতের বিপুল পরিমাণ সাহায্য —এই সমস্ত চক্রান্তকারীদের মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। পাকিস্তানকে সোভিয়েতের অস্ত্রবিক্রয়ের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত এই সমস্ত কেঁচোদের তাই সাপের মতো ফণা তুলে ধরতে উৎসাহিত করছে। এ-ব্যাপারে ভারতবর্ষের দক্ষিণপন্থী জোট কতটা ঐক্যবদ্ধ, তার প্রমাণ সম্প্রতি লোকসভার বিতর্কে পাওয়া গেছে। স্বতন্ত্র সদস্য শ্রীপিলু মোদী এক প্রস্তাবে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং জোট-নিরপেক্ষতার নীতি বাতিল করার জন্য প্রস্তাব এনেছিলেন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করতে উঠে কংগ্রেসী সদস্য শ্রীআবিদ আলী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করতে বলেন। কেননা তাঁর মতে এই হবে নাকি সোভিয়েতের আচরণের যোগ্য জবাব। এঁদের চিনতে কোনো অসুবিধে নেই। কেননা এই জোট সংঘবদ্ধ ভাবে দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলকে এঁদের সঙ্গে গলা মেলাতে দেখে রীতিমতো দুঃখ হয়।

লোকসভায় কমিউনিস্ট নেতা এস. এ. ডাঙ্গে এই সম্পর্কিত বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। ডাঙ্গে বলেছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায় নি, কিন্তু পাকিস্তান সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ, পাকিস্তানেরও সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা অনেকটা বদলেছে। বেশ কিছুদিন ধরেই পাকিস্তানের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। প্রথম বরফ গলে বোধহয় ১৯৬০ সালে 'ইউ-টু'র চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর। তখন থেকেই রাওয়ালপিণ্ডিতে একটা ধারণা জন্মেছিল যে আমেরিকার নাগপাশে বোধহয় বড্ডবেশি জড়িয়ে পড়া হচ্ছে। তাছাড়া ক্রমেই সোভিয়েতের আণবিক শক্তি ও রকেট শক্তি এতই বেড়ে গেল যে সম্ভবত তাঁরা ভাবলেন পেশোয়ারে আমেরিকান বিমান-ঘাঁটি রাখার অনুমতি দেওয়া আর নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা একই কথা। তাছাড়া তখন থেকেই এশিয়ার অন্যত্র মার্কিনী-নীতি প্রচণ্ড মার খেতে শুরু করেছে। ভিয়েতনামে

মার্কিনীদের নাকানিচোবানি খাওয়াটা পাকিস্তান লক্ষ্য করেছে আর ফরমোসাকে দিয়ে যে কমিউনিস্ট চীনকে ঘায়েল করা যায় না এ সত্যও সে বুঝে ফেলেছে। অতএব স্যাটো এবং সিয়াটোর সদস্য হলেও নিজের স্বার্থেই পাকিস্তান আমেরিকা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। স্যাটোর বিরুদ্ধে তুগলের প্রকাশ্য বিদ্রোহ, ভিয়েতকংদের ঠেকানোর ক্ষেত্রে সিয়াটোর হাস্যাস্পদ ব্যর্থতা, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘাঁটি হতে জাপানের সরাসরি অস্বীকার—এ-সমস্তই আয়ুবকে ক্রমশ সাহসী করে তুলছিল। সর্বোপরি ভারত-সোভিয়েত ক্রমবর্ধমান মৈত্রী তাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করল।

প্রথম দিকটায় আয়ুব সহজ পথ হিসেবে পিকিং-এর সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টা করলেন। এটাই তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ বলে তখন মনে হয়েছিল। প্রথমত বোধহয় তাঁর ধারণা ছিল মস্কোর সঙ্গে হাত মেলালে আমেরিকা যতখানি চটবে পিকিংয়ের সঙ্গে মেলালে ততখানি চটবে না। দ্বিতীয়ত ভারত-বিদ্বেষী আয়ুব চীনের ভারত-বিদ্বেষের মধ্যে নিজের মনোভঙ্গির চমৎকার মিল খুঁজে পেলেন। তার উপর তখনকার পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টোর পিকিং-প্রীতিটাও একটু বেশি ছিল। কিন্তু এ গাটছড়াও বেশিদিন টিঁকল না। পাকিস্তান বোধহয় বুঝতে পারল যে চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষকে নিকেশ করা সম্ভব নয়। আর, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে চীনা-নীতি ক্রমাগত বিধ্বস্ত হওয়ায় পাকিস্তান আর ভরসা পাচ্ছিল না। পাকিস্তান যে শিবির পাল্টাতে প্রস্তুত, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের পর থেকে। রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের আমন্ত্রণে আয়ুবের তাসখন্দ গমন এবং ভারতের সঙ্গে শান্তিচুক্তি-স্বাক্ষর এই পরিবর্তিত মনোভাবেরই ফল। মনে রাখতে হবে তাসখন্দ চুক্তি সম্পর্কে চীনের প্রচণ্ড আপত্তি ছিল, তা সত্ত্বেও পাকিস্তান এই চুক্তিতে সই দিয়েছে। তাসখন্দ-সম্মেলন এশিয়ায় সোভিয়েত কূটনীতির বিরাট জয়লাভের প্রতীক এবং এরপর থেকেই পাক-সোভিয়েত সম্পর্ক উন্নততর হচ্ছে। এরই ভিত্তিতে পাকিস্তান সম্প্রতি পেশোয়ারে আমেরিকান বিমান ঘাঁটি তুলে দিতে চেয়েছে।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। বরং আগের তুলনায় এই দুই দেশের মৈত্রী আরও দৃঢ় ও ব্যাপক হয়েছে। সোভিয়েত এই বন্ধুত্বকে কতখানি মূল্য দেয়, তার প্রমাণ এই অস্ত্রচুক্তিতে ভারতের উদ্বেগের খবরে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের আশ্বাস। কোসিগিন

আশ্বাস দিয়েছেন যে এই অস্ত্র যাতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করা হয় সেদিকে তাঁরা তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। এই আশ্বাস শূন্যগর্ভ নয়, কারণ সোভিয়েত আজ পর্যন্ত ভারতকে একটিও মিথ্যা আশ্বাস দেয় নি। পাকিস্তানের সঙ্গে অস্ত্রচুক্তি করার সময়ও কিন্তু সোভিয়েত ভারতকে প্রতিশ্রুত অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য করে আসছে। এই সাহায্যের বিস্তৃত তালিকা সম্প্রতি শ্রীভূপেশ গুপ্ত রাজ্যসভায় উপস্থিত করেছেন: তিন স্কোয়াড্রন মিগ বিমান; মিগ বিমান নির্মাণ করবার যন্ত্রপাতি; নাসিক, কোরাপুট এবং হায়দ্রাবাদে তিনটি মিগ-বিমান নির্মাণের কারখানা তৈরি; সীমান্ত অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য এম. আই. ৪ শ্রেণীর হেলিকপ্টার; সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য এ. এন. টি. শ্রেণীর ভারী বিমান; ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষে যার দ্বারা অমৃতসর শহর রক্ষা করা হয়েছিল সেই জাতীয় অসংখ্য বিমান-বিধ্বংসী কামান। এ ছাড়া সারফেস টু এয়ার মিসাইল (স্যাম) তাঁরা আমাদের দিয়েছেন, আর চারটি সাবমেরিনের অর্ডার দেওয়া হয়েছে যার একটি এসে পৌঁছেচে। সীমান্ত অঞ্চলে সংযোগ রক্ষার জন্য ভারী জিপ গাড়ি পাঠিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়াই। এছাড়া দেশরক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তেল এবং ইস্পাত শিল্পে অগ্রগতির ক্ষেত্রেও সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর কোনোটাই প্রমাণ করে না যে সোভিয়েতের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী অক্ষুণ্ণ আছে, পাক-সোভিয়েত মৈত্রী বাড়ছে। এখন প্রয়োজন ভারত-পাক মৈত্রীকে নিকলুষ ও স্থায়ী করা। উভয় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে এইটিই অন্যতম প্রধান ও জরুরি কর্তব্য। আর সে কাজে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সে-দায়িত্ব কতটা পালন করেছি বা করতে চাই—এ-সম্পর্কে আত্ম অনুসন্ধানের সময় আজ এসেছে।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

প্লাবিতের প্রতিবেদন

মেদিনীপুর পশ্চিম বাঙলার শস্যভাণ্ডার। দু-দশক আগে এই জেলায় প্রকৃতপক্ষে উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকত। ঘরে ঘরে ক্ষুধার্ত নর-নারীর কঙ্কালসার রূপ আজ নিত্য দৃশ্যময়। খরা আর বন্যা প্রতি বছরই কমবেশি কান্নার সৃষ্টি করেছে। এই বেদনাময় অবস্থার কী পরিবর্তন সম্ভব নয়?

পর পর দু-বছর জেলার সবচেয়ে সুফলা অংশ নিষ্ফলা হল। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ এই অবস্থাকে প্রকৃতির দুষ্ট লীলা বা "ভগবানের মার দুনিয়ার বার" বলে নিজেদের সান্ত্বনা দিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে এসে মানুষ কী ঐ কথা বলে কপালে করাঘাত করবে?

জেলার ৩৪টা থানার মধ্যে ২৭টায়ই লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকফাটা আর্ত কান্না কম-বেশি ধ্বনিত হচ্ছে। ক্ষয়-ক্ষতির সামগ্রিক হিসাব এখনও হয়নি। ধান ও রবি ফসল নষ্ট হয়েছে প্রায় ৫০কোটি টাকার। যদিও কৃষকের অস্থাবর সম্পদ নগণ্য, তবুও তা ছিল তাদের অনেকের সাত পুরুষের তিল তিল সঞ্চয়। তার মূল্যও কম করে ৫০ কোটি টাকা হবে। আর যেসব বাড়ি পড়েছে, ভেঙেছে, ডুবেছে—তার মূল্য ২০০ কোটি টাকার কম নয়। অঙ্কটা আনুমানিক হলেও হিসেবটা খুববেশি অসত্য নয়। এই ক্ষয়-ক্ষতি অবশ্য অপূরণীয় নয়। কিন্তু যে শ্রমশক্তি ব্যয়িত ও রক্ত-ঘর্ম ক্ষরিত হয়েছে, তার মূল্য কী কেউ হিসেবে নেবে?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ-জেলার বন্যা-নিরোধ কী অসম্ভব? যুক্তফ্রন্ট সরকার স্বল্পকালীন শাসনব্যবস্থা-পরিচালনা-কালে এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটা পরিকল্পনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এ-সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যয় স্বরূপ ৬৩ লক্ষ টাকার অনুমোদনও তাঁরা পান। তাছাড়া চলতি বাজেট থেকে ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। জেলার বিধানসভার কমিউনিস্ট সদস্যগণ এ-ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন।

বর্তমান যুগে নদী-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য চতুর্বিধ: ১। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ২। সেচ-প্রকল্প গঠন ৩। বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ৪। জল পরিবহন।

এই ধরনের প্রকল্প সংগঠন জন-জীবন পুনর্গঠনের বিশেষ সহায়ক শুধু নয়, অনেক পরিমাণে নিয়ামকও বটে। আজকের মানুষ ৫।৭ হাজার বছর আগেকার মতো অসহায় নয়। প্রকৃতির অন্ধের রূপ অনেকখানিই তার জ্ঞানের পরিধির

মধ্যে ধরা পড়েছে। অপরাজেয় প্রকৃতি মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে আজ দাস্যবৃত্তি করছে। বিজ্ঞানের অপরিমেয় দানে স্রষ্টা মানুষ বিশ্বকে নিজের মনের মতো করে ভাঙছে গড়ছে। সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম অগ্রগতি তাকে মন্ত্রমুগ্ধতা থেকে মুক্ত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকময় পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মানুষ আজ 'বিশ্বকর্মা'! শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির মহিমময় সাধনায় বিশ্বের রূপ-রহস্যের অর্গল সে ক্রমাগত খুলে চলেছে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দী এ-বিষয়ে প্রতিদিনই নব নব বিস্ময়কর আবিষ্কারে যেন প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। মহাকাশও সে বিজয় করেছে।

আর সেই যুগে আমরা অসহায়ের মতো বন্যার তাণ্ডবে ডুবছি, ভাসছি, মরছি; খরার দাহনে তৃষ্ণার জলটুকুও দুষ্প্রাপ্য! কংগ্রেস সরকার পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ করেছেন। ব্যয়িত হয়েছে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্পে টাকাও খরচ হয়েছে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশী সমস্যা সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়ে থেকেছে। কিন্তু কেন? জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের মৌল সমস্যাগুলির অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও কেন আমাদের শাসকগোষ্ঠী মুখে সমাজতন্ত্রের বাগাড়ম্বর করে এ বিষয়ে উদাসীন থেকেছেন?

জাতীয় জীবন পুর্গঠন সমস্যার সমাধানকল্পে পুঁজিবাদের নিজস্ব একটা পথ ও চিন্তা আছে। এ পথ কৃষি ও শিল্পের অসমান বিকাশের পথ। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধি ও মুনাফা স্ফীত হয়। কিন্তু কৃষির সমৃদ্ধি না হলে তার পণ্যের বাজার যে সীমায়িত থেকে যায় এবং কালে তা ধন-তন্ত্রের সঙ্কট সৃষ্টির অন্যতম কারণ হয়—এটা বুঝেও সে কৃষির সমৃদ্ধি সম্পর্কে উদাসীন থাকে!

কিন্তু এ-কথাও ঠিক নয়। সেও কৃষির সমৃদ্ধি চায়। কিন্তু সেটা তার নিজস্ব পথে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির মালিকানা নয়, বৃহৎ বৃহৎ খামারে যন্ত্রায়িত কৃষি-উৎপাদনই তার কাম্য। কোটি কোটি কৃষক জমি থেকে উৎসাদিত হয়ে দিনমজুর রূপে প্রত্যহ তার কাছে শ্রমশক্তি বিক্রয় করবে—এ-ধরনের ব্যবস্থায় তার উৎসাহ। কিন্তু ভারতে মার্কিন মুলুকের মতো এ-পথ অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই এই ব্যাপারে তার উদাসীনতা দৃশ্যমান হয়ে পড়েছে।

যাক, এ-প্রশ্ন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ-নিবন্ধে সম্ভব নয়। মূল আলোচনা বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব কিনা? অথবা "ভগবানের মার দুনিয়ার বার" বলে

শাসককুলের প্রচারণায় আমরা শুধু "হায় ভগবান বলে" কপালে করাঘাত করে দিন কাটাব ?

মেদিনীপুর জেলায় বন্যা প্রধানত তিনটি নদী থেকেই হয়—কংসাবতী, শিলাবতী ও কেলেঘাই। তার সঙ্গে সম্পর্কিত একদিকে রূপনারায়ণ ও অপর দিকে সুবর্ণরেখা। এই সঙ্গে কতকগুলো খাল ও বেসিন আছে—কপালেশ্বরী, চণ্ডিয়া, ভস্‌রা, কাকমতী, তমাল, কুবাই, পারাং, কাঠিয়া, বাগুই প্রভৃতি খাল ও দুবদা, খাগদা ও জগরা বেসিন আর বার-চৌকার জলা। তার সঙ্গে আরও একটা সমস্যা ময়না থানা। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপটি এই প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া নদী ও সেচ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের চিন্তা-সমন্বয়ে এই পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। এই ব্যাপারে আমার নিজের মতামত সুধী সমাজের নিকট গ্রহণীয় হবে না। তবু লিখছি দীর্ঘ চার দশক ধরে রাজনৈতিক কর্মীরূপে সমগ্র জেলায় বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি বলে। অনেক দেখেছি, শুনেছিও অনেক কথা। এই দেখাশোনা ও সামান্য কিছু লেখাপড়ার ফলে আমার বক্তব্য বোধহয় বিশেষজ্ঞদের নিকট ভাবনার কিছুটা খোরাক দিতে পারবে।

প্রথমত, একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে গঙ্গা ও রূপনারায়ণ সংস্কার-জনিত সমস্যার সমাধান না করে, এ জেলার বন্যা-নিয়ন্ত্রণের মৌল সমাধান সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, নদীপ্রকল্প পরিকল্পনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ অত্যন্ত জরুরি। যে সকল জলাধার সৃষ্টি করে সেচপ্রকল্প সংগঠিত করা হয়েছে, তার সমুন্নতি ও বিস্তৃতি-সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ—এই দুই সমস্যার সমাধানের জন্য যদি একীভূত প্রকল্প না করা হয়, তাহলে সমস্যা সমাধান "দূর অস্ত্" হয়ে থাকবে।

যে নদীগুলি এ-জেলার বন্যার মূল কারণ, এখন সে-সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক।

কাঁসাই ও কংসাবতী

কাঁসাই প্রকল্প কয়েক বছর ধরে গড়ে উঠেছে। এবং আজও কাজ চলছে। এর পরিসমাপ্তির অনাগত দিন অপেক্ষমান। কাঁসাই ও কুমারী যমজ ভাই-বোন। একজন বন্দিনী হলেও অপরজন ধরায় বিশুষ্কা ; বর্ষণ সমাগমে ষোড়শী কন্যার উদ্দাম কামনায় চঞ্চল উচ্ছলা। সেই কুমারীকে যদি জলাধারে

ধরে রাখার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে তার জলপ্রবাহের উচ্ছলতা নদীর দুকূলকে ভাসাবে। মানুষের আর্ত হাহাকারে দেশ ভরে উঠবে।

কাঁসাইয়ের বুক পুড়ে ধূ ধূ বালুচর। ক্রমাগত এই বালুর স্তূপ জমে উঠছে। অনেক স্থলে নদীর গর্ত একূল ওকূল দুকূলের সমান হয়ে উঠেছে। এই বালু অপসারণের ব্যবস্থা জরুরি। কারণ বালুচরের আগ্রাসন নদীর বুককে কয়েক দশকের মধ্যেই গোবি মরুভূমি করে ফেলবে, এ-সম্ভাবনা আর অমূলক নয়। এই মূল সমস্যার সঙ্গে নিম্নোক্ত সমস্যাও আছে।

ডেবরা কেশপুর সীমান্তে কপালটিকরির কাছে কংসাবতী দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। একাংশ নাড়াজোল হয়ে দাসপুর থানার মধ্য দিয়ে রূপনারায়ণে পড়েছে। অপর অংশ ডেবরা থানার লোয়াদার ধার দিয়ে পাশকুড়া বাজারের পাশ দিয়ে ময়না থানাকে, তমলুক ও মহিষাদল থানা থেকে বিভাজিত করে কেলেঘাই নদীতে সঙ্গমিত হয়ে সৃষ্টি করেছে হলদি এই নদী গঙ্গাসাগর সঙ্গমের অল্প উপরে হলদিয়াতে বন্দরের কিছু উপাদান গড়েছে।

আগেই বলেছি—কাঁসাই, শীলাই, কেলেঘাই সংস্কার শর্তসাপেক্ষ। গঙ্গা, রূপনারায়ণ ও নিম্নদামোদর সংস্কার-পরিকল্পনা ব্যতীত ঐ সংস্কার-পরিকল্পনা কার্যকরী করা অসম্ভব। আর গঙ্গা, রূপনারায়ণ, দামোদর ও কাঁসাই নদনদীর স্রোতধারার গতি যদি স্বচ্ছন্দ এবং বেগবতী না হয়, তাহলে কলকাতা বন্দরের অনুপযোগিতা হলদিয়াতেও সংক্রামিত হবে।

কাঁসাই নদীর যে স্রোতধারা নাড়াজোল হয়ে গোপীগঞ্জের নিকট রূপনারায়ণে মিলছে, সেইটিই মূল ধারা। কারণ পাশকুড়া বাজারের নিকট নির্মিত পুল কাঁসাই নদীর বর্ষণকালীন স্রোতধারা বহনে বাধাসৃষ্টি করছে। তা সত্ত্বেও ঐ স্রোতধারা যাতে মজে না যায়, তা অবশ্যই দেখতে হবে। কারণ এই ধারাটা অব্যাহত না থাকলে সদর মহকুমার জলনিকাশী ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। এবং নারায়ণগড়ের দক্ষিণ অঞ্চল, সবং থানার বৃহত্তম অংশ, পটাশপুর, ভগবানপুর ও ময়না থানা চিরপ্লাবিত অঞ্চলে পরিণত হবে।

রূপনারায়ণ নদ

এ-সম্পর্কে কয়েক বছর আগে কলকাতার একটি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। সরকারের সেচদপ্তরের কেতায় তা লাল ফিতের বন্দী হয়ে হয়তো মহাফেজখানায় চলে গিয়েছে।

তিন দশক আগেও রূপনারায়ণ, কোলাঘাট থেকে ঘাটাল পর্যন্ত স্টীমার চলাচল করত'। ঐ পথই ছিল ঘাটাল থেকে যাত্রীবহনের মুখ্য পথ। নদীর বুকে পলি জমে তার গতিপথ রুদ্ধ হয়েছে। এসেছিল লঞ্চ। সেও আর ডিসেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত চলার অবস্থায় নেই। এমন কি, বড় নৌকা চলাচলও অসম্ভব হয়ে গিয়েছে। এই নদের বাঁকাচোরা পথকে সরলীকরণ এবং নদীর বুকে জমে ওঠা চর ও পলির জমাটকে সরিয়ে না দিলে নদীর মজে যাওয়া রূপ আরও ক্ষতিকর হয়ে উঠবে।

শীলাই নদী

বগড়া কৃষ্ণনগরের উপর থেকে এই নদীর ভরাট বালুচর অপসারণ ও চন্দ্রকোনা থানার মধ্যে প্রবহমান অংশে ক্ষীরাপাইর নিকট থেকে একটি খাল খনন করে তা ঘাটালের নিচে বন্দরের নিকট রূপনারায়ণে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এর ফলে চন্দ্রকোনা ও ঘাটাল থানার উত্তরাংশের সেচ-সমস্যার সমাধানও সম্ভবপর। এই সঙ্গে ক্ষীরাপাইয়ের দক্ষিণ দিক থেকে নদীকে সরল ও প্রশস্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া শীলাই কাঁসাই সঙ্গমস্থলকে রাজ-নগরের নিকট বিস্তৃতিকরণ সহ গান্ধীঘাটের নিকট মজে যাওয়া চন্দ্রেশ্বর খালকে পুনর্জীবিত করা একান্ত জরুরি। চন্দ্রেশ্বর খালকে উদ্ধার করলে দাসপুর থানার জলসেচ সমস্যারও সমাধান হবে। এই খালটি কুলটিকরির নিকট রূপনারায়ণের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এই খালের উত্তরদিকে স্লুইস গেট না করলে সেচপ্রকল্প কার্যকরী হবে না। এই খালটি মজে যাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তার স্মৃতিরেখা বেঁচে আছে। ঘাটাল থানার ১ ও ২ নং অঞ্চলে সাকরী খালের সংস্কার ঐ অঞ্চলের সমুন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়।

কেলেঘাই

বর্ষান্তে কেলেঘাইয়ের জলে স্রোত নামমাত্র থাকে, কিন্তু মেঘের গুরু গুরু গর্জন ও বারিদবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই সে কালনাগিনীর মতো ফুঁসে ওঠে, প্রবল গর্জনে ছুটে চলে দুকূল প্লাবিত করে। হাহাকার, আর্তধ্বনি, মৃত্যুর কলরোলের সঙ্গে হাজার হাজার বাড়ি ভাঙে, ডোবে; শ্যামলী ফসলের জমি কর্দমাক্ত জলে থৈ থৈ করে।

এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে প্রথম প্রয়োজন কেলেঘাইর মজে যাওয়া বুকের মাটি অপসারণ। সেই সঙ্গে নদীর বুকে বাঁধ বেঁধে বাঁশের আড়া বেড়া

দিয়ে মাছ ধরার জন্ত ইজারা দেওয়ার প্রথাও বন্ধ না করলে নয়।

এছাড়া মঙ্গলামাড়োর বাজারের পাশে যে জল-নিকাশী খালটি রয়েছে, তার বিস্তৃতি-সাধন করে এটিকে কেলেঘাই থেকে রসুলপুর পর্যন্ত জল-নিকাশন খালে রূপায়িত করতে হবে। এই খালটি প্রবহমান এলাকায় শুধু নয়, ভগবানপুর ও খেজুরি থানারও সেচসমস্যা অনেকখানি সমাধান করবে। এই পরিকল্পনার সঙ্গে বারচৌকার জল-নিষ্কাশন-ব্যবস্থাকেও সংযুক্ত করতে হবে।

বাগুই খাল

দাঁতনের উত্তর পশ্চিম কোণে সুবর্ণরেখা নদী থেকে বেরিয়ে বাগুই খাল কেলেঘাইতে মিশেছে, বর্ষান্তে একেবারে বিশুষ্কা বারি-শূন্যা থাকে। কিন্তু বর্ষণ সমাগমে এর ভয়ঙ্করী ধ্বংসাত্মক রূপারূপ পটাশপুর থানার চির বিপর্যয়ের কারণ হয়ে আছে। এই খালটির বিস্তৃতিকরণ ও এর বাঁকাচোরা পথের সরলীকরণ আশু প্রয়োজন, সুবর্ণরেখার মুখে স্লুইস গেট বসালে ও সুবর্ণরেখা এ্যানিকেট্ করলে ঐ খাল আর ধ্বংসরূপা না থেকে সৃষ্টির সহায়িকা তথা দাঁতন পটাশপুর ও এগরা থানার সেচপ্রকল্প রূপে শ্রীময়ী শক্তিসম্পন্না হয়ে উঠবে।

কপালেশ্বরী

সত্যিই এটি "দুঃখের নদী"। ক্যানেলের উদ্বৃত্ত জলের ও খড়্গপুর থানার একাংশের জল নিষ্কাশনী খাল রূপে যার জন্ম. সে যে কত ভয়ঙ্করী ও ধ্বংসাত্মিকা শক্তি ধরে সবং থানায় না গেলে তা বোঝা যায় না। এর বুক জুড়ে আগাছার বন আর ভরাট মাটির স্তূপ। তারও প্রতিকার করতে হবে।

দুবদা বেসিন

প্রতি বছরই সে বন্যার কান্না শুনিয়ে চলেছে। হাজার হাজার মানুষের দারিদ্র্য বজায় রাখাই তার কাজ। দুবদার জলরাশি বর্ষণের বারিধারা নিয়ে সবেগে ছুটে চলে উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানালের দিকে। নিজের বুকে তার অথৈ সমুদ্র লহর। মনে হয় যেন দিগন্তহীন দিশেহীন এর রূপ।

শরশংকার পাশ থেকে দাঁতন থানার বারিপাত-জনিত জলরাশি এগ্রার মধ্য দিয়ে বরদাখালে মিশে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ফলে দুবদা বেসিন একটি বর্ষাকালীন হ্রদ বলে প্রতীয়মান হয়।

এই বেসিন সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে অনেক গবেষণা ও হৈ চৈ চলেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত জানি না। আমার একটা অভিমত রয়েছে। প্রথমত উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানালকে গভীরতর করা প্রয়োজন। এই সঙ্গে বারমাইল থেকে নিঃসৃত পিছাবনী খালটিকে প্রশস্ততর করলে, এর জল-নিষ্কাশন-সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে। দ্বিতীয়ত ওখান থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত জুখী থেকে আর-একটি ক্যানাল রামনগর থানার বালিসাইর নিকট মান্দার খালের সঙ্গে সংযোগ করলে বোধহয় সামগ্রিক নিকাশী সম্ভব হবে। এই সঙ্গে সেগুয়ার নিকট থেকে বরদা খালের যে জলধারা ভুবদা বেসিনে পড়ছে, সেই জলধারাকে আর-একটি ক্যানেলের সাহায্যে উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানালে এনে ফেলতে হবে। মান্দার খালটিরও জল-নিষ্কাশন-শক্তি-বৃদ্ধির জন্য সংস্কার-সাধন প্রয়োজন। সুবর্ণরেখার প্লাবন-প্রতিরোধের জন্য বাংলা এবং উড়িষ্যা সরকারের মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। রামনগর থানার পাঁচটি গ্রাম ও এগ্রা থানার তিনটি গ্রামেও ডোগরাই এবং জলেশ্বরের জলের ঢল নেমে প্লাবনের সৃষ্টি করে। এই জলপ্রবাহকে খালের সাহায্যে সমুদ্রমুখে ফেলতে হবে। এছাড়া ওই গ্রামগুলির প্লাবন-প্রতিরোধ সম্ভব হবে না।

অন্যান্য খাল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে আপাতত এইটুকুই বলি যে তাদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক পরিকল্পনা নিতে হবে।

কিন্তু সামগ্রিক পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হলে (১) সমস্ত জমিদারী বাঁধের অবলুপ্তি, (২) গ্রাম-ঘেরা ভেড়ীবাঁধগুলির অপসারণ, (৩) পরিবহন সড়ক ও গ্রাম্য রাস্তাগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক পুল ও স্লুইস নির্মাণ করে জল নিষ্কাশনকে অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এবার মুখ্য কথা হল, নদীর তীরবর্তী বাঁধগুলি অন্তত দু-ফার্লং সরিয়ে বর্ধিত জলধারাকে কিছুটা ধরে রাখার শক্তিসম্পন্ন করতে হবে। বাঁধগুলি আরও চওড়া, মজবুত এবং উঁচু করা দরকার হবে। বাঁধের সীমানায় দু-ফার্লংয়ের মধ্যে কোনো বাসগৃহ বা পুকুর খনন আদৌ উচিত হবে না।

বন্যার এই দানবীয় ধ্বংসলীলা বিগত ২০ বছরে বন্ধ করার কোনো সুপরিকল্পিত কর্মসূচী কেন করা হল না? এ প্রশ্ন স্বতঃই আসে। প্রথম দিকে সে সম্পর্কে চিন্তার কিছুটা আভাস ছিলও। কিন্তু কংগ্রেসের শাসকগোষ্ঠী, যাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে এ-দেশে বিদেশী পুঁজি ফাঁপছে আর একচেটিয়াগোষ্ঠী বেড়ে উঠছে—তাঁদের শ্রেণীস্বার্থই এদেশে বন্যা-প্রতিরোধের প্রধান অন্তরায়। কারণ, পরিকল্পনার রচয়িতাও তো তাঁরাই!

কথায় আছে—"কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস।" লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের জলে, আর্ত হাহাকারে, বুকের দাহনে চলে শাসককুলের ভোটের সাধন। সরকারী সাহায্যের গন্ধমাদন দলের কর্মীদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে এঁরা নির্বাচনের বিশল্যকরণী পকেটস্থ করেন। বন্যার আশীর্বাদ বিলি-বর্ষণে অনুগ্রহ-দানে এঁদের নিষ্কাম কর্মের মুখোশটুকুও খুলে দেয়। কমিশন-এজেন্সি এঁদের তখন সরগরম জমজমাট হয়ে ওঠে। অবিশ্রাম অবসর আর নয়, নিষ্ক্রিয় কর্মীরা সক্রিয় নিরলস কর্মপ্রমত্ত হয়ে ওঠে। জনসেবা ও আত্মসেবা তখন পাশাপাশি চলতে থাকে।

এই অবস্থার পরিবর্তন-সাধনের জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার তার ৮ মাস পরমায়ুর মধ্যে নদীপ্রকল্প রচনা ও কার্যকরী করার কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু ধনিক—বণিক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ সাধারণ খেটেখাওয়া মজুর-কৃষক ও মেহনতী মধ্যবিত্ত স্বার্থের অনুগ নয়। পরভুক গোষ্ঠীর চক্রান্ত যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটালেও, জাতীয় সমুন্নতির পথ দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সম্মিলিত মোর্চার শক্তিকে দুর্বল করতে পারে নি। কারণ এই শক্তিই সমাজজীবনের নব অভ্যুদয়কে বাস্তব করবে, কৃষক ও কৃষির সমস্যাগুলি সমাধান করে জন-জীবনকে করবে সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী। "বন্যার কান্না" আর নয়। নদীপ্রকল্পকে কার্যকরী করার জন্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগ্রামী সংহতি গড়ে সব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মেদিনীপুরের মানুষ তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

দেবেন দাশ

শ্রীনগরের নির্দেশ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

জাতীয় সংহতি পরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবনের মন্তব্য থেকে দেখা যায় যে ১৯৬৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা ও ব্যাপকতা অতীতের সমস্ত সংখ্যাকে অতিক্রম করেছে। সম্ভবত সেই কারণেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে প্রধান আসামী হিসেবে শ্রীনগরের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল। এমন কি. বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও দাঙ্গা-প্রশমনের জন্ত সরকারের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দিতে আপত্তি করেন নি। তাঁদের অধিকাংশ সাম্প্রদায়িকতাকে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রধান শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবন থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ নির্মূল করার দাবিও তাঁরা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার কমিশনে কংগ্রেসের দু-জন শক্তিশালী প্রথমসারির নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী যে আগ্রহ উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতার উদাহরণ রেখেছিলেন— তাতে মনে হয়েছিল যেন তাঁরা সময় সময় কমিউনিস্ট নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্তকেই নিষ্প্রভ করে দিচ্ছেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী সুখাদিয়া ও কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পার ভাষণে সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি বিশেষ করে জনসংঘ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আর-এস-এস-কে বেআইনী করার দাবিও তোলা হয়েছিল—যা দুই কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাও দাবি করেন নি।

এমন কি উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই পর্যন্ত সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন—"সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে ব্যর্থ হলে সেইসব মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।" সভাস্থ সকল দলের লোক তাঁকে সাধুবাদ জানালেন। আশা হলো এইবার আমরা সবাই কংগ্রেসী রাজ্যে এই ঘোষণার সার্থক ও সাহসী পরীক্ষা দেখতে পাব। অন্তত আমাদের মতো সরল বিশ্বাসী নাগরিক এই আশা নিয়েই ফিরেছিলেন।

কিন্তু ছ-মাসের মধ্যে এই ঘোষণার প্রয়োগ অন্তত কংগ্রেসশাসিত রাজ্যে কি হলো দেখা যাক।

১। নাগপুরের গোলযোগ সম্পর্কে শ্রীনায়েক আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দুষ্কৃতিকারীদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কাউকে ক্ষমা করা হবে না। এই দাবির সঙ্গে আর-এস-এস-এর প্রশ্ন যুক্ত ছিল

তাদের সম্পর্কে তিনি নাকি কঠোর মনোভাবই পোষণ করেন। বললেন, শিব-সেনাদের এবার শায়েস্তা করা হবে। কিন্তু এইসব প্রতিশ্রুতির কি হলো? নাগপুরের দাঙ্গার দুষ্কৃতিকারীরা বহাল তবিয়তেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংগঠন নাগপুরে ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে। পুলিশ, উচ্চকর্মচারী, বড় ব্যবসায়ী, বেকার যুবকদের মধ্যে তাদের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে। 'অর্গানাইজার' কাগজ নিয়মিত সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছে।

২। মহারাষ্ট্রের কথা না হয় বাদ দিলাম। এবার মহীশূর রাজ্যের শ্রীবীরেন্দ্র প্যাটেলের কথাই বলি। তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছিল, তিনি নিশ্চয়ই সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবেন। তিনি আমাকে মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে ফিরে গিয়ে ম্যাঙ্গালোরের দাঙ্গার অপরাধীদের কঠোর হাতে দমন করবেন। মনে হয়েছিল হায়দার আলি, টিপু সুলতানের মহীশূর রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারীদের তিনি দমন করতে পারবেন। কিন্তু মহীশূরের খবরও আমরা জানি। ম্যাঙ্গালোরের দাঙ্গাকারীরা আজও নিরুদ্বেগে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে। নরহত্যার দায়ে কেউ তাদের গ্রেপ্তার করছে না। কোনো বিচার হচ্ছে না তাদের অপরাধের।

৩। কংগ্রেসের অন্যতম গর্ব হচ্ছে অন্ধ্র রাজ্য ও তার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডী। সাম্প্রদায়িকতা কমিশনে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। স্বভাবতই তাঁর সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মন্তব্য ও ভূমিকা অনেকের মনেই আশা জাগিয়েছিল।

কিন্তু তিনি তাঁর রাজ্যে ফিরে গিয়ে কি করলেন? রাজ্যে ফিরে গিয়েই একদিকে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী অন্যদিকে জাতীয় সংহতির অন্যতম প্রধান প্রচারক দুটি ভারতবিখ্যাত পত্রিকা দিল্লীর দৈনিক 'পেট্রিয়ট' ও সাপ্তাহিক 'লিঙ্ক'-এর বিরুদ্ধে তিনি নিপীড়নমূলক আইন প্রয়োগ করলেন। অবাক কাণ্ড। যে দুই পত্রিকা হরিজন বালকের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত নিপীড়নের খবর ভারতবাসীকে জানিয়ে গণতন্ত্র ও মানবতার শত্রুর বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন—তাঁদের অভিনন্দন না জানিয়ে শ্রীনগরে গৃহীত প্রেস ও পত্রিকা সম্পর্কিত প্রস্তাবের চরম অপ-ব্যবহার করা হলো। শ্রীব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে আমারা একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত পেলাম। যাঁরা এখনো কংগ্রেসের মধ্যে একদল সত্যনিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী খোঁজেন, তাঁদের কাছে এই আঘাত প্রচণ্ড। ভারতে গণতন্ত্র ও

ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পক্ষে অন্ধ্র-মুখ্যমন্ত্রীর এই অন্যায় আদেশ অনেক লোককে নিরুৎসাহিত করবে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাঙলায় গত এক বছরে যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে দৃঢ় কঠোর মনোভাব ও নিজেদের নিরাপত্তা বিপন্ন করেও অভূতপূর্ব তৎপরতায় সঙ্গে দাঙ্গার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাছাড়া দাঙ্গা-দমনের কাজে পুলিশ বাহিনীকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করাও তাঁদের শাসন-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। জনপ্রিয় মন্ত্রিসভার এই সাফল্য যুক্তফ্রণ্টের অতি বড় সমালোচকেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। শিখ-বাঙালী দাঙ্গা বন্ধ হলো তিন ঘণ্টার মধ্যে। এণ্টালির হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা থামাতে মন্ত্রী জ্যোতি বসু ও সোমনাথ লাহিড়ী ছিলেন প্রথম সারিতে। হাওড়ায় দাঙ্গা থামাতে নিগৃহীত হলেন মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার আর অপূর্বলাল মজুমদার। মেটিয়াবুরুজে দু-দুবার সাম্প্রদায়িক উত্থানিকে স্তব্ধ করলেন মন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি ও হেমন্ত বসু। তাঁদের পেছনে ছিল মেটিয়াবুরুজের সুতাকলের বীর শ্রমিকেরা। মাত্র কয়েক মাস আগে হোলি উৎসবের সময় নারকেলডাঙ্গা ও কলাবাগানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রহৃত হয়েছিলেন যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ—অজয় মুখার্জি, বিশ্বনাথ মুখার্জি ও সুধীন কুমার এবং এই দাঙ্গার পেছনে যে কংগ্রেসের একাংশ ও আর-এস-এস-দের ষড়যন্ত্র ছিল—একথা তো সর্বজনবিদিত! আসানসোলে বাঙালি অবাঙালী দাঙ্গার সম্ভাবনাকে দৃঢ় হাতে দমন করলেন মন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি। অন্য রাজ্যের ঘটনা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-প্রতিরোধের ব্যাপারে যুক্তফ্রণ্ট গৌরবের অধিকারী—একথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।

জাতীয় সংহতি, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাবগুলি কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে কাজে পরিণত করার মতো উদ্যোগ এখনো সরকারী মহল থেকে দেখা যাচ্ছে না। তাই এই উদ্যোগ সম্ভবত গণতান্ত্রিক জনসাধারণকেই নিতে হবে। সরকারপক্ষ থেকে যদি কোনো বাধা না আসে, তা হলেই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ভারত-পাক সম্পর্ক ও বিপ্লবী ত্রৈলক্যনাথ

একথা অনস্বীকার্য যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারত-পাক সম্পর্ক। সম্প্রতি এই সম্পর্কের নিঃসন্দেহে আরও অবনতি ঘটেছে।

একদিকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, জনসংঘ, মুসারত প্রভৃতি দল বা নয়া ফ্যাসিস্ত সংস্থার শক্তিবৃদ্ধি ; 'অর্গানাইজার' পত্রিকার পাশাপাশি আরও বহু জনসংঘপ্রিয় পত্র-পত্রিকার ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার—অন্যদিকে সোভিয়েত-পাক অস্ত্রচুক্তিকে ব্যবহার করে সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাবের উস্কানি দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পাকিস্তানের নিকট 'আর যুদ্ধ নয়' প্রস্তাব। এ-সবই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতের পক্ষে খুবই তাৎপর্য- পূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তানের ভেতরে বাইরে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার এবং ভারতের বাইরে পাকিস্তানের শাসকদলের শত অপপ্রচার সত্ত্বেও এই প্রস্তাব পাকিস্তানের গণতন্ত্রীকামী জনসাধারণের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখতে বাধ্য। ভারতের বাইরে—বন্ধু রাষ্ট্রদের কাছেও এই প্রস্তাবের তাৎপর্য খুব বেশি। পাকিস্তানের জনসাধারণ ও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে মৈত্রী ও শান্তির আগ্রহ যে কতখানি গভীর, তার অভিব্যক্তি আমরা অনেক সময়েই দেখতে পাই।

আমরা দেখেছি বিরূপ রাজনৈতিক আবহাওয়া সত্বেও দুই দেশের তীর্থ-যাত্রীরা সম্প্রতি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে মিলিত হয়েছিলেন। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম শহরে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের শহীদদের স্মৃতিরক্ষার মধ্য দিয়েও দুই দেশের আত্মিক সহযোগ ঘটেছে। এই পুণ্যধারা যদি ভবিষ্যতে আরো প্রশস্ত হয়, তবে তার ফল সুদূরপ্রসারী।

এই প্রসঙ্গে একজন প্রাচীন বিপ্লবীর কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'অনুশীলন' বিপ্লবী দলের বিখ্যাত নেতা শ্রীত্রৈলক্য চক্রবর্তী চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভারতে আসবার জন্যে বারবার আবেদন করেছেন। সাম্প্রতিক একটি পত্রে কমিউনিস্ট এম-পি শ্রীভূপেশ গুপ্তকে তিনি তাঁর অভিলাষের কথা ব্যক্ত করেছেন। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম নায়ক এই মহৎপ্রাণ বিপ্লবীর ন্যায়সঙ্গত আবেদনে পাকিস্তান সরকার যদি সাড়া দেন, তবে তা ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি পাকিস্তানী জনসাধারণের গভীর আন্তরিকতার আরো একটি নিদর্শন হিসেবে প্রতিভাত হবে। তাছাড়া তিনি জীবনের সায়াহ্নে প্রিয় সাথীদের সঙ্গে শেষবারের মতো সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল। আমরা আশা করব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ভারত-পাক সম্পর্ক উন্নত করার দিক থেকে ও বৃহত্তর মানবতার তাগিদে বিপ্লবী ত্রৈলক্যনাথকে ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে অগণিত ভারতবাসীর ধন্যবাদ অর্জন করবেন।

শান্তিময় রায়

সংবাদপত্রে ধর্মঘট

সারা ভারত সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে গত ২৩শে জুলাই থেকে অসাংবাদিক কর্মচারী বন্ধুদের যে ধর্মঘট শুরু, এখনও তা অব্যাহত। তাঁরা এই দীর্ঘ একমাস রাজপথকে আশ্রয় করে ধ্বনি তুলছেন : "আমাদের বাঁচার মতো মজুরি দাও, কেন্দ্রীয় সরকার তুমি যে অসাংবাদিক বেতনবোর্ডের সুপারিশ গ্রহণ করেছ—তা কার্যকরী করো।"

সারা ভারতব্যাপী অসাংবাদিক কর্মচারী বন্ধুদের এই ধ্বনি দিল্লীর বাদশাহ্‌দের ঘুম এখনও ভাঙাতে পারেনি, টলাতে পারেনি সংবাদপত্রের একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর সোনামোড়া কুৎসিত হৃদয়গুলো। বরং উল্টে দেখছি, ঐতিহাসিক এই ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য সরকারী লাঠি উদ্যত হয়েছে। মালিকপক্ষও কর্মচারীদের হাতে না মেরে ভাতে মারার জন্য প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের দুয়ারে ইতিমধ্যেই লটকে দিয়েছেন ছোট্ট দুটি কথা : 'লক আউট'।

এই ছোট দুটি কথার মধ্য দিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর আকাশ-ছোঁয়া স্পর্ধা যেমন প্রকাশিত, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্লীব-বীরত্বের নমুনাও আমরা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছি।

আমরা জানি, সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারীরা কোনো হঠকারিতার বশে হঠাৎ এ-পথে পা বাড়াননি। অসাংবাদিক কর্মচারীরা তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছেন। আজ থেকে প্রায় একযুগ আগে কার্যনিরত সাংবাদিকদের চাপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে যখন প্রথম বেতনবোর্ড গঠিত হয়, তখন 'উদার' জওহরলালজীও এদের কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন বোধ করেননি। এতে অসাংবাদিক কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ হলেও ধৈর্য ধারণ করেছেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালে কার্য-নিরত সাংবাদিকদের জন্য যখন দ্বিতীয় বেতনবোর্ড গঠিত হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে তখন অসাংবাদিক কর্মচারীদের দাবি উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা দেখলাম, কেন্দ্রীয় সরকার অসাংবাদিক কর্মচারীদের জন্য প্রথম বেতনবোর্ড গঠন করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক কর্মীদের জন্য দুটি বেতন-

বোর্ড প্রায় একই সময়ে গঠিত হলেও—দুটির জন্য দুই পৃথক নীতি নির্ধারিত হল। সাংবাদিকদের জন্য বেতনবোর্ডের সুপারিশকে করা হল বাধ্যতামূলক আর অসাংবাদিকদের জন্য বেতনবোর্ডের রায়কে আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখাই শ্রেয় মনে করলেন কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর চার বৎসর অতিক্রান্ত হল। এরি মধ্যে বেতনবোর্ড সর্ববাদী-সম্মতভাবে অন্তর্বর্তীকালীন যে রায় দিয়েছিলেন, সরকারী চাপে তা অদল-বদল করে তাঁদের সর্বশেষ রায়টি। ১৯৬৭ সালে প্রকাশ করলেন সরকার বেতনবোর্ডের এই রায়কে আরও সংশোধিত করে গ্রহণ করলেন এবং মালিকদেরও গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন।

পরবর্তী কালে আরও অনেক আলাপ-আলোচনা চলেছে। মীমাংসার আশায় অসাংবাদিক কর্মচারীদের সংগঠন শেষপর্যন্ত চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীভুক্ত সংবাদপত্রগুলির উপর তাদের দাবিকে যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল করে শুধুমাত্র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত সংবাদপত্রগুলিতে বেতন-বোর্ডের রায় কার্যকরী করতে অনুরোধ জানান। এই দাবিও যখন এক-চেটিয়া পুঁজিপতিরা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তখনি নিরুপায় হয়ে ধর্মঘটে নেমেছেন অসাংবাদিক কর্মচারী বন্ধুরা।

দেশী-বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত সংবাদপত্রগোষ্ঠীর একচেটিয়া প্রভুত্বকে অস্বীকার করলে যাদের মসনদ টলে উঠবে, সেই পঙ্গু কেন্দ্রীয় সরকারের অসহায়তা আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলে বিদেশী সরকারের বিজ্ঞাপন-দাক্ষিণ্যে এবং নিউজ প্রিণ্টের বিপুল কোটা কালোবাজারে পাচার করে যেসব সংবাদপত্র মালিক বিপুল ধনসম্পদ অর্জন করেছিলেন, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অবাধ মুনাফা শিকারের মাধ্যমে যারা আরও স্ফীতকায় হয়েছেন, তাঁদের অনিচ্ছুক মুঠি থেকে শ্রমিক-কর্মচারীর বাঁচার মতো মজুরিটুকু ছিনিয়ে আনতে কি এখনও গর্জে উঠবে না আসমুদ্র-হিমাচলের জাগ্রত মানুষ? তারা কি এখনও জিজ্ঞাসা করবেনা ১৯৫৭ সালে যে কস্তুরী এণ্ড সন্স লিঃ (মাদ্রাজ), স্টেটসম্যান লিঃ, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, বেনেট কোলম্যান কম্পানি, হিন্দুস্থান টাইমস এবং ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর বার্ষিক আয় ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে, ১৯৬৪ স-লের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের আয় কোন জাদুমন্ত্রে যথাক্রমে ২ কোটি ২৫ লক্ষ, ২ কোটি ৮৯ লক্ষ, ১ কোটি ১৬ লক্ষ, ১ কোটি ৮৩

লক্ষ, ৫ কোটি ৩১ লক্ষ, ২ কোটি ২১ লক্ষ এবং ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকায় গিয়ে পৌঁছল ?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই মুনাফার পাহাড়ের পাদদেশে ক্লীব ভারত সরকার নতজানু হলেও পর্বতপ্রমাণ বিঘ্নবাধা অতিক্রম করেও এর সদুত্তর খুঁজে নিতে সংগ্রামী অসাংবাদিক কর্মচারী বন্ধুদের পাশাপাশি ভারতের জাগ্রত জনমত নিশ্চিত অগ্রসর হবে।

ধনঞ্জয় দাশ

গত সংখ্যা 'পরিচয়'-এর প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছিলেন শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এই সংখ্যায় নাট্য-প্রসঙ্গ বিভাগে প্রকাশিত বিতর্কমূলক নিবন্ধটি সম্পর্কে আমরা পাঠকদের, বিশেষত নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত গুণীজনের মতামত প্রার্থনা করছি —সম্পাদক

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্‌ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয়; ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭

৪। প্রকাশক— " " " " "

৫। সম্পাদক—সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ভারতীয়; ৫ বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেডের যে সকল অংশীদার মূলধনের শতাংশের অধিকারী, তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট ১৯, ব্লক এইচ, সি. আই. টি. বিল্‌ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩ এল, ...পুকুর রোড, কলকাতা-৯ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ... রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮, একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩, কার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১, নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩, লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, (মৃত), ৪২।১এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ... হরিদাস নন্দী, ২৯এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ...বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুহুধ্বনিকা', ... সেন রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা ॥ ... সর্বকমল ভট্টাচার্য, (মৃত), ৯।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১৯। ...দিত্য রায়, ৫৩বি, গড়চা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২০। নারায়ণ ...পাধ্যায়, ৯৩।১, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ

পরিচয়

বর্ষ ৪৫ ৷ সংখ্যা ৩

আশ্বিন ৷ ১৩৮২

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

পরিপ্রেক্ষিতের রবীন্দ্রনাথ । দেবেশ রায় ৩৭৫
ভিয়েতনামের গেরিলাদের সঙ্গে । জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়
চেকোস্লোভাকিয়া—অন্য দিক । সুশোভন সরকার ৪০৩

গল্প

বন্দুক । অজিত মুখোপাধ্যায় ৪১৩ ৷ ধস্ । চিত্ত ঘোষাল ৪২৫ ৷

কবিতা

গ্যাব্রিয়েল ওকারা । অনুবাদ : মনীশ ঘটক ৪৩৬ ৷ সরিৎ শর্মা ৪৩৬ ৷
বীরেন্দ্রনাথ সরকার ৪৩৬ ৷ সত্য গুহ ৪৩৬ ৷ শিবেন চট্টোপাধ্যায় ৪৩৯ ৷
আশিস মুখোপাধ্যায় ৪৪০ ৷ দিলীপ সরকার ৪৪০ ৷ কিরোজ চৌধুরী
৪৪১ ৷ কালীপদ কোঙার ৪৪২ ৷ ইভগেনি ইভতুশেঙ্কো । অনুবাদ :
অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৪৩ ৷

পুস্তক-পরিচয়

সত্যজিৎ চৌধুরী ৪৫৭ ৷ স্বপা ভট্টাচার্য ৪৫৭

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

শঙ্কর চক্রবর্তী । ৪৩৪

বিবিধ প্রসঙ্গ

শান্তিময় রায় ৷ গণেশ বসু ৷ শুভব্রত রায় ৷ গৌতম ঘোষ ৷ তরুণ
সান্যাল ৷ অমলেন্দু চক্রবর্তী ৷ ধনঞ্জয় দাশ ৷ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৷ ৪৬৭-৪৮৩

চিঠিপত্র

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ৪৮৫ ৷ মিহির সেন ৪৮৭ ৷

সম্পাদকীয়

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র।
গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদপট

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

MoLoy

EXPORT QUALITY
এখন
আপনাদের জন্য
পাওয়া যাচ্ছে!
সুলেখা
একসিকিউটিভ কালি
EXECUTIVE INK
Sulekha
সুলেখা
ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা
EXECUTIVE IN

পরিপ্রেক্ষিতের রবীন্দ্রনাথ

দেবেশ রায়

তরুণ কবি-সমালোচক সুরজিৎ দাশগুপ্ত "দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথের" মধ্যে কিছু কিছু মিল আবিষ্কার করেছেন তো বটেই, পরন্তু সাহিত্যের তিন সম্রাকে মিলিয়ে ভাবতে চেয়েছেন কোনো বুনিয়াদি সূত্র, যা কবিত্বের মহত্বকে নির্ধারিত করেও আধুনিক। রসগ্রাহী চিন্তাবিদ আবু সয়ীদ আইয়ুব বোদলেয়রীয় শিল্পভাবনাকে রবীন্দ্রনাথের চারপাশে খাড়া করিয়ে দেখতে চেয়েছেন ভারতীয় কবির মঙ্গলভাবনার সঙ্গে বোদলেয়রীয় আধুনিকতার সম্বন্ধ। আর বিশ্বমনীষার আনন্দ নিষ্যন্দন আকাশে নিঃশ্বাস গ্রহণেই অধিকতর অভ্যস্ত "রাবীন্দ্রিক বাংলার মানুষ", বাংলা ভাষার কবিতার আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতের রচনায় নিজের হাত ব্যবহার করছেন গত কয়েকযুগ ধরে সেই বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেয়েছেন তাঁর "আত্মপরিচয় বা সত্তাসংক্রান্ত সংকটানুভব ও উত্তরণ"-এ আধুনিক বিশ্বের সত্তাঘটিত সংকটের ওয়ালেস স্টিভনসীয় ও ব্রেখ্‌টীয় দুই বিপরীত উত্তরের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ গ্রহণ-বর্জন মিল-অমিলে।

ফলে আমাদের মতো তৃষিত গৌড়জনের এ-রকম একটা অভাবিত লাভ ঘটে গেল যে যথাক্রমে তিন লেখকের "দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ" "আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" "রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা"—তিনটি রচনা একত্রে গত সাতশ বৎসরের পৃথিবীর সাহিত্যের প্রধানতম সৃষ্টিপ্রক্রিয়াগুলি প্রায় কালানুক্রমিক ভাবেই এনে দিয়েছে। পরস্পরের অজান্তেই বাংলাদেশের শিল্পজিজ্ঞাসাকাতর মনীষী সহ তরুণ থেকে বার্ধক্যের মহৎ তরুণ কবি পর্যন্ত যে প্রায় একটি সুপরিকল্পিত স্তরবিন্যস্ত অনুসন্ধানের অংশী হয়ে পড়লেন তাতে বোঝা যায় দৈনন্দিনের আত্মপরিচয়হীন গড্ডলে "স্রোতের শ্যাওলাসম" ভেসে বেড়ানো যদিচ প্রায় পরিণত জাতীয় অভ্যাস, মলেও যায় না, সঙ্গে

সঙ্গে দেড়শ বছর আগে জাতীয় আত্মজিজ্ঞাসার সেই তাড়া এখনো দুর্মর, মলেও যায় না।

এই আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে প্রধান বিবেচনা মেথডের। অবরোহী পদ্ধতির বিন্যাসে সুরজিৎ দাশগুপ্ত ত্রয়োদশ শতকী ইতালি থেকে উনিশ শতকী বাংলা-তে চলে আসেন মধ্যআঠার-শতকের জার্মানিকে ছুঁয়ে—তাঁর গ্রন্থের প্রথমতম বাক্যটিকে যেন ব্যাখ্যা করবার জোরেই "মহাকবিরা ক্রান্তিকালের সন্তান।" আবার বিস্ময়, শুভ ও মঙ্গলবোধ বা এই তিনের সমন্বয়কেই রোম্যান্টিক কবিতার প্রধান ধারকচেতনা ধরে নিয়ে বোদলেয়ারি অমঙ্গল-বোধের অসারতা আর ঠাকুরি অশুভবোধের সারবত্তার নজির ও তুলনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন আইয়ুব। অপরদিকে, আরোহী বিন্যাসের টানে শার্লক হোমসের শেষ বক্তৃতার অব্যর্থতায় কবি কাহিনী থেকে শেষলেখা পর্যন্ত রচনার তদন্তের অন্তে বিষ্ণু দে এক পদ্ধতির আভাস করেন কলোনির চৈতন্যে যাতে বিশ্ব, বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতার লড়াই, ফ্যাসিবাদ আর সমাজতন্ত্রের আলোড়নে আধুনিকতার একটি স্বত্ব সংজ্ঞা জন্ম নেয়।

মেথডের প্রসঙ্গ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। ভারতীয় চিন্তায় সংশ্লেষের ঝোঁক বরাবরের, তাই সে ঝোঁক যেমন বুদ্ধদেবকে জড়িয়ে নেয়া দশাবতার স্তোত্রের রচয়িতা কাটিয়ে উঠতে পারেন না, তেমনি কাটিয়ে উঠতে পারি না আমরা। বা রবীন্দ্রনাথ। বা এমন-কি বুদ্ধদেব বসুও। "যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে, মিলাব তায় জীবন গানে"—এমন একটা কথা একান্তে জপতে জপতে ও প্রকাশ্যে ভনতে ভনতে কখনো কখনো নিজের কাছে আর প্রায় সবদাই বাইরে এমন একটা ধারণা রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রতিষ্ঠা করেই ফেলেছেন যে কী তাঁর কাব্য বা জীবন বা দুটো মিলিয়ে সমগ্রতা, সব সময়ই বর্তুলাকার অর্থাৎ বৃত্ত অর্থাৎ ঘুরে-ঘুরে ফিরে আসা। এবং সেই ফিরে-ফিরে আসাকে একটা সার্থকতার তাৎপর্য দিতে চাই বলেই হয়তো বলি সত্যে ফিরে আসা, উৎসে ফিরে আসা, ধ্রুবপদে ফিরে আসা। হেন গুজবে কান দিয়ে বুদ্ধদেব বসু সামান্য এই গাণিতিক তথ্যটাই ভুলে যান,

> "ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বোচ্চ শিখর থেকে বিংশ শতাব্দীর সর্বনিম্নতল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জটিল দুর্গম যাত্রাপথ বিস্তৃত।......সেই প্রথম স্বাদেশিকতা এক শতাব্দী পরে আমাদের কাছে গল্প কথার সামিল, আর সভ্যতার সঙ্কট আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঔদ্ধত্য

স্রষ্টার কাছেও দুঃস্বপ্নের অতীত। রবীন্দ্রনাথ এ-সব কিছুরই সাক্ষী।"
(সুরজিৎ দাশগুপ্ত)

এবং সাতপাঁচ না ভেবেই বলে ফেলেন
"জীবন ও কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যৌবন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একই ধারণা পোষণ করে গেছেন আর তাঁর পক্ষে সেটাই হয়তো স্বাভাবিক বলা যেতে পারে।" (বুদ্ধদেব বসু)

আসলে ভুলেই যাই যে বিশ্বতানের ধ্রুবপদকে জীবনে গানে মেলানোটা একটা শখ বা ইচ্ছে মাত্র নয়। দ্বন্দ্বময় যন্ত্রণার পদ্ধতির ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, আশি বৎসরের বিস্তৃত জীবনে, সেই স্পর্শহারা বাক্‌রোধী ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ গগনে একা একা স্বপ্নের ভুবন সৃষ্টি করার প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে তৈরি আশিটি বৎসর নিরন্তর কুরুক্ষেত্র। দ্বন্দ্বসঙ্কুল এই জীবনক্রিয়া আমাদের কলোনিয়াল চৈতন্যে আঁটে না বলেই তাঁর জীবন ও সাধনার পরিধি নিয়ে সাত তাড়াতাড়ি এক বৃত্ত এঁকে সমাধান খুঁজে তৃপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বলি— রবীন্দ্রনাথ বড় বেশি সমাহিত, তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। তেমন বেয়াড়া আধুনিক সমালোচকের রবীন্দ্রনাথকে খারিজ-করে-দেয়া-শ্লাঘা কি নিজের গা চাটবে এমন কথা জানতে পেলে, যে আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগে অর্থাৎ উনতিরিশি বিশ্বমন্দারও আগে, এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ।

আর রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারটাতেই চরম বামী আর দক্ষিণী পরস্পরের বিপরীত দিকে হাঁটতে সুরু করে, শেষে এসে মুখোমুখি ধাক্কা লাগাতে।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, উপনিষদ, ভূমা, অসীম ও অরূপ দিয়ে পুজোর ছলে রবীন্দ্রনাথকেই ভুলে থাকার গোঁড়ামি আর য়ুরোপীয় পাপবোধ, নরক-চেতনা, মৃত্যু, অস্তিবাদ ও নেতির আঘাতে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙার কালাপাহাড়ি বিলাস আসলে এই মুখ্যপ্রতিজ্ঞা দুইয়ের উপর নির্ভরশীল যে ভারতীয়তা = ভাববাদ আর আধুনিকতা = পাপবোধ ইত্যাদি। ন্যায়শাস্ত্রের ইস্কুলি ছাত্রও জানে এমন সমানীকরণ অতিব্যাপ্তি ত্রুটিতে খারিজ হয়ে যায়। আর তাই চল্লিশ বছর পরেও ভিন্নতর প্রতিজ্ঞাও এনে দাঁড় করিয়ে দেয় ঐ পচা সিদ্ধান্তে।

অথচ যেথডের এই গোলমাল কোনো কোনো সময় অজ্ঞাতসারেই পেছন থেকে ছুরি মেরে বসে। নইলে সুরজিৎ দাশগুপ্ত "বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সমকাল থেকেই তিনি যে অবিচ্ছিন্নভাবে ছবি আঁকার চেষ্টা সুরু করেন এটা

নেহাত আকস্মিক যোগাযোগ নয়"—এমন একটা আবিষ্কার দিয়ে বানান কিনা বস্তাপচা এই সিদ্ধান্তের সিঁড়ি

"প্রথম জীবনে মানসসুন্দরীর উদ্দেশে বলেছিলেন,

তোমারেই করিয়াছি সংসারের ধ্রুবতারা।—

এ-সমুদ্রে আর কভু হব না ক'পথহারা।

আর জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে শেষ কবিতাটিতে ছলনাময়ীর উদ্দেশে বললেন,

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে যে-পথ দেখায় ইত্যাদি। যা।। সুরুকালের 'ধ্রুবতারা' আর যাত্রা শেষ কালের 'জ্যোতিষ্ক' বহন করছে পূর্ণবৃত্তের ইঙ্গিত"—

আবার মৃত্যুর মাত্র সাতদিন আগে রচিত এই কবিতাটির সাক্ষ্য নিয়ে "শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথেরও স্থায়ী এবং মৌলিক বিশ্বাস" কামুর অস্তিবাদী প্রকৃতি চেতনার "অনুরূপ" ছিল আবু সয়ীদ আইয়ুব এমন উক্তি করে বসে ব্যাখ্যা দেন—

"প্রকৃতি বিষয়ে পরপর দুই আপাত বিপরীত উক্তিতে (ছলনাময়ী ও পথপ্রদর্শক) সত্যিই কিন্তু কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষকে মিথ্যাবিশ্বাসের ফাঁদে ফেলে তখনই যখন তাতে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ভাবে বিশ্বের বিধানে সব কিছুই সুন্দর·····সহজ মনোহারিতা থেকে চোখ তুলে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর দিকে যখন সে তাকায় তখন 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ' থেকে মুক্ত হয়।"

'তোমার' সঙ্গে 'ধ্রুবতারার', আর 'ছলনাময়ীর' সঙ্গে 'জ্যোতিষ্কের' সম্বন্ধসূত্র কি, 'ছলনাময়ী'কে কেনই বা প্রকৃতি বলে মেনে নিতে হবে, ছলনাময়ী কি করে পথপ্রদর্শক হন যেখানে বলাই আছে পথ দেখাচ্ছে 'তোমার জ্যোতিষ্ক' —এমন সব জরুরি কৌতূহল না মিটিয়েই সিদ্ধান্তে আসা হয় কারণ এখনো আমাদের কলোনিয়াল চৈতন্যে কৃষ্ণ কেমন, যার মন যেমনের মতোই রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতা যার যার নিজের মনে মাপা। শ্রীযুক্ত আইয়ুব তাঁর গ্রন্থশেষে কবিতা সমালোচনার রীতি বিষয়ে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তাতে শব্দ অলঙ্কার বাকপ্রতিমাকে অতিরিক্ত মূল্য না দিয়ে সমগ্রতাবিচারের কথা বলেছেন। সমগ্রতা বিচারের অর্থ কি আলোচ্য কবিতাটির ছলনাময়ীর "সৃষ্টির পথ" আর জ্যোতিষ্কের পথের পারস্পরিক বৈপরীত্যটাও না দেখা। আর পরস্পরের বিপরীতে স্পষ্টপ্রত্যক্ষ স্থাপিত এই ছলনাময়ীর সৃষ্টির

আর জ্যোতিষ্কের পথ-কে সরল করে ছলনাময়ী=প্রকৃতি—এই সমীকরণের আশ্রয় নিতে হয় কারণ মুখ্যপ্রতিজ্ঞাতেই যে রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্তের কথা রয়েছে। ফলে নগ্ন ভাবে উদ্‌ঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে তাঁর এই দ্বন্দ্বদীর্ণ, মৃত্যুর সম্মুখেও দ্বন্দ্বদীর্ণ, চৈতন্যটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো না। সারা জীবন আত্মসচেতনতার লক্ষণের গণ্ডি পেরিয়ে পেরিয়ে, আবেগের দ্বন্দ্বকে তত্ত্ব-বিশ্বে প্রতিষ্ঠা দিয়ে বাহিরের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার এই আপোষহীন শিল্পী বালকবয়সে জানলার খড়খড়ি দিয়ে বাহিরের সঙ্গে আত্মতা স্থাপনের প্রয়াসে চৈতন্যের বোধিলাভের পথে যাত্রা সুরু করেছিলেন। বাহিরের সঙ্গে আত্মাকে মেলাবার কী দায়ই না তিনি ঘাড়ে নিয়েছিলেন যে সোনার তরী-চিত্রা-কল্পনা-ক্ষণিকার সাফল্যের পর, নষ্টনীড় আর চোখের বালির পর, নৈবেদ্য আর নৌকাডুবির অকৃতার্থতার সাধনা করেন। এমন যাঁর এলিয়ট কথিত ব্যক্তি-ভেদী স্ফুরণ তিনি কি না সুখদুঃখের ঢেউ খেলানো এই রূপ-সাগর তীর থেকে চিরপ্রস্থানের পূর্বমুহূর্তে বলে ফেললেন যে সৃষ্টি আর রূপের বিশ্বে শুধু ছলনা আর মিথ্যাবিশ্বাসের ফাঁদ আব প্রবঞ্চনা। বাঁচার পথ কি না অন্তরের পথ, চিরস্বচ্ছ। নিজের সঙ্গে পৃথিবীর, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে-ব্যবধান ঘোচাতে শতকের তিন পাদব্যাপী আয়ুকাল ব্যয়িত, সেই ব্যবধানকে স্বীকার করে, নগ্ন ভাবে স্বীকার করেই, ব্যর্থহীনতায় স্বীকার করেই চরম প্রমাণ। খেয়াতরী হারা এ পারের ভালোবাসার আর রইল-টা কি ?

ব্যক্তিব সঙ্গে তার সময়ের দ্বন্দ্ব থেকেই,– শ্রীযুক্ত আইয়ুব ঘোষণা করেছেন চিন্তার ডায়ালেকটিক্‌সে তিনি বিশ্বাসী, ডায়ালেকটিক্‌স্ বস্তুটি ঠিক ভেঙে-ভেঙে ব্যবহার করা যায় না, হয় গোটাটাকেই স্বীকার করতে হয়, নতুবা গোটাটাকেই প্রত্যাখ্যান—যদি একজন শিল্পীর মনোভঙ্গি তৈরী হয়ে ওঠে তাহলে সেই দ্বন্দ্বের সন্ধানই সেই মেথড যা যুক্তির টানে নানা তুলনা, প্রতিতুলনা, প্রভাব ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গ টানতে পারে। শ্রীযুক্ত আইয়ুব তাই তাঁর গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটিতে, নানা আলোচনায় আমাদের মতো পাশ্চাত্যসাহিত্য বা বিশ্ব সাহিত্যের অনভিজ্ঞ পাঠককে ঋণী করে রাখলেও রোম্যান্টিকতা ও অমঙ্গলবোধ, অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতা—এই বিষয়গুলির সম্পর্ক-কে ঠিক নৈয়ায়িক শৃঙ্খলায় উপস্থিত করেন না। ফলে আমাদের মতো পাঠকের সন তারিখ নির্ভর ইতিহাস বোধের ওপরও একটা চাপ পড়ে। যেমন তিনি বলেছেন –

"···রবীন্দ্রনাথকে রোম্যান্টিক কবি বলতেই হয়, রোম্যান্টিকতার পরাকাষ্ঠা বললেও ভুল হয় না। অথচ ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'রোম্যান্টিকতা' খুব দ্রুত গতিতে অশ্রদ্ধেয় হয়ে পড়ে··· এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যভাগে যে-মেজাজ ও রুচি ইংরেজি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল (ফ্রান্সে আরো আগে হয়েছিল)তার কাছে রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ অত্যন্ত ছোট হয়ে গেলেন ···**এই** নবমূল্যায়ণের ধাক্কা বাংলা দেশে এসে পৌছেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ·· কল্লোল ও পরিচয় যুগের কবিরা শিক্ষা পেয়েছিলেন ঐ কবিগুরুর পাঠশালাতেই, তাঁদের চোখ, কান, কণ্ঠ ও মন তৈরি হয়েছিল তারই সুরের ঝরণাতলায়। ·· কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাঁদের কবিজন্ম ঠিক রবীন্দ্র বিদ্রোহী তাঁদের বলা যায় না, কারণ তাঁরা আদৌ ঐ কাব্যসাম্রাজ্যের রাজানুগত নাগরিক ছিলেন না। সাহিত্যের অন্য জগতে তাঁরা ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, অন্য ভাবধারায় পুষ্ট; যে কাব্যানুশীলনে তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে তাঁদের **রুচি ও রচনাশৈলী** তা রবীন্দ্র কাব্যের অনুশীলন নয়। বোদলেয়র, র‍্যাঁবো, মালার্মে, জাঁ জেনে, অ্যালেন গিন্‌সবার্গ কাব্যের **এই** জগৎ রবীন্দ্রনাথের জগৎ থেকে বহুদূরে অবস্থিত।" (দরকার মতো হরফগুলি আমি মোটা করেছি)

—এরপর তিনি বোদলেয়র, মালার্মে ও ভেরলেনের কাব্যজগৎ নিয়ে যে স্বাদু আলোচনা করেছেন তা ওপরের উদ্ধৃতিনিরপেক্ষ ভাবে আমাকে আধুনিকতা বিষয়ে শিক্ষাদান করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে এই অংশকে মেলাতে পারছি না। আমার অসুবিধা হচ্ছে –

১। শ্রীযুক্ত আইয়ুব কাদের কথা বলছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জগতে ভূমিষ্ঠ হয়ে বাংলা ভাষায় কবিতা লিখছেন। তাঁদের 'আধুনিকতা'-ই শ্রীযুক্ত আইয়ুবের বিবেচ্য।

২। বাংলা কাব্যের ইতিহাস তাহলে কি আমাকে এই ভুল শিক্ষাই দিয়ে এসেছে যে এই শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের একেবারে গোড়ার বছরগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে মানবো না বলে বাংলা কবিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গ ওঠে ও শেষতম তরঙ্গটি-ই যার শীর্ষে ছিলেন— সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে—রবীন্দ্র বিরোধিতায় উন্নততম।

৩। দেশি কুসংস্কারে ইতিহাসকে পছন্দ মতো বানানোর প্রয়াসে যদি এতোদিন ভুল শিক্ষাই পেয়ে থাকি—কাব্য পাঠের অভিজ্ঞতাও তো শ্রীযুক্ত আইয়ুবের কথায় সায় দেয় না। তিনি রুচি ও রচনাশৈলী-র কথা বলেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-ই তো বাংলা কবিতায় সবচেয়ে বেশি অরাবীন্দ্রিক উপাদানের দ্বারা নির্মিত শৈলী এনেছেন। এবং সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শৈলী সেই স্বাতন্ত্র্যেরই আর এক নিশানা। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর তো দেখছি রাবীন্দ্রিক শৈলী ফিরে এসেছে। চরণকে ছন্দের দিক থেকে পূর্ণ বৃত্ত করা, বাক্ প্রতিমাকে সাজানো-গোছানো, বাক্যবন্ধে কোনো জটিলতা না আনা, ক্রিয়াপদের উদার ব্যবহার প্রভৃতি। আমি কিন্তু কখনোই বলছি না এগুলোই দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী কবিতার একমাত্র শৈলী। বলতে চাইছি এগুলোও দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী কবিতার শৈলীর উপাদান। তাঁর কাছে বাংলা সাহিত্যের এই আধুনিক কবি কারা তা স্পষ্ট করে না বলায় আমার বোঝার পক্ষে অসুবিধে হচ্ছে। পাছে আমিও অস্পষ্ট থেকে যাই, তাই শ্রীযুক্ত আইয়ুবকে নিবেদন, "রবীন্দ্রকাব্যের অনুশীলন নয়" বলে যাঁদের রুচি ও রচনা শৈলীকে তাঁর মনে হয়েছে, "বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাঁদের কবিজন্ম" সেই কবিদের রচনায় কি তিনি কখনো কখনো খেয়া-গীতাঞ্জলি, এমন কি কল্পনার ছন্দ আর বাক্য নির্মাণের ধ্বনি শুনতে পান না? আমি যে শুনতে পাই তার নজির রেখে দেয়া নিরাপদ—

১।   তখনো ছিল অন্ধকার   তখনো ছিল বেলা
     হৃদয়পুরে জটিলতার   চলিতেছিল খেলা
     ডুবিয়া ছিলো নদীর ধার   আকাশে আধোলীন
     সুষমাময়ী চন্দ্রমার   নয়নে মায়াহীন

২। পা ছুঁয়ে যে প্রনাম করি সে কি কেবল দিনযাপনের নিশান?
    আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
    নির্জীব পা সরিয়ে নাও কিনা—।

মাত্র দুটো নজিরেই নিশ্চয়ই এ-প্রমাণ চলে না যে এঁরা কতো বেশি রাবীন্দ্রিক কিন্তু এটুকু নিশ্চয়ই বলা চলে এঁরা কেবলই অরাবীন্দ্রিক নন।

তাই "বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাদের কবিজন্ম" তাঁদের সম্পর্কে শ্রীযুক্ত আইয়ুবের অনুমানগুলির নাগাল অভিজ্ঞতায় পাই না বলেই মেধভক্তির প্রসঙ্গ এতোবার আসে। তাহলে অন্তত সিঁড়ি ধরে ধরে এগনো যায়। নইলে একথা মানতে কেমন সঙ্কোচ হয়, শ্রীযুক্ত আইয়ুবের কথা হওয়া সত্ত্বেও, যে রোম্যান্টিকতা-বিরোধী কাব্যবোধের ধাক্কায় রবীন্দ্রনাথ ছোট হয়ে গেলেন। ছোট আর বড় তো আপেক্ষিক। মানদণ্ডটা কি। রবীন্দ্রনাথ আলাদা হয়ে গেলেন, বিচ্ছিন্নও

হয়তো। তাতে রবীন্দ্রনাথের ও আধুনিকতার এলো গেলোটা কি ?

কারণ আধুনিকতার কোনো সংজ্ঞা শ্রীযুক্ত আইয়ুব দেন নি। বোদলেয়র থেকে গিন্‌সবার্গ কোন্ সূত্রে তাঁর কাছে আধুনিকতার তাৎপর্যে একত্রিত তা তিনি জানান নি।

আধুনিকতার সংজ্ঞাহীন লক্ষণ তাই ক্যাটিগরিহীন অমঙ্গলবোধকেই আশ্রয় করে। তাই শ্রীযুক্ত আইয়ুবের মতো দিকপাল উকিল জুটলেও, অমঙ্গলবোধেরও কবি রবীন্দ্রনাথ, এই সিদ্ধান্তটা তেমন জুতসই দাঁড়ায় না। বা মঙ্গলবোধ, ঈশ্বরবোধে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েই পান নি, দুঃখবিষাদের মধ্যে দিয়েই পেয়েছিলেন—এই অ্যালিবি। তার একমাত্র কারণ

১। "কড়ি ও কোমলে দুটি বিপরীত ঠাটের রাগিনী একই সঙ্গে বেজে উঠেছে—জীবনের জয়গান এবং 'মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি' "

২। "প্রেমিক তার মানুষী প্রিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গভীর ব্যথা ও অসম্ভব আশা বুকে ধারণ ক'রে বেরিয়ে পড়ছে তার মানসীর সন্ধানে"।

৩। "আমরা ঈশ্বরের আরও এক ধাপ কাছে পৌছই যখন রবীন্দ্রনাথ জীবন দেবতার সংজ্ঞাকে প্রশস্ততর করে বলেন, কবির অন্তরালে যিনি কবি"

৪। ("পরিব্যাপ্ত নৈরাশ্য ও বিষাদের ঘনায়মান অন্ধকার থেকে") "নিষ্ক্রমনের দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ খুঁজে পেলেন রবীন্দ্রনাথ, একটি পথ ক্ষণিকা, অন্যপথে কালিদাসের কাল পেরিয়ে বৈদিক ভারতবর্ষে "

৫। "গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, গীতালি —স্পষ্টতই ঈশ্বর প্রেমের কবিতা বা গান"

যথাক্রমে "কড়ি ও কোমল" "মানসী" "চিত্রা" "ক্ষণিকা-নৈবেদ্য" "গীতাঞ্জলি গীতিমালা-গীতালি"—এই কাব্যগুলি সম্পর্কে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে শ্রীআয়ুব এসেছেন পুথিগত ব্যাখ্যার পথ দিয়ে। "রবিরশ্মি" থেকে সুরু করে "রবীন্দ্রপ্রতিভার ধারা" (শ্রীক্ষুদিরাম দাশ) পর্যন্ত তো এই পুথিগত ব্যাখ্যাই বিশ্ববিদ্যালয়ি রবীন্দ্র চর্চা। কিন্তু শ্রীযুক্ত আইয়ুব একবারো ব্যাখ্যা করলেন না এই দুঃখ-বিষাদ, ঈশ্বর-সন্ধান আর মানবী থেকে মানসীতে যাওয়া রবীন্দ্রনাথে এলো কোত্থেকে। এর সঙ্গে বিহারীলালের বিষাদ আর মধুসূদনের ট্রাজিডি চেতনা আর নবীনচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির ফারাক কোথায়। কাব্য বিচারে অধুনা স্বীকৃত এলিয়টি সূত্র—কবি স্থাপিত হন তাঁর অতীতে ও ভবিষ্যতের সঙ্গে অন্বয়ে—শ্রীযুক্ত আইয়ুবের হাতেও যদি প্রয়োগে দীপ্তি না পায় !

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুঃখ, বিষাদ, মরুন, তৃষ্ণা, অরূপ, ঈশ্বর এ-শব্দগুলির কোনো লক্ষণার্থ নেই। আর শ্রীযুক্ত আইয়ুবের সিদ্ধান্তগুলি অবরোহনে একেকটি মুখ্যপ্রতিজ্ঞা যদিচ সে প্রতিজ্ঞাগুলি আরোহী ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত নয়। মুখ্যপ্রতিজ্ঞার সঙ্গে সিদ্ধান্তের হরিহর-আত্মতা ঘটানোর দায় এমনই প্রাণান্তিক যে শ্রীযুক্ত আইয়ুবের মতো রসগ্রাহীকেও এইমতো করুণ ব্যাখ্যা লিখতে হয়:

"আর-এক প্রকার দুঃখের কথা গীতাঞ্জলিতে বারে বারে বলা হয়েছে। ...তাঁকে না পাওয়ার দুঃখ। ...যে বিরহ মিলনেরই সম্ভাবনায় মদির, তা মিলনেরই পূর্বাস্বাদন, তিক্ত হলেও সুস্বাদু।

তুমি যদি না দেখা দাও
　　করো আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা

এ অনুযোগ ব্যর্থ হবার নয়, ব্যর্থ হবে এমন আশঙ্কা নেই অনুযোগকারিণীর মনে। যদি থাকত...এই আবদারের সুর তাতে বেমানান হ'ত।

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
　　দুরন্ত বাতাসে।

'দুরন্ত' শব্দটা লক্ষণীয়। যে বাতাসের সঙ্গে পরাণ কেঁদে বেড়ায় তাকে ছোট ছেলের মতো আদর ক'রে বলা হচ্ছে 'দুরন্ত'।" তিনি কি "দুষ্টু" সাজেস্ট করেছেন? তা হলে-ই শ্রীযুক্ত আইয়ুবের অভিপ্রেত ব্যাখ্যা জুতসই হতো না কি? অঝোর জলধারার দুর্গে বন্দিনীর বিরহ সামান্যতম অলঙ্কার খুঁজে পায় না এমন নিঃসীম নিঃসঙ্গ, কল্পনায় অলঙ্কৃত অস্তিত্বের সঙ্গসুখও যেখানে সকল সম্ভাবনার বাইরে, তাই জিভের ডগায় শব্দ আসে—দুরন্ত।

কিন্তু আরোহী যুক্তিশৃঙ্খলার হদিশ শ্রীযুক্ত আইয়ুবের জানা না থাকলে আর কার জানা থাকবে। "মানসী"-র অতৃপ্তি ও বিষাদের মূলের খোঁজ করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরীর কোনো একটি প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথের এই উত্তরটার উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন

"একএকবার আমার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে টানছে,

আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারত-বর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপীয় চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে···একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। সব সুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাসীন্য।"

কিন্তু এই দ্বন্দ্বকে "মানসীর প্রেমের কবিতাগুলির নৈরাশ্য ও বিষাদের মূল কারণ" বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে সেই কারণের মূল নির্দেশ করেছেন "আত্মার রহস্য শিখা" ও "এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্য" সন্ধানে। অর্থাৎ তাঁর অবরোহী যুক্তি শৃঙ্খলার মুখ্য প্রতিজ্ঞাটিকে প্রতিষ্ঠিত করে যে আরোহী যুক্তি শৃঙ্খলা তাকে হাতে পেয়ে খ্যাপার মতই ছুঁড়ে ফেলে আবার তিনি তা-ই অনুসন্ধান করতে কোমর বাঁধেন।

বিষ্ণু দের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার দায় ইতিমধ্যেই যথেষ্ট হলেও তা বিশেষত এই কারণেই নতুন তাৎপর্য পেয়েছে যে তাঁর "রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতা" নামক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রচর্চার পক্ষে এই নিতান্ত প্রয়োজন একটি মেগডের প্রস্তাবনা করেছেন। বলে রাখা ভালো যে এই প্রবন্ধটির গ্রন্থরূপ আমার হাতে আসার সুযোগ হয় নি বলে ৭২ বঙ্গাব্দের শারদীয় সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত রূপটিই একমাত্র সম্বল। আমি যেমন বুঝতে পেরেছি তাতে বিষ্ণু দের সংগঠনটি এইরূপ :

১। "রবীন্দ্রনাথের **তত্ত্ববিশ্ব ও শিল্পসাহিত্য কর্মে** যেমন বড় রকমের একটা মিল, তেমনি একটা অনিবার্য বিরোধও উহ্য, যদিও থেকে-থেকে কম বা বেশি দেখা যায় তাঁর কবিত্বে এবং প্রায়শই তাঁর চিত্র প্রেরণায় আর প্রবীন বয়সের স্বাধীন বা স্বাভিভাবক বহু গানে ও গীতিনাট্যে তত্ত্ব যায় হেরে। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে এই তত্ত্ব-সংগঠন না করলে রবীন্দ্র কীর্তি থাকত অনেকাংশে মূক, অপ্রকাশিত।"

২। "মনোবিজ্ঞানে যে-তিনটি ক্রান্তি বা সংকট পর্ব এই স্বীয় সত্তাবোধের আদি সংকটের পরবর্তী বলা যায় : নৈঃসঙ্গ ও অন্তরঙ্গতার দ্বৈতাদ্বৈত সমস্যা, সৃজনশীলতার সংকট এবং স্বভাব কৈবল্যের সমস্যা—এই তিনটি মূলপর্বেই রবীন্দ্রনাথের বারংবার পরীক্ষোত্তরণ বোধহয় পৃথিবীর ব্যক্তি-ইতিহাসে এক দুর্লভ ব্যাপার"

৩। "ঐ দ্বন্দ্বময়তাকে তিনি কয়েকটি পুরুষার্থ বা মূল্যবোধের আবেগে বেঁধে-ছিলেন · ···"

অর্থাৎ বিষ্ণু যে প্রথমেই তাঁর সংগঠনটিকে এমনভাবে দাঁড় করান যে উপস্থাপিত পরবর্তী ব্যাখ্যা ও তথ্যের সঙ্গে এই সংগঠনকে মিলিয়ে নেবার অবকাশ জোটে যাতে করে তিনি আপ্তবাক্য উচ্চারণের অপবাদ থেকে স্বচ্ছন্দেই মুক্তি পান। আধুনিকতার সংজ্ঞা থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথে দ্বন্দ্বময়তার সংকট ও উত্তরণের সাক্ষ্যপ্রমাণসহ ব্যাখ্যা আর "প্রেইআদ্ থেকে পারনাসীয় কবিতার ঐতিহ্য" যাঁদের মনের মাটিতে তাঁদের রবীন্দ্র সংক্রান্ত সংশয়-অভিযোগের জবাব আর আধুনিক বিশ্বের আধুনিক শিল্পীসাহিত্যিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন ও মননের পার্থক্য ও সম্পর্কের প্রসঙ্গে মূলরচনা-রবীন্দ্রকৃত অনুবাদ-স্বকৃত অনুবাদ পাশাপাশি এনে তার উপরে বিষ্ণু যে এমনভাবে সংগঠনটিকে দাঁড় করান তাতে আমার মতো অন্য কোনো পাঠকও যাতে দিকদিশা হারিয়ে না ফেলেন সেই কারণে আমি প্রবন্ধটির অখণ্ডতা তিনভাগে ভাঙছি—প্রথম ভাগ—ভূমিকা : আধুনিকতার সংজ্ঞা ও রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় ভাগ—রবীন্দ্রনাথে এই সংজ্ঞার প্রয়োগ ও পরীক্ষা। তৃতীয় ভাগ—অন্যান্য আধুনিক শিল্পীর মন ও মননের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য।

প্রথম ভাগটিই সবচেয়ে জরুরি। "সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে সংকট যন্ত্রণা ও উত্তরণের পর্বপরম্পরা ব্যক্তি বিশেষের সীমায়িত সমস্যামাত্র···সেখানেও ব্যক্তিসত্তার সার্থকতা, স্বাস্থ্য ও উৎকর্ষ নির্ভর করে কীভাবে ঐ সংকট পর্বগুলি মানুষটি ব্যক্তির অহংসর্বস্বতায় নয়, বরঞ্চ অন্য সংলগ্নতায় অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ ও ইতিহাসের অর্থে অতিক্রম করে। এবং এই সংকট ও উত্তরণ পর্ব পরম্পরার পুরুষার্থ সুষ্ঠু হয়, যখন মানুষটির সত্তাসমস্যা নিছক ব্যক্তিকভাবে অস্বাস্থ্য ও স্বস্তিলাভ, বন্ধন ও উন্মোচনের ব্যাপার থেকে যায় না, যখন আধিব্যাধি উপচিয়ে লোকটির চরিত্র হয়ে ওঠে রূপকের মতো ব্যাপ্ত অর্থাৎ সামাজিক, ঐতিহাসিক অর্থেই অর্থবহ, মূল্যবান।" এই নিরিখে তিনি এরিক এরিকসন কথিত লুথার কাহিনীর প্রসঙ্গই আনেন তাই নয়, পরবর্তীকালে পিকাসো বা বাকের ছবির আর আমাদের বিদ্যাসাগরের কথা এনে নিজের নিরিখকে ব্যক্তিগত নিরিখ না রেখে ঐতিহাসিক নিরিখে রূপান্তরিত করেন।

ফলে দ্বিতীয় ভাগে প্রবেশ মুখেই বিষ্ণু দে জীবনস্মৃতি থেকে যে দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দেন তা মূলত 'মানসীর' নৈরাশ্য ও বিষাদ প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব কর্তৃক উদ্ধৃত পত্রাংশের সঙ্গেই যুক্ত।

"আমাদের সমাজ, আমাদের ছোট ছোট কর্মক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত

একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে যেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পারে না, সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ ; এই জন্যই ইংরাজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় **স্বভাবতই** প্রার্থনা করে। (মোটা হরফ আমার)

এই কথাগুলি, রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতিতে" যদিও ভগ্নহৃদয়ের প্রসঙ্গ ধরেই এনেছেন তবু তাঁর "পনেরো-ষোলো বছর হইতে বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত" অর্থাৎ মানসী রচনাকাল পর্যন্ত সময় সম্পর্কেই, প্রযোজ্য। শ্রীযুক্ত আইয়ুবের অসুবিধা হয়েছে শৃঙ্খলার দিক থেকে বোধ হয় এইখানে যে ভারতীয়তা আর য়ুরোপীয়তার এই দ্বন্দ্ব কি করে কবিতার নৈরাশ্য আর বিষাদে পরিণতি পায়। "স্বভাবতই" শব্দটাকে সেই কারণে আমি ওপরের উদ্ধৃতিতে মোটাদাগে বুলিয়েছি। য়ুরোপীয় জীবন যে তখন আমাদের স্বভাবের মধ্যে প্রবেশ করেছে আর স্বভাবের এই দ্বন্দ্বময়তায় বাঙলাদেশের উনিশ শতক একবার রামমোহনের বিশুদ্ধ "জ্ঞানোজ্জ্বলিত হৃদয়ে", একবার বিদ্যাসাগরের র‍্যাশন্যাল কর্মজীবনে, একবার বঙ্কিমের সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়িকতার আধারে স্থাপিত মহৎ রোম্যান্টিকতায় আর একবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীবনে পাগলের মতো মাথা কুটেছে।

জাতির স্বভাবের এই দ্বন্দ্ব দেখতে পান নি বলেই শ্রীযুক্ত আইয়ুব তাঁর গ্রন্থে গীতাঞ্জলি বা রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-রসের কবিতা বা গান আমাদের প্রাণিত করে কেন এই নান্দনিক প্রশ্নের উত্থাপনা করেছেন। অথচ আজ থেকে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর আগে, আজ থেকে কিঞ্চিদধিক আশি বৎসর আগের তাঁর কাব্য জীবনের অভিজ্ঞতার রবীন্দ্রনাথকৃত ব্যাখ্যাতেই শ্রীযুক্ত আইয়ুবের এই সংশয়ের হদিশ মেলে

> "তখনকার কালের ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে যিনি আমাদের কাছে মূর্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি হৃদয়েরই উপাসক ছিলেন। সত্যকে যে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা নহে, তাহাকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিলেই যেন তাহার সার্থকতা হইল, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব ছিল। জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্মে তাঁহার কোন আস্থাই ছিল না, অথচ শ্যামাবিষয়ক গান করিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। এস্থলে কোনো সত্যবস্তু তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল না, যে-কোনো কল্পনায় হৃদয়াবেগকে উত্তেজিত করিতে পারে তাহাকেই তিনি সত্যের মতো ব্যবহার করিতে চাহিতেন।"

ইংরেজের দেয়া চৈতন্যের আততি নিয়ে ভারতীয় সত্যকে আমরা ত্যাগ করলাম নাকি সে আমাদের নাগালের বাইরেই চলে গেল, রয়ে গেল আর পরদেশিদের দানের চৈতন্যে মিটলো না স্বভাবের দাবি। তাই সত্য পাই কি না পাই, "সত্যের মতো" কোনো কিছু পেলেও আমরা অভিভূত। আর আমাদের খণ্ডিত জাতীয় চেতনায় গীতাঞ্জলির মতো সত্য অনুভূতি আর কোথায় পাব? আমি আস্তিক কি নাস্তিক ওসব কথার ধারও না-ধেরে সেই সত্যই আমাকে পর্যুদস্ত করে।

যাহোক,জাতীয় আত্মজিজ্ঞাসার উনিশশতকি এই সংকটই তো রবীন্দ্রনাথের চিত্তসংকটের আধার। এই সংকট থেকে কিশোর রবীন্দ্রনাথ পরিত্রাণের জন্য লড়ছিলেন তার উদাহরণ হিসেবে ভারতীতে মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনাটির বক্তব্যের তাৎপর্যের ত্বরিত ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যার ইঙ্গিতমাত্র আমাদের মুগ্ধ করে। বিষ্ণু দে-র লেখা এই লাইনগুলি পড়বার আগে কোনোদিন মাথাতেও আসে নি 'গোরা'র সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব তখনই বীজাকারে দেখা দিয়েছিল ঐ রচনাতে। কিন্তু সংশয়ে পীড়িত হই যখন দেখি, আত্মসংকটের এই লড়াইয়ের সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিষ্ণু দে কবিকাহিনীর প্রসঙ্গ আনতে বলছেন "…কিশোর কবির নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বিষাদ, তাঁর আত্মসংকটের আর্তনাদ বিশিষ্ট চেহারা পেয়েছিল।" "এই বিশ্বৈকাত্মতা রবীন্দ্রনাথের মনে আজীবন ভর করেছিল আকাশ-বাতাসের মতো। এবং বিশ্ববোধ এ-ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে. নিঃশেষ ছিল না, বালকের জানা ছিল যে 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন'।" রবীন্দ্রনাথের সত্তাসঙ্কটের সাক্ষ্য বিষ্ণু দে এই ভাবে যখন 'কবিকাহিনী'তেই আবিষ্কার করেন এবং রবীন্দ্রতত্ত্ববিশ্বের একটা অন্তত আভাস এই কাব্যটিতে মেলে বলে সিদ্ধান্ত করেন তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—'বনফুল'-ও নয় কেন। 'বনফুল' রচনার আগে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়ে গেছে। সেই কনিষ্ঠ পুত্রকে কি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুর আর হিমালয় মানে ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তারও অনেক পরে তো "মানবসমাজের বিশ্ব করাঘাত করে চলে নলিনীর স্বপ্ন ভেঙে জোড়াসাঁকো, বোলপুর, বক্রোটার অলকাপুরীর গজদন্তরচিত দ্বারে"—বিষ্ণু দে। Ritualisation of his worklife তো তখনই সুরু হয়ে গিয়েছিল মহর্ষি পিতার এই জীবনাচরণের সহযাত্রায়—"ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিশ ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না,

এবং তাঁহার কাজেও যেমন তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না।" তের বছর বয়সের কবির 'বনফুল' কাব্য রচনায় পেছনের ইতিহাসের প্রভৃতির আরো সব সাক্ষ্য টেনে না এনেও বলা যায়, আপাতদৃষ্টিতে প্রচলিত কাব্য-সংস্কারের অন্ধ অনুসরণ আর বিহারীকবির কাব্যরীতির অন্ধ অনুকরণ চোখে পড়লেও, কাব্যের ভেতরে তো এমন নির্ভুল সাক্ষ্যও আছে, যাতে এ-কাব্যের পেছনে কবির ব্যক্তিঅভিজ্ঞতার আর সেই অভিজ্ঞতার আধার সন্ধানের সক্রিয় লড়াইটা বেশ ধরা পড়ে যায়।

১। অনুকারক তের বছর বয়সের এই কবির কাব্যটির অনুরূপ, কোনো বিহারীকবির পক্ষেও লেখা সম্ভব ছিল না। বিহারী কবির অনুকরণে কবি চেষ্টা করেছেন কাহিনীর মূলবিন্যাস ভুলে গিয়ে সুযোগমাত্র রোম্যাণ্টিক প্রসঙ্গান্তরে একেবারে ডুবে যেতে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পুত্রের পক্ষে "মনের মধ্যে কোনো জিনিশ ঝাপসা" রাখা সম্ভব ছিল না। সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা দিয়ে ঘেরা হিমালয়ের অখণ্ড স্বাধীনতার শিক্ষা তরুণ মহত্তের ওপর ব্যর্থ হতে পারে নি। তাই বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্যের সঙ্গে তুলনাতেও 'বনফুল'-এ পাওয়া যাবে না উচ্ছ্বাসের আত্মঘাতী উদ্বেলতা।

২। চকিতে এমন চরণের সঙ্গেও তো বনফুলে দেখা হয়ে যায়

লভেছি জনম করিতে রোদন
রোদন করিব জীবনভোর

যা কখনো কড়ি ও কোমলের অনুষঙ্গ আনে। দ্বিতীয় সর্গের শেষে কমলার আশ্রম ত্যাগের বর্ণনার শেষাংশে পরবর্তী "যেতে নাহি দিব"র একটা ক্ষীণতম কঙ্কালের আভাস পেয়ে যাওয়াটা যদি নেহাতই অমার্জনীয় হয়ে পড়ে তাহলে— তৃতীয় সর্গের পরবর্তী গানটির তৃতীয় স্তবক থেকে কিছুদূর, ছন্দে তো বটেই, এমনকি ভাবে-ভাষায়-কল্পনায়, অনেককাল পর রচিত সোনার তরীর পুরস্কার কবিতায় বাণীবন্দনা অংশটির প্রাথমিক খসড়া মনে না হয়েই পারে না।

৩। কমলার কল্পনার পেছনে বঙ্কিম-পুষ্ট কিশোর কল্পনা কাজ করেছে কি না সে হয়তো অনুমানের ব্যাপার, কিন্তু প্রেম আর পাপের দ্বন্দ্বের সেই প্রাথমিক চেতনার পেছনে নিশ্চয়ই দেবতুল্য বিহারীলালের আদর্শ সক্রিয় ছিল না।

৪। তাই সেই হিমালয়বাসের অভিজ্ঞতা তার প্রত্যক্ষতা নিয়েই আসে:

যবে শিখরের 'পর
উড়িয়া উড়িয়া বেড়াত দলে,
শিখরেতে উঠি বেড়াতাম ছুটি—
কাপড় চোপড় ভিজিত জলে।

৫। প্রমাণ করবার উকিলি দায় না নিয়েও এটুকু বলা যায় যে বনফুল-এর হিমালয় বর্ণনা আর কমলার মুখের পৌনঃপুনিক পিতৃস্মৃতি আর নির্বাসনের সুখস্বর্গ থেকে মানুষের সংসারে প্রবেশে এই ঘোষণা

হায় রে সেদিন ভুলাই ভালো!
সাধের স্বপন ভাঙিয়া গেছে!
এখন মানুষে বেসেছি ভালো,
হৃদয় খুলিব মানুষ কাছে!

বারবার আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় জীবনস্মৃতি'র পিতৃদেব, হিমালয়যাত্রা আর প্রত্যাবর্তন এই ধারাবাহিক অধ্যায় তিনটিতে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে মুণ্ডিতমস্তক যে-বালককে দেবেন্দ্রনাথ নিয়ে গিয়েছিলেন, সে-বালক আর কোনোদিন ফিরে আসে নি। হিমালয় থেকে রবীন্দ্রনাথ যে একা একা ফিরেছিলেন—দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ফেরেন নি—এই ঘটনার পেছনেও একটা তাৎপর্য খুঁজতে ইচ্ছা যায়।

"বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে—এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পেঁছিলাম। ..তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।"

৬। কিন্তু সেই তরুণ মহত্তের জন্য নিষ্ঠুরতর নির্বাসন অপেক্ষা করে ছিল। "ইহার পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্বের চেয়েও অনেক কঠিন হইয়া উঠিল। দাদারা···আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন।·· আমি বেশ বুঝিতাম ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে।"—আর ভদ্রসমাজের বাজার থেকে নির্বাসিত মহৎ তরুণ তাঁর তরুণ মহত্ত্ব নিয়ে "সেই অল্প পরিচিত কল্পনাজড়িত অন্তঃপুরে একদিন বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলাম। যাহা প্রতিদিন পরিমিতরূপে পাইতে পাইতে সহজ হইয়া যাইত তাহাই হঠাৎ একদিনে বাকিবকেয়া সমেত পাইয়া যে বেশ ভালো করিয়া তাহা বহন করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না।"

বনফুল-এ কমলার নির্বাসন বেদনা, বারবার হিমালয়ে পিতৃগৃহের স্মৃতি চারণা, প্রথম থেকেই কখনো কখনো মৃত্যুর সঙ্গে আত্মীয়তা আর মানবজীবনে প্রবেশে যার সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনবোধ, বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর হাতে তার মৃত্যু—সেই বিশ্বাসঘাতকতাই আবার কমলার স্বামী এবং শেষে বাল্যভূমিতে ফিরেও কমলা কোনো আশ্রয় খুঁজে পায় না এককালের সেই সম্পূর্ণ অধিত জীবনেও। পিতৃস্নেহের আশ্রয় থেকে চ্যুত, বাল্যের আশ্রয় থেকে চ্যুত, সংসারের আশ্রয় থেকে চ্যুত কমলা-র একমাত্র আশ্রয় মৃত্যু। আর নিরবলম্ব এই কমলার বর্ণনায় তের বছরের তারুণ্যে মহত্ত্ব ভর করে—আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত করার তাড়ায়—

অনন্ত আকাশ মাঝে একেলা কমলা !
অনন্ত তুষারমাঝে একেলা কমলা !
সমুচ্চ শিখর পরে একেলা কমলা !
আকাশে শিখর উঠে
চরণে পৃথিবী লুটে
একেলা শিখর-প'রে বালিকা কমলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্যরচনা সুরু করেছিলেন মৃত্যু, পাপ, বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা আর আত্মহত্যার একটি কাহিনী লিখে। শুনতেই কেমন অবিশ্বাস্য। অথচ প্রমাণিত সত্য।

এতোক্ষণে বোধহয় এমন একটা ভুল ধারণা সৃষ্টির সুযোগ দিয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে তাঁর সত্তাসঙ্কট আর তত্ত্ববিশ্বরচনার ডায়ালেকটিসে বিষ্ণু দে 'কবিকাহিনী'কে যে স্থান দিতে চেয়েছেন আমি 'বনফুলে'র জন্য সেই জায়গাটি চাইছি। না। তত্ত্ববিশ্বের কোনো সাংগঠনিক উপাদান 'বনফুল'-এ নেই। আবার সত্তাসঙ্কটের এতো উলঙ্গ প্রকাশ, বাল্য আর কৈশোরের অভিজ্ঞতার এমন বিন্যাস—কবিকাহিনীতে নেই। তাই বনফুল আর কবি-কাহিনী-র মিলিত বিশ্লেষণে সেই তরুণ মহত্তের জীবনের তাত্ত্বিক গঠনবিন্যাসটি ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রতত্ত্ববিশ্বের ভূগর্ভের এই আলোড়নে যা কিছু শব্দে-ছন্দে বাইরে বেড়িয়ে এসেছে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণেই, বিষ্ণু দে নির্দেশ করেছেন, রবীন্দ্র-নাথের হৃদয়-মন-মনীষার সংগঠন ধরা পড়বে। ইতিহাস আর মনোবিজ্ঞানের পরিপূরকতায় ব্যক্তিজীবনের গূঢ়তায় এই অন্বেষণ। এই অন্বেষণের প্রাথমিক

চেষ্টাতে এমন আশ্চর্য ঘটনা ধরা পড়ে যে তের বছর বয়সের বাল্যরচনা "বনফুল"-এর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরবর্তী পরিণত রচনার যে বস্তুগত বা ভাবগত মিলই ঘটে গেছে তাই নয়, রবীন্দ্রজীবনীকার কর্তৃক অংশত উদ্ধৃত জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত তের বৎসর বয়সের "প্রভাত প্রলাপে" —আট বৎসর পর রচিত কবির "সমস্ত কাব্যের ভূমিকা" নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের প্রাথমিক খসড়ার চিহ্ন।

আয় কল্পনা মিলিয়া দুজনা
ভূধরে কাননে বেড়াব ছুটি।
সরসী হইতে তুলিয়া কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।
দেখিব উষার পূরব গগনে,
মেঘের কোলেতে সোনার ছটা।...
বলিব দুজনে—গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া হৃদয় ব্যথা;
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগৎ শুনিবে সে-সব কথা

বা অন্যতর একটি কবিতায়

চাল ঢাল চাঁদ! আরো আরো ঢাল
সুনীল আকাশে রজতধারা।
হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরাণ হয়েছে পাগলপারা।
গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি।
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
পরাণ আজিকে উঠেছে মাতি।

তের-চোদ্দ বছর বয়সের এই রচনাতে-ই কি তখনকার কাব্যভাষার বিরোধী, কাব্যধারণার প্রতিবাদী রবীন্দ্র-কাব্য-ভাষা আর ধারণা স্পষ্টতা চাইছে না? অঙ্কপ্রসঙ্গে বিষ্ণু দে জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয় অংশ থেকে একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি দিয়েছেন। "অনেকদিন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির

বিষয় আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠছে—নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে—…।" কোন অভিরিক্ততার সংযোগে তের বৎসর বয়সের পদ্যপ্রলাপের ভাষা আর ছন্দ আর অনুষঙ্গ—একুশ বয়সের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ বা তার-ও পরে ব্যবহৃত হয়ে কবির "সমস্ত কাব্যের ভূমিকা" বা "কাব্যানুসংধানে ভাষা" হয়ে ওঠে তার বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে কি রবীন্দ্রনাথের সত্তার, সেই সত্তা বা নিজের ভাষায় নিজেই লালিত-পালিত, সচেতনতালাভের ইতিহাস রচিত হতে পারে। মহর্ষির পরিবারে "কড়ি ও কোমল"-এর "দুঃসাহসিক রূপদানের কৃতিত্বের" ইতিহাস তো রচিত হয়েছে কবি কর্তৃক খারিজ করে দেয়া বাল্যরচনা থেকে সুরু করে, "বনফুল" থেকে রবিচ্ছায়া পর্যন্ত ছয়টি কাহিনী কাব্যের দীর্ঘতায়, একটি অন্তত গীতি-নাট্যের লিরিক সংঘাতে, পাঁচটি কাব্যের ছোট ছোট কবিতায়, একটি উপন্যাসে, তিনটি অন্তত জার্নালধর্মী রচনায়—সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালাবার আগে সকাল বেলার এই পরিমান সলতে যে কোন গড়পড়তা শিল্পীসাহিত্যিক সারা জীবনেও পাকাতে পারেন না। তার বেষ্টন থেকে বেরিয়ে আসতে বা আবেগের দেয়াল ভেঙে ফেলতেই যে আত্মসচেতনতা ও আবেগের অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বাঁধছিলেন তারই কাহিনী তো একুশ বছর বয়সের সীমা পর্যন্ত এই রচনা-বলিতে। বিষ্ণু দে সেই আত্মসচেতনতা লাভের উপাদানের তালিকা দিতে "তাঁর দেশ ও কাল, তাঁর দুর্গত সামাজিক পরিস্থিতি, পারিবারিক পরিবেশের আভিজাত্য; মাতাপিতা, বিশেষ করে পিতার কঠিন কিন্তু সহানুভূতি কোমল প্রভাব; তাঁর অগ্রজেরা, বিশেষত একপক্ষে জ্যোতিদাদা ও মেজদাদা আর বৌঠানেরা এবং গুণেন্দ্রনাথ; অন্যপক্ষে হেমেন্দ্রনাথের কড়া শিক্ষাব্যবস্থা এবং বড়দাদার ব্রহ্মচর্য বিষয় আকস্মিক উপদেশ এবং ইওরোপীয় জীবনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তাঁর সমস্ত গোঁড়া তর্ক"—এ-সবের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই উপকরণগুলি তো অনেকবারই পরস্পরের বিরোধিতা করেছে তখন। বাল্যের নির্বাসন থেকে হিমালয় প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে মুক্তি, দেখতে দেখতে ভদ্রসমাজের বাজার থেকে নির্বাসনে দাঁড়িয়ে যাওয়ায়, পরবাস ঘোচাতে কবিকে সবদিকে ছুটতে হয়েছে। হিন্দু-মেলা জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত দিতে চাইছিল কিন্তু সেখানেও পৃথিবীর অন্য সব কাজের অনুপযুক্ত এই তরুণ মহত্তের মনের মুক্তি ছিল না। বিলাতপ্রবাস আর সেই প্রবাস থেকে ফেরার পর-ও এ-প্রবাসবেদনা ঘোচে নি। ১৮৮০ থেকে

১৮৮৩-র মধ্যে ব্যারিস্টার হবার আশায় তিন তিনবার রবীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রার আয়োজন করেছিলেন। আর প্রতিবারে যাত্রার ব্যর্থতার পর সেই অন্তঃপুরেই ফিরে আসছিলেন—যে অন্তঃপুরে কবিতা ছিল আর ছিলেন কাদম্বরী দেবী। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৩ আঠারো থেকে বাইশ—রবীন্দ্রনাথের আত্মসচেতনতার সবচেয়ে কঠিন কাল। বাইরের কর্মের পৃথিবীর থেকে অন্তঃপুরের আশ্রয়ে যতো বেশি মুক্তি মিলছিল ততো বেশি বিরোধ-ও বাধছিল সেই অন্তঃপুরের-ই সঙ্গে। তাই কাদম্বরী দেবীর যে স্থানান্তরপ্রস্থানে বিশ বয়সের কবি মর্মভেদী চিৎকার করে ওঠেন সেই প্রস্থান সম্বন্ধেই পরবর্তী মন্তব্য—"তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার আশায় মন স্বভাবতই যে সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধকরি তাঁহারা দূরে যাইতেই…কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল।" সন্ধ্যা সঙ্গীতের শেষেই তো 'হৃদয়নাশা', 'বিকৃত', 'ছেলেখেলা' ভালোবাসা-কে "দূর করতে" চিৎকার করেন। অন্তঃপুরের সেই বিরোধ এমনও তীব্রতা পায় :

এমনি হয়েছে শান্ত মন,…
ভালো লাগে বিহঙ্গের গান,
ভালো লাগে তটিনীর কথা।
ভালো লাগে কাননে দেখিতে
বসন্তের কুসুমের মেলা,…

যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিয়ো না নিয়ো না কেড়ে
নিয়ো না নিয়ো না মনমোর।…
আবার হারাই যদি এই গিরি এই নদী
মেঘবায়ু কানন নির্ঝর…
তাহা হলে এ জনমে নিরাশ্রয় এ জীবনে
ভাঙা ঘর আর গড়িবে না।

আর সন্ধ্যাসঙ্গীতের শেষ উপহারে-ই অন্তঃপুরচারিণীকে কবি এক বিগত জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ততোদিনে তো ভদ্রসমাজের বাজারে রবীন্দ্রনাথের অন্ত এক পরিচয়ের সূত্রপাত হচ্ছিল ভগ্নহৃদয়ের কবিকে ত্রিপুরা-রাজের বা সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিকে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনন্দনে।

আত্মসচেতনতার আততিতে, পরিপার্শ্বের সঙ্গে নিজের সঙ্গতিতে, সন্ধ্যা-সঙ্গীতের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রভাতসঙ্গীতে আর ছবি ও গানে

পরিক্রান্ত হচ্ছিল—১২৯০ এর গ্রীষ্মবর্ষাবাস কারোয়ারের সমুদ্রসৈকতে, ১২৯০ এর অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ, ১২৯০ এর ফাল্গুনে কারোয়ার বাসের স্মৃতির ছবি ও গান "যাহার নয়নকিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি-একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে" উৎসর্গ, ১২৯১-র বৈশাখে সেই বৌঠানের আত্মহত্যা। আর তার আগেই দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ জমিদারির "জমাওয়াশিল বাকি ও জমাখরচ" "প্রতিদিনের আমদানি-রপ্তানি পত্রসকল" দেখা সুরু করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আত্মসচেতনতার বিকাশে, পরিপার্শ্বের সঙ্গে সেই আততির সঙ্গতিসাধনের যে-ব্যাখ্যা বিষ্ণু দে উপস্থিত করেছেন—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অশিক্ষিত আমি সে-ব্যাখ্যার কাছে এতো বেশি ঋণী যে কাব্যভাষার বিবর্তনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ষোলো বছরের বা তাঁর তের থেকে উনত্রিশ বয়সের বা মানসী পর্যন্ত প্রয়াসের কাহিনী না থাকাতে নিজেকে বঞ্চিত না ভেবে পারি না। সেই ভাষা, যাতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে চিনেছেন। আর সেই প্রসঙ্গে-ই অনিবার্য এসে যায় তাঁর অন্তঃপুর জীবনের কথা—সেই ভাষার অন্যতর উৎস।

তাঁর রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক প্রবন্ধটিতে সুরজিৎ দাশগুপ্ত-ও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন—"ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্তরে স্বকীয় উপলব্ধির ধারণে বা প্রেমের অনুসরণে লোকবাধা অতিক্রম করতে পারেন নি, হয়তো সেই অক্ষমতাকে পূরণ করলেন কাব্যের ক্ষেত্রে লোকসিদ্ধছন্দের বেড়া ভেঙে মানসীতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রবর্তন করে।"

অথচ আমার আশা নষ্ট করে তারপরই সুরজিৎ দাশগুপ্ত এবংবিধ সাধারণ মন্তব্য করে বসেন—"মানসসুন্দরী ক্রমে বিবর্তিত হলেন জীবনদেবতাতে।"

সুন্দরীরা কেন দেবতা হতে চান, মানস আর জীবনের ফারাকটাই বা কোথায় সে-সব কথার মীমাংসা আগে হওয়া দরকার। আবার সঙ্গে সঙ্গে দরকার রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপনা। সেই পরিপ্রেক্ষিত যেমন বাংলাদেশের উনিশ শতকে তেমনি দান্তে গ্যয়টে-তে বা শেক্সপীয়রে বা বোদলেয়রে বা ব্রেখটে রচিত। তাই তুলনামূলক আলোচনার বিস্তৃত প্রয়াসে কালক্ষেপের বদলে সুরজিৎ দাশগুপ্ত তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দান্তে, গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করে ঐ পরিপ্রেক্ষিতটাকেই প্রাঞ্জল করে তোলেন। "মধ্যযুগের খোলস কাটিয়ে ইউরোপের লৌকিক চেতনা যখন সবে আধুনিক যুগের পানে উন্মুখ সে সময় 'ডিভাইন কমেডি' লেখা হয়"—এ কথার

আলোচনাতেও অন্তত একবার চিরনির্বাসিত কবিটিকে দেখা যায়—তার মুখমণ্ডলের অন্যায় শ্মশ্রু দেখে কুমারীরা অঙ্গুলি সংকেতে বলতো—'ঐ যায় দান্তে নরকের আগুনে তার দাড়ি ঝলসে গেছে।' দাড়ি থাকলেই যে ঋষিমশাই বনে যায় না, এ-কথাটি অন্তত, রবীন্দ্রসম্পত্তির অছি আর বোদলেয়র থেকে ভালেরির রসে তৃপ্ত আধুনিকতার অছিদের, স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো।

সেই সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে আমি অন্তত জানতে সাহায্য পেয়েছি—এই তিনটি বই থেকেই।

ভিয়েতনামের গেরিলাদের সঙ্গে

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

দিল্লীর কেরামতিতে ভোগান্তির একশেষ করে, শেষ পর্যন্ত, ভোর ছটায় রওনা হয়ে যখন সোফিয়ায় পৌঁছনো গেল তখন আমাদের ঘড়িতে রাত দুটো। সোফিয়ার ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা। গাড়ি, ঘোড়া, ডাক্তার, দোভাষী সব তৈরিই ছিল। তবু আমাদের আস্তানায় পৌঁছে ঘর, বিছানা বুঝে নিতে নিতে রাত প্রায় ভোর হয় হয়। পরের দিন ঘুম ভাঙতে, প্রথমেই যার কথা মনে হোল, তার নাম ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা কোথায় আছে? কেমন করে দেখা পাওয়া যায় তাদের? পরে জানতে পেরেছিলাম, এই মনে হওয়াটার মালিক শুধু আমরাই না। শ দেড়েক দেশের হাজার বাইশেক প্রতিনিধির প্রায় সকলেই এর মালিক। আমরা সব শেষে পৌঁছনোর দলে। আগে থেকে যাঁরা পৌঁছেছেন তাঁরা সমানে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—ওরা কোথায়?

সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজির ছাত্রী আশিয়া—সকালে কিংবা সন্ধ্যা-বেলা—যে কোন সময় তাকে দেখলেই মনে হবে এইমাত্র সে হলিউডের কোন স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এসেছে। অথবা একটু পরেই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে যাওয়ার জন্যে আশিয়া তৈরি। আমাদের জনাকয়েক দোভাষীর একজন। সকালবেলা ঘরে ঘরে ঘুরে, কুশল প্রশ্ন সেরে সে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তাকে ডেকে জানতে চাইলাম ভিয়েতনামীরা কোথায় আছে। একগাল হেসে আশিয়া বলল—"প্রত্যেক ঘর থেকেই আমাকে ওই প্রশ্নটা করা হচ্ছে। একটু সবুর করো না। এতো তাড়া কিসের!" মুখ টিপে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল আশিয়া। ভাবটা যেন, অতো সহজে কি পাওয়া যায় যাদুধন, একটু ভোগো।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন, ভিয়েতনাম দিবস। প্রথম দিনটাও হয়ে হয়ে ভিয়েতনাম দিবসই হয়ে গেল। তৃতীয় দিন খবর পাওয়া গেল ভিয়েতনামী প্রতিনিধিদের সাথে ভারতীয় প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক হবে। সকালে উত্তরের প্রতিনিধিদের আর সন্ধ্যায় দক্ষিণের মুক্তি ফৌজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

বুলগেরিয়ার আতিথেয়তার কথা উল্লেখ করতে অস্বস্তি বোধ হয়, ভয় হয়

বাঙালী সুলভ কায়দায় বহু বিশেষণ ব্যবহার করেও হয়তো কম বলার অপরাধে অপরাধী হবো। যারা উৎসব নগরীতে ছিলেন তাঁদের জন্তে তো নতুন তৈরি বিশাল বাড়ি, রেস্তোরাঁ, লিফ্‌ট্‌, ফোন, পার্ক, গাড়ি, বাস ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তদের জন্তে শহরের বড় বড় বাড়ি ও হোটেলগুলি খালি করে দিয়েছিলেন সোফিয়ার মানুষ। এমনি সব বাড়িতেই ছিলেন সোভিয়েত, জার্মান (পশ্চিম), রুমানীয়, ভিয়েতনামী, চেক (যদিও ফিরে এসে শুনেছি এদেশে নাকি রটেছে যে চেকদের একটা দলকে সীমান্ত থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাকিদের নাকি থাকতে দেওয়া হয়েছে শহরের বাইরে কুঁড়ে ঘরে) প্রভৃতি প্রতিনিধিদল। ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের জন্তে যে বাড়িটি দেওয়া হয়েছিল, সেটি বোধহয় এর মধ্যে বিশালতম। সবুজ গাছ আর রং-বেরং-এর ফুল দিয়ে ঘেরা বাড়িটি। গেটের দুপাশে ফুল দিয়ে তৈরি করা উৎসবের পাঁচ-রং প্রতীক। একতলায় বিরাট হল ঘর। অন্তপাশে একতলা ও দোতলা নিয়ে অনবদ্য একটি প্রদর্শনী ভিয়েতনামের ওপর। একাধিক মিটিং হল, ওয়েটিং হল—গোটা বাড়িটা ঝকমকে আসবাবপত্রে, আলোতে, কার্পেটে ছবির মতো। সারাদিন এবং সারারাত সেখানে ভিড়। নানাদেশের, নানাভাষার, নানা বর্ণের, নানা পোষাকের মানুষের আনাগোনা।

সকালবেলা আমরা গিয়ে পৌছতেই দরজা থেকে আলিঙ্গনে, আপ্যায়নে আমাদের বেঁধে নিয়ে চললেন উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা। আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা শুরু হতেই ভয় হোল, গোটা ব্যাপারটাই বুঝি আনুষ্ঠানিক হয়ে যায়। আমার ডানদিকে একজন ভিয়েতনামের তরুণ বাঁ দিকে একজন ভিয়েতনামী তরুণী। লক্ষ্য করে দেখলাম, আমাদের প্রত্যেকের পাশেই একজন করে ভিয়েতনামের তরুণ-তরুণী বসেছেন। ভয়টা কেটে গেল। সারাটা সকাল কাটল এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার অনুভূতিতে।

সন্ধ্যেবেলা আবার আসা। এবারে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বন্ধুদের সঙ্গে মোলাকাত। ওদের দেখলেই বোঝা যেতো কে দক্ষিণের, কে উত্তরের। উত্তরের প্রতিনিধিরা স্যুট পরে, মেয়েরা গাউন কিংবা ওদের জাতীয় পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর দক্ষিণের প্রতিনিধিদের ছেলেমেয়ে প্রত্যেকের গায়েই সামরিক পোষাক। জলপাই সবুজ মোটা কাপড়ের পা-জামা, ফুল-প্যান্ট-এর কাছাকাছি। একই কাপড়ের কুর্তা। বুকের ওপর দুটি পকেট। মাথায় জলপাই সবুজ সামরিক টুপি। পায়ে হো চি মিন চপ্পল। বুকেতে ফুল

হয় না। লড়াই করতে করতে ওরা চলে এসেছে। সোফিয়াতে আসাটাও ওদের লড়াই-এরই অাঁক।

আনুষ্ঠানিক ব্যাপার-স্যাপার সারা হোল। শুরু হোল আলাপ-পরিচয়, গল্প করা, গান শোনার পালা: প্রতিনিধিদের প্রায় সকলেই তরুণ। পঁচিশ বছরের ওপরে কেউই নেই। সতেরোরও অভাব নেই। কম কথা বলে। হাসিতে লাজুকভাব। প্রশংসা শুনলে লাল হয়ে যায় ফোলা ফোলা গাল দুটো। কথা বলার সময় চোখের চেয়ে মাটির দিকেই তাকিয়ে থাকে বেশি। এমনি একজনের নাম হুয়েন থু বা। তেইশ পেরিয়ে চব্বিশে পা দিয়েছে। দেখতে কেমন যেন বোকা বোকা। শুধু চোখ দুটোর ভেতরে তাকালে আগুনের ধার টের পাওয়া যায়। আঙুলে গোনা বয়েস। অথচ এরই মধ্যে তার যা অভিজ্ঞতা, অনায়াসে সে একটা ধ্রুপদী উপন্যাসের নায়ক হতে পারে। কথাটা তাকে বলতেই লজ্জায় মাটির দিকে তাকালো সে। বিড়বিড় করে বলল, "আমার মতো হাজার হাজার তরুণ আছে ভিয়েতনামে। তারা আমার চেয়ে অনেক বেশি সাহসের...।"

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সবাই মিলে দাবি করতে আরম্ভ করল, তোমার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাই। তোমার লড়াই-এর অভিজ্ঞতা। হুয়েন সত্যিই লজ্জা পেলো এবার! ঘাড় নেড়ে আপত্তি করতে আরম্ভ করল। কিন্তু ততক্ষণে মাইক, দোভাষী সব কিছু তৈরি। হুয়েন একটু ইতঃস্তত করে বলতে আরম্ভ করল তার কাহিনী। থেমে থেমে, একটু ভেবে নিয়ে, প্রায় ভাবলেশহীন বলা, বেশ বোঝা যায় সাজিয়েগুছিয়ে গল্প বলা তার অভ্যাস নয়।

হুয়েন বলল "আপনারা তো জানেন আমরা লড়াই করছি। ইয়াং-কিদের হাত থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্যে লড়ছি আমরা। আমাদের দেশের মানুষের সেই লড়াই-এর কাহিনীই আমি বলব আপনাদের। একটা ছোট্ট ঘটনা। আমি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এটা একটা ঘটনামাত্র। এমন শত শত ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। আমি যে দিনটির কথা বলব, সেটি বলতে পারেন, সাগরে একটি বিন্দুর মতো।

"ব্যাপারটা ঘটেছিল দক্ষিণের একটি শহরের প্রান্তে। যে দিনের কথা বলছি, তার দিনকয়েক আগে ইয়াংকিদের একটা গোটা ব্যাটেলিয়ন সেখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল মুক্তি-ফৌজের হাতে। ফলে ওদের অত্যাচার আর

প্রতিশোধের চেষ্টার অন্ত ছিল না! ওদের বন্দুকে তো গুলির অভাব নেই। কাজেই হাতের কাছে ওরা যা পায় তার ওপরেই চালিয়ে দেয় গুলি। এমন কি নিরীহ গরু-বাছুরও রেহাই পায় না। অথচ আপনারাই বলুন, গরুবাছুর কি যুদ্ধ করে? আসলে আমার মনে হয়, ওরা ভয় পায় যে গরু-বাছুরও ওদের পছন্দ করে না। কাজেই তাদেরও ছেড়ে কথা বলে না ওরা।

"আমি যে অঞ্চলে ছিলাম, সেখানে ওরা আর কিছু না পেয়ে প্রায় দেড়শ গরু মেরে ফেলল। আমরা দেখলাম ব্যাপারটা ক্রমশ: বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। একটা কিছু করতে হয়। করতে হয় বলতে একটা ইয়াংকিও যাতে রেহাই না পায় এমন কিছু করা দরকার।

"সেদিন দুপুর থেকে বৃষ্টি নেমেছে। মুষলধারা বৃষ্টি। সন্ধ্যে নাগাদ আমার কাছে নির্দেশ এলো। আমি কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম হ্যাভারসাক। ইয়াংকিদের প্যারাশুটের কাপড় দিয়েই তৈরি। বন্দুকটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একটা জায়গায় অন্য বন্ধুরা অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দেখি বাকিরাও ভিজে একসা। ঠাণ্ডায় সবাই কাঁপছে ঠকঠক করে। এই অবস্থায় লড়াই করা যায় না। আমরা তখন নিজেদের কয়েকটা ছোট ছোট দলে ভাগ করে ফেললাম। তিনজনকে নিয়ে একটা দল হোল সবাইকে মাসাজ করে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে। এই করে ঠাণ্ডায় অচল হাত পাগুলো একটু গরম করে নিতে না-নিতেই গুলির শব্দ শোনা গেল। ইয়াংকিরা প্রায় তিন শ গজ দূরে রয়েছে, আমরা জানতাম। যেমন করেই হোক ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে। আর এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি হাতিয়ার আর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম আমরা। গুলির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে লাফিয়ে পড়লাম ট্রেঞ্চের মধ্যে। কিন্তু এরই মধ্যে একজনের বুকে এসে লাগল মেশিনগানের গুলি। সে কাত হয়ে পড়ে গেল আমার পাশে। আর নড়ল না। কিন্তু মাথার ওপরে তখন গুলির ঝাঁক। ট্রেঞ্চের মধ্যে পজিশন নিয়ে আমরা জবাব দিতে শুরু করলাম। আমাদের জবাব পেয়ে ওদের বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেল। যতো রকমের হাতিয়ার ছিল ওদের সাথে, সব গর্জন করতে আরম্ভ করল। গুলির ধারাবর্ষণ শুরু হোল আমাদের চারপাশে।

"কিছুক্ষণ এই অবস্থা চলল। আমরা বেশ ভালোই করছিলাম। হঠাৎ আমার পাশের বন্ধুটির বুকে একটা বুলেট বিঁধে গেল। তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে

তার ও আমার রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে আমি লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম একটা নিরাপদ জায়গার দিকে। ইয়াংকিরা আমাকে দেখতে পেয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের দিকে গুলির ঝাঁক ছুটে আসছিল। ফলে মাঝে মাঝেই বন্ধুটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দুটো রাইফেলই ব্যবহার করে আমাকে জবাব দিতে হচ্ছিল। এইভাবে কোনমতে গুলি বৃষ্টির এলাকার বাইরে গিয়ে আমি ব্যাণ্ডেজের বাক্স খুলে শুরু করলাম ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হতেই আমার খেয়াল হোল আমি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। একেবারে একা আমি। আর সঙ্গে প্রায় আধমরা আমার বন্ধু। এলাকাটাও আমার পরিচিত নয়। এদিকে গুলির বৃষ্টি আমার চারপাশে। একটু ভয়, না, ভয় ঠিক নয়, মনে হোল, বন্ধুটিকে হয়তো বাঁচাতে পারব না। এবং আমাকেও হয়তো মরতে হবে। ঠিক করলাম, হয় বন্ধুটিকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, আর নয়তো ওর সঙ্গেই মরব।

"গুলির শব্দ ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছিল। বন্ধুটি যদি গুলির শব্দ শোনে তবে তার ক্ষতি হবে। তা ছাড়া ওইভাবে বসে থাকারও কোন অর্থ হয় না। এইসব ভেবে আবার তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু যাবো কোন দিকে? হঠাৎ পায়ে কি একটা জড়িয়ে গেল। হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। টেলিফোনের ছেঁড়া তার ছড়ানো রয়েছে। ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হোল না! আমাদের বন্ধুদেরই কাজ এটা। ওই ছেঁড়া তার বরাবর হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ইয়াংকিরা গুলি চালাচ্ছিল। আমিও জবাব দিচ্ছিলাম মাঝে মাঝেই। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। দেখতে পেয়েই সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। ওরা ধরে নিয়েছিল যে আমি নিশ্চয়ই মরে কোথাও পড়ে আছি" (এই কথাটা বলার সময় হুয়েন প্রা॰ খুলে হাসল। ছোট্ট ছেলের মতো সরল হাসিতে ঝকমক করে উঠল তার দুপাটি দাঁত। সে হাসি আমি জীবনেও ভুলব না)।

"তার কাছে খবর পেলাম আমাদের দলের দু-জন ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক-জন ইয়াংকিকে খতম করেছে। এবং লড়াই করতে করতে তার প্রাণ দিয়েছে। ইয়াংকিদের হাতে ওদের মৃতদেহ ছেড়ে দেওয়া যায় না। কাজেই আমরা ঠিক করলাম, ওদের নিয়ে আসতে হবে। আমার কাঁধ থেকে আহত বন্ধুটিকে নামিয়ে রেখে আমরা দু-জনে ফিরে চললাম আবার। একটা জলার ধারে ওরা পড়ে ছিল। যদিও তখন রাত। বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু আমাদের চিনে নিতে

কোন অসুবিধা হোল না। ইয়াংকিরা তখন আকাশে আলোর বোমা ফাটাচ্ছে অনবরত। আমাদের খোঁজার জন্যে। সেই আলোতে আমাদের বন্ধুদের খুঁজে বার করলাম আমরা। ওদের তুলতে গিয়ে মনে হোল একজন তখনো বেঁচে। দু'জনকে কাঁধে ফেলে আমরা দৌড়তে আরম্ভ করলাম। আমার কাঁধের ওপর আহত বন্ধুটি। তার আঘাত থেকে বন্যার মতো রক্ত ঝরছে। ব্যাণ্ডেজ করতে পারলে হোত। কিন্তু থামার উপায় নেই। ইয়াংকিরা প্রাণের আক্রোশে গুলি চালাচ্ছে। একটা বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে এসে ওকে নামালাম। ব্যাণ্ডেজের বাক্সটা বার করে দেখি কোন উপায় নেই। বুলেটের আঘাতে বাকসটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কোন কাজে লাগবে না।

"বন্ধুটি বিড়বিড় করে কথা বলছিল। বোধহয় একটুখানি জ্ঞান ফিরেছে। তাকে কেমন করে বাঁচানো যায়! আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। শুনতে পেলাম সে বিড়বিড় করে বলছে,—'আমি কি মরে যাচ্ছি, কমরেড, এখনো যে দু-জন ইয়াংকি···আমি কি মরে···।

"আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'তুমি ভেঙে প'ড়ো না। আমরা বাঁচব। নিশ্চয়ই বাঁচব। তুমি শুধু একটু শক্ত হও, একটু আশা রাখো।'

"কিন্তু তখন কথা বলার সময় নেই। ইয়াংকিরা আমাদের দেখে ফেলেছে। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে আমাদের। আর আমরা মাত্র দু-জন। আমি আমার আহত বন্ধুটির গায়ের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। পাছে ওর গায়ে গুলি লাগে। ওইভাবেই গুলি চালাতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু এক-জায়গা থেকে ক্রমাগত গুলি চালালে ওরা ধরে ফেলবে যে আমরা মাত্র দু-জন। ওরা এগিয়ে আসতে সাহস পাবে। কাজেই আমরা লাফ দিয়ে দিয়ে পজিশন পালটে পালটে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলাম, যাতে ওরা ভাবে যে আমরা সংখ্যায় অনেক। এতে ওরা ভয় পাবে। এগোতে সাহস করবে না। হোলও ঠিক তাই। এগোতে এগোতে ওরা থেমে গেল। তখন আমরা ওদের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলাম। একটা, দুটো, তিনটে, পরপর অনেকগুলো ইয়াংকিকে পড়ে যেতে দেখলাম। সাতজনের একটা দল দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে পেছন ফিরে ছুটতে আরম্ভ করল। মাথার ওপরে তখনো ওদের জ্বালানো আলো। আমরা ছুটলাম ওদের পেছনে। সাতটাকেই খতম করলাম। দাঁড়িয়ে একটু নিঃশ্বাস নেবো কিনা ভাবছি, এমন সময় দেখি চারজন ইয়াংকি বন্দুক-টন্দুক ফেলে পালাচ্ছে। তাদের আর মারলাম না আমরা।

বন্দী করলাম। পরে জেনেছিলাম এই ঘটনাটিতে মোট চুয়ান্নবইজন ইয়াংকি খতম হয়েছিল। আমরা হাতে পেয়েছিলাম চব্বিশটি মার্কিন হাতিয়ার। আর চারজন আস্ত ইয়াংকি বন্দী পেয়ে আমাদের বন্ধুরা, বিশেষ করে ছোটরা যে কি খুসি তা আমি বলতে পারব না।"

রাত অনেক হয়েছিল। বিদায় নেওয়ার সময় পার হয়ে গেছে বহুক্ষণ। তবু লোভ সামলাতে পারলাম না। ভিড়ের মধ্যে থেকে হুয়েনকে কোনমতে আলাদা করে জিজ্ঞাসা করলাম :

"কমরেড, যুদ্ধ তো শেষ হয়ে যাবে আজ বাদে কাল। তারপর তুমি কি করবে ?"

সে যেন একটু অবাক হোল আমার প্রশ্ন শুনে, বলল,

"কেন ? হ্যানয়ে পড়তে যাবো। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জন্যে সিট রয়েছে !"

আবার জিজ্ঞাসা করলাম :

"উৎসব কেমন লাগছে ? সোফিয়া কেমন লাগছে ?"

"ভালো। খুব ভালো। তোমাদের সঙ্গে দেখা হোল, আলাপ হোল··· খুব ভালো।"

জানতে চাইলাম, "এর পরের উৎসবে আসবে তো ?"

এবারে হেসে ফেলল হুয়েন। হাসতে হাসতেই বলল :

"পরের উৎসবে আমরা আসব না। তোমরা যাবে। কারণ, পরের উৎসব আমরাই করব ! সে উৎসব হবে সায়গনে। মুক্ত সায়গনে।"

চেকোস্লোভাকিয়া—অন্যদিক

সুশোভন সরকার

১

বিতর্কমূলক সমস্যায় উভয়পক্ষীয় মতামত লোকের সামনে তুলে ধরাই প্রাথমিক কর্তব্য। কমিউনিস্ট-সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অধিকাংশে আজ একদেশদর্শী আলোচনা সেইজন্য দৃষ্টিকটু লাগে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের গত বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে মস্কো-চুক্তি সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে চেক পার্টির নীতি ও কার্যক্রমের প্রতি যে-শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, বিপদের দিনে চেক জনগণের সংহতি ও সংযম সম্বন্ধে যে-অভিনন্দন জানানো হয়েছে, উপরোক্ত আলোচনায় তার চিহ্ন-ও চোখে পড়ে না। শারদীয়া 'পরিচয়' পর্যন্ত অধিকাংশের এই পথ অনুসরণ করল দেখে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হবার সংগত কারণ দেখছি।

চেক সঙ্কটের মূলে আজ প্রধান প্রশ্ন হল সোভিয়েট সৈন্য প্রবেশ যুক্তিসঙ্গত ও মঙ্গলজনক কিনা। মূল প্রশ্ন এড়িয়ে প্রায় সকল লেখক জোর দিচ্ছেন পটভূমিকার উপর—যে-পটভূমিকার বিশ্লেষণে বিভিন্ন ব্যাখ্যা অনিবার্য। বাইরে থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা এবং ভিতরে প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা মেনে নিলেও চেক জনগণ ও পার্টির অমতে সৈন্যপ্রেরণের যৌক্তিকতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যায় না, তার ফলাফল-ও পরিণামে ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারে আসল আলোচ্য কিন্তু এই কথাই।

সোভিয়েট অভিযানের সমালোচনা আমি অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে করেছি। তার সবটার পুনরুক্তি করে 'পরিচয়ে'র মূল্যবান পাতা ভারাক্রান্ত করতে চাই না। সৈন্যপ্রবেশের এই নীতি যে ভ্রান্ত হতে পারে, সাম্প্রতিক সোভিয়েট আচরণের বিরুদ্ধে সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যে আপত্তি ওঠা স্বাভাবিক, এইটুকু মাত্র প্রতিষ্ঠা করা এ-লেখার উদ্দেশ্য।

২

চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট সৈন্যপ্রেরণের স্বপক্ষে যত কথা বলা হয়েছে, যুক্তিহিসাবে সেগুলিকে পরস্পর-সংযুক্ত দুই প্রধান পর্যায়ে পর্যবসিত করা সম্ভব। সংক্ষেপে তার মর্ম হল যে সমাজতান্ত্রিক জগতের সামরিক আত্মরক্ষার

খাতিরে এবং চেকদেশে প্রতিবিপ্লবের প্রচণ্ড স্রোতকে রোধ করার জন্ত সৈন্ত-প্রবেশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

বিদেশে সৈন্ত পাঠানো যে সকল ক্ষেত্রেই নিন্দনীয় এমন সিদ্ধান্ত অবশ্ত অন্যায়। দিগ্বিজয়ী হিটলারের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পরাক্রমের সামনে একক মিত্রহীন বিপন্ন সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে সেদিন পূর্ব-পোল্যাণ্ড্ দখল ও ফিন্‌ল্যাণ্ড্ আক্রমণ ছাড়া উপায় ছিল না। ১৯৫৬ সালের হাঙ্গারিতে প্রতিবিপ্লব রাষ্ট্রশক্তি দখল করে ফেলেছিল, পশ্চিম থেকে সাহায্য চাওয়া হয়, সুয়েজের সঙ্কট তখন মহাযুদ্ধের কিনারা পর্যন্ত এগিয়ে আসে, বিশ্বযুদ্ধ আটকাবার অন্যতম হাতিয়ার অর্থাৎ আণবিক অস্ত্রে আমেরিকার সঙ্গে সমতা তখনও রাশিয়ার আয়ত্তের বাইরে। চেকোস্লোভাকিয়ার বর্তমান সমস্যা কি এই অবস্থার অনুরূপ?

চেকদেশে সোভিয়েট 'হস্তক্ষেপ' ঘটেছে এমন মন্তব্য নাকি কমিউনিজ্‌ম্-বিরোধী। ২৩শে আগষ্টের বক্তৃতায় ফিডেল কাস্ট্রো সোভিয়েট অভিযানের দৃঢ় সমর্থন করেও বলেছেন—What cannot be denied here is that the sovereignty of the Czechoslovak State was violated.… And the violation was, in fact, of a flagrant nature." কাস্ট্রোও কি কমিউনিজ্‌ম্-বিরোধী?

'প্রাভ্‌দা'র প্রবন্ধ লেখক এক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, শত্রুর অনুপ্রবেশের আশংকা থেকে সমাজতান্ত্রিক জগতের আত্মরক্ষার খাতিরে সৈন্ত-প্রয়োগে কোন-ও দোষ থাকতে পারে না। ভিয়েতনামে আমেরিকার হস্তক্ষেপ সমর্থনে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার কর্ণধারেরাও ত' এই ধরনের যুক্তির আশ্রয় নেন—শত্রুপক্ষের অনুপ্রবেশ থেকে আত্মরক্ষা। চেকোস্লোভাকিয়ার বিশেষ অবস্থানের কথা উঠেছে। এই দেশের মতন ভিয়েতনামকে-ও কি সমাজ-তান্ত্রিক জগতের "নরম তলপেট" আখ্যা দেওয়া যায় না? অথচ সেখানে সৈন্তবাহিনী পাঠাবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ঠিক কি? সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র ত' আজ সংখ্যায় চোদ্দটি; পঞ্চরাষ্ট্রের চেক অভিযানের আগে কি অন্য সোশালিস্ট্ দেশগুলির পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল? পশ্চিমের বিরাট দুই সাম্যবাদী পার্টির নেতারা মস্কো গিয়ে রুশ কর্তৃপক্ষকে সামরিক অভিযান থেকে নিবৃত্ত করবার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছিলেন; বিশ্ব সমাজবাদী আন্দোলনের স্বার্থরক্ষায় কি তাঁদের কিছু দায়িত্ব নেই? হয়ত

নেই, কারণ ফ্রান্সে নাকি সম্প্রতি বিপ্লব 'রাজার দুলালে'র মতন ('দুলাল', 'কুমার' নয়) দরজা থেকে বিনা অভ্যর্থনায় ফিরে গিয়েছিল। আর ইটালি প্রমুখ পশ্চিমী দেশে নাকি কমিউনিস্টরা ভোট-সংগ্রহের মোহে আচ্ছন্ন। এদেশে আমরা যে কোন স্বপ্নে বিভোর কে জানে !

শত্রুর চক্রান্ত অবশ্য উপহাসের বস্তু নয়, বাস্তব সত্য। দেশে দেশে যে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র চলছে তাকে অস্বীকার করার কোন-ও প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে সে-বিপদ কতখানি, হিটলারের দুর্বার অগ্রগতির সে কি সমগোত্রীয়, বাস্তব অবস্থাটা আজ ঠিক কি? এইখানেই বিচার এসে পড়তে বাধ্য। মনে রাখতে হবে যে আমেরিকার (বিপদের মূলকেন্দ্র নিশ্চয় আমেরিকা) ঠিক হিটলারি শক্তি নেই; আমেরিকাকে আজ চলতে হয় সন্তর্পণে সাবধানে; সোভিয়েট রাশিয়ার অস্ত্রশক্তি এখন আমেরিকার তুলনায় হীনবীর্য নয়; সমাজতান্ত্রিক জগৎ আর আগের মতন অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলা চলে না। আজকের দিনে আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই ন্যায্য কারণে সাক্ষাৎ সংঘর্ষ এড়াতে উদ্যত এ-সত্য ত' সুবিদিত; পরস্পরকে আক্রমণ তাই 'ঠাণ্ডা যুদ্ধে'র সীমা ছাড়িয়ে ওঠে না। মার্কিন সাম্যবাদী দলের সেক্রেটারি গাস হল সোভিয়েট সামরিক অভিযানের প্রবল সমর্থক—৩:শে আগস্টের রিপোর্টে তিনি কিন্তু স্বীকার করেছেন—"It is true at this moment that neither U. S. nor West German imperialism is ready to strike militarily."

অঘটন অবশ্য ঘটতে পারে। পশ্চিম জার্মানির নায়কদের মতিগতি এমন যে তাদের পক্ষে অতর্কিত আক্রমণ অসম্ভব ছিল না। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার তিন দিকে ওয়ারস-চুক্তির সৈন্যবাহিনী সর্বদা প্রস্তুত আছে। পশ্চিম জার্মান সেনাদল সীমান্ত অতিক্রম করা মাত্র সেই বাহিনী সহজেই অগ্রসর হতে পারত শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য। এই যুক্তিকে উপহাস করে বলা হয়েছে এত ভদ্রতা কেন, এতে যে বেশি রক্তক্ষয় হ'ত! 'রক্তক্ষয়' বেশি হত কিনা জল্পনা বৃথা, কারণ পশ্চিমী অভিযান ত' শুধু সম্ভাবনার কথা, আশু নিশ্চিত সত্য নয়। আর 'ভদ্রতা'র এই লাভ যে সোভিয়েট সৈন্য পরে এলে পেত সারা বিশ্বের সমাজবাদী ও শুভবুদ্ধি লোক মাত্রের অকুণ্ঠ সমর্থন, চেক নেতা ও জনগণের অধিকাংশের সোৎসাহ সহযোগিতায় তখন অভাব হত না।

আজকের দিনে সশস্ত্র সংঘর্ষে জনমত ও জন-সহযোগিতা কিছু তুচ্ছ বস্তু নয়, আধুনিক ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

পশ্চিম জার্মানি হঠাৎ তাণ্ডব শুরু করে দিলে আমেরিকা কি পিছিয়ে থাকতে পারত? মার্কিন হস্তক্ষেপ পরোক্ষ হলে সোভিয়েট ইউনিয়ান পাল্টা চাপ সৃষ্টি করতে পারে বোমাবিধ্বস্ত ভিয়েতনামে সশস্ত্র সাহায্যের পরিধি বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিয়ে, যাতে আমেরিকার চৈতন্যোদয় হতে বাধ্য এবং যাতে প্রগতিশীল মহলে সমর্থনের জোয়ার আসবে। আর মার্কিনীরা যদি সরাসরি যুদ্ধে নেমেই পড়ে, তাহলে ত' বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে; তখন প্রধান লড়াই চলবে আকাশ-পথে। সে-অবস্থায় চেক ভূমির বিঘোষিত ভৌগোলিক সামরিক গুরুত্ব হবে লুপ্তপ্রায়, সে-অঞ্চল তখন কার দখলে ভাবার অবকাশ থাকবে না।

সোভিয়েট সমর্থকেরা আজ বিশেষ অঞ্চল দখল রাখার সামরিক সুবিধা, কর্তৃত্বের নির্দিষ্ট এলাকা, দুই শিবিরে শক্তির ভারসাম্য ইত্যাদির ব্যাখ্যায় সরব। সমাজতন্ত্রী জগৎ আজ যেন আঠারো শতকের বহুনিন্দিত রাজনীতিতে ফিরে যাওয়া আর গ্লানিজনক মনে করছে না; যুদ্ধ আটকাবার আশায় অপর পক্ষের আগেই সামরিক কাজে এগিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মনে হচ্ছে সমর্থনযোগ্য। ইতিহাস কিন্তু বলে না যে এমনভাবে শান্তি বজায় থাকে। অসীম বিপদের মুহূর্তেও তাই লেনিন সাবেকি রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করবার বিপ্লবী সাহস দেখাতে পেরেছিলেন।

৩

বাইরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চাইতে ভিতরের প্রতিবিপ্লবী স্রোত আটকানোই যে সামরিক অভিযানের আসল লক্ষ্য ছিল, এই কথা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সাম্প্রতিক সোভিয়েট প্রচার থেকে। আটকাবার এই প্রক্রিয়াটির তাই যথার্থ বিচার প্রয়োজন।

চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে প্রতিবিপ্লবী ঝোঁক যে প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান, এ-সত্য অস্বীকার করবার কারণ দেখি না। সাহিত্যচর্চা থেকে রাজনৈতিক আলোচনা, সংবাদ-মাধ্যম থেকে নানা সংগঠনের কার্যক্রম ইত্যাদির ভিতর দিয়ে সমাজতন্ত্র-বিরোধিতা কিছু পরিমাণে নিশ্চয় প্রকাশ পেয়েছে। মৌলিক প্রশ্ন হল এর কারণ কি। বহির্বিশ্বের বুর্জোয়া প্রভাব ত' সমাজতান্ত্রিক সকল দেশের উপরই এসে পড়ে। চেকোস্লোভাকিয়ায় তার বিশেষ প্রচারকে

শক্তিশালী করেছে দেশবাসীর মনে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। তাকে দূর করবার প্রকৃষ্ট উপায় কোনক্রমেই অবাঞ্ছিত সৈন্যপ্রবেশের মধ্যে নেই, স্টালিনী শাসনের বিগত দিনের পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়াটা-ও নিষ্ফল। প্রতিবিপ্লবের নূতন নূতন নিদর্শন খোঁজার ভিতর কিন্তু মূল প্রশ্নের মোকাবিলা করার লক্ষণ দেখি না। যে-উদ্দেশ্যে সোভিয়েট সৈন্য দেশে প্রবেশ করল, সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

প্রতিবিপ্লবী শক্তির বাস্তব ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও ভুলের অবকাশ আছে। দেশ-দখলের পর প্রতিবিপ্লবী প্রতিরোধ ত' বিশেষ চোখে পড়ল না। প্রকাশ্য অভ্যুত্থান ঘটে নি, নাশকতামূলক কাজও যৎসামান্য, অস্ত্রশস্ত্রই বা কতটুকু আবিষ্কার হয়েছে? গোপন রেডিও প্রতিবিপ্লবের অকাট্য প্রমাণ নয়—রেডিও দেশের বাইরে থেকে চালানোও সম্ভব, ক্ষুব্ধ দেশবাসীর তার সঙ্গে সহযোগ-ও স্বাভাবিক, আর 'মুক্ত' রেডিও চেক সরকারের নির্দেশ অমান্য করে নি। সমাজতন্ত্রবিরোধিতা কিছুটা বাড়িয়ে দেখা হয় নি এমন কথা বলি কি করে,—বিরোধী মতের অস্তিত্ব এবং তার প্রাধান্য ঠিক এক ব্যাপার নয়। দেশদখলের পর প্রতিবিপ্লব যদি মিলিয়ে যায় তাহলে তার বিস্তার সম্বন্ধেই সন্দেহ ওঠে। আর এখনও যদি শত্রুপক্ষের কাজকর্ম চলতে থাকে, অথবা পরে সুযোগের অপেক্ষায় এখন যদি তারা গা ঢাকা দিয়ে সময় কাটাতে পারে, তবে আবার সেই মূল প্রশ্নে ফিরে আসতে হয়—প্রতিবিপ্লব আটকাবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি? বিদেশী সৈন্য-ই বা কতকাল দেশে বসে থাকবে?

তাছাড়া কি মানতে হবে যে চেকোস্লোভাকিয়ায় স্বদেশী বিপ্লবী শক্তি নেই, তার প্রভাব যৎসামান্য? যদি না থাকে তবে সেখানে সমাজতন্ত্র গঠন ত' আকাশকুসুম; অপরে এসে বিপ্লব মিষ্টান্নের মতন মুখে তুলে দেয় না, বিপ্লব অর্জন করতে হয়। দেশে যদি বিপ্লবী শক্তি থাকে, তবে তাকে জনমত জয় করে নিতে হবে নিজের জোরে, বহিরাগত সৈন্যের সাহায্যে না। অপর দেশের সৈন্য প্রবেশে বিপ্লবের শক্তি বাড়ে না, অন্তত মহাযুদ্ধের ওলট-পালটের দিন বাদ দিলে। বিপ্লব কিছু আমদানির বস্তু নয়, বন্দুকের নলে তাকে নিয়ে আসা যায় না।

বলা হবে যে চেকদেশে সমাজতন্ত্রী শক্তি আছে নিশ্চয়, কিন্তু তা অসংগঠিত; চেক সরকার ও পার্টি তাকে নেতৃত্ব দিতে পারে নি, প্রতিবিপ্লবী আলোড়ন অবাধে চলতে দিয়েছে। অথচ চেক ও রুশ উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ অগস্টের

ঘটনাবলীর ভারতীয় প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনলাম যে বিরোধী প্রত্যেক সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেওয়া হয়েছে চেক কমিউনিস্ট মহল থেকে। আসলে চেক নেতাদের বিশ্বাস যে অসন্তোষ প্রশমনের কার্যকরী উপায় হল নূতন পার্টি কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ন। এই বিশ্বাস ভ্রান্ত কিনা সেটা প্রমাণ বা অপ্রমাণের অবসর দেওয়া হল না। দিলে কি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ধ্বসে পড়ত, সে দুনিয়া কি এতদিন পরেও এত ভঙ্গুর? অথচ জনগণের অসন্তোষ যদি সামান্য না হয়, দেশের মধ্যে যদি তার বিস্তৃতি ব্যাপক হয়, তবে বহিরাগত সৈন্য দিয়ে তার অবসান সম্ভব হবে না।

বস্তুতঃ একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে চেক পার্টি ও নেতৃত্বের উপর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। ওটা সিকের আর্থিক পরিকল্পনার প্রচুর নিন্দা শুনছি, কিন্তু তার অনুরূপ ব্যবস্থা সোভিয়েটসহ অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও পরীক্ষিত হয়েছে, তাতে সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ে নি। তত্ত্ব হিসাবে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য প্রকাশ পায় সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্য দিয়েই, এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির স্বাধীনতা ও সমতা নীতিগত ব্যাপার। অথচ এখন একে এড়িয়ে চলবার লক্ষণ চোখে পড়ছে না কি? সিজার বলেছিলেন বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের পথ বিভিন্ন—এমন কিছু নূতন কথা নয়। গৃহীত এই তত্ত্বকে 'প্রাভ্‌দা' ব্যাখ্যা করছে এই বলে যে বিভিন্ন পথ কিন্তু কয়েকটি সাধারণ সত্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, যে-সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সোভিয়েট মডেল-এর মধ্যেই। 'প্রাভ্‌দা'র এ-কথা বলার নিশ্চয় সম্পূর্ণ অধিকার আছে, অন্য সমাজবাদীদের-ও স্বাধীনতা আছে তার বিশ্লেষণী বিচার করবার। কিন্তু প্রচার ছাড়িয়ে অস্ত্রের জোরে নিজস্ব ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেবার চেষ্টাও কি মানা চলে?

চেক পার্টির অবস্থা নাকি এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তাকে অক্ষম করে ফেলে। বিপুলসংখ্যায় পার্টি-সভ্যদের নাকি বের করে দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষিত পুরানো নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা চলেছে, পার্টি কংগ্রেস না ডেকেই নীতি পরিবর্তন হচ্ছে, পার্টি সংস্থা ও সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচনে গলদ থাকছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক পার্টির অভিজ্ঞতাতেই এমন ঘটনা ঘটেছে। তাই বলেই কোনও পার্টির আভ্যন্তরীন ব্যাপারে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ কি চলতে পারে, তার পরিণাম কি শুভ? কমিন্টার্নের প্রথম যুগে কোনও কোনও পার্টি পুনর্গঠিত হয় বাইরের চাপে, তাতে সুফল পাওয়া

গিয়েছিল এমন কথা ইতিহাস বলে না। আর সোভিয়েট চাপে যদি চেক পার্টি ও নেতৃত্বের পুনর্গঠন করতে হয় তাহলে তাদের নৈতিক সমর্থন থাকবে কোথায়, জনমতই বা তাদের পিছনে সামিল হবে কেন?

এ-কথাও শোনা যায় যে সোভিয়েট বাহিনী আপনা থেকে আসেনি, চেক সরকার ও পার্টি নেতৃত্বের একাংশ সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের নাম দেশদখলের পর-ও প্রকাশিত হল না, সম্ভবতঃ জনমতের ভয়ে। আধডজন মহামান্য নেতা-ও এঁদের মধ্যে থাকতে পারেন, কিন্তু হাঙ্গারির কাডার-এর মতন তাঁরা ত' লোকমতের সামনে প্রকাশ্যে এসে দাঁড়াতে পারলেন না। সৈন্য প্রবেশের পর তাঁরা ত' পাল্টা সরকার গঠনের দায়িত্ব নিতে পারতেন। ৯ই সেপ্টেম্বর পার্টি কংগ্রেস ডাকা হয়েছিল, অপেক্ষা না করে তার দুই সপ্তাহ আগেই সোভিয়েট বাহিনী এসে উপস্থিত হল কেন? এর থেকে একটা কথাই প্রমাণ হয়—যারা রাশিয়ার দিকে চেয়ে আছেন তাঁরা সংখ্যালঘু ও জনসমর্থনহীন। তেমন 'একাংশে'র অনুরোধে হস্তক্ষেপ করা ত' মারাত্মক যুক্তি। মস্কো চুক্তি তাই সম্পন্ন করতে হল এমন নেতাদের সঙ্গে, যাঁদের মধ্যে কিছু লোককে প্রতিবিপ্লবী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মুক্তি পেয়ে তাঁরা আবার প্রমাণ করছেন যে পার্টি ও জনগণ (চেক দেশে যার অধিকাংশই শ্রমজীবী) এখনও তাঁদের পিছনে।

নূতন চেক কর্মসূচীতে সেন্সর-প্রথা অবসানের আশ্বাস ছিল, মনে হয় সোভিয়েট নেতাদের প্রধান আশংকা এইখানে। অথচ স্বয়ং মার্কস সেন্সরশিপের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। রুশবিপ্লবের পরমুহূর্তে লেনিন যখন সেন্সর-প্রথা প্রবর্তনে বাধ্য হলেন, তখন তিনি ঘোষণা করেন যে এই দুঃখজনক ব্যবস্থা সাময়িক মাত্র, শীঘ্রই একে তুলে দেওয়া হবে। জন রীডের লেখায় পড়ি যে লেনিনের বহু সহকর্মী (ট্রট্স্কি ব্যতীত) সেদিন সেন্সর-প্রথাকে সমাজবাদী নীতির বিরোধী বলে নিন্দা করেছিলেন। লেনিন তাঁদের আশ্বাস দেন যে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে পত্র-পত্রিকা তুলে দেওয়া হবে, সরকার নয়, জন-প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে, যাতে বিভিন্ন পার্টি তাদের সমর্থকের অনুপাতে বিভিন্ন মত প্রকাশ করে যেতে পারে। 'সাময়িক' এই নিয়ন্ত্রণ এতদিন পরেও আজ ওঠে নি, দৃঢ়মুষ্টি হয়েছে সরকারেরই হাত। কোনও দেশে সাময়িক ব্যবস্থা শেষ হবে কিনা সে-সিদ্ধান্তের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পার্টির উপর ন্যস্ত থাকাটাই উচিত নয় কি? অস্ত্রের জোরে সিদ্ধান্ত চাপাতে গেলে স্থায়ী সমাধান

আনতে পারে না। সেন্সর ছাড়া প্রলেটারীয় ডিক্টেটরশিপ চলবে না, এমন কথা ভাবা অনুচিত। ডিক্টেটরশিপ ত' রাষ্ট্রমাত্রেরই লক্ষণ, যে-রাষ্ট্রে সেন্সর নেই সেখানে-ও ত' ডিক্টেটরশিপ চলতে থাকে।

স্বাধীন মতপ্রকাশকে জুজুর মত ভয় পাওয়া দীর্ঘযুগব্যাপী প্রতিষ্ঠিত-সমাজতন্ত্রের সাজে না। নানা মত প্রকাশ পেলে সমাজবাদী আদর্শকে লড়াই করে চলতে হয়, তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। ধনতন্ত্র ত' অনেক সমালোচনা সহ্য করে টিকে আছে, অথচ আর্থিক সংঘাতে ধনতন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু। বর্ধিষ্ণু সমাজতন্ত্রই বা এত ভয় পাবে কেন, অধিকাংশ লোকের স্বার্থ যখন সমাজতন্ত্রের প্রবল আকর্ষণ। আর্থিকভিত্তি দৃঢ় থাকলে হাজার হাজার কথা তাকে উচ্ছেদ করতে পারে না। আর অসন্তোষ থাকলে তার প্রকাশ বাঞ্ছনীয়, তাহলে সময় মত ব্যবস্থা নেওয়া চলে। কণ্ঠরোধ করে থাকলে অসন্তোষকে গোপন ষড়যন্ত্রের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, তাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

৪

সোভিয়েট নীতিবিশেষের সমাজবাদী সমালোচক মাত্রকে গঞ্জনা শুনতে হয় যে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করা হচ্ছে। চেকদেশে সোভিয়েট সৈন্য প্রবেশই যে শত্রু-প্রচারকে অনেক বেশি শক্তি জোগালো সে সম্বন্ধে নীরব থাকাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। আসলে কমিউনিস্ট মহলে স্বাধীন চিন্তার নিদর্শন পরিণামে বিশ্ব সমাজবাদকে শক্তিশালী করে।

মার্কসবাদীমণ্ডলীতে বিতর্ক উঠলেই অনেকে আশ্রয় খোঁজেন নেতাদের কাছে—সোভিয়েট, চীন, বা কিউবার নেতাদের কাছে। প্রকৃত আশ্রয় আছে কেবল মার্কসবাদের মধ্যেই—মার্কসের কালজয়ী শিক্ষার মধ্যে, মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিনের তত্ত্ব ও বিচার-পদ্ধতির ভিতর। পার্টির মধ্যে এই শিক্ষার অভাবেই লোকে সংকটে অসহায় বোধ করে।

অনেকে আবার মার্কসের 'তরুণ' মানবিকতা ও 'পরিণত' শ্রেণীসংগ্রামকে পৃথক করে দেখেন। মার্কসের প্রকৃত শিক্ষায় দেখি উভয়ের মিলন, এদের তফাৎ করতে গেলে একদেশদর্শিতা এসে পড়তে বাধ্য।

মানুষের মুক্তির প্রথম সার্থক সোপান শোষণের অবসান, আর্থিক মুক্তি। কিন্তু মার্কস তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রেখেছিলেন মানবিক বিকাশের আদর্শ —"development of human energy which is an end in itself." মার্কসবাদের নূতন দিগন্ত সম্পর্কে আজকাল যে humanism-এর ধ্বনি উঠেছে,

তার মূল এইখানে—মার্কসের নিজের কথায়—"the doctrine that man is the highest being for man ; i.e. the categorical imperative to overthrow all conditions in which man is a humiliated, enslaved, despised and rejected being."

মানুষের alienation দূর করার প্রধান বাধা হল আর্থিক শাসন। কিন্তু অন্ত বাধাও ভোলা চলে না, যেমন বুরোক্রাসি। মার্কস লিখেছেন—"Bureaucracy regards itself as the be-all and the end-all of the state …the all-pervading universal spirit of bureaucracy is ***mystery***, secrecy. …Worship of authority is its ***way of thinking***."

Regimented Communism কথাটা মার্কসেরই সৃষ্টি মনে হয়। ১৮৭০ সালের রচনায় তিনি একে তীব্র বিদ্রূপ করছেন দেখতে পাই। তিনি বলেছিলেন "there is only one remedy for all these intrigues, but it is a very radical remedy, full publicity." ১৯৬৩ সালের মে মাসে World Marxist Review পত্রিকায় রুশ লেখকের প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

বিপ্লব জনগণের সৃষ্টি। মার্কস বলছেন "I call revolution the conversion of all hearts and the raising of all hands in behalf of the honour of the free man." শ্রেণী সংগ্রামের আওতায় all নিশ্চয় আক্ষরিক অর্থে মাথা গুনে প্রত্যেকটি লোক নয়, কিন্তু জনগণের বিপুল সংখ্যাকে টানতে না পারলে বিপ্লব সম্ভব বা স্থায়ী হতে পারে না। লেনিন তাই এর উপর অতটা জোর দিয়েছিলেন।

বিপ্লব বাইরে থেকে চাপানো চলে না। ১৮৮২ সালে এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন—"the victorious proletariat can force no blessings upon any foreign nation without undermining its own victory by so doing."

প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতার অপব্যাখ্যা সম্বন্ধে লেনিন সাবধান করে ছিলেন—"the ridiculous assertion that we should conceal every concrete difficulty of the revolution with the declaration that 'I am counting on the trump-card of the international and socialist movements so that I can commit any folly I like'."

বিপ্লবী শ্রমিক সরকারের সম্ভাব্য ভুলচুকের স্বীকৃতিও পাই লেনিনের লেখায়—'just because the proletariat has carried out a social revolution it will not become holy and immune from errors and weaknesses" (১৯১৬)। অন্যত্র—"Undoubtedly, we have done, and will do in the future, an enormous number of absurd things." (১৯২২)

সমাজবাদী সমালোচক আজ যদি মনে করেন চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট সৈন্যপ্রেরণ রাষ্ট্রনীতির পরিচায়ক, তবে তাঁকে মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্র বিরোধী বলে চিহ্নিত করা চলে না, বিতর্কের পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর অবশ্য প্রাপ্য। বরং এতে প্রমাণ হয় তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার মহান ঐতিহ্য, মহৎ কীর্তি, নীতি-পরিবর্তনের বিপুল শক্তিতে বিশ্বাসী। নয় তো' মার্কসবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচনা নিরর্থক। বুর্জোয়া সমালোচনা থেকে এখানে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

বিপ্লবের পথ নিঃসন্দেহে দুর্গম। সেই জন্যই মুক্ত মনে বিচার প্রয়োজন, অন্যথা বিচারের কোনও অবকাশ থাকত না। বিপ্লবের পথ নিশ্চিতই "গোটা ঐতিহাসিক অধ্যায়"-ব্যাপী পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর কার্যক্রম। সেই জন্যই সব সময় এক কর্মসূচী চলে না, পরিবর্তনের-ও দরকার আসে। বিপ্লবের পথ নিশ্চয় "নেভ্স্কি প্রসপেক্টের মতন একটা সোজা সড়ক নয়।" সেইজন্যই খোলা রাস্তায় ট্যাঙ্ক চালালেই সব সমস্যার সমাধান হয় না।

৬ই অক্টোবর ১৯৬৮

বন্দুক

অজিত মুখোপাধ্যায়

বাসের ইঞ্জিনের শব্দ কানে ঝাঁ ঝাঁ করে বাজল বাস থেকে নেমে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর গ্রাম্য নিস্তব্ধতার পরিচিত আবহাওয়া ঘিরে ধরল অবনীকে। কী শাশ্বত স্তব্ধতা। অবনী বেশ খুশি হয়ে উঠল। অথচ খুশি হওয়া এখন মোটেই উচিত নয়। যে-বাড়ি থেকে সে স্বেচ্ছায় পীড়নের চাপ সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে বেঁচেছিল সেখানে ফিরে যাওয়ায় আর যাই কিছু থাকুক আনন্দ নেই। আছে আবার পীড়নের মুখোমুখি হবার আতঙ্ক।

তবু অবনী খুশির হাত থেকে নিজেকে এড়াতে পারল না।

এই সব রাস্তা ধুলা খন্দর উপর তার পায়ের ছাপ খুঁজলে এখনো পাওয়া যেতে পারে। ঘোষদের বাঁশঝাড়ে অবনীর নিজহাতে কাটা বাঁশের গোড়াটা তেমনি ঠুঁটো। গোড়াতে হাত বুলোল। পিসির বাড়ির দক্ষিণ দিকে যে পেয়ারা গাছটা লাগিয়েছিল সেটাতে ফুল এসেছে। গাছটাকে জড়িয়ে দাঁড়াল। রোদ্দুরের তাতে গাছটা এখনো গরম। একপাল হাঁস তালপুকুর থেকে উঠে কুটির পুকুরের দিকে প্যাঁক প্যাঁক শব্দে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে চলেছে। ওই যে অবনীর কালিহাঁস। হাঁসটা অবনীর এত প্রিয় ওর ডিম খেতে দিত না কাউকে। কালিহাঁসের সব কটা ডিমের বাচ্চা ফুটোনোর চেষ্টা করেছে অবনী।

কালিহাঁস হঠাৎ ঝাঁক থেকে বেরিয়ে এসে অবনীর পায়ের কাছে ঠোঁট ঘষতে লাগল। ওকে কোলে তুলে নিল।

চোখে জল এসে গেল।

এখানকার সঙ্গে তার আশৈশব সম্পর্ক—ঘনিষ্ঠ। এখানকার মাটি গাছ ডাঙা ঘর মানুষ পশু সবাইকার সঙ্গে তার ভাব। কিন্তু এখানকার জীবন তার সহ্যাতীত। এটা যে পিসির গাঁ পিসির ঘর। নিজের ঘর কবে পড়ে গেছে নিজেদের গাঁয়ে। বাপমাকে সে কবে ছোটবেলায় হারিয়েছে।

কালিকে বুকে চেপে ধরে অবনী আবার ভাবল। এখান থেকে আবার পালাবে কিনা। কিন্তু বাইরের জগতও সমান কঠোর। সেখানে এর-তার

দুয়ারে পড়ে থেকে, উঞ্ছবৃত্তি করে কাটাতে যেরা ধরে গিয়েছিল। আজ কারুর স্নেহ-মায়া-মমতা মেলে তো কাল গলাধাক্কা। আজ বিরাট বাড়ির বৈঠকখানায় তো কাল ফুটপাতে। মনঃপূত মনিব মেলে তো পার্শ্বচর মেলে না, পার্শ্বচর মেলে তো মনিব মেলে না।

কষ্ট যখন ঘরে আসে পিসির ঘরে ও বাইরে প্রায় এক প্রকার তখন পিসির বাড়িতেই ভালো।

গঞ্জনা যার চাবুক সব সহ্য হয়ে গেছে অবনীর। এখন বাকি আছে তাকে খুন করে ফেলা। দাদা যদি ওকে খুনই করে ফেলে তাহলে তো আর যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য দেহটা জ্যান্ত থাকছে না!

দাদা তাড়িয়ে দেবে না। ভাতের অভাব নেই। ফেলা ছড়া ভাতেই অবনীর চলে যাবে।

এবারে ওদের মতে চলবে ভেবে এসেছে। ওরা যা বলবে তাই করবে। মজা হল এই যে ওদের কথামত কাজ করতে গিয়ে যখন অঘটন ঘটে দোষ চাপে অবনীরই কাঁধে। অবনী ওদের স্মরণ করিয়ে দেয় ওরা আরও রেগে ওঠে। অবনীর কপালে জোটে নির্মম তাড়না। সেই জন্য অবনী দেখেশুনে ওদের কথামত কাজ করতে চাইত না, সব ব্যাপারে নিজের গোঁ খাটাত।

পিসির বাড়িতে বাস করেও অবনীর একগুঁয়েমিটা গেল না। সব শুনে নিজের মতে কাজ করে ও আনন্দ পায়। কাজের সুফলে প্রশংসা জোটে না। কুফলে জোটে শাস্তি। তবু আনন্দ পায় অবনী। নিজের মতে কাজ করে কতবার সে সফল হয়েছে হিসেব করে যখন ভাখে শতকরা পঞ্চাশটির অনেক বেশিবার সে বিজয়ী, তখন নির্মমতম তাড়না মুখ বুজে সহ্য করে।

এবার ঠিক করেছে স্বমত সে বিসর্জন দেবে। বহুরূপীর মত ক্ষণে ক্ষণে ওদের রঙে রঙ পালটাবে।

কিন্তু পারবে কি? নিজেকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না। বাইরেও কোথাও নিজের মত-জাহির-করা স্বভাব বিসর্জন দিতে পারে নি। স্বভাব কি কেউ একেবারে পালটাতে পারে?

মন সন্দেহ সত্ত্বেও অবনী নিজকে মনে মনে ধমকায়।

সোজা পিসির পায়ে পড়ে যাবে। দাদার দু'পা জড়িয়ে ধরবে, দাগিন্দ চরণ জোর লাথি কষবে। অবনী মাটি আঁকড়ে শুয়ে থাকবে।

মহড়া দিয়ে চলেছে সেই কলকাতা থেকে।

দুয়ার গোড়ায় আর পা সরছে না তার।

নাঃ মনে মনে গাল দিল লগিন্দকে। ও শালার পোষা পায়ে জিভ দিয়ে চাটতে পারবে না।

কালিটা ঠোঁট দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে গলায়। গা শিরশির করে উঠল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি দু ঠোঁট দিয়ে চেপে চেপে ধরতে লাগল কালি।

রোমাঞ্চকর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল অবনীর গোটা শরীরে।

ভারি সদর দুয়ারটা ঠেলে কালিকে বুকে ধরে ভিতরে ঢুকে পড়ল অবনী।

পিসি রান্নাচালার চাঁচতলায় এক তাড়া শুকনো কুচা ঝাড়ছিল।

লগিন্দ প্রায় এক হাত উঁচু শান বাঁধানো রোয়াকে নতুন চকচকে বন্দুকটা দেখাচ্ছিল শান্তিকে মানে বৌদিকে। দুজনেই অবনীকে দেখে ক্ষণিকের জন্ত সংশয়ান্বিত হল।

অনেকদিন আগে থেকে বন্দুক নেবে বলে লগিন্দ জল্পনাকল্পনা করছে। নিজের মনেই নেবে কি নেবে না এই তোলাপাড়া চলছিল। বন্দুক ঘরে আনা মানেই তার ঘরে ঐশ্বর্য উপচে পড়ছে একথা সশব্দে ঘোষণা করা। কিন্তু মা লক্ষ্মী ঘরে যতই হাত-পা ছড়িয়ে বসছেন, লগিন্দ ও শান্তির মনে ভয় ততই বেড়ে চলেছিল। ক্রমাগত মানুষ—বিশেষ অভাবী মানুষের হিংস্রতার ক্রিয়াকলাপ বেড়ে চলেছে চারিদিকে। কোথায় বুড়ো বুড়িকে পর্যন্ত ছেঁচে ছেঁচে মেরে ডাকাতরা যাবতীয় ধন-সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে। বাড়িতে একটা বন্দুক থাকলে কত সাহস কত ভরসা। সেই বন্দুক আজ সদর থেকে নিয়ে এসেছে লগিন্দ। বন্দুক বাগিয়ে ধরা টোটা ভরা ঘোড়া টানা ও ফায়ার করার কৌশল শেখাচ্ছে শান্তিকে। শান্তি তো ভয়েই সারা। মাঝে মাঝে অস্ফুট আর্তনাদ করছে। জীবনে কখনো কাউকে লাঠিপেটা করেছে কিনা যার মনে নেই তার হাতে বন্দুক কি সহজে গর্জাবে!

লগিন্দ বলল, বুকে ঠেকিয়ে—নাইলে হাড় কপান ভেংগে যাবেক।

শান্তি প্রথামত বাগিয়ে ধরতে না পেরে ঠকাস করে রোয়াকে ফেলে দিল নতুন বন্দুকটা। লগিন্দ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল। বন্দুকটা তুলেই কোঁচা বুলিয়ে আঁচড়ের দাগ মুছতে লাগল।

অজস্র গালাগাল দিল লগিন্দ, মা ও মামাত ভাই অবনীর সম্মুখেই।

শান্তি হাসছে। না হেসে তার উপায় নেই।

শান্তি বলল, নিজে ধর দিকি।

পাখি মারার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বন্দুকটা ধরল লগিন্দ কিন্তু তার হাত এক মিনিট স্থির থাকছে না। মাত্রাছাড়া মদ খেয়ে স্নায়ুমণ্ডলীতে ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে।

বাইরে সজনে গাছের ডগার দিকে বন্দুকের নল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাঁপতে কাঁপতে বন্দুকের নলটা নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে, অর্থাৎ শান্তির বুকের সোজাসুজি।

সঙ্গে সঙ্গে শান্তির মুখের রং বদলে গেল। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে সরে গিয়ে বন্দুকের নলের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরল নলটা।

বলল, দাঁতে দাঁত চেপে, তাইলে বড় মজা, না?

আধ বুড়ো লগিন্দ এখনো গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে কাটায়। তার অন্যতম কারণ শান্তি নিজেও। পুরুষের বারমুখীনতা শান্তি সইতে পারত না কোনোকালে। লগিন্দকে বুকে টেনেও নেবে, মুখে নিন্দে করতেও ছাড়বে না। লগিন্দ ছাড়া অন্য পুরুষের চিন্তা করতে পারে না শান্তি। কোনো প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতাও নেই। রাস্তাও জানা নেই। আগে মাঝে মাঝে অসহযোগ প্রকাশ করত যখন তাদের একমাত্র ছেলে মধু কয়েক বছরের। প্রায় দু বছর শান্তি অসহযোগ চালাতে পেরেছিল। হয়তো এই অসহযোগের ফলেই পরবর্তী কালে ওদের তিন-তিনটি মেয়ে জন্মাল পরপর। শান্তি স্বামীকে তার অধিকার থেকে চিরকাল বঞ্চিত করতে পারল কই! বরং ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় কাউকে জ্বালাতে না পেরে নিজেই পুড়ে চলল।

লগিন্দ বলল, কী ভাবছ! তুমাকে মাত্তে পারি! তুমি পিরথের লখ্খী।

শান্তির চোখে প্রগাঢ় ভয়। ভয়টা মুহূর্তে থিতিয়ে ফেলল শান্তি। লগিন্দর কাছে এগিয়ে গিয়ে কানে কানে বলল, তুমার হাত থির রইছে না যে গো! বন্দুক লিয়ে কী করবেক?

লগিন্দ সগর্বে ধমকাল।

শান্তি বলল, দাও দেখি—

লগিন্দ বন্দুকটা পেছন দিকে ঘোরাতেই ওদিক থেকে পিসি মানে কাতু রান্নাঘরের কপাট ভেজিয়ে দু হাতে দুটি পাট ধরে কেঁপে উঠল।

যত দিন যাচ্ছে মৃত্যুকে তত ভয় কাতুর। জ্যোতিষী দেখলেই হাত দেখাবে আর জিজ্ঞেস করবে, কবে যাব বল দিকি? সত্তর বছর বয়স চলছে

কাতুর। যে-ই শুনবে তার পরমায়ু একশো বছর, বাঁধানো দাঁতগুলি সব বেরিয়ে পড়বে। —কত কষ্ট যে কপালে আছে।

লগিন্দ শান্তি ও মধু তিনজনে মিলে কাতুর নামে যত সম্পত্তি আছে সবগুলি মধুর নামে দানপত্র লিখে দিতে চাপ দিচ্ছে কাতুকে। কাতুর ছটি মেয়ে। সবাই ছেলেপিলের মা হয়ে শ্বশুরঘর করছে। যদি তারা মায়ের সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে আসে!

কাতু দানপত্র লিখে দিতে বর্তমানে রাজি নয়। মরতে তার এখনো দেরি আছে, অনেক দেরি। সম্পত্তিটুকু লিখে দিক, আর পরদিন থেকেই তাকে সবাই হেনস্থা করুক। হেনস্থা সহ্য করা কাতুর পক্ষে অসম্ভব, বিধবা কাতু সুদীর্ঘ কুড়ি বছর এ সংসারের কর্ত্রী। বরং তীর্থে তীর্থে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো অনেক সহজ।

কাতুকে মেরে লগিন্দর লাভ নেই। বুড়ি মাকে মারার মত কোনো অবস্থাও সৃষ্টি হয় নি। তবু কাতু কাঁপতে লাগল তার দিকে বন্দুকের নলটা স্থির দেখে।

শান্তি হঠাৎ বন্দুকের নলটা হাতের কাছে পেয়ে চেপে ধরল বাঁ হাতের মুঠোয়।

ঘরের ভিৎরেই তুমার হাত কাঁপছে। লোকের চিচ্‌কার শুনলে ইটা তুমার হাতে রইবেক?

বন্দুকটা কেড়ে নিল শান্তি।

লগিন্দ কয়েক পা পেছিয়ে গেল।

শান্তির কাঁধ থেকে আঁচল সরে গেছে। খালি গা। হাঁটু গেড়ে বসে ঠিক দূরের বাঘ-মারার ভঙ্গিতে বন্দুকটা কণ্ঠনালীর নিচে ঠেসে ধরল শান্তি। ওর হাঁটুর উপর কনুই, হাতের চেটোর মধ্যে বন্দুকের নল।

প্রথমে টিপটা থাকল খেজুর গাছের মাথায়, তারপর, ছাতের কার্ণিশে, তারপর রান্নাঘরের চালায়, রান্নাঘরের কপাটে, কাতু কপাটটা একেবারে বন্ধ করে চেপে ধরল, তারপর লগিন্দর দিকে।

চেম্বারে টোটা ভরা আছে। ঘোড়া টানা ছিল না, কাতু নলটা স্থির রেখেই ঘোড়া টেনে দিল।

বলল, এত খুন মিছামিছি ডরেই মরাছলম!

সজোরে কয়েক হাত উঁচু লাফ দিয়ে লগিন্দ দালানে ঢুকে পড়ল।

হেসে উঠল অবনী। কুয়াতলার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে অবনী মজা দেখছে। তাকে নিয়ে এরা পড়ে নি বলে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। কালির পিঠে গভীর সোহাগে হাত বুলোচ্ছে আর বন্দুকটার খুঁটিনাটি তীব্র নজরে লক্ষ্য করছে।

বৌদির চোখমুখে এমন একরাশ আলোর ছটা আগে কখনো ছাখে নি অবনী।

লগিন্দ অথবা কাতুও না।

দীর্ঘ তেইশ বছরের দাসিত্বকে শান্তি যেন একটি মাত্র গুলিতে শেষ করে দিতে পারে। কী দৃঢ় হাতে ধরেছে বন্দুকটা।

শান্তি নিজেও অবাক হয়ে যাচ্ছে। জাঁদরেল শাশুড়ি ও দশটা গাঁয়ের জবরদস্ত মোড়ল তার স্বামীর চোখের সামনে, অথচ সে দাসী নয়, বরং যেন ওদের কর্ত্রী।

সবার মনেই কি নিজেকে প্রকাশ করার অসীম ক্ষমতা থাকে? যতই পীড়িত পদদলিত হোক মানুষ, তার হাতে শক্তি তুলে দিলে মনের শক্তিটা অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসে বাইরের শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে পারে? এখন নিজেকে কেমন অসমসাহসী, যে কোনো কিছুকে তুচ্ছ করার যোগ্য মনে হচ্ছে! মা দুর্গার মত সুখে সুখী মনে করছে শান্তি নিজেকে!

নলটা ঘুরছে। চক্রাকারে।

কালিহাঁসের সঙ্গে মিলল নলের ডগার মাছিটা।

কুয়ার পেছনে হটতে লাগল অবনী। কালিহাঁসটাকে শান্তি কোনো দিন দেখতে পারে না। কারণ ওটা অবনীর প্রিয়। অবনী শান্তির চক্ষুশূল; শুধু শান্তির কেন, লগিন্দর, মধুরও।

শান্তি, খিলখিল করে হেসে উঠল।

কালিহাঁসটাও বোধহয় প্রাকৃত চেতনায় অবনীর কোলে ছটফট করে উঠল। পা ছুঁড়তে লাগল। হয় তো কোলে আটকা থাকার অভ্যেস নষ্ট হয়ে গেছে অবনীর সাতমাস অনুপস্থিতিতে। হয় তো বারুদের গন্ধ পেয়েছে পাখিটা।

লাফ দিল কালি ছটফটিয়ে উঠে। উড়ে গিয়ে বসল কয়েক হাত দূরে। ছুটে গেল অবনী কালির পিছু পিছু।

বন্দুকের নল কালিকে লক্ষ্য করে সরছে।

কাতু আর রান্নাঘরে থাকতে পারল না, উঠোনে বেরিয়ে এল। কালির দিকে নল কিন্তু কালির কাছেই অবনী। কী ঘটতে কী ঘটে। মনে পাপ আর হাতে অস্ত্র থাকলে মানুষ কী করে বলা যায় কি!

দৈবাৎ বলেও একটা কথা আছে!

কালিকে শান্তি গুলি করবে ভাবাই যাচ্ছে না, হয়তো সত্যি সত্যি শান্তি নিছক মহড়া দিচ্ছে।

কাতুর বুক ধড়ফড় করছে তবু। মন মানছে না।

বন্দুক এ বাড়িতে প্রথম। বন্দুক হাতে নিলে মানুষের মনের ভিতরে কী ভাবান্তর ঘটে সে সম্বন্ধে কারু ধারণা নেই। সবাই খারাপ দিকটাই ভেবে চলেছে।

কালিকে আবার কোলে তুলে বন্দুকের দিকে তাকিয়ে অবনীর পা নিঃসাড় হয়ে গেল।

বন্দুকের কানা চোখটা তাকে দেখছে।

শান্তি এবার উচ্চগ্রামে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

হাসি থামলে বলল, এস গো, ঘোড়াটা নামিয়ে দাও।

নগিন্দ নকল সাহসের ভঙ্গি দেখিয়ে রোয়াকে বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে ঘোড়াটা নামাল অনেক কসরতের পর।

বৌদির হাতে ধরা বন্দুকের ছবিটা অবনীকে বড় আনন্দ দিল। মিনমিনে মেয়েটি যেন ঝাঁসীর লক্ষ্মীবাঈ হয়ে গেছে।

পিসি আড়ালে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল কোথায় ছিল অবনী, কেন আবার মার খেতে সেখান থেকে ফিরে এল। পিসি খুশি হয়েছে অবনী ফিরে আসায়। অক্ষম মমতাটাও মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে। বাইরের স্বাধীনতাতেই তো অবনী ভালো ছিল। কেন, কেন ফিরে এল ছোঁড়াটা।

এই বাড়িতে অবনীর চোখ ফুটেছে। নগিন্দর বাড়িঘর জিনিস-পত্র জমিজমা সবগুলির সঙ্গে তার শৈশব সংশ্লিষ্ট সম্পৃক্ত। এই সবে যে তার অধিকার নেই, সে জ্ঞান অবশ্যই হয়েছে খুব কম সময়ের মধ্যে। কিন্তু এখানেই যে তার জ্ঞানের আরম্ভ ও স্বপ্নের বিস্তার, এ গ্রামের মাধুর্য ও কুশ্রীতা দুটিতেই সে যুগপৎ মোহাবিষ্ট। নগিন্দর সব কিছুতে হাত দিয়ে অনেক ধমক অনেক শাসন শুনে শুনে কানে কড়া পড়ে গেছে। এই সবকিছুর সঙ্গে তার কোন অধিকারের সম্পর্ক না থাকলেও এদের সুখ দুঃখ এদের উত্থান-পতন প্রভৃতি

সমস্ত ব্যাপারে নিজেকে অবিচ্ছেদ্য ভেবেছে। এখানকার তুচ্ছ দৃশ্যেও অবনীর গভীরতম সুখ, ভোরের বর্ণান্তর দেখলে তো অবনী আর কিছু চায় না জীবনে। বরাবর ওর মন বলে এসেছে এত সব আছে, কেন তার এতটুকু দাবি নেই?

পিসা বিহারে চাকরি করত যখন, তখন মাঝে মাঝে অবনীর বাবাকে পাঠাত সঞ্চয়ের টাকা। সে টাকায় পিসার নামে জমি কিনে দিয়েছে অবনীর বাবা। একটার পর একটা জমি জমা সম্পত্তি। একেকটা জমি ডাকলে সাড়া দেয়। অবনীর বাবা আদ্যা চাষী। পিসার একটি কাণা-কড়ি পর্যন্ত এদিক-ওদিক করেনি। পিসা মরল, পিসি ছ মেয়ে ও ছেলে বউ নিয়ে এখানে এল। ছ মেয়ের বিয়ে দিয়েছে পিসি, এত বড় সংসার চলেছে, তবু বছর বছর জমি বেড়েছে; সব জোগান দিয়েছে অবনীর বাবার হাত দিয়ে কেনা সম্পত্তি। অবনীর বাবা মরল। মা মরল বছর খানেক বাদে। অবনীর নামে এক ছটাক সম্পত্তি রেখে যায়নি ওর বাবা। দোষ বাবার নয়; লোকটার কোনদিনই কিছু ছিল না। কোন রকমে সংসারটি চালিয়ে গেছে খেটেখুটে। পিসি অবনীকে মানুষ করার ভার নিল কিন্তু লগিন্দ শাস্তি ও মধুর দুর্ব্যবহারে অবনী অতি শৈশবেই স্কুল ছাড়ল, বিনি মাইনের মুনিষ খাটতে লাগল পিসির ঘরে।

লগিন্দর বাপুতি সম্পত্তির গোড়ায় তো অবনীর বাবা। অবশ্য সেই সুবাদে নয়, স্বাভাবিক মানুষ হবার সুবাদেই অবনী লগিন্দর সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছন্ন ভেবে এসেছে অজ্ঞাতসারে।

ভাবলেই তো আর কাজে হয় না।

সব ভাবনাই তো আর কাজে করা যায় না। সহজে।

ভাবনা কাজে দেখাতে গিয়ে অবনীর খালি পিঠ ফেটেছে কঞ্চিতে অনেক বার।

লাঙলের বোঁটা ধরতে অবনীর কোনো দিনই ভালো লাগে না। ইদানিং অবনীকে দিয়ে চাষ করাবার মতলব ভেঁজেছিল শান্তি। প্রায়ই গজর গজর করত, হয় ঝাঁঝি নয় নোয়ান নয় সোল জমির বাত কেটে যাচ্ছে বলে। বর্ষা যখন সম্যক তখনও নাকি সোল জমির বাত কেটে যাবার ভয়! ঘরে চার লাঙলের চাষ, পাঁচটা থাকলেই ভাল। পাঁচ লাঙলের চাষ আসলে চার লাঙলে তোলা হচ্ছে। বাড়তি লাঙল হেলে মোষ সবই আছে। সুতরাং কেন অবনী এটা সেটা বাজে কাজে সময় নষ্ট করে। বাপ-দাদা-ঠাকুর্দা যখন চাষী তখন সে কী এমন লাট সাহেব, লাঙলের বোঁটা হাতে ধরলে ফোস্কা পড়বে।

অবনীকে আম্মা গোলে পাঠাল একদিন, বলল, যাও, রোগ পড়েছে, বন্ধ করে দিয়ে দয়ে এস।

কয়েক মিনিটের মধ্যে অবনী পালাল ছ মাইল দূরে গড়বেতা। ফিরল রাত দশটায়। পিঠে কঞ্চি ভাঙল লগিন্দ।

যে কোন ছোটাছুটির কাজ অবনী পলকে মেরে ফেলবে, কিন্তু চাষবাসের কাজ তার দু চোখের বিষ।

বিষ হোক আর যাই হোক মুখের কথা শুনতে হবে। যতক্ষণ তোমাকে এ বাড়িতে ফিরতে হবে থাকতে হবে খেতে হবে ততক্ষণ এ বাড়ির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

সাত মাস বাদে অবনী ফিরে আসায় লগিন্দ ও শান্তি প্রকাশ করল কপট রাগ। মুখে গালাগাল দিল অকথ্য, মনে কিন্তু খুশি। অবনীর কাজকর্ম সারতে দুটি বাড়তি লোক হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কালই তাদের জবাব দেওয়া হবে।

ঘসর-ঘস খড় কাটল অবনী, ডাবায় খোল জাব দিল, জল দেখাল পচিশটা গরু মোষকে। মাত্র এক ঘণ্টায়।

ডোবার ধারে এসে দাঁড়াল ; ধুলোর ঝড় বইছে তাল গাছের সারিতে, তার জোর শব্দ, আকাশে একরাশ কৃষ্ণপক্ষের তারা, মাঝে মাঝে তারা খসছে। কোথাও দূরে বৃষ্টি হয়েছে। গরম হাওয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে এসে লাগছে গায়ের ঘামে।

কেন ফিরল এই শাসনের রাজত্বে, এই ডোবা এই তালগাছ ওই রাস্তাটার জন্য ? এই রকম গাছ মাটি রাস্তা আকাশ তো সর্বত্রই !

আশু পোড়ের মেয়ে শুঁটির জন্য ? ওর তো কবে বিয়ে হয়ে গেছে। শুঁটির বরটা এক রাতও ছেড়ে থাকতে পারে না শুঁটিকে। বাপের বাড়ি আসা শুঁটির প্রায় বন্ধ।

তবে কিসের জন্য এই বর্বর গ্রামে ফিরে আসা ?

মোহিনী কলকাতার পায়ের ধুলোয় বসে প্রাণত্যাগ করা কি এই গাঁয়ে পড়ে থেকে মার খেয়ে মরার চাইতে শ্রেয় ছিল না ?

দোতলায় পশ্চিমের ঘরে শুয়ে ঘুম এল না অবনীর। বিড়ির তাড়া আর দেশলাই নিয়ে দোতলার ছাতে উঠে এল। পায়চারি করল, ছাতের মধ্যেকার হাঁটু সমান উঁচু পাঁচিলের আড়াআড়ি জায়গায় বসল আর বিড়ির পর বিড়ি

ফুঁকল। শালা লখিন্দ বেশ সুখে আছে, না আছে খাবার চিন্তা, না আছে পয়সার। ঘরে একজনের পাশে শুচ্ছে তো বাইরে দশজনের। কোনদিন লোকটার একটা ভারি রোগ হতে দেখল না অবনী। যকের মত সম্পত্তি লখিন্দর। খেতে মাত্র কটা পেট। উত্তরাধিকারী কেবল মধু। লখিন্দ প্রথম যৌবনে ঠিকাদারি করে কিছু টাকা লোকসান দিয়েছিল। কিন্তু গত দশ বছর থেকে যা ধরছে সোনা হয়ে যাচ্ছে। দশ হাজার টাকার আলু প্রায় লাখ টাকার কাছাকাছি করে দিয়েছে কোল্ড স্টোরেজ। এ বছর ডাঙা চাষ করার জন্য পচিশ হাজার টাকা খরচ করে কুয়া কাটিয়ে পাম্প বসিয়েছে। একশো বিঘে তার এলাকা। লালচে ডাঙা এবার চিরসবুজ থাকবে।

কোনো—কোনো অভাব নেই। লখিন্দর সংসারটাই বোধহয় স্বর্গ, অন্তত অবনীর জ্ঞানের মাপকাঠিতে। বোধহয় এই স্বর্গের অজ্ঞাত টানেই অবনী কলকাতা থেকে ছুটে এসেছে।

অবনী ভাবল পৃথিবীতে তো কত অঘটন ঘটে, কলেরা আছে ভূমিকম্প আছে, আছে আরও কত কী। সে সব কিছুর একটা এখানে হয় না কেন। কেন রাতারাতি ঝটাঝট মরে যায় না লখিন্দ শান্তি আর মধু।

মধু তো এখানে থাকে না। থাকে কলকাতায়। পড়ে এম-এ। দু জায়গায় একসঙ্গে কলেরা বা ভূমিকম্প হবে কী ভাবে।

মধু এখানে আসে ছুটি ছাটায়। তখন হোক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড।

রাত্রি বাড়তে বাড়তে কোথায় এসে ঠেকে খেয়াল নেই। বিড়ির বাণ্ডিলে যা ছিল খতম। মাথাটা ঠাণ্ডা হল না।

একলা একটা জীবন নিয়েও কত দুশ্চিন্তা। মাথার উপর ঘননীল আকাশে কত তারা, নিচে ক্রোশের পর ক্রোশ রাত্রির গভীরতা। কোটি কোটি প্রাণীর সাড়া এখন অপ্রকাশ্য। বোধহয় তাদের জীবনেরও অবনীর বুকের মত বেদনা। সুস্থভাবে প্রকাশের। সুস্থভাবে প্রকাশের স্তরে স্তরে কত বাধা কত আঘাত কত প্রতিযোগিতা কত খুনোখুনি। অথচ সবাই চায় একমাত্র জিনিস, সুস্থভাবে জীবনের প্রকাশ। কিন্তু এই ব্যাপারটা কি সবাই মিলে তৈরি করা যায় না।

কেন যায় না অবনীর মাথায় ঢোকে না। কেন একজন আরেক জনকে অকরুণ তাড়না করে পীড়ন করে বোঝে না সে।

দূরে উত্তরদিকের শালবনের কোলে একটা বড় আলো চোখে পড়ল

অবনীর। কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগে ওই দিকে চেয়ে থাকল। ক্রমশই একটা আলো দুটো হল তিনটে হল পাঁচটা হল। অবনীর বুকটা কে যেন চেপে ধরল দারুণ অশুভ চিন্তায়। দেখা না থাকলেও ওই আলোর মানে জানা আছে।

দ্রুত পায়ে দোতলায় এসে দাদার ঘরে জোর ধাক্কা মারতে যাবে, ভিতরে হাসির শব্দে থেমে গেল। গ্রামের রেওয়াজ ঘরে লণ্ঠন জেলে শোয়া। ঘর তাই আলোকিত। দরজার ফাটলে চোখ রাখল অবনী।

শান্তি বিস্রস্ত বসনে নগিন্দর হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ঘরময়। বলছে, যাও না লায়েক পাড়াকে যাও।

ইতস্তত করতে লাগল অবনী, অথচ একতিল অপেক্ষা চলে না। দরজায় আঘাত হানতে যাবে, নগিন্দ শান্তির শাড়িটা ধরে হেঁচকা টান দিয়েছে। শান্তি পড়তে পড়তে খাটের প্রান্ত ধরে বেঁচে গেছে। পুরো শাড়ি নগিন্দর হাতে। খাট ধরে উবু হয়ে হাঁপাচ্ছে শান্তি, তার চাইতে বেশি হাঁপাচ্ছে নগিন্দ নিজে। ও মেঝেতে বসে পড়েছে। কয়েক মিনিট পরেই অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল। শান্তি হঠাৎ ছুটে গিয়ে নগিন্দর গলা জড়িয়ে ধরল এবং কী হাসি।

ঘেন্নায় পা কুঁকড়ে গেল অবনীর।

সজোরে কিল মারল দরজায়।

বিরক্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল ভিতর থেকে, কে র‍্যা!

দাদা, ডাকাত—

কী, কী বলচু!

দরজা খুলে দিল নগিন্দ কয়েক মিনিট বাদে। চোখের কোল ভেজঘামে চিকচিক করছে নগিন্দর, শান্তিরও, বোঝা গেল দুজনে অনেকক্ষণ আগে থেকেই ছোটাছুটি করছে।

নগিন্দর চোখ অস্বাভাবিক ঘোলাটে। মুখের মোটা দাগালো চামড়ায় ভয় থর থর করছে। ভকভক গন্ধ বেরোচ্ছে মুখ থেকে।

কী বলচু! তোতলিয়ে প্রশ্ন করল নগিন্দ।

ডাকাত গো দাদা!

বিড়বিড় করে বলল নগিন্দ, আজই বন্দুক আনলাম, আজই শালার ডাকাত।

[illegible]বে নিবে ইটাই জানে, শান্তি বলল, কবে নিচ্ছ সেটা কেউ জানে নি।

[illegible] শাড়িটা পরেছে জড়াইয়ে যাবার ভঙ্গিতে।

[illegible]াট ধরে নগিন্দ বলল, খোলটা দিয়েন।

শান্তি অবনীকে আলোর দিক।

খুতনিতে ঘামের ফোঁটা জমছে নগিন্দর, চোখ যেমন খুশিতে জলছিল এসেছে। অনেক দিন আগে থেকে ভয় আসছে তার বাড়িতে ডাকাত পড়তে পারে যে কোনো রাতে। তাহলে আজ সত্যি সত্যি পড়ল।

পড়ুক। সে তো সাবধান হয়েই আছে। ভগবানের অসীম কৃপায় বন্দুকটাও পেয়ে গেছে।

নাটকীয় কায়দায় নগিন্দ কালীর কঠোর উদ্দেশে প্রণাম করে চেঁচিয়ে উঠল।

এ যাত্রা কোনো রকমে বাঁচলে হয়, আর এ গাঁয়ে এক মাসও বাস করবে না নগিন্দ। শহরে উঠে যাবে। শহরে কত বড় লোক। কই ওখানে তো ডাকাতি কাড়াকাড়ির কথা আকচার শোনা যায় না। ওখানে যে ঘরে ঘরে বন্দুক রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ। বছরে একশো লোককে পালন করার ক্ষমতা এ গাঁয়ের মধ্যে কেবল নগিন্দর। শহরে তার মত মাতব্বর গলিতে গলিতে। এখানে প্রাণ ফাটিয়ে চেঁচালেও রাতে তার সাহায্যে কেউ বেরোবে না। সবাই হিংসায় জলছে। নগিন্দর মত তোরাও খেটেখুটে অবস্থা ফেরা না, কে ধরে রেখেছে তোদের। নিজের ভালো করার চেষ্টা নেই কারও, অন্যের মন্দ করার ফিকির সদাসর্বদা। কত মাথা খাটিয়ে বাপুতি সম্পত্তি বজায় রেখেছে নগিন্দ, বাড়িয়েওছে। বুকের জোর হাতের জোর আর মাথার জোর থাকলে মানুষ কী না পারে।

অবনী বন্দুকের খোলটা বয়ে নিয়ে ঘর থেকে বারান্দায় এল। টলতে টলতে এগোল। নগিন্দ অবনীর কাছে।

প্রাণের ভিতর থেকে শক্তি সংগ্রহ করে নগিন্দ প্রশ্ন করল, কুথাকে কুন দিক বাগে?

অবনীকে জবাব দিতে হল না। ভনভিতে চোখটা আলো উত্তর দিল উত্তর দিক থেকে। সেই আলোগুলো কখন জোড়টা হয়ে গেছে কেউ খেয়াল করে নি।

ভয়ের মধ্যেও নগিন্দর চোখ জলে উঠল। শালার হিংসা, ভাবল নগিন্দ। তার সুখ তার ঐশ্বর্য তার আনন্দের দিকে দুর্নিবার লোভ ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওঁৎ পেতে আছে। তার প্রাণটাই যেন সকলের দরকার। তার জীবন সকলের কাছে মধুমাখা, এটাকে চেটে শেষ করতে পারলেই সকলের কর্তব্য।

খোলটা বন্দুক থেকে খুলে ফেলল নগিন্দ নড়বড়ে হাতে।

বন্দুকে টোটা ভরল দীর্ঘ সময় ধরে।

চৌকটা আলো ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়িটাকে গোল হয়ে ঘিরবে। বেটারা কী নিঃশব্দ। নগিন্দ জানে, আলো চোকটা কিন্তু লোক আছে হয়তো চৌত্রিশটা। আর প্রত্যেকেই আজ নৃশংস খুনী। প্রতিবাদ করলেই বড় বড় ধারালো সান্‌দা বা কাঁ্যাচার আঘাত। কোনো কোনো দলের মধ্যে বন্দুক পর্যন্ত থাকে।

কাতুও আচমকা ঘুম থেকে উঠে এসেছে বারান্দায়।

ফিসফিস করে প্রশ্ন করছে শান্তিকে, কী আবার কামাল হইচে।

আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে শান্তি বাইরের মাঠের দিকে। আকাশে কখন পাতলা মেঘ ছেয়ে ফেলে কঠিন করেছে অন্ধকার। কেবল কয়েকটি লালচে আলো আঁকাবাঁকা ভাবে এগিয়ে আসছে।

নগিন্দ হাতে তুলে নিল বন্দুকটা। কিন্তু কিছুতেই এক মিনিটও স্থির রাখতে পারছে না।

অবনী বলল, তুমার দ্বারা হবেক না দাদা। আমাক দাও।

জানিস তুই! ইয়ার কি কলা-কৌশল জানিস!

প্রশ্ন করেও ভরসা পায় নগিন্দ। যদি একবার হ্যাঁ বলে ছোকরা তাহলে সে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। ওর কেনা মুনিষ হয়ে থাকবে বাকী জীবন।

জানি।

লে।

অবনী বন্দুকটা ধরল বেশ পাকা ভঙ্গিতে।

শান্তির চোখে সন্দেহ ঘনিয়ে এল। অবনীর মুখভাব শান্তি লক্ষ করছিল অনেকক্ষণ আগে থেকেই।

বারান্দার জালের ধারে ধারে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বেড়াতে লাগল অবনী। যে কোনো একটা আলো বাগে পেলেই ফায়ার করবে।

দোতলাটা এমন ভাবে তৈরি, সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিলে জানলা বা লোহার জাল না-ভেঙে কেউ দোতলায় ঢুকতে পারবে না। এবং চতুর্দিকে লক্ষ করার জন্য জানলার ব্যবস্থা আছে। অনেকটা দুর্গের কায়দায় তৈরি দোতলাটা।

অবনী একবার নগিন্দর ঘরে ঢুকে পড়ছে দক্ষিণ দিকটা দেখতে, একবার

কাতুর ঘরে, পশ্চিমটা দেখতে ; নিজের ঘরে, পুবদিকটার জন্ত, বারান্দায়, উত্তর দিকটা।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে অমিত শক্তিধর মানুষের মত নিজেকে ভাবতে সুরু করেছে। অন্ধকার ডাকাত লগিন্দ শান্তি সবাইকে, তার জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধকগুলিকে কীটানুকীট গণ্য করছে। একবার পাঁয়তারা কষে উত্তরে যায় তো পর মুহূর্তে দক্ষিণে, এই পুবে তো এই পশ্চিমে। যতদূর বন্দুকের গুলি যাবে ততদূর এখন তার হাতের কব্জায়। মনে হচ্ছে বন্দুকের গুলি অন্ধকারের সীমান্ত পর্যন্ত সহজেই পৌঁছে যাবে।

শান্তির পিঠে হঠাৎ নল ঠেকিয়ে বলল অবনী ভাঙা গমগমে গলায়, দাও, তুমার সব ফিকে দাও তো।

শান্তি আঁ শব্দে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে নিজের মুখ নিজের হাতে চেপে ধরে ক্ষেপে গেল, বলতে গেল 'হারামজাদা' কিন্তু বেরোল না মুখ দিয়ে।

খুব নরম মিঠে স্বরে শান্তি বলল, ঠাকুরপো ইটা কি মজা করার কাল ?

লগিন্দর বুকের দিকে অবনী নলটা সোজা করে রাখছে। কখনো কখনো। কিন্তু অবনীর মুখের ভাব খুব স্বাভাবিক। যেন ওর নিশানা আসলে নিচের দিকে, লগিন্দর দিকে নল রাখাটা খুবই সাময়িক। লগিন্দ ভাবছে, শুয়ারকে বন্দুক দিয়ে কী ভুলই না করেছে।

অবশ্য এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী। শুয়ারটা ছাড়া আর কে আছে বর্তমানে—তাদের রক্ষক !

কাতু প্রায় অথর্ব বুড়ি জীবনে বন্দুকই স্পর্শ করে নি। শান্তি প্রথমত মেয়েছেলে দ্বিতীয়ত আজই বন্দুক ধরেছে, ফায়ারটায়ার করে নি এখনো। হয়তো শান্তি অনায়াসে বন্দুক ছুঁড়তে পারত, বিকেলে বন্দুক ধরার ভাব থেকে মনে হয়। কিন্তু বাইশ বছরের সাঙিন যুবক অবনীর উপর ভরসা করে ফেলেছে লগিন্দ নিজেরই অজ্ঞাতসারে।

কী মহা ভুলই যে করেছে !

লগিন্দ বলল, অবনী ছিল নাই তো আমাদের কত কষ্ট হইছে !

পুব দিকের ঘরের জানলায় অবনী টিপ করছে, বারান্দার কথা কানে যাচ্ছে তার।

শান্তি বলল, ছেল্যাটা ভাল, উয়ার মনটা বড় পরিষ্কার।

লগিন্দ বলল, কত বছর উয়াকে খাআলম। পতিফল দিবেক নাই ?

নগিন্দ পুব দিকের ঘরে ঢুকল নিদারুণ চাপা ভয়ে। অবনীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পিঠে হাত দিল। যমের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে মৃত্যু ঠেকানোর ফন্দি এটা।

নগিন্দ ফিসফিসিয়ে বলল, ইটা মাছি, আর উইযে আলো, উটার

অবনী ধমকাল. থাম—সব জানা আছে—

একটা আলো খেজুর গাছের গোড়ায় চটা ধরিয়েছে। লোকটার গোটা দেহ দেখতে পেয়েছে অবনী। চটার আগুনে লোকটার মুখ আন্দাজ করা যাচ্ছে এখন দেশলাই নিভে যাবার পর।

কিন্তু লোকটাকে গুলি করতে মন সরছে না অবনীর। কী ক্ষতি করেছে লোকটা। কী অপহরণ করতে আসছে তার। নগিন্দর ঘর লুট করে নিয়ে গেলে তার অবশ্য আশ্রয়চ্যুত হবার আশংকা আছে। হয়তো নগিন্দ ও শাস্তি ডাকাত চলে যাবার পর কাল সকালে তাকে লাথি মেরে বিদেয় করে দেবে, যদি এখন ডাকাত তাড়াতে ব্যর্থ হয় অবনী।

এখন ফায়ার না করলে ডাকাতগুলো ঢুকে পড়ে তাকেও ঠেঙিয়ে জড়-পুঁটলি করে দিতে পারে।

তবু একটা মানুষ খুন করা কি সোজা কথা!

যার সঙ্গে কোনো বিবাদ বিসম্বাদ নেই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা কি সহজ কাজ!

আবার ভাবল অবনী, একটা গুলি বাইরে, আরেকটা ভিতরে। বাস। দুই গুলিতে এক উদ্দেশ্য সিদ্ধি। নগিন্দ খতম, ডাকাতরাও পালাবে।

নগিন্দকে মারলে কাতু দেখবে, শাস্তি দেখবে। ওরা পুলিশের হাতে তুলে দেবে। তাহলে শাস্তি ও কাতুকেও শেষ করতে হয়। কাতুকে মারতে পারবে না। একমাত্র বুড়িই অবনীকে ভালোবাসে। বুড়ির সঙ্গে অকৌশল করতে পারবে না অবনী।

তাছাড়া মধু আছে নগিন্দর ওয়ারিশ। এতগুলো লোককে মেরে লাভ?

বন্দুকটা হাতে আসার পর নানান দ্রুত চিন্তা অবনীর মস্তিষ্কের কোষগুলি তাতিয়ে তুলে চলেছে।

তাহলে রাস্তা কোনটা। অবনী সর্বদাই দেখেছে, যে কোন কাজ করতে যাও, একটার বেশি রাস্তা তোমার সামনে। যে রাস্তা সোজা সহজ মনে হচ্ছে, পরে দেখলে সেটা মোটেই তা নয়। যে রাস্তা আপাত কঠিন, দেখা যায়

সেটা আশাতীত সোজা। অবশ্য সোজা রাস্তা বরাবর সোজা থাকে না। কিছুদূর পরেই জটিল ও কষ্টদায়ক আকার নেয়।

বরাবর চলার মত মনঃপুত রাস্তা বোধহয় সকলের জীবনে মেলেও না।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে দেখা গেছে সুফলই ফলেছে। আবার দীর্ঘকালের চিন্তা ভাবনার পরে নামা কাজে নাজেহাল হতে হয়েছে।

লোকটাকে মেরেই হোক বা জখম করেই হোক ডাকাতের দল তাড়াতে পারলে হয়তো কাল থেকে এ বাড়িতে তার খাতির বাড়তেও পারে। বরাবর যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।

প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল বন্দুক।

হো হো হো হো হুয়া শব্দের চীৎকার সারা গ্রাম মন্থন করে তুলল। চতুর্দিকে মশাল নিভে গেল। দৌড়া-দৌড়ির শব্দ চতুর্দিকে। একটা মাত্র টর্চের আলো জ্বলতে-নিভতে লাগল।

শান্তি ছুটে এল পুব দিকের ঘরে।

কাতু নিজের ঘরে খিল দিয়ে বসে পড়ল উবু হয়ে, ঠাকুর নাম জপ করতে লাগল।

আর একটা টোটা ভরে দিল নগিন্দ। এবারে আগেকার চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি।

অবনীর শরীর বিতৃষ্ণায় গুলোচ্ছে, ও গিয়ে খাটে বসে পড়ল বন্দুকটা আঁকড়ে ধরে। উত্তেজনায় শরীরটাতে ধীরে ধীরে কাঁপুনি ধরল।

শান্তি জানলার গরাদে মুখ ঠেকিয়ে নিচের দিকে দেখছে।

অনেকগুলো ছায়া খেজুর গাছের গোড়ায় জড়ো হয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিকে মিলিয়ে গেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নগিন্দ ও শান্তি দেখল নিঃশ্বাস বন্ধ করে, টর্চের আলোটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে।

নগিন্দ শান্তিকে খৈনির ডিবেটা এনে দিতে বলল। এনে দিল শান্তি।

দূরের দিকে নজর স্থাপন করে বলল শান্তি, ফাঁকা শব্দেই ছুটেছে! কাউকেই লাগে নাই!

বুঝা যাবে সকালে—নগিন্দ বলল দাঁতের মাড়িতে এক টিপ তৈরি খৈনি ফেলে।

খাট থেকে অবনী উঠে এল ধীর পায়ে। ভিতরটা এখনো আর উত্তাল-

পাথাল করছে। হয়তো লোকটা এখনো খেজুর গাছের তলায় মরে পড়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। হয়তো হাঁটুতে বা আড়ে বা অন্য কোথাও জখম হয়েছে, পালিয়েছে দলের সঙ্গে, বা তাকে অন্য সবাই বয়ে নিয়ে গেছে।

লোকটার গায়ে গুলি লাগে নি এ হতেই পারে না।

পুব দিকের জানলায় উঁকি মারল অবনী দু চোখ বড় বড় করে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

অবনী শান্তির কাছে টর্চ চাইল নিচটা দেখার জন্য। শান্তি ও নগিন্দ দুজনেই জানাল, এখন টর্চ জ্বালা ঠিক হবে না। যদি ওদের হাতে বন্দুক থাকে, বিপদ ঘটবে।

নগিন্দ বলল, ছাদে উঠে একবার দেখা দরকার।

শান্তি বলল, যদি কেউ লুকিয়ে বসে থাকে?

দস্যুরা যে গ্রাম ছেড়ে সত্যি সত্যি চলে গেছে এখনো বলা যায় না। হয়তো ওরা চুপচাপ অপেক্ষা করছে গা-ঢাকা দিয়ে। গৃহস্থ শুয়ে পড়লে ওরা উঠে আসতে পারে। আজ আর রাত্রে কারুর ঘুম হবে না। ঘুমোতে যাওয়াও আজ বোকামি।

রাত্রির ঘুম আর নিশ্চিন্তে আসবেও না ভবিষ্যতে। এ সমস্যা এখন দেখা দিয়েছে গ্রামের প্রতিটি অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে।

নগিন্দর মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে। কোথা থেকে কী ঘটে গেল ঠাহর করতে পারছে না। সব চাইতে ওর বেশি খারাপ লাগছে এই ভেবে, অবনীর হাতে তাদের প্রাণ রক্ষা পেল। কাল সকাল থেকে ছোঁড়ার দাপট সহ্য করতে হবে। সবাইকে দাবিয়ে রাখার যে বড় সুখ ছিল তার। সবাইকে দাবিয়ে রাখার যে কী উল্লাস কী সম্মান সেটা নগিন্দ ছাড়া এ তল্লাটে আর কে ভালো জানে।

সাহসে ভর করে নগিন্দ দোতলায় ছাতে যাওয়ার দরজার খিল খুলতে গেল। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল শান্তি। ওদের কথাবার্তায় অবনী বন্দুকটা নিয়ে এসে দাঁড়াল নগিন্দর পিছনে।

গম্ভীর মেজাজে বলল, চল, উপরটা দেখা দরকার।

বীরের মত নগিন্দ ছুটি দরজা খুলে ছাতে উঠে এল। পিছু পিছু অবনী শান্তি ও কাছু।

শান্তি বলল, তুমি আবার ক্যানে বা?

কাতু বলল, একা কি মরব ?

সবারই এখন একা থাকা অসম্ভব। সম্পদে মানুষ একা থাকতে ভালোবাসে, গর্ব করে, বিপদে চাই তার দুর্বলতম সঙ্গীটিও। লগিন্দর মত অসামান্য অহংকারী লোকটিও আজ অবনীর হাতের মুঠোয় অস্তিত্ব সঁপে দিয়েছে।

পশ্চিম দিকের জঙ্গল থেকে একটা টর্চ দ্রুত এগিয়ে আসছে। উত্তর দিকের টর্চের আলোটা তখনো সম্পূর্ণ মুছে যায় নি।

ছাতে কেউ নেই। গ্রামে কেউ আত্মগোপন করে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না ছাত থেকে।

কিন্তু আবার আলো কেন।

সকলেরই চোখ পড়েছে আলোটাতে।

লগিন্দ অবনীর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল।

আবার চার জনের শরীরে প্রবল অস্বস্তি ছটফট করতে শুরু হয়েছে।

লগিন্দ বলল, অবনীকে, যে ঢ্যামনা সে ঢ্যামনাই রয়ে গেলি। কাউকেই গুলি লাগে নাই।

শান্তি বলল, উয়ার হাতে আবার ছাড়ে! আমি আগেই বুঝেচি উয়ার মতলব খারাপ, তুমরা জানলে কত করল, কত লাফান-ঝাঁপান! আসলে সব বাজকরের ফন্দি।

অবনী রেগে বলল, তাহালে আমি ঘর ঢুকে খিল দিতম বৌদি।

লোক দেখানি গ, তুমার যত লোক দেখানি। কী রকম মারে, অই তো আবার ছুটে আইচে।

আলোটা বেশ দ্রুতবেগে আসছে। ক্রমে গ্রামে ঢুকল, তালপুকুর কুটির-পুকুর পেরিয়ে মল্লিকদের খড়পালুই। কিন্তু একটা মাত্র আলো কেন ?

লগিন্দ ভেবে কিনারা পেল না একটা মাত্র আলোর কারণ।

অবনীর মনে মনে ধিক্কার জন্মাল। মনে হল বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে চোখের নিমেষে সব কটাকে শেষ করে দেয়। কোনো সুবিচার নেই! বুক দিয়ে আপ্রাণ আগলালেও বলে ফাঁকিবাজি! এদের অনেক খেয়েছে পরেছে অবনী সত্যি, কিন্তু তার প্রতিদানে হাজারো গুণ কি ফিরিয়ে দেয় নি। গ্রহীতার খাঁকতি কিছুতেই মিটতে চায় না। একটু আগেই নিশ্চিত খুনের হাত থেকে বাঁচানোর যে দৃঢ় চেষ্টা করেছে অবনী তার তুলনা আছে ?

পিছনের ডোবায় নেমেছে টর্চের আলোটা। নিশ্চয় দস্যুদের চর! নিম-গাছের ঝোপে মানুষটা আড়াল পড়ে গেল।

কাঁপাকাঁপা স্বরে নগিন্দ বলল, মা মেয়াছেলারা নিচে যাও। ঘর ঢুকে খিল দিই বসে থাক।

শান্তি নগিন্দকে ছেড়ে যেতে সাহস পেল না। প্রতিবাদ করতে গেল। ধমক লাগাল নগিন্দ।

অগত্যা কাতু ও শান্তি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল দোতলায়।

অবনী এগিয়ে গেল ছাতের আলসের ধার ঘেসে। নগিন্দ অনুসরন করল অবনীকে। দুজনের নিঃশ্বাস আবার বন্ধ হয়ে গেছে। বিরাট ঝাঁকড়া নিমগাছ। লোকটাকে আবছা দেখা যাচ্ছে যখন জ্বলছে টর্চের আলো। আলোটাও একসাথে বেশিক্ষণ জ্বলছে না।

অবনীর কানের কাছে একরাশ মদের গন্ধ ছেড়ে নগিন্দ বলল, নিবি বন্দুকটা?

হাত কাঁপছে?

না, তা ঠিক নয়।

তুমিই ধর।

ডাকাতটার রকম-সকম দেখে অবনীর পরিচিত স্মৃতি ভেসে উঠল বিদ্যুতের মত। এত রাত্রে মধু আসবে কী করে' হ্যাঁ, আসতে পারে। রাত আড়াইটার সময় পিয়ার ডোবায় থামে আপ ট্রেনটা। হেঁটে বন ভেঙে আসতে বড় জোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তাহলে এখন রাত সোয়া তিন।

অবনী নিজেকে সামলাতে পরেছে না।

এক ঢিলে দুটি পাখি মারার প্রচণ্ড সুযোগ কি তার সামনে! একি দৈব অভিসন্ধি!

অবনীর বুকটাতে অস্বস্তি করতে লাগল।

হ্যাঁ। মধুই। কোনোখান থেকে এলে আগে ডোবায় নেমে হাত মুখ ভালো করে ধোবে মধু, তার পর ঘর ঢুকবে।

নগিন্দ সানুনয়ে বলল, ধর, ধর না অবনী।

এক ঝাঁকুনিতে অবনী নগিন্দর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল।

মাতাল নগিন্দর মাথার ঠিক নেই; ভয়ে নেশায় সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

টর্চের ক্ষীণ আলো নিয়ে পাতার ঘন ঝোপের ফাঁকে বড় একটা ভৌতিক চোখের মত। হাত দিয়ে চাপা দিয়েছে মধু টর্চের আলোটা। এটা তার এক মজার খেলা। হাত চাপা টর্চের লাল আলোটা দেখতে ও বড় ভালোবাসে।

টর্চের আলোর সঙ্গে স্বাভাবিক দূরত্ব মেপে মধুর শরীরে বন্দুকের টিপটা ঠিক করল অবনী। কিছুক্ষণ আগেকার অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদী আশায় নিজেকে আবার সুদৃঢ়মনা করে তোলার চেষ্টা করল। এই গ্রামে ফিরে আসার সার্থকতা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তীব্র শোকধ্বনির দ্বারা ঘোষিত হতে পারে। পৃথিবীর যাবতীয় সুখের একমাত্র তালার চাবি হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে ডুপ্লিকেট অবনী।

না, শান্তির গর্ভধারণ করার ক্ষমতা আর নেই।

মধুর শোক ভুলতে অবনীকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া লগিন্দ ও শান্তির দ্বিতীয় পথ খোলা থাকছে না।

কিন্তু ছেলের খুনীকে ছেলের আসনে কি বসাবে তারা ?

বন্দুকের নলটা কাঁপছে অবনীর হাতেও। লগিন্দর হাওয়া লেগেছে অবনীর স্নায়ুতে। অবনীর মনটা ফোয়ারার ধারায় ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, কিছুতেই মনটাকে ছুরির ডগার মত ধারালো ও একাগ্র করতে পারছে না অবনী।

গুমোট কান্নায় তার বুক ভেঙে ফেলতে চাইছে।

নিজের হাতে নিজের জীবন গড়ে নিতে পারা যায় তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ এখন অবনীর হাতের কাছে। এক সুযোগ জীবনে দ্বিতীয় বার আসে না। একটা সুযোগ নষ্ট করার অপরিমেয় মূল্য দিতে হয় মানুষকে। সুযোগটা যদি হয় অসামান্য কিছু, তাহলে আফশোসের শেষ থাকে না উত্তর জীবনে।

অবনী বুঝতে পারছে, মানুষই তার নিজের জীবনের স্রষ্টা ও ধ্বংসকর্তা।

তোরও হাত নড়ছে যে !—লগিন্দ প্রায় কেঁদে ফেলল।

হাঁ গো দাদা ··তুমিও ধর - দু জনায় ধরি।

বন্দুকটা লগিন্দকে গছিয়ে দিল অবনী। তারপর নলটা নিজের কাঁধে রেখে দুহাতে আঁকড়ে ধরে অবনী বলল, পাচ্ছ, সোজা পাচ্ছ ? লগিন্দ সাহসে ভর করে ট্রিগারে তর্জনীটা দিল পেঁচিয়ে।

নলটা লাল আলোটার প্রায় সোজাসুজি আসতেই গর্জে উঠল বন্দুক। ফায়ারের চাইতেও প্রচণ্ড স্বরে আর্তনাদ করে উঠল মধু। অবনী জ্ঞান হারিয়ে

পড়তে গিয়ে কপাল কাটাল ছাতের আলসেয়। হাজার বার ছেলের নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে লখিন্দর ছুটে গেল ডোবার পাড়ে।

কাতু ও শান্তি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল।

লখিন্দর, কাতু ও শান্তি তিনজনে মধুকে ধরবে কি, নিজেরাই বুক চাপড়াচ্ছে।

বড় কঠিন মন মধুর। লখিন্দর চাইতে অনেক বেশি কঠিন। বাঁ হাতের কব্জির নিচে বেঁধা এফোঁড়-ওফোঁড় ক্ষত চেপে জড়িয়েছে কোঁচায় খুঁটে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে কাপড়।

কোথায় এরা মধুকে ধরাধরি করে নিয়ে যাবে, তা নয়, মধু নিজেই স্বচ্ছন্দে হেঁটে গিয়ে বিছানায় সজ্ঞানে শুয়ে পড়ল।

একটি নাইজেরিয় কবিতা

গ্যাব্রিয়েল ওকারা

এক সাথে অনেক গলার কলরব শুনি,
লোকে বলে, পাগলেরা নাকি অমনি শুনতে পায়।
গাছেরা এ ওর সাথে কথা কয়, আমি শুনি,
লোকে বলে ওঝা বদ্যিরা নাকি অমনি শুনতে পায়।

আমি বোধ হয়
পাগল,
না হয় ওঝা বদ্যিদের কেউ।

হয়ত পাগল। কারণ আমি পরিষ্কার শুনতে পাই
অনেক লোক মিলিত কণ্ঠে আবেদন জানাচ্ছে আমার কাছে
বলছে
ওঠো ওঠো, তোমার লেখবার টেবিল থেকে ওঠো,
এই গভীর রাত্রে
সমুদ্রের পর্বতপ্রমাণ ঢেউ ভেঙে
ওপারে পাড়ি দিতে হবে,
সময় নেই,
ওঠো, ওঠো, চলো—

কিংবা ওঝা কি বদ্যি।
চারা গাছগুলো বুড়ো গাছের সাথে কথা কয় আমি শুনি,
মানে বুঝি না,
মানে বোঝার সঙ্কেত আমি ভুলে গেছি।
কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি,
মানুষেরা আর গাছেরা একজনের কথাই বলছে,
যে চাঁদের দিকে মুখ করে আমার দিকে পিছন ফিরে

চলেছে
সাত সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ ভেঙে
দেশ মহাদেশ পেরিয়ে,
আর আমি
আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে রুমালের মতো ওড়াচ্ছি
থর থর কাঁপা হাতে,
ডেকে ডেকে আমার গলা ভেঙে গেল
কিন্তু সে ফিরে চাইছে না।   চলেছে, সে চলেছেই

অনুবাদ : মনীশ ঘটক

স্বচ্ছল বিশ্বাসে

সরিৎ শর্মা

আবারো উদ্বেল তারুণ্যে
সময়ের মত আকাশ দুলে উঠল
মোহানার দিকে—

ধনুকের মত পিঠ বাঁকিয়ে
দিগন্তের তোরণ উঁচু করে ধরল

মিলিত জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে তার নিচে
সচ্ছল বিশ্বাসে···

চতুর্দিকে জলধারার শব্দ ··
চতুর্দিকে জলধারার শব্দ···
চতুর্দিকে··

ওরা দিগন্ত পার হওয়ার আগেই
জলস্রোতে মিলবে বলে
নেমে এল নিভৃত জলধারাটি·

শব্দের বুদ বুদ

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

আকাশ গম্ভীর

কারখানার গেটে—
বেদনার নীল রেখা
ডোরা কাটা বাঘের মত
লাফিয়ে লাফিয়ে চ'লে গেল।

সামনে
উল্কার বেগ।

পিছনে
শব্দের বুদ বুদ।

এ ভরা ভাদরে

সত্য গুহ

সমস্ত রাত্রির শব্দ ভাসানের—বিসর্জনের
মানুষের শুকনো চামড়ায় হচ্ছে জোরবেত্রাঘাত, যেন অন্ধকারের
পেশীগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে, দুমড়েমুচড়ে একাকার তরু
ও চাঁদ চোখের জলে অবসাদগ্রস্ত বুক, জলপ্লাবিত রূঢ় মরু
পাদপাদপ কাঠ, হয়ে যাচ্ছে আকাশকুসুম
জলের চিৎকারে ভাঙে পাথরেরও ঘুম
জল আর জল
পাথরের মাথাভাঙা তরল গরল
প্রখর তৃষ্ণায় আমি আর্ত দিশাহারা
চোখ ভেঙে বুকময় সজল সাহারা
মুখে তুলি জলের গেলাস, জলের ভেতরে ভাসে লাশ

কোথাকে জলের কোপ-এ উপরে যায় ঘাস
আহা রে আহা রে
উমার হোলোনা যাওয়া কৈলাশ পাহাড়ে

আমার দুচোখ ভয়ে শাদা হয়ে গেছে, জলে ভয়ে গেছে বুঝি মেধা
যে দিকেই চোখ পড়ে আমার বিশদ ছবি একা
বানভাসি গাঁগেরামগেরস্ত বৌ-এর
দশহাত ভেঙে যায়, রক্ষাক্ষমতাহীন বোকা যুদ্ধাস্ত্রের
জীবনসংগ্রামে শুধু বয়ে যাওয়া হোলো, জীবন যাপনে নামে ধস
অসুর আরব্ধ যুদ্ধ মাথায় উঠিয়ে নিচ্ছে যেনবা রাক্ষস
রেললাইন, লোহাগু'ড়পুল
আকাশ বাণীর স্তম্ভ বাংলোর স্কুল
কেয়ারটেকার উড়ে যায়
প্রকৃতির স্বেচ্ছাচার, স্বাধীনতা, সাঁতার কাটছি আমি আকাশ গঙ্গায়
নিয়তির চুলের ছায়ায় বান্ধবন্ধনছিন্ন মর্মন্তুদ দ্বীপ
চারদিকে ধ্বংসচিত্র শাখা ভাঙা, ভাঙা বাসা উদভ্রান্ত জরীপ
সমস্ত অস্তিত্ব ভয়ে ক্লান্ত কোজাগরী
অশ্রুনদীর তীরে সতীদাহ শিশুদাহ রোরুদ্যমানিনী বিভাবরী
ভাসান ভাসান বান বোল দিচ্ছে বুক ভরে ঢাকী
কোথায় স্টেশান কই মেঘলী জ্যোৎস্নায় উড়ছে শিস্ তুলে জোনাকী
কোথাও উদ্ধার নেই, মুক্তি নেই, হাত তুলে ধরো
মাংসাশী জলের স্রোতে বিদ্যুৎ প্রকল্প বৃথা, দণ্ডবিধি বস্তাবে তোমারও
নিজের পতন শব্দ নিজের কানেই তোলে খেদ
এ্যারোপ্লেনেরও চাই দৌড়ুবার ক্ষেত
পায়ের আঙুল ছুঁয়ে খাদ
শূন্যতা ছুঁয়েছে নখ—অনন্ত উদ্ধারকামী রোমকূপের হাত

আমি আচ্ছন্ন হয়েছি আমি চলচ্ছক্তিহীন
চকিত হাওয়ায় উড়ে গেছে হে মোমবাতি, শিরে সংক্রান্তির টিন
হাঁটু ধরে টেনে যাচ্ছে জল
ভাসিয়ে যাচ্ছে পিতৃপুরুষের পাপপুণ্যফল

হাওস্-আপ হাত তুলে ধরো
ঘর বাঁধবার খড় খুঁজে আর কী হবে বা, যত করো জড়ো
ছুটে যাবে শরম সম্রম
তোমার খাটের বাজু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থির যম
আত্ম বিশ্বাস ?   কিসে কার ভবিষ্যৎ বেঁচে আছো প্রকৃতির দাস
কিমাকায় নষ্ট ফসলতা বেশভূষা শায়ার ভেতরে মরামাস
যতই স্বাধীন
তুমি তালকানা পাখী ফাঁদে উড়ে পড়বে চিরদিন
অথবা ভূকম্প, কিম্বা অন্ধারায়ষান
রাণীমক্ষিকার প্রেম বুনবে ফুসফুসে, আর সভ্যতায় দিলেও সাবান
ময়লা হবে না দূর
ভিটে ছেড়ে দাও তুমি বাসা হবে এখানে ঘুঘুর
গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, অভিমানে ঘা লাগে—চাবুক
বিবরের মুখ থেকে ছুটে যায় হঠাৎই ঝিনুক
সত্যগুহ পেয়ে যায় মানুষের মৌলিক দেহ
না, নেই সন্দেহ যে কোন আর্শিতে দেখ তুমি সত্যগুহ
পাঁচটি আঙুলে তুমি ঠেলে দিতে পারো ক্লান্ত কপালের চুল
বঙ্গোপসাগরের দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার জল, নষ্ট রক্ত ফুল
বিদ্যুৎ প্রকল্প আর সেচখাল
তোমার নির্মান, আছে শস্যের সাহস, আছে মীরা কান্নীলাল
তুমি শিখেছ কেবলই হয়ে যাওয়া
অকূল মরুতে উট সমুদ্রে জাহাজ উড়োসাবমেরিন বাওয়া
তুমি শিখেছ হৃদয়ে যেতে ভালোবাসা
জখম বাঘকে আর গাভীন গরুকে নিয়ে আসা
জলের নিকটে, স্বাধীনতা
প্রকৃতির আছে, তোমার নিজের আছে সার্বভৌমিকতা
আছে সহ অবস্থান
তুমিই উৎসব গড়ো তুমিই হে করেছ ভাসান
ভেঙে পড়া নয়, ভাঙার মতন কিছু নয়
একজন লোকের পাশে অন্যজন ভিড় দিলে [illegible]—জনসভা হয়

এখন আড়ালে

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

আড়ালে এখন যেন অস্তমিত রাতের প্রার্থনা
ভূগর্ভের স্তর থেকে
নীল স্তরে—ভূমণ্ডলে—উজ্জীবিত কোন গ্রহান্তরে
অন্য এক ঋতুর সংলাপ।
দূরাগত প্রতিধ্বনি কেঁপে উঠলো রিক্ত গিরিখাদে।

অজস্র যক্ষের দল জেগে আছে :
কতকাল তুহিন পাহাড়ে পিঠ রেখে
দেখা যায় হিম সম্প্রপাত
দেখা যায় ঝরে পড়া
তুষারের ক্ষতের ভিতরে
যন্ত্রণায় নীল আর্তি, কী জমাট অপার বেদনা
রক্তে রক্তে আদিমতা—সভ্যতার তীব্র অভিশাপ।

অন্তিম রাতের কণ্ঠে তাই জাগে মন্ত্রগূঢ় প্রার্থনার ভাষা
বিশালাক্ষী মন্দিরের আকাশ চূড়ায়
আলোকের প্রতিশ্রুতি
নিলীন নক্ষত্রঝরা—মানুষের বোধ থেকে সুগভীর বোধির ভিতরে
অন্ধকার ইতিহাস—সুড়ঙ্গে—আঁধারে
দুরন্ত অশ্বের খুরে বেগবান সুপ্ত জনপদ।

ঐ মুক্তি

আশিস মুখোপাধ্যায়

কোন পূর্বযুগীয় এক মানবীর হাত
আমাকে টেনে বসালো এক রক্তশূন্য পাথরের ওপর
তারপর আমাকে শেখালো—এই প্রভু,
এই মুক্তি ;
আমি সদর্পে মাথা নেড়ে বল্লাম, 'না
এ নয়
ঐ রাস্তা
ঐ মুক্তি'
আমি সামনে ইতিহাস উপুড় করে দিলাম।
সেই মানবী এলোমেলো হাওয়ার মতো
...এদিক ওদিক ঘাড় ফেরালো
তারপর স্তব্ধতা

আমি দুহাতে লাল সূর্য নিয়ে
লাফিয়ে পড়লাম সমুদ্রে।

আমার মৃত্যুর পর

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি

দিলীপ সরকার

আমার মৃত্যুর পর
চন্দনের বাটিটা সরিয়ে রেখো
ফুলগুলো পাঠিয়ে দিও অন্য কোনখানে
বৃথা নষ্ট করো না
কেননা, ফুল চন্দনে আমার কোন মোহ নেই।

আমার মৃত্যুর পর
গলার শিরা ফুলিয়ে ফুলিয়ে
প্রিয়তম শ্মশান বন্ধুগণ
ঈশ্বরের নাম নিয়ে বৃথা ডাকাডাকি করো না
আমার অন্তরে বাজে শুধু মানুষের গান
ঈশ্বরে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

আমার মৃত্যুর পর
মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে
পথের দু'ধারে খই ছিটিয়ে ছিটিয়ে
অমন করে আর পথে পথে হেঁটো না

অন্নপূর্ণার এই দেশে
যে জননী হাতপাতে এখনও ফুটপাথে
বরং মুঠি তার ভরে দিও বন্ধু, জীবনের প্রসন্ন আশ্বাসে
কেননা, অন্নদাত্রীর প্রতি আমার কোন আস্থা নেই।

একই বৃত্তে আমরা

ফিরোজ চৌধুরী

'হ্যাঁ' 'না' আজ কিছুই বলবো না
আজ আমার দর্শকের ভূমিকা
দূর থেকে শুধু দেখে যাবো :

দেখবো নিছক মিথ্যে বলে লোকগুলো
কত অনায়াসে হজম করে ফেলছে
দেখবো প্রতিশ্রুতিপূর্ণ প্রচুর মানুষ বেয়নেটের ডগায়···
দেখবো গাছের পাতা আজ সবুজ নয়—হলদে বিবর্ণ
ফুল শুকিয়ে গেছে—নদীগুলো যেন একমনে কেঁদে মরছে
কোথাও একরত্তি জল নেই :

অতীতের ইতিহাসের মত রহস্যময় মোটেই নয়
গৃহস্থবধূর ঠিক আটপৌরে শাড়ির মতন
আজকের এ দৃশ্য বড় সহজ এবং নৈমিত্তিক :

শুধু একটি কথাই আমার কাছে আমরণ
রহস্য রয়ে গেল—
জীবন নিঃসন্দেহে দুঃসহ—মরুভূমিময়
তবুও আমরা চলছি
কেবলই চলছি
ঘুরে ফিরে
সেই একই বৃত্তে।

ঘুমের মধ্যে

কালীপদ কোঙার

ঘুমের মধ্যে দেখলাম,
কতকগুলো লোকের হৃৎপিণ্ড
রেফ্রিজারেটারে জমা আছে,
কোটরগত চোখে
লাল মার্বেলের মতো আগুন জ্বলছে,
স্তূপীকৃত বইএর টিলায় বসে
তারা সব
আমার শরীরের মতো প্রিয়
কবিতাগুলোকে
নিলাম করবে ব'লে
ক্রমাগত হাতুড়ি ঠুকছে।

হে মানুষ, তোমাদের প্রতি

ইভগেনি ইভতুশেংকো

কথরখানার সাইরেনে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে
রাজপথে
সরণীতে
জনতার ভিড়ে
গায়ে গা দিয়ে তোমরা ঘরে ফের।
তোমাদের কাছে এসে
তোমাদের সঙ্গে মিশে
আমি দুঃখিত নই মোটেও।
তোমরা খুবই শ্রান্ত
তোমাদের স্নায়ু দুর্বল।
পৃথিবীর নব রূপায়ণে
তোমাদের অপ্রতিহত গতি, তোমাদের জয়যাত্রা,
সেতুবন্ধনে বেঁধে দিয়েছে স্বর্গ আর মর্তকে।
কিন্তু পথের শেষ এখনও হয় নি।
সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন তোমাদের মুখ;
তোমাদের প্রত্যেকে যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী;
বিযুক্ত হৃদয়
বিবেক,
তোমাদের প্রত্যেকের চিন্তা খণ্ড-বিখণ্ড করেছে
এই অনন্ত পৃথিবীকে।
তোমরা নিজের মত করে বিশ্বাস করো প্রত্যেকটি জিনিসে,
মদের জন্যে
পানীয়ের জন্যে
তোমরা মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হও নিজেদের
বিচ্ছিন্ন হও সকলে সকলের থেকে।

আবার তোমাদের দৃষ্টিতেই মানবতা মূর্ত,
মহান ভ্রাতৃত্বের জন্যে তোমরা দান করেছ নিজেকে।
বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলি
আসলে একটি কাহিনীই
বিযুক্ত বিবেকগুলি
আসলে একটি বিবেকই।
আমি তোমাদের কাছে এই ভবিষ্যতের কথাই বলতে চাই,
আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর ভিতর দিয়েই
জীবনকে যা সংহত করে
তাকে খাটো করতে চাই না।
না
আমি ভবিষ্যদ্বক্তা হতে চাই না,
হতে চাই না বিচারক।
কিন্তু আমাকে তোমরা ক্ষমা করো
যেমন করে ক্ষমা করো বিরক্তিকর সঙ্গীকে।
হে মানুষ, তোমাদের কাছে আমি আবার বলছি :
"আমরা মানুষ।
আমরা মানুষ।

আমরা মানুষ
আমরা তর্ক করি
অভিযোগ করি
সুযোগ পেলেই একে অন্যকে নিপাত করি প্রাণপণে।
কিন্তু আমাদের এই বিচ্ছিন্নকরণ
এ আমাদেরই সৃষ্ট এক মিথ্যা,
আমরা মানুষ, তাই আমরা কোনোদিনও বিচ্ছিন্ন নই।
অন্যকে ভুলে যাওয়া
ভুলে যাওয়া নিজেকে,
অন্যকে হত্যা করা
আত্মহত্যারই সামিল⋯ ⋯⋯।"

অনুবাদ : অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ধস্

চিত্ত ঘোষাল

সংবাদপত্রে বা বেতারে খবরটার কোনো উল্লেখ ছিল না। বা কোনো মহাপুরুষ এরূপ কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বলেও শোনা যায়নি। তবু চাপা সশংক উচ্চারণে কথাটা লোকের মুখে মুখে ফিরছিল। কেউ জোর গলায় এটাকে গুজব বলে উড়িয়ে দিতে পারছিল না, কেমনা বিপদটা ছোটখাট নয়, জীবন মরণের প্রশ্ন, যদি নামেই···। তেমনি মেনে নিতেও পুরোপুরি মন থেকে সায় মিলছিল না, একই কারণে, এত বড় বিপদ যদি আসেই তাহলে মৃত্যু, ধ্বংস···না, না, এতটা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু ভয়, সংশয় আর উত্তেজনার পিঠে চেপে কথাটা কেবলই ঘুরঘুর করছিল। কাজের সময়, বিশ্রামে কিংবা আড্ডায়, চায়ের দোকানে, ক্লাবে কেউ না কেউ হঠাৎ বলে ফেলছিল—'শোনা যাচ্ছে শিগগিরই নাকি নামবে।' 'তুমি শোননি? সবাইতো বলছে—।' আর তারপরই কেমন যেন কাজের বিশ্রামের আড্ডার সুর তাল সব কেটে কেটে যাচ্ছিল। আগের সেই মেজাজ শত চেষ্টাতেও আর ফিরিয়ে আনা যাচ্ছিল না তখন। দু'একজন জোর করে কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিল; কিন্তু তারাও অন্যদের মত ধস শব্দটা উচ্চারণ না করেই বলছিল—ইয়ে নামবে না কচু নামবে। নামলেই হল, যত্তো সব। এই ছাখো ভুল করে ফেলেছি, ট্রাম্প করব তা না, ধুৎ···

পাহাড়ের ঢালে ছোট শহর। ছোট হলেও পুরো শহরই। সরকারী বেসরকারী অফিস কাছারি, কিছু কল-কারখানা, কলেজ একটা, গোটা তিনেক স্কুল, চার্চ, দুটি মসজিদ, বেশ কিছু মন্দির, মিউনিসিপ্যালিটি, কনজারভেন্সি সারভিস, ট্যাপ-ওয়াটার, হাসপাতাল, সিনেমা হাউস, ভদ্রপল্লী, শ্রমিক বস্তি ইত্যাদি যা কিছু একটা শহরে থাকা উচিত, এমন কি ক্লাব ট্রাব ছাড়াও শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটা সংস্থাও আছে এ শহরে। এখানকার লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অস্তিত্ব বিষয়ক নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ ভাবনাচিন্তা নিয়ে যথারীতি জীবনযাপন করছিল। খাদ্যশস্যের দর গত বছর যে তুঙ্গে উঠেছিল এ সময় এ বছর তার অর্ধেকেও ওঠেনি, তবু বাজারে মন্দা,

চেকোস্লোভাকিয়ায় ওয়ারশ জোটের পাঁচটি দেশের সৈন্যপ্রেরণ, দক্ষিণ আমেরিকায় মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সাংস্কৃতিক সফর, ইত্যাকার এবং অন্যান্য গতানুগতিক বিষয়ে যখন এই পাহাড়ী শহরে কোনো আলোচনাই জমে উঠতে পারছিল না, তখনই ধস নামার কথাটা কি ভাবে যেন এসে হাজির হল। খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা ও উৎপত্তির হদিশ কেউ দিতে পারল না, কিন্তু এর ওর তার মুখ থেকে সবাই শুনল। শুনল শিগগীরই ধস নামবে। তথ্য ও কল্পনা মিশিয়ে ঘটনার সম্ভাব্য চেহারা দাঁড়াল এই রকম—পাহাড়ের ওপর থেকে শিথিল শিলাস্তূপ গুম গুম শব্দ করতে করতে গড়িয়ে গড়িয়ে যাত্রা পথে বৃক্ষ, মৃত্তিকা ও আরো শিলাস্তূপের সঞ্চয়ে বিপুলায়তন ও প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে এই শহরের ওপর দিয়ে শহরের খানিকটা বা সমস্তটাকেই অঙ্গীভূত করে, গড়াতে গড়াতে আরো নিচে, অনেক নিচে সমতলে গিয়ে থামবে, স্থির হবে। তখন অখণ্ড শহরের অংশ বা সম্পূর্ণ শহরটাকেই এবং শহরবাসীদের শরীরগুলিকে শিলা ও মৃত্তিকার মিশ্রণ থেকে আলাদা করে চেনার কোনো উপায় থাকবে না। শহরের লোকেরা পাহাড়ের দিকে তাকাল, যেন পাহাড়-প্রকৃতির ভীষণ চক্রান্তের ফিসফাস শব্দের জন্য কান পাতল, কিংবা ওপরের ধূসর গাছ ও আরো ওপরের মেঘস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সংকেত খুঁজল। অল্পবিস্তর শঙ্কিত সকলেই, যদিও ধস নামার প্রকৃতি ও পুস্তকনির্ভর বর্ণনায় অহংকৃত হবার সুযোগ কেউ কেউ নিয়েছে, সম্ভাব্য ভয়ানক পরিণাম নিয়ে কারো বা চেষ্টিত পরিহাস, তবু কেউ এই সর্বনাশ খবরের সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করল না। খবরটা তার ধ্রুপদী নিশ্চয়তায় দু'দিনের মধ্যে শহরের বুকে পুরনো শ্বাসকষ্টের মত চেপে বসল—মৃদু অথচ নিয়ত ক্রিয়াশীল। দপ্তরে দপ্তরে গা-আলগা ভাব, ঝানু আড্ডাধারীরাও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, মায়েরা সকাল সকাল বাচ্চাদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, রাত ন'টার শহরে মধ্যরাত্রির নির্জনতা। ধস ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বাঘের মত নয় যে রাত্রেই তার আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি, তবে ভয়ের সাধারণ চেহারাটাই বোধ হয় এ রকম। নিভৃত অন্ধকার উষ্ণ আরামের মধ্যে বোধ হয় সব ভয় থেকেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় বলে মানুষের ধারণা।

তখনো শহর ছেড়ে পালানোর হিড়িক সুরু হয়নি। ইচ্ছা অনেকেরই, বিশেষ করে সমতলে যাদের আশ্রয় আছে, কিন্তু কেউই মনের কথা খুলে বলতে পারছে না, কেন না খেটার কোনো সরকারী বা বেসরকারী স্বীকৃতি

নেই। অন্তত একজন বেসরকারী বিশেষজ্ঞও যদি মুখ খুলতেন। কিন্তু সে রকম কিছুই না হওয়ায় বড় বড় কর্তারা অফিস-টফিস খুলে রাখছেন এবং অধীনস্থদের কেউ পেট খারাপের মত সর্বজন গ্রাহ্য কারণে ছুটি চাইলেও সে যে ভয়েই ছুটি চাইছে তা প্রমাণ করার জন্য অনাবশ্যক দীর্ঘ তিরস্কার ও উপদেশাদি দিয়ে নিজেরাই হিষ্টিরিয়ার রুগীর মত আচরণ করছেন। বড়কর্তাদের টেলিগ্রাম আর জরুরী চিঠি পাঠানো হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে, সে সবের বক্তব্য অত্যন্ত জটিল, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও মঙ্গলামঙ্গলের আলোচনার অন্তরালে সাময়িকভাবে এখান থেকে হেড অফিসে বা অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হওয়ার আবেদন, অর্থাৎ তাঁদের সটকে পড়ার ব্যাপারটা যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এ প্রকার ভদ্র চেহারা দেওয়ার চেষ্টা। এঁরাই আবার মানুষ যাতে প্যানিকি না হয়ে পড়ে তার জন্য মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে দপ্তরে বা কলে কারখানায় কারোকে ছুটি দেওয়া হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে যদি অসুস্থতা বা এ জাতীয় কারণে ছুটি দিতেও হয়, শহর ত্যাগ করে যাওয়ার অনুমতি কোনো ক্রমেই মিলবে না। সাধারণ মানুষের শহর ত্যাগের ইচ্ছা তখনো মনে মনেই, হয়তো মানসিক প্রস্তুতি চলছে, সক্রিয় প্রচেষ্টা সুরু হয়নি। কেননা যাব বললেই কারো একমাত্র আশ্রয় ছোট একটু বাড়ি, কারো চাকরি, সব ফেলে, ইস্তফা দিয়ে, সামান্য সম্বলের ভরসায়, এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে অজানা অচেনা কোনো জায়গায় হুট করে চলে যাওয়া যায় না। কতদিন সেখানে থাকতে হবে তারও স্থিরতা নেই। তারপর বহুদিন অপেক্ষা করেও ধস যদি না নামে ফিরে আসতে হবে নিজের অবিবেচনা আর নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিতে দিতে, এখানেই, যদিও এই নিঃসম্বল আশ্রয়টাকে তখন হয়তো অমিত্র বিদেশের মতই মনে হবে। সব হারিয়েও জীবনটাতো বেঁচেছে এই সান্ত্বনাটুকুও সেক্ষেত্রে থাকবে না।

উপরের চিন্তা থেকেই রিলিফের কথাটা উঠেছিল। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রিলিফের প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছিল। রিলিফ কি শুধু বিপদ ঘটে যাবার পরেই দেওয়া হয়? বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলেই কি রিলিফ দেওয়া যায় না? দেওয়া উচিত নয়? যাদের কোথাও যাবার উপায় নেই তাদের যদি এখনই কোনো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়? খুব একটা ভালো ব্যবস্থা কেউ আশা করছে না, মাথা গোঁজার মত একটু জায়গা, মোটামুটি খাদ্য খাবার,

স্যানিটেশন। যাদের নজর এর চেয়ে উঁচু বা যাদের উপায় আছে তারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিক। খুবই ভালো কথা, রিলিফ আগে দেওয়া যাবে না এমন কোনো আইনও নেই। কিন্তু ধসের খবরটা যখন সরকারী মহল থেকে আসেনি কে তোমার রিলিফের দাবি শুনছে? বাঃ, তাই বলে যে-কথা গোটা শহরটাকে ভাবিয়ে তুলেছে তার কোনো ভিত্তি নেই? থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে, থাকলেও আমরা সেটা জানি না, অন্তত সরকার জানে বলে আমরা জানি না। কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। যাই হোক, একটা দরখাস্ত দেওয়া যেতে পারে রিলিফের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়ে, নিদেন পক্ষে সরেজমিনে একটা তদন্ত হোক। দরখাস্তের বয়ান গুছিয়ে ভালো ইংরিজিতে লেখা দরকার, ওপর মহলে যাচ্ছে, ঝকঝকে ইংরিজি আর তেমনি ঝকঝকে টাইপ না হলে ওঁরা পাত্তাই দেবেন না। দরখাস্ত লেখার ভার তাই উকিলবাবু আর ইংরিজির অধ্যাপক মশায়ের নেওয়া উচিত, কাঠামো উকিলবাবুই করবেন, তারপর ইংরিজিটায় ঘ'স মেজে একটু বাহার লাগিয়ে দেবেন অধ্যাপক। টাইপ করানো হয়ে গেলে শহরের মান্যগণ্যদের দিয়ে সই করাতে হবে। কে দায়িত্ব নিচ্ছে? একটা কমিটি তৈরী করা হোক বরং। দরখাস্ত ছেড়ে দিলেই কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে না, ফলো আপ না করলে এই আঠারো মাসে বছরের দেশে ফলের আশা বৃথা। পরিস্থিতি বিপজ্জনক বলেই হয়তো কিছু কিছু আপত্তি ও বাদ প্রতিবাদ সত্ত্বেও একটা মোটামুটি সর্বসম্মত কমিটি গঠন করা সম্ভব হল। দু'দিনের মধ্যেই ধসের ফিজিক্যাল ও মেটাফিজিক্যাল নানা তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত গালভরা ইংরিজিতে প্রায় তিন পাতার এক দরখাস্ত যথাস্থানে প্রেরিত হল, যার বক্তব্য —রিলিফের ব্যবস্থা করা হোক, সম্ভব না হলে অন্তত ব্যবস্থা রাখা হোক, তাও যদি না সম্ভব হয় অবিলম্বে সরেজমিনে তদন্ত যেন অবশ্যই করা হয়। দরখাস্ত দাখিল করার আগে তড়িঘড়ি টাউনহলে একটা সভাও ডাকা হয়েছিল। সেখানে সকলেই এই বিষয়ে একমত হয়েছিল যে ধস যদি নামেই শহরের অস্তিত্বের পক্ষে তা হবে অতিশয় বিপজ্জনক। রিলিফের দরখাস্ত পাঠানোর প্রস্তাব ছাড়া আর কোনো প্রস্তাব এ সভায় নেওয়া হয়নি, কারণ ধসের মুখে যারা পড়ে তাদের নিজেদের জন্য কিছুই করার থাকে না। অবশ্য সভায় ধসের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নানা দিক নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত বহু বক্তৃতায় অনুসন্ধিৎসুরা বিস্তর উপকৃত হয়েছিল।

কোথাও একটি ভালোবাসা পুষ্পিত হচ্ছিল।

—আহ আকাশটা কি নীল!

—তোমার চোখের চাইতেও?

—বারে, আমার চোখতো কটা। বিড়ালাক্ষী।

—না। তোমার দু'চোখ আমার অপার, অসীম স্বপ্নের নীলাকাশ। তাই আমার কাছে তারা স্বচ্ছ, নির্মেঘ, নীল···

—তুমি এত সুন্দর বল···

—তুমি এত সুন্দর তাই বলি।

—উঃ, কবিতা থামাও। আজকের দিনটা অপূর্ব·

—কবিতার মতই··

—তোমার সঙ্গে পেরে উঠিনা, বাপু।

—পেরে না উঠলে কি ভালোবাসতেও পারবে না?

—পারব, পারব, পারি, পারি···

—তবে কাছে এসো। আমার সারা মুখে তোমার অধরোষ্ঠের অভিজ্ঞান এঁকে দাও।

—ছিঃ, এই খোলা জায়গায়! কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে!

—হায় নারী!

—বেশ, দেবো, অভিজ্ঞান নয়, রাজটীকা, একটি বার··

—যথা প্রাপ্তি··

একটু পরে: এখন ছেলেটির বুকে মাথা রেখে মেয়েটি স্থির, ঘাসের বিছানায় শায়িত ছেলেটির শান্ত দৃষ্টি আকাশের নীলে, একটি হাত মেয়েটির মাথায়, মাত্র একটি চুম্বনের সম্পদে ওরা যেন সমস্ত পরিপূর্ণতার আনন্দে তৃপ্ত ঈশ্বর-ঈশ্বরী।

হঠাৎ কোনো শব্দে যেন মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল, আলুথালু কাপড় গুছিয়ে সে ছিমছাম হয়ে বসল ছেলেটির পাশে। চোখ থেকে স্বপ্নের ঘোর মুছে ফেলে এদিক ওদিক তাকাল, বলল—আচ্ছা, তুমি শুনেছ?

—কি?

—সবাই জানে···তুমি জান না?

—ও স্বপ্ন।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলে ছেলেটি সিল্কের শাড়িতে মোড়া মেয়েটির নিটোল উরুতে মাথা তুলে দিতে চাইল।

মেয়েটি সরে গেল। ছেলেটি হেসে আবার আগের ভঙ্গিতে।

—ধস নামাটা যেন কিছুই না ?

—নামুক না। ঝঞ্ঝা, ঝড়, মৃত্যু, দুর্বিপাক যা আসে আসুক। বধূরে আমার পেয়েছি আজিকে ভরেছে কোল।

ছেলেটি উঠে বসল, একটি সবল হাত বাড়িয়ে মেয়েটির ইচ্ছায় অনিচ্ছুক কাঁধে বেড় দিয়ে তাকে কাছে টেনে আনল। ফুলের মালা জড়ানো বেণি ক'বার দুলিয়ে মেয়েটি প্রতিবাদের অভিনয় সাঙ্গ করে ছেলেটির হাতের বেষ্টনীতে নিশ্চুপ নিশ্চল হয়ে রইল কিছু সময়।

ছেলেটি হাত নামাতে মেয়েটি কথা বলল।

—আচ্ছা, আমাদের যখন ঘর সংসার হবে······আমাদের ভালোবাসা যখন পুরনো হবে···

—আমাদের ভালোবাসা চির নতুন।

—সব নতুনই পুরনো হয়।

—পুরনো হলেই অসুন্দর হয় না।

—আমি কি তাই বলেছি ?

—তবে কি বলছ ?

—বলছিলাম···তখন যদি ধস নামার আশঙ্কা দেখা দেয় আমরা কি তখনো আজকের মত নিরুদ্বেগ থাকতে পারব ?

মেয়েটির চোখে মুহূর্ত চোখ রাখল ছেলেটি, তারপর অনেকক্ষণ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে কি রকম বিহ্বলভাবে ধীরে ধীরে বলল—জানি না।

কয়েকটি যুবক পাহাড়ের কিছুটা ওপরের দিকে দুদিনের একটা পর্যবেক্ষণ-অভিযানে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য ধস সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান। এদের দুঃসাহসিকতা ও মানবপ্রেম শহরে প্রশংসিত হল। নাগরিক সম্বর্ধনা দেবার প্রস্তাব উঠল। প্রস্তাবটা অবশ্য শেষ অবধি দুটো বিরোধী মতের জন্য টিঁকতে পারল না। একদল বলল—মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ মেনেছে তারা মহত্তম মানবতাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, সম্বর্ধনা জানিয়ে তাদের ছোট করার প্রয়োজন নেই, মানুষের মনেই তাদের শ্রদ্ধার আসন পাকা হয়ে রইল। আরেকদলের মত—অল্প সময়ে যাহোক একটা সম্বর্ধনা দিয়ে এদের মহৎ প্রয়াসের অমর্যাদা না করাই উচিত, সময় ও

সুযোগ যদি আসে তখন এদের যথাযোগ্য সমাদর করতে হবে। যুবকেরা ফিরে এল। আগেও এরকম বহু অভিযানে তারা গিয়েছে, কেউ এদের লক্ষও করে নি, মনে করেছে যথা ছেলেদের প্রমোদ-অভিযান। এখন পরিস্থিতি অন্য রকম। সকলের সাগ্রহ সাদর দৃষ্টি এদের দিকে। দেখা গেল দু'দিনের পর্বত অভিযানও বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, দলের অনেকেই প্রায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফিরেছে।

—কিছু দেখলে? শহরবাসীদের অধীর জিজ্ঞাসা।

—কি বলুন তো?

—তোমরা ধস্ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্যই তো…

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। না, কই, তেমন কিছু…

—তার মানে স্পষ্ট প্রমাণ না পেলেও আভাস…

—তা ঠিক নয়…

—গোপন করো না, বিপদ সকলের।

—আমরা যাকে বলে, কিছু বুঝতে পারি নি।

—কিছুই বুঝতে পার নি একেবারে?

—না, ঠিক বোঝা বা দেখা বলতে যা মানুষের ধারণা…

—তোমাদের কথা থেকে মনে হচ্ছে স্পষ্ট প্রমাণের অভাবেই তোমরা বলতে দ্বিধা করছ।

—ঠিক বোঝাতে পারব না…বাতাসে কেমন যেন…হয়তো আমাদের মনেরই ভুল…

ভয়টা পক্ষবিস্তার করল। অভিযাত্রী যুবকেরা ধসের সংকেত পেয়েছে। পাহাড়ের শরীরে প্রকৃতির অশুভ শক্তিরা যে ভয়ানক চক্রান্ত সম্পূর্ণ করে এনেছে তার বিষাক্ত নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করেছে তারা। মন যাদের একাগ্র, ইন্দ্রিয়ের শক্তি তীক্ষ্ণ, তারা আসন্ন ঘটনার ইঙ্গিত পায়। সজ্ঞান বিচারে না বুঝেও, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের গভীর অন্তরঙ্গতার সূত্রে, এই যুবকেরা অমঙ্গলের পূর্বচ্ছায়া দেখেছে। মানুষের মনের অতলে এমন আশ্চর্য ক্ষমতা আছে যার দ্বারা যে-সব লক্ষণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাও মানুষ সময় বিশেষে ধরতে পারে। যেমন অন্ধরা অনেক সময় শব্দ বা গন্ধ ছাড়াই মানুষ বা বস্তুর উপস্থিতি বুঝতে পারে। এভাবে বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞ জনের নানা আলোচনায় ভয়টা মনস্তাত্ত্বিক তথা আত্মিক বিভূতি লাভ করছিল।

বলা বাহুল্য ঐশ্বরিক নিরাপত্তার কয়েকটা কর্মসূচী নেওয়া হল। চার্চে, মসজিদে সমবেত প্রার্থনা। হিন্দুদের পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী পুজানুষ্ঠান। অনেক দেবদেবীই পুজিত হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দুটি পল্লীতে এই উপলক্ষ্যে ওলাই চণ্ডী ও শ্রীশ্রীশীতলামাতার পুজানুষ্ঠানের উদ্যোগ অনেকের দ্বারাই সমালোচিত হতে লাগল, যেহেতু উক্ত দেবীরা এতবড় বিপর্যয় ঘটানোর মত শক্তির অধিকারিণীই নন।

: রিলিফের দরখাস্তটার কি হাল জানেন কিছু ?

: না, কোনো খবর নেই।

: রিলিফ কি আসবে মনে হয় ?

: কি জানি···

অফিস অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ভদ্রলোক পর পর কয়েকটা সামাজিকতার ধাক্কায় ইনসিওরেন্সের দুটো প্রিমিয়াম বাকি ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ এ সময় প্রিমিয়াম বাকি রেখে পলিসিতে একটা খুঁত রাখা··। এত টাকা একসঙ্গে জোগাড় করাও শক্ত। এক ভরসা এ বিপদ যদি আসেই যাকে বলে সবংশে নির্বংশ···পলিসি, পলিশি-হোল্ডার নমিনি, মায় ইনসিওরেন্সের অফিস সমেতই একটা চিঁড়েচটকানো কাণ্ড····· তবু ধার টার করে দিয়ে দেওয়াই ভালো··· কেউ যদি ছিটকে গিয়ে বেঁচে যায়, চান্স যদিও নিল, তবু বলা যায় না, অঘটন আজো ঘটে···দুশ্‌শালা, ওটাতো একটা অখাদ্য বইয়ের নাম··মরুকগে। গিন্নীর পিকউলিয়ার আবদার···শুকনো খাবারের লম্বা এক লিস্টি, ওয়াটার বটল তিনটে, ফার্স্ট এইডের বাক্স···কেনো, কিনে মর···এস জিনিসটা যে কি তা কি একটু ইমাজিনেশন খাটিয়েও বুঝতে পারে না···পাহাড়টা ফুটিফাটা হয়ে যখন হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়বে ঘাড়ের ওপর···দূর, দূর, মেয়েমানুষ কখনো আগুমেণ্ট বোঝে···কেনো, প্রাণ যা চায় কেনো গিয়ে··· । এই ডামাডোলে খোকনের ইণ্টারভিউটা না কেঁচে যায়···কদিন ধরে যা মেজাজ দেখা যাচ্ছে সেন সায়েবের ···তবু বলে কয়ে ধসের আগেই যদি ইণ্টারভিউটা···তারপর কপালে যা আছে তাতো হবেই···

একটি মহৎ উপন্যাসের বিষয়ের জন্য গল্পলেখক অনেক দিন ধরেই অপেক্ষা করে আছেন। এতদিনে সেই বিষয় তিনি পেয়েছেন। চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই শহর। মানুষকে পর্যবেক্ষণ করার এর চেয়ে চমৎকার সুযোগ আর হতে পারে না। এরকম সময়েই মানুষ তার যথার্থ স্বরূপে বেরিয়ে

আসে—সমস্ত মহত্ব ও সমস্ত নীচতা নিয়ে। লেখক ঘুরছেন, দেখছেন কথা বলছেন, শুনছেন। নোট বইয়ের পাতায় পাতায় বহু সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র তিনি ধরে রাখছেন, যেগুলি তাঁর প্রথম উপন্যাসে বর্ণাঢ্য, বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু এই বিপুল ঐশ্বর্য হাতে পেয়েও তিনি বিমর্ষ। কেননা উপন্যাস যদিও জীবনেরই লিখন, তবু লেখক এক্ষণে জীবন থেকে ডিটাচমেন্ট প্রত্যাশী, ডিটাচমেন্ট সকল মহৎ শিল্পকর্মের প্রথম ও প্রধান শর্ত বলে তিনি মনে করেন, এবং ডিটাচমেন্টকে তিনি বর্তমানে শারীরিক অর্থেই ধরেছেন; শারীরিক অর্থে বিশেষভাবে এ কারণে যে শারীরিক ডিটাচমেন্ট ছাড়া ধসের পরে উপন্যাস লেখার জন্য তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। আর উপন্যাস লেখার জন্য যদি বেঁচেই না থাকা গেল তেমন প্রাণান্তকর ঘটনার মধ্যে যাওয়া কেন? অর্থাৎ উপন্যাসই যদি লেখা না হল তবে আর অভিজ্ঞতার মূল্য কোথায়? উপন্যাস লেখার আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুকে তখনই বরণ করা যায় যখন দুটো অভিজ্ঞতাই কারো কাছে সমান কাঙ্ক্ষিত। ঔপন্যাসিক তো ছিটগ্রস্ত বা আত্মহত্যাকামী নন যে উপন্যাস লেখা হোক চাই না হোক যে কোনো মূল্যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ানোই তাঁর কাজ। অথচ শারীরিক ডিটাচমেন্টের কোনো উপায় করা যাচ্ছে না, সেহেতু লেখক বড়ই অস্থির, বিষণ্ণ।

: রিলিফের কোনো খবর?

: নাঃ, হোপলেস।

: আমি জানতাম রিলিফ আসবে না।

: তবু রিলিফের আশা আমাদের করতেই হয়।

শোনা যাচ্ছে কারখানার শ্রমিক আর উপকণ্ঠের চাষিরা শাবল, কোদাল, গাঁইতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। নিজের এলাকাগুলিকে বাঁচাবার জন্য তারা নাকি মাটি আর পাথরের দুর্ভেদ্য আড়াল খাড়া করবার কথা ভাবছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে আসল বস্তুর চেহারা আর ক্ষমতা কি হবে বলা যাচ্ছে না, তবে ওদের এলাকার আশে পাশে বেশ কিছু পাথরের চাঙড় আর মাটি ওরা ডাঁই করেছে। এ খবরে ভদ্রপল্লীতেও এরকম কিছু একটা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। তারপরই অবশ্য বিপুল শ্রম, যন্ত্রপাতির অভাব, অনভিজ্ঞতা ইত্যাদির প্রশ্ন বিবেচনা করে দেখা গেছে এ ধরনের নিরর্থক প্রচেষ্টা মূর্খ শ্রমিক আর চাষিদেরই সাজে। মাটি আর পাথরের দেয়াল খাড়া করে ধস ঠেকানো যায় না। উচ্চস্তরের যন্ত্রবিদ্যায় জ্ঞান, প্রচুর অর্থ ও দীর্ঘদিনের চেষ্টার দ্বারাই এ

কাজ সম্ভব। উৎসাহ উদ্দীপনা ভালো জিনিস, তবে অকাজে শক্তিক্ষয় করা বোকামি, অশিক্ষিত মূর্খদেরই এটা মানায়। কিন্তু এসব যুক্তি এমন তীব্রভাবে উপস্থাপিত হচ্ছিল যাতে মনে হতে পারে কারো মূর্খতাকে উপেক্ষা বা করুণা করা নয়, যেন একটা গোপন ঈর্ষাই ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল।

অদ্ভুত একটা খেলা চলছিল। ভাগ্যবান ও ভাগ্যহীনেরা, যাদের উপায় আছে এবং যাদের উপায় নেই, জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে যারা কর্তা এবং যাদের ওপর কর্তৃত্ব চাপানো আছে—সবাই এই শ্বাসরুদ্ধকর ভয়ের পরিমণ্ডল থেকে পলায়নের তীব্র ইচ্ছায় ছটফট করছিল, কিন্তু একটা কর্তৃপক্ষীয় বা গুরুত্বসমন্বিত ঘোষণার অভাবে কেউ তার ভয় ও পলায়নেচ্ছাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত বা কার্যকরী করতে পারছিল না।

যাঁর চিন্তাশীলতা উন্নাসিকতায় ওতপ্রোত জড়িত, মতামতের প্রকাশে যিনি তিক্ত, নির্মম, অবিশ্বাসী, স্বীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিও যাঁর অশ্রদ্ধা চরম ও সুনিশ্চিত, দর্শনশাস্ত্রের সেই অধ্যাপক, যিনি এতাবৎকাল ছাত্রদের কাছে অবিচল প্রত্যয়ে বা অপ্রত্যয়ে ঘোষণা করেছেন দর্শনশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ সারবস্তু যদি কোথাও থেকে থাকে তা জড়বাদী দর্শনেই, তিনি সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতায় ছাত্রদের বলেছেন—আমরা বোধ হয় ধ্বংস হতে চলেছি। এ সম্পর্কে আমার মনোভাব কি তা তোমাদের জানার ইচ্ছা হতে পারে। শংকরের মায়াবাদ বা ঐ জাতীয় রাবিশ না মেনেও বলা যায় শেষ পর্যন্ত কিছুই তো থাকে না, বিনষ্টিই চূড়ান্ত ভাগ্য মানুষের, সভ্যতার, সব কিছুরই, অতএব···

: রিলিফের জন্য কারোই যেন মাথা ব্যথা নেই।

: অবাক করলেন। রিলিফ আমরা সবাই চাই, কিন্তু রিলিফ যে আসবে না তাও জানি। লটারির টিকিট কেটে পুরস্কার পাবার একটা অবাস্তব আশার মত রিলিফের আশাটাও আমরা লালন করতে ভালোবাসি।

: লটারীর পুরস্কার কেউ কেউ তো পায়।

: তাতে একটা শহর বা জনসমষ্টির ভাগ্য ফেরে না।

কবি একটা ভয়ানক সুন্দর, সৃষ্টি ও ধ্বংসের চরম ব্যঞ্জনায় রক্তাক্ত চিত্রকল্পের জন্য উন্মাদের মত হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি, চৈতন্যের গভীরে ডুব দেওয়ার জন্য বহির্বিশ্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন, যদিও তাঁর বর্তমান কবিতার প্রেরণা এসেছে বহির্বিশ্বেরই ধস নামার সংবাদ থেকে। তীব্র গাঢ় নেশায় তিনি নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখছেন।

শিল্পী এ সময় ভাবছিলেন এবার শুরু হবে মরীয়া মানুষের পলায়ন। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন বিরাট একটা পলায়নের সমস্ত মানসিক প্রস্তুতি প্রায় শেষ। এই ধস তাঁর মনে প্রথমত একটি নিসর্গ-চিত্রের প্রেরণা এনেছিল যার নাম তিনি ভেবেছিলেন দি ল্যাণ্ড-স্লাইড। তারপর একটি মহত্তর চিত্রের কল্পনা তিনি করেছিলেন—বিরাট ধ্বংসের মুখোমুখি মানুষ প্রদীপ্ত সংহত সাহসের মূর্তি তুলে দাঁড়িয়েছে—দি গ্রেট স্ট্যাণ্ড। এখন যে ছবিটার কথা তিনি ভাবছেন তার নাম হবে দি গ্রেট এক্‌সডাস্‌।

: রিলিফের কি খবর ?

: আর রিলিফ—

সেদিন রাত্রে প্রবল বর্ষণ শুরু হল। বর্ষণ এ সময় অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এর তীব্রতা, যার সাক্ষী ছিল পরিত্যক্ত রাজপথের ভৌতিক ল্যাম্পপোষ্টগুলি ও কিছু ভবঘুরে কুকুর, শুধুমাত্র তার ধ্বনির ঐশ্বর্যে বিছানার উষ্ণ আরামে আশ্লিষ্ট মানুষগুলির চেতনায় অতিপ্রাকৃত শঙ্কার অনুভূতি জাগিয়ে তুলছিল। তারা যেন দেখছিল জলের সূক্ষ্ম ধারাগুলি নরম নিঃশব্দ চিতাবাঘের থাবায় পাথরের শরীর থেকে গভীরতর স্তরে নেমে যাচ্ছে, বিচরণ করছে, তাদের অনিবার্য কঠিন নখরগুলি কুরে কুরে পাহাড়ের দেহকে হিংস্র শ্বাপদের লালায় জারিত ছিন্নভিন্ন শিকারের মাংসের মত নরম পিণ্ডে পরিণত করছে। আর সর্বোচ্চ স্তরে বর্ষণ নাগিনীর সহস্র ফণায় নির্মম আক্রোশে ছোবলের পর ছোবল হানছে। বনস্পতির শিকড়ের বন্ধন শিথিল হতে হতে পাথরের বড় বড় চাঁইগুলি এখনো বিপজ্জনক ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। এই ভারসাম্য বিধ্বস্ত হতে আর সামান্য একটু পিচ্ছিলতার সুযোগ মাত্র প্রয়োজন···সহসা সর্বগ্রাসী সামুদ্রিক প্লাবনের পরিচিত দৃশ্যপট যেন গলে গলে বিপুল ঝর্ণার মত তরঙ্গিত হয়ে সানুদেশে নেমে আসতে থাকবে···যে কোনো মুহূর্তে···যে কোনো মুহূর্তের ভগ্নাংশে··· প্রচণ্ড বিধ্বংসী পতন শুরু হওয়ার প্রয়োজনীয় প্রেরণা—বায়ুস্তরের বিশেষ একটি কম্পন—ছুটে আসবে একটি মাত্র বজ্রনির্ঘোষ থেকে, যা এখন অবিরাম বৈদ্যুতিক উজ্জ্বলতায় গর্জনশীল। অন্ধকারের অন্তরালে জল বাতাস বজ্র বিদ্যুৎ এবং নিসর্গের অজ্ঞাত ধ্বংসের শক্তিরা মত্ত এক ভয়ঙ্কর খেলায়। হাওয়ার পীড়নে পীড়িত গাছের আর্তনাদ, অতি দীর্ঘ নিশ্বাসের মত বাতাসের তীব্র, অশুভ শনশন, নির্মম চাবুকের মত বৃষ্টির ধারালো চিৎকার—পার্বত্য বর্ষণের একান্ত পরিচিত·

এ সকল শব্দ এখন এই পাহাড়ী শহরের দুঃস্বপ্ন-কাতর অর্ধ-নিদ্রিত সত্তায় আশ্চর্য ভীষণ তাৎপর্যে অন্বিত।

পরের সকাল নির্মেঘ, প্রসন্ন, সূর্যকরোজ্জ্বল।

ঘরের বাইরে এসে শহরবাসীদের মনে হল তারা এক অবাস্তব দুঃস্বপ্নের জগতে নির্বাসিত ছিল এতকাল। তারা আশ্বস্ত ও আত্মনির্ভর বোধ করল। দেখা গেল যাদের উপায় ছিল এমন অনেকেই রাত্রের অন্ধকারে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। তারা অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাপারটাকে নিল।

সংবাদপত্রের জন্য তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সংবাদপত্র এল না। বেতারে সংবাদ এল এই শহরের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগের একমাত্র পথটি প্রবল বর্ষণে বিধ্বস্ত। ভগ্ন সেতুর এপারে একদল যাত্রী অসহায়ভাবে অপেক্ষমান। পলাতকদের এই ভাগ্য জেনে শহরবাসীরা করুণায় মৃদু হাসল।

সেই সকালে আকাশ কাশগুচ্ছের মত শরতের শুভ্র মেঘ ও নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত। তখন সহসা সকল চরাচর যেন গুম গুম শব্দে কেঁপে উঠল। প্রথমে যা ছিল দূরাগত, ভ্রমর গুঞ্জনের মত, ধীরে ধীরে সেই শব্দ প্রবল গম্ভীর ছন্দে নিনাদিত হতে লাগল, ঊর্ধ্বলোক হতে আগত ভয়াবহ শব্দের প্রবাহই যেন ক্রমে ধস বা হিমবাহের প্রলয়ংকর শরীর গ্রহণ করবে···

কিন্তু মানুষগুলি এইবার আতঙ্কিত হল না, খোলা মাঠে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা দাঁড়াল, সম্ভাব্য আক্রমণের দিক লক্ষ করে তারা নির্ভীক ভ্রূকুটি হানল, মানুষ আরেকবার অনির্বচনীয় মানুষী মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কারণ তারা নিঃসন্দেহে জেনেছে রিলিফ আসবে না।

পুস্তক-পরিচয়

আগুন ফুলের মালা : অজিত মুখোপাধ্যায়। সারস্বত লাইব্রেরী। দাম তিন টাকা

অব্যবহিত এই বর্তমানে আমাদের দৃষ্টি অনেকটাই আচ্ছন্ন। সুশৃঙ্খল ভাবনায় ভবিষ্যতকে সাজিয়ে তুলবার কোনো নিশ্চিত প্রকল্প প্রস্তুত নেই কোথাও। বিভ্রান্তি আছেই, জীবনে এবং সাহিত্যেও। সাহিত্য তো শুদ্ধ-বিবেকের প্রকাশ। শিল্পী—তাঁর প্রতিভার টানে নানামুখী বিভ্রম দীর্ণ করে পান দেশকালের শুদ্ধ উপলব্ধি। কিন্তু আমাদের সাহিত্যও আশাভঙ্গেরই দৃষ্টান্তে পরিকীর্ণ ইদানীং।

এমন মুখভ়ড়নো পরিবেশে কেউ যদি সীমিত ক্ষমতায়ও সততার সঙ্গে জীবনের খণ্ডিত কোনো সত্য আশ্রয় করতে চেষ্টা করেন, আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি। বাট পাতার পরিসরে বড়ো একটি গল্প (উপন্যাস ?) 'আগুন ফুলের মালা'—এই রকম একটি চেষ্টা। গত বিশ বৎসর এবং অনাগত ভবিষ্যতের পটে ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের বিস্ফোরণ আকস্মিকভাবে একালের ইতিহাসের নিহিত তাৎপর্য যেন দীপ্ত করে তুলেছিল। অজিত মুখোপাধ্যায় শোভেন-কমু-টুকুর গল্পে সেই তাৎপর্য ধরতে চেষ্টা করেছেন। আমাদেরই পরাহত পৌরুষ যেন শোভেন, আমাদেরই জরাজীর্ণ অস্তিত্ব কমু, টুকুর অকুতোভয় মৃত্যুতে আমাদেরই ঈপ্সিত মহিমা ঝলকে ওঠে। এই গল্পে অজিতবাবু প্রতিপক্ষের যেসব মানুষ এনেছেন তাঁদের কেমন যেন বানানো মনে হলো আমার ; খুবই ছকে ফেলা চরিত্র এরা—সুন্দর চৌধুরী বা পরিতোষ।

সত্যজিৎ চৌধুরী

১. হে অগ্নি, প্রবাহ—রাম বসু, ২. এখন সময় নয়—শঙ্খ ঘোষ, ৩. আমার হাতে রক্ত—কৃষ্ণ ধর, ৪. অস্থি মজ্জা মাংস ইত্যাদি—শান্তি লাহিড়ী, ৫. নীলকণ্ঠ পাখির সময়—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৬. প্রতিবিম্ব—পরেশ মণ্ডল, ৭. এ যেন বারবেলা—সত্য গুহ, ৮. তোমার জন্যেই বাংলা দেশ—তরুণ সান্যাল। গ্রন্থজগৎ। প্রতিটি পুস্তিকার দাম পঞ্চাশ পয়সা।

'অনুভব কবিতা সিরিজে'র বই দেখে সহজেই মনে পড়বে এক পয়সায় একটি পুস্তিকামালার কথা। উদ্দেশ্য এক হলেও দুটির মধ্যে পার্থক্যও আছে। এক পয়সায় একটি-র বইগুলি লেখকরা নিজেরাই বার করতেন,—সুলভ হলেও

একটি স্বতন্ত্র বই-এর পুরো মর্যাদাই তাদের দেওয়া হত। কিন্তু 'অনুভব কবিতা প্রচার' সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তার একটি বই সিরিজের অন্যতম, যেন ততটা স্বতন্ত্র নয়, আলাদা হলেও মলাটে একই ছবি। সম্পাদিত কবিতার বইতে পাঠক স্বাভাবিকভাবেই জানতে চান, কবিতাগুলি কোথা থেকে কী ভাবে সংগৃহীত। এখানে কোথাও তার উত্তর নেই। এক পয়সায় একটি-র প্রত্যেক বইতে কবিতা সংখ্যা ছিল ষোলো, এই সিরিজে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ষোলো। ফলে কবিতা যত ছোট তত বেশি ধরে গেছে, গুণগত ওজনও সেই পরিমাণে বেড়েছে।

রাম বসু-র 'হে অগ্নি, প্রবাহ' সিরিজের প্রথম বই। সারা বই জুড়ে একটিই টান। হয়তো সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে। তমসাবৃত কাল, দেশ এবং আলোকোজ্জ্বল আকাশ—এই দুয়ের মধ্যখানে কবির 'আমি'।—দেশ-কালে বিদ্ধ, জর্জরিত, তবু 'দুই বাহু প্রসারিত' নীলিমায় 'আমি' কখনো-বা প্রসারিত 'আমরা'য়। সমাজ রাজনীতির প্রসঙ্গ খুব স্বাভাবিক ভাবেই স্থান পেয়েছে তাই কবিতাগুলিতে।

শব্দ-ব্যবহার বা ধ্বনি-সৃষ্টিতে কবির আগ্রহ খুব স্পষ্ট নয় এখানে। একই অর্থ-অনুষঙ্গে একই শব্দ বারবার প্রয়োগের ফলে কবিতা পাঠের উত্তেজনা হ্রাস পায়। যেমন,

ক. "অনেক হাত আমি দেখেছি যা থাবা, সেখানে অনেক হৃদয়ের মাংস"
—'হে অগ্নি, প্রবাহ'

"তার আঙুলের ফাঁকে কখনও মাংস জড়িয়ে ছিল।" —'গায়ত্রী'

"গলিত মাংসের গন্ধ পার্কের ভিতরে।" —'স্বপ্নের রচনা'

খ. "দহনের স্তবকগুলি চোখের ওপর হয়ে যাবে নক্ষত্রমণ্ডলী—'বরবর্ণি নক্ষত্র আমার'

"শান্তির নিটোল বৃত্তে মুখ রেখে আমি
"নক্ষত্রপুঞ্জের সুগন্ধি নিলাম, সখি। —'তোমার পায়ের নিচে'

"সেইটুকুই মাধুর্য যা ডানার বিথার থেকে মিলে যায় নক্ষত্রপুঞ্জে
—'দুই বাহু প্রসারিত করে যাবো'

'রাত দুটোর গল্প' 'হাইড রোড' এবং 'ছায়ার নিচে'—এই তিনটি কবিতা বাদ দিলে অন্য সব কবিতাগুলির থীমই পৌনঃপুনিক। 'হাইড রোড' কবিতায় "মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে অচৈতন্য বিমর্ষ বিকেল, হাওয়ায় আইডিন আর

ক্লোরোফর্ম"—পংক্তি দুটিতে এলিয়টের সুপরিচিত পঙ্‌ক্তির ব্যবহার অতি প্রত্যক্ষ। তবু কবির নিজস্ব সুন্দর চিত্রকল্পও অনুপস্থিত নয়—

"তবু ভাখো আমার চোখের মণি জলস্রোত ফুল
আর তুই হাত তুলে নিল আরতির দীপাধার
তোমার পায়ের নিচে বৃক্ষ হলে
জীবনের নাম হবে শস্য সমারোহ।" 'তোমার পায়ের নিচে'

'এখন সময় নয়'-এর যে প্রকাশ সময় দেওয়া আছে তাতে মনে হয় এ বই না প্রকাশ হলেও ক্ষতি ছিল না। একই সময় প্রকাশিত 'নিহিত পাতাল ছায়া'র এর সব কবিতাই আছে একটি বাদে। তবে বইটিকে একটা নিজস্ব চরিত্র দেবার চেষ্টা করেছেন সম্পাদক। একটি কেন্দ্রীয় থীম কবিতা থেকে কবিতায় খুলে খুলে গেছে। পুনরুক্তি নয়, বিকাশ।

'এখন সময় নয়' পুস্তিকার নাম—কিসের সময় নয় এখন ? —কবির উত্তর—

"যে সব শামুক তোমরা তুলে এনেছিলে
তার মধ্যে গাঢ় শঙ্খ কোথাও ছিল না।
.　　　.　　　.
আমি চাই আরো কিছু নিজস্বতা অজ্ঞাত সময়।" —'সময়'

এখন তবে সময় হয়নি আত্মপ্রকাশের। 'গাঢ় শঙ্খের' অন্বেষণায় এখন অজ্ঞাতবাস। আত্মদর্শনের সেই পথে কবি একা—'জবালা যাবার পথ আমাকেই খুঁজে নিতে হবে' এবং এপথ স্বভাবতঃ অন্তঃনির্দেশী—'যতোই এগিয়েই আলো আমি আরো মুঠো করে সব/নিজের ভিতর দিকে টান দিই'। কিন্তু 'বাহির'-এর প্রতিও যে কবির টান দুর্দম—'ঘর' নামে দুটি কবিতায় প্রতিভাস তা বলে দেয়। তাই ভিতরে আনতে চাওয়া মানে বাহিরের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা নয়—

"এখন ঠিক সময় তো নয়
শরীর আমার জন্ম-জামিন
পথিক জনস্রোতের টান
তার ভিতরে এমন উজান
আমি আড়াল চেয়েছিলাম পিচনদাঁড়ে।" 'আড়াল'

ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্বেই বরং কবির সত্তা-সংকট স্থাপিত। 'জন্মদিন' 'চাবি' ও 'জাবাল' কবিতায় এর আভাস মেলে, এবং সব থেকে টান টান হয়ে ওঠে সে সংকট 'সুন্দর' কবিতায়। 'নিহিত পাতাল ছায়া'র উৎস আত্মস্বরূপের

মধ্যেই খুঁজেছেন কবি। নিজেকে চিহ্নিত করেছেন 'সুন্দর'-এর হত্যাকারী-রূপে। সে আত্মস্বরূপ তার নিঃসাড়তায় তার গর্ব-দৃপ্ত পাপবোধে সমগ্র আধুনিক মানসের সঙ্গে যুক্ত, তার প্রতিভূ। অহংকারী কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভেঙে ফেলে নিরূপিত ছন্দের আধার—পূর্বনিরূপিত অন্যান্য মূল্যবোধগুলির মতো। কিন্তু কবিতার শেষ দুটি পংক্তিতে বেজে ওঠে এক অপ্রত্যাশিত বাণী—'যদি বা নিজের ছায়া নিজেকে জড়িয়ে ধরে বলে / 'তুমি কি সুন্দর নও বেঁচে আছ কেন পৃথিবীতে' —এ বাণী কবির ভিতর মহলের, উদ্ঘাটিত আত্মস্বরূপের আরেক দিক, সেখানে 'সুন্দর'-এর প্রতিষ্ঠা।

ভিতর-বাহিরের এই দ্বন্দ্ব কখনো করুণ হয়েছে আইরনির নিরাসক্তিতে,—যেমন, 'নষ্ট' কবিতায়।

একদিকে যেমন এই কবি গড়ে নিয়েছেন স্বকীয় এক গাঢ় রূপকল্প, অন্য দিকে সচেতন প্রয়াসে শব্দের ব্যবহারে এনেছেন নিভৃততা। 'চমঝমক'-প্রিয় পাঠককে তিনি স্বভাবের গভীরতার সরলতায় ফেরাতে চান।—'শব্দগুলি খুলে যাক, খুলে খুলে যায়— যেমন বা ভোর' (নাম)। 'এমনি ভাবা' কবিতাটি মনে পড়িয়ে দিতে পারে 'খেয়া'র উৎসর্গ-পত্রের কবিতাটির কথা। দুয়েই আছে লজ্জার অনুষঙ্গ।

হয়তো এই কারণে 'খেয়া'কেও কেউ কেউ মিস্টিক কাব্য ভেবে থাকেন কিন্তু 'এখন সময় নয়'-এর কবি লজ্জা অস্বীকার করেন—'মনে কি ভাবো লাজুক আমার এমনি ভাবা' (এমনি ভাবা)। আত্মপ্রকাশ নয়, আত্মসংবরণ যাঁর কবিতার অভিপ্রায় তাঁর তো এমন ভাষারই প্রয়োজন। পুস্তিকার প্রথম কবিতাটিকে একটু খাপছাড়া মনে হয়, মনে হয় না-থাকলেই ভালো হত, 'সময়' হতে পারত যথার্থ শুরু।

'এখন সময় নয়'-এর কবিতা-সংখ্যা যেখানে সাতাশ, 'আমার হাতে রক্ত' সেখানে মোটে আটটি কবিতার সমষ্টি। শুধু এই কারণেই পুস্তিকাটি খেলো লাগতে পারে, কিন্তু অন্য কারণও আছে। প্রথম দুটির মতো এই পুস্তিকা চরিত্রবানও নয়। একটি কবিতার শেষ লাইন 'আমি স্বেচ্ছাবন্দী হলাম নরকে' দ্বিতীয়টির 'আমি শুধু বিস্ময়ে রামধনু',—বিযুক্ত বোধ-এর যোগ্য দৃষ্টান্ত।

কবিতাগুলি পড়ে কবির ভাষা বুঝে নেবার উপায় নেই। চলিত ভাষার মাঝেমাঝে 'পুষলেরে সম্ভাবি' 'মিল খুঁজতেছিলাম' 'কোথায় নাযছে ইহা' ইত্যাদি বাক্যাংশগুলি উদ্ভট শোনায়।

'অস্থি-মজ্জা-মাংস ইত্যাদি' মনে পড়াতে পারে স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের 'আমি তারে ভালোবাসি অস্থি-মাংস সহ'। কবির বক্তব্যও অনেক সময় তাই। কিন্তু কৈফিয়ত কেন?—'আমি এই অস্থির শব্দটি মিত্রণায় হয়ে লিখে ফেলি / কবিতা লেখার জন্ম হতে ভালো লাগে না কৌশলী।' 'যোনি' শব্দ বাঙলা কবিতায় এতদিনে হয়তো পচতে শুরু করেছে।

নারীদেহ, তার অঙ্গাভরণ, রূপটান ইত্যাদি অনুষঙ্গ খুব বেশি পাওয়া যাবে কবিতাগুলিতে। যেমন, 'নাভিদেশ' 'জরায়ু' 'বিনুনি বাঁধি' 'নীল শাড়ি' 'জরির ঝালর দেয়া সায়া' 'নূপুর' 'সূর্মা' 'আলতা' ইত্যাদি। পারিপার্শ্বিক ও সময়ের দূষণে কবির যে ঈপ্সিত প্রণয় পূর্ণ হতে পারছে না সে যেন শুধুই বিলাসগত—এই সব অনুষঙ্গের ব্যবহার তেমন ধারণা করায়। টুকরো শব্দ টুকরো ছবি যেন কোনো গভীর বেদনার তলে এসে মিলিত হয় না। অপরিতৃপ্ত থেকে যায় পাঠকের প্রত্যাশা।

আধুনিক কবিতা কখনো কখনো সত্যিই হয়তো শুধু শব্দের পারমুটেশন কম্বিনেশন, এবং সব সময় খুব কৌশলীও নয়—এই রকম মনে হয় 'নীলকণ্ঠ পাখির সময়' পড়ে। 'অন্ধকার' শব্দটি সহজেই কাজে লাগানো যায় কবিতায়; কারণ সফোক্লিস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ শব্দের বহু মাত্রিক ব্যবহার আমরা দেখে এসেছি। আলোচ্য পুস্তিকার ষোলোটি কবিতার মধ্যে এগারোটি কবিতায় 'অন্ধকার' শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত। কী ধরণের ব্যবহার দেখা যাক। 'বিস্মৃতি নিয়ে' কবিতার শুরু "আকাশের রঙ মেখে মা তার ছেলেকে ডাকে / অন্ধকারে নীলকণ্ঠ পাখীর মতন"—অন্ধকারের বৈপরীত্যে ঝরে পড়ছে নীলকণ্ঠ পাখীর মতো মায়ের আহ্বান। এরপরে, 'রজনীগন্ধার মতো অন্ধকারে' —যে উপমায় অন্ধকারের নঙর্থকতা আর বজায় থাকে না। কিন্তু পরেই কবি যখন বললেন 'আমার দুচোখ অন্ধ পৃথিবীর সূচীতীব্র আঁধারে'— তখন আবার নঙর্থকতা স্বীকার করাই হল। শেষ স্তবকের শুরুতে অন্ধকার আর বৈপরীত্য নয়, নীলকণ্ঠ পাখীর স্বরটাই অন্ধকার, নীলকণ্ঠ পাখি আবার রজনী-গন্ধার মতো। এরপর 'অন্ধকার শুধু অন্ধকার' বলে যখন কবিতা ফুরোয় তখন সে অন্ধকার কী বা বোঝাতে পারে আর।

শিল্প-সচেতনতা তখনই ফলবান যখন তাগিদটা আসে কবিতার ভিতর মহল থেকে। 'প্রতিবিম্ব' নামের পুস্তিকাটিতে এমনি এক ফলবান প্রচেষ্টা চোখে পড়ল। যদিও এঁর রূপকল্পের ব্যবহার প্রায়ই কোনো না কোনো

বিদেশী সাহিত্যিককে মনে পড়ায়। কবিতার বাক্য এমন কি শব্দকেও ভেঙে ভেঙে এমন ভাবে সাজাতে চাইতেন কামিংস্, যাতে মাত্র গড়নটাও কবিতা-বোধের সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। শ্রেষ্ঠ কবিতায় নিশ্চয়ই তার কোন প্রয়োজন নেই,—কিন্তু সব কবিই তো শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারেন না। তাই 'প্রতিবিম্ব' কবিতায় একটি করে শব্দের পংক্তি আঁকাবাঁকা সাজানোয় যখন জলের মধ্যে কাঁপা কাঁপা ভাঙা ভাঙা প্রতিবিম্বের আদল আসে, দীর্ঘ ক্ষীণতনু প্রতিকৃতির ধারণা জন্মায়, কবির একাকীত্ব প্রতীত হয়, তখন ব্যাপারটা মন্দ লাগেনা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বরং উনগারেত্তির গাঢ়তম আয়তনের অনুসরণ আরো সম্ভাবনাময় মনে হয়। তবে অভিজ্ঞতা নৈর্ব্যক্তিক, সাধারণ হতে না পারলে এ ধরণের রূপকল্প স্বভাবতই বন্ধ্যা। উনগারেত্তি যখন বলেন 'I listen to a Love of other floods', তখন তিনি সমগ্র মানবজাতির আশাবাদের প্রতিভূ হয়ে ওঠেন। অথচ একলা নোয়াহ্-র কাছেই শুধু নবসৃষ্টির বার্তা পৌঁছতে পারে—এই দিক থেকে কবির অভিজ্ঞতা অনন্য। পরেশ মণ্ডলের 'বোধি' কবিতার অভিজ্ঞতা অনন্য কিন্তু বিশ্বজনীন নয়। আলোকস্তম্ভ বা টেলিগ্রাফ পোস্ট-এর ধরণের ইমেজ ফিরে ফিরে এসে যায় তাঁর কবিতায়। —'ছ-ফুট লম্বা পোস্টের ছায়া কাঁপছে', 'টেলিগ্রাফ পোস্ট/কোমরটা ভাঙা'—এদের চেহারায় সাধারণ বৈশিষ্ট্য কবির বিচ্ছিন্ন একলা স্বভাবের উপর ঝোঁক দেয়। কিন্তু বিচ্ছিন্নকে যুক্ত করার প্রয়াসে, নৈর্ব্যক্তিকতার সাধনাতেই সার্থক হতে পারে কবির ইমেজিজ্‌মের প্রবল প্রবণতা।

'প্রতিবিম্ব'র পরে 'এ যেন বারবেলা' একেবারে আর এক প্রান্তের। এ পুস্তিকায় কবি যেন কবিতাকে পৃথক শিল্প বলেই মানেন না। জার্নাল আর কবিতায় যেন কোন তফাতই নেই। আধুনিক কবিতা লেখার যতকিছু উপকরণ সবই জড়ো করেছেন কবি—সবই পাশাপাশি রাখা আছে,—শুধু তার থেকে কবিতা জন্মলাভ করেনি। যদিও কবির সততা সন্দেহের অতীত। বারবেলা সময় দেশকে প্রভাবিত করে,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্প হয়ে আসে 'কালো রোদ' বা 'কৃষ্ণ-সূর্য'—যার আলোয় জেগে ওঠে 'ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ঘর বাড়ি'। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে চিত্রকল্পের কোনো প্রাণবন্ত সম্পর্কস্থাপনের প্রয়াস নেই কবির। দেশ, কাল ও কবির আত্ম-উন্মোচন তথ্যগত থেকে যায়, সত্যগত হতে পারে না।

তরুণ সান্যালের 'তোমার জন্যেই বাংলাদেশ' সিরিজের অষ্টম সংখ্যক বই।

এখান থেকে ষোলো পাতার নিয়মটা বর্জিত হয়েছে দেখে ভালো লাগল। 'তোমার জন্তেই বাংলাদেশ'—নাম থেকেই থীমের বিশিষ্টতার ধারণা হয়। কবির বেদনাবোধের উদ্দীপন বাংলাদেশ ; তাঁর বাসনা-কেন্দ্র বিপ্লব। রক্তঝরা ভিয়েতনামের দিকে তাকিয়ে কবি ভাঙাচোরা স্বদেশের জন্ত ব্যথিত হন ; চে-গুয়েভারার রক্তরাঙা মৃতদেহ আপন ব্যর্থতার দিকে কবির দৃষ্টি ফেরায়। 'চে-গুয়েভারা সেই জটায়ু আমার ভাই'—'সম্পাতি' কবিতায় পঙ্গু সম্পাতির ভূমিকায় কবি স্থাপন করেন নিজেকে। ব্যর্থতাবোধ গভীরতম হয়ে ওঠে যখন নিজের মধ্যেই হত্যাকারীকে দেখতে পান কবি, 'আমারই শোণিত সত্তা অদ্বিতীয় তুমি হিংস্র ব্যাধ'। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে বিষ্ণু দেকে অনেকবার মনে পড়বে। 'লালকমল নীলকমল' 'সুয়োরাণী দুয়োরাণী' 'সাতভাই চম্পা ও পারুল' ইত্যাদি সম্ভবতঃ ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসেবেই কবি ব্যবহার করেছেন। 'তোমার জন্তেই বাংলাদেশে'-এর বড়ো কবিতাগুলির বিস্তারের স্বভাবেও বিষ্ণু দের সঙ্গে কোথাও মিল আছে। যেন কোনো আশ্চর্য সুরশক্তির টানে টানে মিলে যায় বিষ্ণু দের বৈচিত্রময় প্রসঙ্গগুলি। তরুণ সান্যালের কবিতা চিত্রধর্মী।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রতি কবির বিশেষ পক্ষপাত লক্ষ করা যাবে এই পুস্তিকায়। তারা সবসময় অনিবার্য নয় এবং কখনো কখনো তাদের অর্থবহতাও সন্দেহজনক : 'কবিতা' নামের কবিতায় 'ভয় বাড়ে টিবটিব ঘরের মধ্যে'-র পরে যখন পাই 'পদশব্দ গম্ভীর টিবটিব শব্দশব্দ ভীষণ টিবটিব'—তখন টিবটিব শব্দ ভয়ের সঙ্গেই সম্পর্কিত হয় স্বভাবতই। কিন্তু যিনি শূন্যপথে একা হাটছেন, যিনি ঘরের মধ্যে নেই—তাঁর নিজের পায়ের শব্দ নিজের মনেই যদি ভয় জাগায় তবে তো কবিতাটির ভিতই ফাঁক হয়ে যাবে।

বাংলার হাল আমলের কবিতার—চল্লিশ থেকে ষাটের দশকের—কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে এই আটটি পুস্তিকা থেকে। তাই এই পুস্তিকামালার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, বিশেষ করে ছাপার ব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধি।

সুতপা ভট্টাচার্য

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

ভারতের রোহিনী :

এ বছর গত ৩১শে আগষ্ট রাত্রিবেলা ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে ত্রিবান্দ্রাম শহরের কাছে থুম্বা রকেটষ্টেশন থেকে রোহিনী নামে ভারতে তৈরি দুটি রকেট ছোঁড়া হয়েছে। এই সর্বপ্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানীরা একটি রকেটের সমগ্র অংশকে ভারতেই তৈরি করতে সক্ষম হলেন।

১৯৬৩ সালের ২১শে নভেম্বর ভারতের থুম্বা কেন্দ্র থেকে উর্ধাকাশে প্রথম রকেট পাঠানো হয়। থুম্বা কেন্দ্রটির সবচেয়ে বড় গুরুত্ব হল—এ পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর অবস্থিত। পৃথিবীর সূর্যালোকিত অংশে ভূ-চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর একটি বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এই বিদ্যুৎ স্রোতের দূরত্ব ৮৮ থেকে ১০০ কিলোমিটারের মত। ভারতের থুম্বাকেন্দ্র থেকে রকেট ক্ষেপনের মূল বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর বিদ্যুৎস্রোতের প্রবাহ এবং উর্ধাকাশে বায়ুস্রোতের গতিবিধি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা।

থুম্বা বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্ররূপেও গড়ে উঠেছে। সেখানে একসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন। থুম্বা থেকে বহু আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার অংশরূপে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে একই সময়ে সন্ধানী রকেট ছোঁড়া হয়ে থাকে। 'আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান' ও 'আন্তর্জাতিক শান্ত সূর্যের বছর' ছিল এ জাতীয় দুটি বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টা।

রোহিনী রকেট ক্ষেপণকে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করা যায়।

জোয়ার্-পাঁচ

চাঁদের দেশটা আজ আর আমাদের কাছে অপরিচিত জগত নয়। গত এগার বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যে অভিযান শুরু করেছেন, সেই অভিযানে চাঁদ অনেকবারই তাঁদের লক্ষ্যবস্তু

হয়েছে। চাঁদের উলটো পিঠের ছবি তাঁরা তুলে এনেছেন, চাঁদের জমির ওপর স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশনকে তাঁরা নামিয়েছেন ও চাঁদের জমির খুব কাছাকাছি বিভিন্ন কক্ষপথে চাঁদেরই কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

চাঁদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল একটিই। অদূরভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা মানুষকে চাঁদের জমিতে নামিয়ে আবার নিরাপদে তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে চান। এই উদ্দেশ্যসাধনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশন—জোন্দ্‌-পাঁচের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের কিছুটা তাৎপর্য রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের' বিজ্ঞানীরা এ বছরের ১৫ই সেপ্টেম্বর জোন্দ্‌-পাঁচকে মহাকাশে পাঠান। ১৮ই সেপ্টেম্বর জোন্দ্‌-পাঁচ চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছোয় এবং চাঁদের জমির ২০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে ২১শে সেপ্টেম্বর ভারত মহাসাগরে এসে নিরাপদে অবতরণ করে। সেখান থেকে বস্তুটিকে উদ্ধার করে বোম্বাই শহর হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জোন্দ্‌-পাঁচের সাফল্য এই সর্বপ্রথম প্রমাণিত করল যে একটি মহাকাশযান পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে আবার নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে। জোন্দ্‌-পাঁচের ক্যামেরাযন্ত্র চাঁদের জমির যে সব ছবি তুলেছে সে ফিল্মগুলো বিজ্ঞানীরা সরাসরি হাতেই পেলেন, যে সুযোগ ইতিপূর্বে তাঁরা কখনো পান নি। এ ছবিগুলোর মাধ্যমে চাঁদের জমির অনেক খুঁটিনাটি তথ্য এই সর্বপ্রথম ধরা পড়বে।

জোন্দ্‌-পাঁচ, চাঁদকে প্রদক্ষিণের পর ফিরে আসার পথে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটার বা সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটার গতিবেগ অর্জন করেছিল। এই বিপুল পরিমাণ গতিবেগ নিয়ে ইতিপূর্বে কোন মহাকাশযানই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে নি। এর ফলে মহাকাশযানের দেহে এক বিপুল পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয়। সেই তাপকে নিয়ন্ত্রণের যে সমস্যা, তার সমাধানের পথের সন্ধানও বিজ্ঞানীরা আজ পেলেন। অদূরভবিষ্যতে চাঁদে অবতরণের পর মানুষ যখন আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে, তখন তাকে গতি ও তাপ সম্বন্ধীয় একই ধরণের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তাই জোন্দ্‌-পাঁচের সাফল্য চাঁদের দেশে মানুষের সশরীরে অভিযানের দিনটিকেই ত্বরান্বিত করে তুলল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অ্যাপোলো-সাত

অ্যামেরিকার বিজ্ঞানীরা গত ১১ই অক্টোবর তিনজন মহাকাশযাত্রী সমেত অ্যাপোলো-সাত নামে একটি মহাকাশযান চাঁদের দেশে মানুষ পাঠাবার পরিকল্পনাকে দ্রুত রূপ দেবার জন্য মহাকাশে ক্ষেপণ করলেন। এর যাত্রী ছিলেন,—ওয়াল্টার স্কিরা, ওয়াল্টার কনানিংহাম এবং ডন আইসেলে। এই তিনজন মহাকাশযাত্রী এগার দিন একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে পরিক্রমার পর পৃথিবীর মাটিতে আবার নিরাপদে ফিরে এসেছেন। এগার দিনের দীর্ঘ মহাকাশযাত্রার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে আর কেউই অর্জন করতে পারেন নি। চাঁদের দেশে মানুষের অভিযানের পথে অ্যাপোলো-সাতের ঘটনাটিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে ধরা যেতে পারে।

শারীর ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হরগোবিন্দ খোরানা এবছর শারীর ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে আরো দুজন অ্যামেরিকান বিজ্ঞানী নিরেমবার্গ ও হোলির সঙ্গে যুক্তভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

ভারতবর্ষেই তাঁর গবেষণাকাজ করার জন্যে খোরানা বহুদিন চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করার কোন সুযোগ না পাবার ফলেই তিনি স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তা নাহলে আজ ভারতবাসীরূপেই এই দুর্লভ সম্মান তিনি লাভ করতেন।

খোরানা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের একটি বিশেষ উপাদান নিউক্লিক অ্যাসিডকে কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে তৈরি করেন। আমাদের জৈব গঠনের অন্যতম প্রধান পদার্থ প্রোটিন গড়ে উঠেছে যে অ্যামিনো অ্যাসিডের সমবায়ে, খোরানা সেই অ্যামিনো অ্যাসিড সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকাজের মধ্য দিয়ে জীবনের রহস্য এবং জীবজগতের বংশগতির ধারা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছেন। অন্য দুজন অ্যামেরিকান বিজ্ঞানীও স্বতন্ত্রভাবে এই একই লক্ষ্যের দিকে আমাদের এগিয়ে দিয়েছেন বলে খোরানার সঙ্গে মিলিতভাবে বিজ্ঞানজগতের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করলেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী

বিবিধ প্রসঙ্গ

গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী ও আমাদের জিজ্ঞাসা

১৯৬৮ সালের ২রা অক্টোবর থেকে মহাত্মা গান্ধীজীর জন্মের শতবার্ষিকী উৎসব দেশে বিদেশে রূপায়ণের প্রচেষ্টা চলেছে।

প্রথম দুদিনের সরকারী ও বেসরকারী কর্মসূচিগুলি দেখলে মনে হয় যেন গান্ধীজী দেশের শতকরা নব্বই জনের কেউ ছিলেন না। তাদের জীবনের সঙ্গে তাঁর জীবনের মর্মবাণীর যেন কোন সম্পর্কই ছিলনা এবং ভবিষ্যতেও যেন তা গড়ে তুলতেও দেওয়া হবে না।

আসলে গান্ধীজীকে মূলধন করে যাঁরা একদিন ভারতের বিপ্লবের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন, যাঁরা গান্ধীজীর আদেশ উপেক্ষা ও অমান্য করে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের উপদেশকে শিরোধার্য করতে দ্বিধা করেন নি, তাঁদের কাছে গান্ধীজীর স্মৃতি শুধু অনাবশ্যক নয়—অবাঞ্ছিতও বটে। গান্ধীজীর জীবনের শেষ অঙ্কের দিনগুলি এখনো অনেকের মনে অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে নিজে যুদ্ধ ঘোষনা করলেন ও তাঁর প্রধান শিষ্যদের তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে বললেন।

সর্দার প্যাটেল তখন সহকারী প্রধান মন্ত্রী। দেশ বিভাগ হয়ে গেছে। দিল্লীতে আর-এস-এসরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উন্মত্ততায় মেতে উঠলো। অনেক মুসলিম পরিবার প্রাণ হারালেন। গান্ধীজী কোলকাতা থেকে সোজা দিল্লীতে উপস্থিত হলেন। মৌলানা আজাদ ও জওহরলাল প্রতিদিন তাঁকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিস্তারের খুঁটিনাটি খবর দিতে লাগলেন। গান্ধীজী বিচলিত হয়ে—সর্দার প্যাটেলকে ডাকলেন। প্যাটেল গান্ধীজীর মুখের উপর বললেন "সব খবর অতি-রঞ্জিত"—"মুসলমানরাও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে আছে"—পরেরদিন এই কথার সমর্থনে পুলিশ কমিশনার টেবিলের উপর, তিনটি পেনশিল কাটা ছুরি ও একটি বঁটি দা সাজিয়ে রেখে দিলেন—খানাতল্লাসী-অস্ত্রের নিদর্শন হিসেবে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন খুব রসিকতা করে সেদিন বলেছিলেন "সামান্য সামরিক জ্ঞান থাকলে এই খেলনাগুলি এখানে আনা হতোনা।" সর্দার প্যাটেল লাল হয়ে উঠেছিলেন। দিল্লীতে শক্ত মানুষ হিসেবে তাঁর

নামডাক যথেষ্ট। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়লো বাপুজীর ওপর। তিনি গিয়ে বললেন—তাঁকে অপদস্থ করার জন্যই এতসব ষড়যন্ত্র। গান্ধীজী বললেন "আমি কি চীনে বসে আছি না দিল্লীতে।" "আমার কি চোখ নেই।" রাগে গড় গড় করে—সর্দারজী উঠে গেলেন। তিনি চললেন বম্বে। পরদিন থেকে গান্ধীজীর আমরণ অনশন। সারা দেশ গান্ধীজীর পেছনে। দিল্লীর স্বদেশ প্রেমিক হিন্দু-মুসলিম-শিখ ভাই-বোনেরা এইবার বেরিয়ে এলেন—দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করতে। গান্ধীজীর জয় হলো। আর-এস-এসরা এবার জনসাধারণের দৃপ্ত প্রতিরোধের সামনে পিছু হটলো। তারাও এসে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে—তাদের সদাচরণের আশ্বাস দিল—। গান্ধীজী অনশন ভাঙলেন। সারা দেশে তখন সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলনের বান ডাকতে আরম্ভ করেছে। এই সময়ে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে আর-এস-এসরা কতকগুলি ইস্তাহার বিলি করলো। চারদিক থেকে খবর এলো—এদের লক্ষ্য—গান্ধীজীর জীবনের ওপর।

সর্দার প্যাটেল নির্বিকার। যা হবার তাই হলো। ১৯৪৮এর ৩০শে জানুয়ারী বিকেল ৪-৫০-এ বিড়লা ভবনে—প্রার্থনা সভার আরম্ভে বিনায়ক গডসের তিন রাউণ্ড গুলি—গান্ধীজীর বক্ষ ভেদ করে গেল। সারা দেশ সেদিন স্তম্ভিত বেদনার্ত বিক্ষুব্ধ।

গান্ধীজীর হত্যাকারীর দল ও হত্যার সাহায্যকারীর দল আজ বিশ বছর পরেও কিন্তু বহাল তবিয়তে আছে। আর আছে বছরে একবার আনুষ্ঠানিক রামধুন সূত্রযজ্ঞ, আর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান।

গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত আজ কোথায়? যে সাম্প্রদায়িক শয়তানের দল গান্ধীজীকে হত্যা করেছিল—তাদের অভূতপূর্ব রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য দায়ী কারা? আজ বিশ বছর পরেও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় দেশ বিপর্যস্ত কেন? রাঁচী, মীরাট, এলাহাবাদ, মোরাদাবাদ, কোলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, নাগপুরে দাঙ্গার দুষ্কৃতকারীরা এখনো শাস্তি পায়নি কেন? শতবার্ষিক উৎসব আরম্ভ হওয়ার পরেও হরিজন বালকের রক্তে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের বোধন হল কেন?—বিহারে পুপরি গ্রামে আর-এস-এসের গুণ্ডারা মুসলিম নাগরিকদের বাড়ি পুড়িয়ে দিল কোন সাহসে? এই ভাবেই কি গান্ধীজীর জন্মউৎসব পালিত হবে? আজ গান্ধীজীর নাম নিয়ে গান্ধীজীকে এখনো হত্যা করছে যারা তারা গান্ধীজীর অমর স্মৃতিকে এখনো ভয় করে।

গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত, তাঁর মর্মবাণী এঁদের কাছে অসহনীয় অবাঞ্ছিত ঐতিহ্য। তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান প্রধান মূল মন্ত্রগুলি ছিল অহিংসা, সহজ অনাড়ম্বর জীবনধারা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও সামাজিক সাম্য। আজ গান্ধীজীর এই মর্মবাণীকে সফল করে তুলতে চায় যাঁরা তারা হচ্ছেন অবহেলিত অবজ্ঞাত! তাঁর আদর্শবাদ নিয়ে যাঁরা শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন ডাঃ সুন্দর লাল, নবকৃষ্ণ দাস, সতীশ দাশগুপ্ত, অরুণকুমার ঘোষ প্রভৃতি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। গান্ধীজীর যে ঐতিহ্য প্রগতিশীল, সার্বজনীন ও বিশ্বমানবের প্রাণের কাছাকাছি, সে ঐতিহ্য দেশ ও কালের সীমান্ত পার হয়ে সুদূর আমেরিকাতেও নিগ্রোজাগরণের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। ডাঃ লুথার কিং ছিলেন তারই শ্রেষ্ঠ প্রতীক, আর মূর্ত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, শান্তি ও মানবতার রক্ষী সুদূর ভিয়েতনামের শ্রেষ্ঠ জীবনসাধক মহাত্মা হো-চি-মিনের মধ্যে। আজ তাই ভারতের চেয়ে শতগুণে বেশী গান্ধীজীর মর্মবাণীকে ভিয়েতনামের মানুষেরা অযুত প্রাণের বিনিময়ে রূপ দিচ্ছেন। গান্ধীজী ও হো-চি-মিন, ভারত ও ভিয়েতনাম এই উৎসবে তাই হয়ে দাঁড়াবে একটি নাম —একটি প্রাণ ও একটি জীবন ধারা।

শান্তিময় রায়

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করে একমুঠো ভাত খাবো তবু গোলামি করব না।— বলিষ্ঠপ্রত্যয়ী এই কথাটি লিখেছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর আত্মজীবনীতে। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই মনীষী অসমীয়া সাহিত্যে ছিলেন নব-জাগৃতির অগ্রদূত। 'জোনাকী' যুগের অসমীয়া যুগমানস ও সংস্কৃতি সাধনার ছিলেন তিনি একক ব্যক্তিত্ব। এ বছরে নানান জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাঁরই জন্মশত বার্ষিকী।

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে আসামের আহতগুরির কাছাকাছি কোথাও তিনি 'ভূমিষ্ঠ নহৈ নৌকাত হ'ল'। আসামেই লেখাপড়া শুরু করেন লক্ষ্মীনাথ। শিবসাগর সরকারী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে চলে এলেন কলকাতা। তখন তিনি সবে আঠারোর মণিকোঠায় পা দিয়েছেন। ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। এই সময়েই চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ও হেমচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে তিনি অসমীয়া ভাষা উন্নতি-সাধনী সভা গঠন করেন। কলকাতা হয়ে উঠল অসমীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি।

একছত্রটা অসমীয়া সাহিত্যে নতুন দিনের শঙ্খধ্বনি শোনাল। চন্দ্রকুমারের সম্পাদনায় বেরুল জোনাকী পত্রিকা। তিন বছর পর লক্ষ্মীনাথ এই কাগজটি সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে নেন। এ সময়েই তিনি বিয়ে করেন ঠাকুর পরিবারের হেমেন্দ্রনাথের মেয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরীকে। এই ঘটনাটি নিছক বিবাহ নয়, দুই সংস্কৃতির সেতু-বন্ধন। লক্ষ্মীনাথ—ঠাকুর পরিবারের উদারতা দ্বারা প্রভাবিত হলেন। জোনাকী পত্রিকায় এই ঢেউ লাগল। ফলে কাগজটি শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, অসমীয়া জাতীয় জীবনেও দারুণ প্রভাব বিস্তার করল, মানবচেতনায় হল সোচ্চার। লক্ষ্মীনাথ তাঁর 'বীণ বরাগী'কে আহ্বান জানালেন : নতুন প্রাণর /ন চকুজুরি/দীপিতি ঢালি দে তাত ; / পুরণি পৃথিবী / ন-কৈ চাই লওঁ / হে বীণ এবারি মাত।

এই যুগেই প্রেমের জয়গান শোনা গেল সোজাসুজি উপদেশের ভঙ্গিমায় :
ই জীবনে কামর যে সমাপতি নাই / আরম্ভণ, দৃষ্টান্তর মাথোঁ আছে ঠাই ॥

নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানবাত্মার আর্তি শোনা যায় লক্ষ্মীনাথের সাহিত্য। এই যুগেই শোষিত জনগণের প্রতি মমত্ব প্রকাশ পেল, দেখা দিল গণচেতনা। ১৯০৯ সালে ডাক পিওনকে দেখে তাই যখন তাঁর জানতে ইচ্ছে করে যে, সে কি কি খবর নিয়ে যাচ্ছে তার ঝুলিতে :

কই যোয়া ডাকোয়াল খোজ কিদ কোবাল ?
জুখুক জুখুক কিনো বাজো ?

তখন কবির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জেগে ওঠে।

এক কথায়, অসমীয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় জোনাকী পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী মুখ্য ভূমিকা নেন, এবং লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ছিলেন এর নেতৃত্বে।

কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প, রূপকথা, রস রচনা, জীবনী, ধর্মালোচনা থেকে শুরু করে সাহিত্যের এমন কোন দিক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে তাঁর হাতের ছোঁয়া লাগেনি। আসামের জনগণকে তিনিই শুনিয়েছেন :

অ' মোর আপোনার দেশ
অ' মোর চিকুণি দেশ
এনেখন শুৱলা
এনেখন সুফলা
এনেখন মরম দেশ।

অবশ্য বলতে লজ্জা নেই যে, তাঁর এই স্বদেশানুরাগে বেশ কিছুটা সীমাবদ্ধতার ছায়া পড়েছে। ফলে বাঙলাদেশের উনিশ শতকের নবজাগরণের নায়কেরা যেমন অনেকেই প্রথম জাতীয় মহাবিদ্রোহের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেননি, তেমনি আলোড়নকারী কামরূপ-দরঙের সশস্ত্র কৃষক-বিদ্রোহ যে তাঁকে সামান্যও বিচলিত করেছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না।

তবু সব কিছু মিলিয়ে বেজবরুয়া যা দিয়েছেন তাও নিতান্ত কম নয়। প্রখর মনীষার অধিকারী, দেশব্রতী এবং সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া শুধু আসামের নয়, গোটা ভারতেরই গর্ব। তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আজ আসামের আর একজন অসামান্য গীতিকার জ্যোতিপ্রসাদের উক্তিই বারবার মনে আসছে।…'তোমাকে কে ভুলতে পারে বল? স্মরণ করবে, তোমায় স্মরণ করবে রোজ সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রে, দুপুরে ভবিষ্যতের বহু যুগান্তের অসমীয়া। তুমি থাকবে আমাদের ভাষার শব্দে শব্দে, তুমি থাকবে আমাদের কবিতায় ছত্রে ছত্রে, তুমি থাকবে আমাদের সাহিত্যের ভিতরে বাইরে, তুমি থাকবে অসমীয়ার জীবনের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে। তুমি থাকবে, থাকবে, থাকবে।' বলাবাহুল্য শুধু অসমীয়াদের কাছেই নয়, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া বেঁচে থাকবেন সমস্ত ভারতীয়ের হৃদয়ে।

গণেশ বসু

মৃত্যুঞ্জয় মানুষ

গত বছর আটই অক্টোবর লাতিন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আর্নেস্টো 'চে' গুয়েভারাকে সি. আই. এ.-র এজেন্টদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে খুন করা হয়। আর্জেন্টিনায় তাঁর জন্ম। ফ্যাসিস্ট বাতিস্তার হাত থেকে কিউবাকে মুক্ত করার সংগ্রামে অগ্রবর্তীদের তিনি ছিলেন অন্যতম। কিউবার মুক্তির পর তিনি কিউবার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। গুয়েভারা মনে করতেন, মার্কিন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গোটা লাতিন আমেরিকাই খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রে 'বল্কানাইজ' করা হয়েছে। তাই লাতিন আমেরিকার বিপ্লবীর কাছে কিউবা, আর্জেন্টিনা বা বলিভিয়া নয়··· গোটা লাতিন আমেরিকাই অখণ্ড স্বদেশ। কিউবার নাগরিকত্ব ও সরকারী সমস্ত পদ ত্যাগ করে, মার্কিন নাগপাশ থেকে গোটা মহাদেশকেই মুক্ত করার জন্য, গেরিলা-যুদ্ধ সংগঠনের কাজে বলিভিয়াকে প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র হিসাবে গুয়েভারা বেছে নেন। বলিভিয়ার হিগুয়েরা শহরের আট কিলোমিটার দূরে আন্দিজ পর্বতমালার যুরো

গিরিবর্ত্মে, মার্কিন প্রসাদপুষ্ট বলিভিয়ার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এক সম্মুখ যুদ্ধে তিনি আহত হন। পরে তাঁকে হিগুয়েরা শহরে গুলি করে হত্যা করা হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশেই এবছর আটই অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক গেরিলা দিবস' রূপে পালন করা হয়েছে। গুয়েভারার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা, বা সংগ্রামের পদ্ধতি বিষয়ে অনেকেরই মতভেদ হতে পারে, কিন্তু সকলেই অন্তত মনে রাখেন তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী অমর বাণী "সংগ্রাম আমাদের বিপ্লবী হবার সুযোগ এনে দেয়, তুলে নিয়ে যায় মানব-প্রজাতির শ্রেষ্ঠতম স্তরে—আমাদের মানুষ হিসাবে স্নাতক হবার মর্যাদা এনে দেয়" আর তাঁর অমর কাহিনী।

তিন বছর আগে, ১৫ই অক্টোবর, ভিয়েতনামের বীর দেশপ্রেমিক তরুণ নগুয়েন ভ্যান ত্রয়কে গুলি করে হত্যা করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের প্রসাদপুষ্ট দেশদ্রোহী তাঁবেদারের দল। ভিয়েতনাম-আক্রমণকারী, পররাজ্য-লোলুপ মার্কিন সাম্রাজ্যশাহীর দলনেতাদের অন্যতম, ম্যাকনামারাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে দেশী-বিদেশী শত শত সাংবাদিকের সম্মুখে অকুতোভয় এই দেশপ্রেমিক ভিয়েতনামের যৌবনের মন্ত্র উচ্চারণ করেন—'জয় হোক ভিয়েতনামের, জয় হো-চি-মিন'।

সি. আই. এ-র সেবাদাস ইন্দোনেশিয়ার সামরিক 'রাষ্ট্রপতি' সুহার্তো কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের অজুহাত তুলে ক্ষমতা দখল ক'রে দুলক্ষেরও বেশি কমিউনিস্ট ও দেশপ্রেমিকদের হত্যা করেছে। নয়া উপনিবেশিকতাবাদের ঘৃণ্য চক্রান্ত ধর্মান্ধতাকে জাগিয়ে তুলে দেশটাকে নরককুণ্ড করে তুলেছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য সুদিসমান, নুজনো এবং প্রাদেশিক নেতা উইরজো মার্তোনোকে ২৯শে অক্টোবর '১৯৬৫-র ব্যর্থ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের অপরাধে' গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি পোদগর্নি ইন্দোনেশিয়ার জঙ্গী সরকারের নিকটে—এঁদের প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর না করার জন্য আবেদন করেছিলেন। বলাবাহুল্য তা অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে কোনঠাসা প্রতিক্রিয়া চক্র সন্ত্রাসের চাবুকে মানুষের মুক্তি আন্দোলন থমকে দিতে চায়। কিন্তু আমরা জানি বিশ্বব্যাপী বিপ্লবীরা মৃত্যুঞ্জয়।

শুভব্রত রায়

এবারের অলিম্পিক ও মেক্সিকো

আগ্নেয়গিরির উপর অলিম্পিক? হ্যা তাই-ই। পম্পেইতে খেলার আসর শেষ হলেই আবার অগ্ন্যুৎগীরণ শুরু হবে। আলামুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। গলিত লাভার স্রোত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭ হাজার ফুট উঁচুতে এবারকার অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ক্রীড়াঙ্গন, এবং বলাবাহুল্য, তা মেক্সিকোতে। ১৯তম অলিম্পিকের অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে ১২ই অক্টোবর। ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়াম এখন লোকে লোকারণ্য। মেক্সিকোর তরুণী এ্যাথেলিট কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত অলিম্পিকের মশাল জ্বলছে অনির্বাণ-শিখার মতো, পত্‌পত্‌ করে উড়ছে পাঁচ মহাদেশের ঐক্যের প্রতীকযুক্ত পতাকা। নিঃসন্দেহে সারা পৃথিবীর চোখ এখন মেক্সিকোর দিকে। অলিম্পিক আসর শুরু হবার মাত্র কয়েকদিন আগেও ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষপর্যন্ত শেষ হবে কি না। মেক্সিকোর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘর্ষ 'অলিম্পিক প্রাঙ্গণ'কেও যথেষ্ট উত্তপ্ত করেছিল। লাতিন আমেরিকার বহু দেশেই মার্কিন সেবাদাস সরকার গদীতে আসীন। 'অধোন্নত' বা 'উন্নতিকামী' অনুগৃহীত এ তাঁবেদার দেশ-গুলোর দারিদ্র্যের চেহারা যাতে বাইরে ধরা না পড়ে তার জন্য সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে মার্কিন সরকার। এবারের অলিম্পিকের দেশ মেক্সিকোর জনগণের প্রকৃত অবস্থার কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে সে দেশের সরকার, ফলে ঘটেছে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংঘর্ষ। অবশ্য অলিম্পিক আসরও রাজনীতির আওতার বাইরে পড়ে নি। অলিম্পিককে ঘিরেও চলেছে চরম রাজনীতি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের গুরুরা এখানেও চুপচাপ বসে নেই। যদিও অলিম্পিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বভ্রাতৃত্বের জন্য, প্রত্যেক দেশের ক্রীড়াশীল যৌবনের বিকাশের জন্য তবু খেলোয়াড়ী মনোভাবের অভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখানেই সবচেয়ে বেশী। তাই সোভিয়েত বিরোধিতার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, গণতান্ত্রিক কোরিয়ার অংশ গ্রহণে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করা হয়, লোকায়ত্ত চীন সাধারণতন্ত্র আজও অলিম্পিক আসরে অংশগ্রহণ করতে পারে না অথচ বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী প্রতিনিধিদলকে অলিম্পিক থেকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেবার সময় চরম টালবাহানা দেখা যায়। কিউবার প্রতিনিধি ন্যায্য কারণেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে অগণতান্ত্রিক এবং মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর আড্ডাখানা বলে

মন্তব্য করেন। নিজেদের দেশে সমানাধিকারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথেলিটরা বুদ্ধিবিবৃতিতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি, মার্কিন নাগরিক অ্যাভেরি ব্রানডেজের পদত্যাগ দাবি করেছিলেন 'জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার কল্যাণের জন্য'। এই 'ভদ্রলোকই' সবচাইতে বেশি সচেষ্ট ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী প্রতিনিধিদলকে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করানোর জন্য। পরে অবশ্য তাঁর উঁচুমাথা হেঁট হয়েছিল সারা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষের কাছে। তবুও টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এই নির্লজ্জ বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো অ্যাথেলিটরা কোনো রকম প্রতিবাদ জানালে তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অলিম্পিকে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথেলিটদের প্রশিক্ষক খ্রীস্টান রাইট তখনই বলেছিলেন, 'ব্রানডেজের উক্ত বিবৃতি নিগ্রো অ্যাথেলিটদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার করেছে'। প্রকৃতই তাই। ধনতন্ত্রের চরম সঙ্কট ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। ক্রীড়ামঞ্চেও এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। ক্রীড়ামঞ্চও হয়ে ওঠে তাই অন্যদিকে সংগ্রামেরও মঞ্চ। ১৯১১ সালে আই. এফ. এ. শীল্ডে মোহনবাগান দলের বিজয় আমাদের কাছে তাই অবিস্মরণীয়। 'বিশ্ব কাপে' গণতান্ত্রিক কোরিয়ার প্রতিযোগিতা আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করি। আমেরিকার দ্বিধাবিভক্ত সমাজও অলিম্পিক আসরে প্রত্যক্ষ করা গেল। অলিম্পিক পদকজয়ী টমি স্মিথ, জন কারালেসের প্রতিবাদ সারা বিশ্বের মানুষকে অভিভূত করে। তাঁদের নগ্ন পায়ে কালো দস্তানাপরা মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে মাথা নিচু করে—সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত কালো মানুষের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন—আমাদের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পাবার যোগ্য। সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে এই দুই বীরকে 'অলিম্পিক গ্রাম' ছেড়ে যাবার আদেশ দেয়। কিন্তু ভয় দেখিয়ে আর যাই করা যাক, ব্ল্যাক পাওয়ার মুভমেন্টকে দমানো যায় না। একে একে বহু নিগ্রো অ্যাথেলিট প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে, লাতিন আমেরিকার প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্র কিউবার প্রতিনিধিরা ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি, তাঁদের অর্জিত সমস্ত পদক আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথেলিটদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হল।

এবারের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানও হচ্ছে বিক্ষুব্ধ মেক্সিকোয়। গত কয়েকমাস মেক্সিকোর সাধারণ মানুষের আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ

করছিল।' সারাদেশের মানুষের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন অনেকদিন থেকেই চলছিল—অবশ্য ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ আন্দোলনের প্রসার ঘটে আরও জঙ্গী মনোভাব নিয়ে। গত জুলাই মাসে স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশ মিলিটারির এক গণ্ডগোলের ফলে পুলিশ স্কুল বাড়িটি দখল করেছে। ছাত্ররা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানালে স্কুলটিকে পুলিশ-মিলিটারির অস্থায়ী ব্যারাকে রূপান্তরিত করা হয়। মেক্সিকোর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদে 'সিট্-ইন' আন্দোলন শুরু করে। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেও পুলিশ-মিলিটারির অনুপ্রবেশ ঘটে। ক্রমশঃই ছাত্রদের দাবির সমর্থনে এবং নিজেদের দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মেক্সিকোর ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী। এই আন্দোলন ক্রমশঃই জোরদার হতে থাকে। ফলে মেক্সিকোর সরকার বাধ্য হয়ে আদেশ দিলেন—১লা অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমস্ত ফৌজ তুলে নেওয়া হবে। ২রা অক্টোবর বিজয় মিছিল শুরু হয় রক্ত পতাকা এবং চে-গুয়েভারার ছবি নিয়ে। ১৫ হাজার (সরকারী মতে) সম্পূর্ণ নিরস্ত্র জনতার মাথার উপর মেশিনগানের বুলেট চলে। নিহত হয় ৩২ জন (সরকারী মতে), আহত হয় একশজনেরও বেশি। সরকার পক্ষে যারা আহত হন তাদের মধ্যে জেনারেল টলেডোও আছেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের সরিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৪৬ বর্গ কিলোমিটারের দেশ মেক্সিকোর লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৭ লক্ষ ২৪০। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৮ জনের বয়স ২৫-এর নীচে, বামপন্থী আন্দোলনের পুরনো ঐতিহ্য মেক্সিকোর, ১৯১০-১৭তে মেক্সিকোর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এমিলিয়ানো জাপাটা এবং ফ্রান্সিসকো ভিলা—এই দুই দুর্ধর্ষ যোদ্ধার নাম সারা লাতিন আমেরিকায় পরিচিত ; ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনার্ডরা দেশ ছেড়ে ঘাঁটি গেড়েছিলেন মেক্সিকো এবং লাতিন আমেরিকা অন্যান্য দেশে। মেক্সিকোতেই প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল কাস্ত্রো আর গুয়েভারার, এখান থেকেই 'গ্রানমা'র যাত্রীরা যাত্রা শুরু করেছিলেন। বামপন্থী আন্দোলনের পুরনো অগ্নিকেন্দ্রে আবার লড়াই শুরু হয়েছে। ২১শে থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭ জন মেক্সিকান গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। ২৪শে সেপ্টেম্বর শহরের উত্তরাঞ্চলে ধৃত শ্রমিকনেতাদের মুক্ত করার জন্য যে লড়াই হয় তাতে কৃষকদের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষও ছিলেন। মোট সাতশ ছাত্র এবং ৩৪ জন অধ্যাপক গ্রেপ্তার হন। পুলিশ

মিলিটারির নারকীয় অত্যাচার লক্ষ্য করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রেক্টর জ্যাভিয়ার বেরেস সিয়েরা সরকারের Excessive use of force-এর নিন্দা করেন। লাতিন আমেরিকার প্রখ্যাত কবি ভারতে নিযুক্ত মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত অক্তাভিয়া পাস ছাত্রদের উপর পুলিশী অত্যাচার এবং অলিম্পিককে কেন্দ্র করে কবিতা লেখেন। মেক্সিকো সরকারের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি রাষ্ট্রদূতের কাজ থেকে পদত্যাগ করেছেন। মেক্সিকোর প্রখ্যাত কমিউনিস্ট চিত্রশিল্পী সিকারাসও সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ব্যক্ত করেছেন। মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টি বলেছেন, এই বিক্ষোভের মূল প্রোথিত অনেক গভীরে—দেশব্যাপী ধিকি ধিকি বিক্ষোভের আগুন লেলিহান হতে চাইছে। পুলিশ-মিলিটারির অত্যাচার এ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। দিনের পর দিন আইন অমান্য আন্দোলন চলেছে, দাবি উঠেছে—(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দাঙ্গাবাজ পুলিশদের হঠাতে হবে। (২) মেক্সিকো শহরের পুলিশ-প্রধানের অপসারণ চাই, (৩) রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। (৪) ফৌজদারী আইনের নাশকতামূলক কার্যবিরোধী ধারা চলবে না। মেক্সিকো সরকার সমস্ত দাবি বিবেচনা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করেননি। আপাততঃ অলিম্পিক চলাকালীন অবস্থায় মেক্সিকোর আন্দোলন স্তব্ধ। ছাত্রদের ২১০-এর কমিটি ঘোষণা করেছে, অলিম্পিক শেষ হলেই আবার আন্দোলন শুরু হবে। রণাঙ্গন মেক্সিকো এখন ক্রীড়াঙ্গন—যদিও ক্রীড়াঙ্গনেও লড়ায়ের বাজনা বাজছে।

গৌতম ঘোষ

লেখকদের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

আফ্রো-এশিয় লেখক সংঘের দশ বছর পূর্ণ হল। উনিশশো ছাপান্নোয় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লেখকেরা সমবেত হয়েছিলেন দিল্লীতে। লক্ষ্য ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ও জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে লেখকের ভূমিকা নিরূপণ করা। লক্ষ্য ছিল—সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণমুক্ত সদ্য-স্বাধীন দেশে নতুন প্রগতিশীল সংস্কৃতি গড়ে তোলা। আর লক্ষ্য ছিল শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য। আটান্নো সালের অক্টোবরে গড়ে উঠলো আফ্রো-এশিয় লেখক সংঘ। আফ্রিকা ও এশিয়ার শাইত্রিশটি দেশের দুশোরও বেশি লেখক ঐ সংস্থা গঠনের উদ্বোধনী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, ইউরোপ ও আমেরিকার তেরটি দেশের লেখক উপস্থিত ছিলেন পর্যবেক্ষক হিসাবে।

দশ বছর বড়ো কম সময় নয়। এ দশ বছরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন আরও দুর্বার হয়েছে। সমাজতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়েছে। আবার কোন কোন দেশে পায়ের শিকল ছিঁড়তে না-ছিঁড়তেই হাতে হাতকড়া চেপে বসেছে নয়া উপনিবেশিকতার। কোথাও ধর্মের নামে, কোথাও উপজাতির নামে, কোথাও বর্ণের নামে চলেছে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ—ইন্দোনেশিয়া, নাইজিরিয়া, অ্যাঙ্গোলা-মোজাম্বিক-রোডেশিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকায়, চলেছে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ চূড়ান্ত পর্যায়ে ভিয়েতনামে। যখন আফ্রো-এশিয় লেখকদের আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, তখনই এসেছে সঙ্কীর্ণতাবাদী বিভেদপন্থার আঘাত। চীনা রাজনীতির বিভেদপন্থা তখনকার সম্পাদক রত্নে সেনানায়কের বকলমে এই ঐক্য, সংগ্রাম ও সংহতির সংগঠনকে চূর্ণ করতে চেয়েছে। তাই কলম্বো থেকে এই সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কায়রোতে, যে কায়রো আজ ইস্রায়েলের মুখোসে ঢাকা সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ও চক্রান্তকে চূর্ণ করার দৈরথে পাঞ্জা লড়ছে। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে আফ্রো-এশিয় লেখক-সংস্থার তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বেরুটে, আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ৫টি দেশের লেখকেরা। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারত থেকে হরিবংশ রায় 'বচ্চন', মুলকরাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকরা।

আফ্রো-এশিয় লেখক সংগঠনের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এ বছর ২০-২৫ সেপ্টেম্বর তাসখন্দে আন্তর্জাতিক লেখকদের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পঞ্চাশটি দেশের লেখক এতে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউসুফ এস সেবাই (ইউ. এ. আর.), শঙ্কর কুরুপ (ভারত), ইয়োশিও হোত্তা (জাপান), জন মৃওয়াজি (কেনিয়া), ফ্রাঙ্ক হার্ডি (অস্ট্রেলিয়া), আলেক্স লা গুমা (দক্ষিণ আফ্রিকা), ফ্রান্সিসকো কোলোয়ানে (চিলি), জাঁ ব্রিয়েরা (সেনেগাল), রিফাৎ ইলগাজ এবং ওকটে আকবল (তুরস্ক) প্রমুখ খ্যাতিমান লেখক। সোভিয়েত লেখকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চেঙ্গিজ আইৎমাতোভ, আনাতোলি সোফ্রোনোভ, বাগি কারবাবায়েভ, রসুল গামজাতোভ, ইভগেনি ইভতুশেঙ্কো।

শঙ্ক মহাদেবের নক্সা, হাতের উপরে রাখা মুচবদ্ধ পাঁচটি হাত এবং একটি খোলা বই—এই প্রতীকলাঞ্ছন আন্তর্জাতিক লেখক সিমপোসিয়মের মূল আলোচ্য

বিষয় ছিল 'সাহিত্য ও আধুনিক বিশ্ব'। সামাজিক প্রগতি ও জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামে লেখকের ভূমিকা, ক্ল্যাসিক্যাল ঐতিহ্য ও সমকালীন সাহিত্য, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য—ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়। আর ভিয়েতনাম শ্রদ্ধার সঙ্গে হয় বার বার উচ্চারিত। সিংহলের লেখক গুনসেনা বিঠল বলেন, "আমাদের অস্ত্র, এই লেখনী। আমাদের শান্তি ও স্বাধীনতার পথ আটকে দাঁড়ানো সাধারণের শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্যত করি, ব্যবহার করি এই কলম। আমাদের এ-সংগ্রামে ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই যত দিন না আমাদের মহাদেশগুলির প্রগতিবাদী শক্তিগুলির ঐক্য সাধিত হয়—ততদিন আমাদের বিজয় নিষ্পন্ন হবার নয়।"

ভিয়েতনামের একটি কাহিনী লেখনীর এই ক্ষমতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। হাতে কপি করা শলোকভের 'ভার্জিন সয়েল' বইটি গেরিলা সৈনিকেরা লড়াইয়ের অবসরে পড়েন। হাতে হাতে ঘোরে পবিত্র চিহ্নের মত সেই বই। একটি খণ্ড লড়াইয়ে একবার ঐ কপিটি শত্রুর হাতে পড়ে যায়। দেশপ্রেমিক সৈনিকেরা প্রতিজ্ঞা করলেন বইটি ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই রাত্রে তুমুল লড়াইয়ের পর বিজয়ী বাহিনী গর্বোদ্দৃপ্তভাবে ফিরলেন তাঁদের আস্তানায়। সঙ্গে তাঁদের সেই উদ্ধার করা 'ভার্জিন সয়েল'এর কপি।

দক্ষিণ আফ্রিকার লা গুমা বলেন, "একমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবেশেই গড়ে উঠতে পারে জাতীয় সাহিত্য।" ১৯৫৮ সালে, আফ্রো-এশিয় প্রথম লেখক সম্মেলনের সময় তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাসিস্ত জেলখানায়। এখন প্রবাসে নির্বাসনে দিন কাটাচ্ছেন। তুর্কি লেখক ওকটে আকবল বললেন, "সৃষ্টিশীল রচনা হবে ঘড়ির মত, চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দেবে সকাল, নিজের সময়কে। পথের দিশা দেখিয়ে দেবে খাঁটি কম্পাসের মত।" মিশরীয় লেখক আব্দুল রাহমান আলী শারকাই বলেন, "লেখকরা হলেন জাতির শ্রেষ্ঠ রাজদূত। আরব দেশগুলিতে তাই লেখকদের বলা হয় প্রফেট।" এই রাজদূতদের মেলাতে হবে। সেজন্য চাই অনুবাদ। এলোমেলো অনুবাদ নয়, "লেখকদের সংগঠনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে অনুবাদ করতে হবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে গত দশ বছরে আফ্রো-এশিয় লেখকদের দু-হাজার গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়েছে।

ক্ল্যাসিক্যাল ঐতিহ্য ও আধুনিক সাহিত্য আলোচনায় বহু বক্তাই অতীতের সাংস্কৃতিক সম্পদ ও আধুনিক সাহিত্যের বিজয়গুলির মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে

তোলার কথা বলেন। ঐতিহ্যবাদী রচনাশৈলী ও সমকালীন রচনার আঙ্গিকের সমন্বয় করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

বক্তারা নিরক্ষরতার অভিশাপের কথাও উল্লেখ করেন। উপনিবেশিকদের ভাষাকে বাহন করে বহু দেশেই এখনও সাহিত্য রচনা চলেছে। নাইজেরিয়র লেখক ভাই সালারিন আফ্রিকার দেশগুলির দ্বিভাষিকতা প্রসঙ্গে, বলেন, আফ্রিকার ভাষাগুলিকে স্বচ্ছন্দ বিকাশের অধিকার দিলে, আফ্রিকার সাহিত্য আরও বৈভব, সুষমা ও প্রাচুর্যে ভরে উঠবে।

আবেগমথিত কণ্ঠে বিখ্যাত আরব লেখক, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ এল সাবাই বলেন, "সৃষ্টির স্বাধীনতা হলো সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতাবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা।"

১৯৭০ সালে আফ্রো-এশিয় লেখকদের চতুর্থ সম্মেলন ভারতে অনুষ্ঠিত করার জন্য ভারতীয় লেখকদের প্রস্তাব বিপুল আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। ঠিক হয়, ১৯৬৯ সালে ঢাকারে আফ্রো-এশিয় কবিদের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। আফ্রো-এশিয় লেখকদের জন্য 'পদ্ম' পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করা হয়েছে।

এই দশম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতীয় কবিদের একটি কাব্য সঙ্কলনও উজবেক প্রকাশনা-সংস্থা প্রকাশ করেছেন। বিষ্ণু দে, শঙ্কর কুরূপ, মখদুম মহিউদ্দীন, বচ্চন ও অন্যান্য ভারতীয় কবির কবিতা এতে আছে।

আফ্রো-এশিয় লেখক সংঘের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি ঘোষণায় বলা হয়েছে "সংগ্রামের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে আমাদের কাজের সাফল্য নির্ভর করছে কর্মের ঐক্যে এবং আমাদের কালের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের উপর।"

তরুণ সান্যাল

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার/১৯৬৮

বার্ষিক গতির প্রচলিত নিয়মের মতোই বছরে একবার করে একজন কবি বা সাহিত্যিককে নোবেল পুরস্কার পেতে হয়। কোথাও কোথাও সুইডিশ আকাদামি একজনকে পুরস্কৃত করে নিজেরা ধন্য হন, কোথাও সেই পুরস্কারে একজনকে ধন্য করেন। শলোকভ বা সার্ত্র্-কে নোবেল পুরস্কার অতিরিক্ত সম্মানের কোন শিরোপাই দিতে পারে না, আবার কোন কোন বছরে সুইডিশ আকাদামি আচমকা এমন এক-একটা নাম ছুঁড়ে মারেন, দিন কয়েকের জন্য

বিশ্ববাসী একটু হকচকিয়ে গিয়েই থিতিয়ে পড়েন। তারপর বিশ্বসাহিত্যের আলোচনায় সার্থে শলোকগুরাই ঘুরেফিরে আসেন, অসংখ্য নোবেল পুরস্কার-ধন্য কবি-সাহিত্যিক করুণভাবে হারিয়ে যান। নেহাৎ ঠাট্টা করেই সেদিন বলছিলেন একজন সুধীব্যক্তি—'য়ুরোপ, আমেরিকায় নোবেল-প্রাইজটার আর কোন ঠাটই নেই তেমন। ওটা কি করে পেতে হয় তার আটঘাটগুলি বেশ ভালো করেই বুঝে নিয়েছে ওরা। লাফালাফিটা আমাদের, আমরা পাই না বলে।'

বোধ হয় এ-কারণেই ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত জাপানী কথাশিল্পী য়ুআসুনারি কোয়াবাতার নামটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের পর কোয়াবাতাই নোবেল পুরস্কারের তালিকায় দ্বিতীয় এশিয়াবাসী সাহিত্যিক। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিষয়ে যে পরিমাণ অধ্যয়ন-আলোচনা হয়, প্রাচ্য দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৌতূহল সত্ত্বেও আলোচনার প্রয়াস তুলনামূলকভাবে অল্প। চিত্রকলা, চলচ্চিত্র বা কাবুকি নৃত্য প্রভৃতির মধ্যে জাপানকে কিছুটা কাছাকাছি পেলেও কবিতা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ হয় তো অনুবাদের অভাবেই তেমন করে ঘটে না। তবু এরই মধ্যে যুদ্ধোত্তর জাপানী সাহিত্যের যে দু-একজন কথাশিল্পীর সঙ্গে আমাদের ব্যাপক পরিচয় ঘটেছে (য়ুকিয়ো মিশিমা, ওজামু দাজাই) কোয়াবাতা সে তুলনায়ও বহুশ্রুত নাম নন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জাপানের শিল্পপ্রধান অঞ্চল ওসাকাতে কোয়াবাতার জন্ম। একেবারে শৈশবেই কতকগুলি মৃত্যু এবং পারিবারিক দুর্ঘটনা তাঁকে এক আত্মীয়হীন নিঃসঙ্গতায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। পরবর্তী জীবনাচরণেও যে এই একাকীত্ববোধ তাঁকে পরিচালিত করেছে, তাঁর সাহিত্যও সেই বোধের সাক্ষ্য বহন করে। জীবন যেখানে অসংখ্য টানাপোড়েনের এক ক্ষত-বিক্ষত স্রোতধারা, তোজোর জাপানই হোক অথবা নাগাসাকি হিরোসিমার পরবর্তী সারা পৃথিবীর দধীচি জাপানই হোক, কোয়াবাতা নিরুদ্বেগে আত্মসমাহিত। কি এক বিষণ্ণতা আর অপার বিস্ময় নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ১৯৩৪-এ শুরু করে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে লিখে ১৯৪৭-এ তিনি যে 'স্নো-কান্টি' উপন্যাসটি প্রকাশ করেন, সুইডিশ আকাদামি সে রচনাটির প্রতি সপ্রশংস হয়ে এ বছরের নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী 'থাউজেণ্ড ক্রেন' উপন্যাসটি তাঁর আরও একটি বিখ্যাত রচনা। কড়

বাস্তবজীবনের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে বিচ্ছিন্ন সুখী-সমৃদ্ধ পরিবারে এক যুবক তার কতকগুলি আত্মগত সঙ্কটে পীড়িত, সর্বত্রই এক বিষাদের বেদনা। নিজের কামনা-বাসনা নিয়েও প্রেমের ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মোচনে ব্যর্থ, এবং মৃত পিতার প্রণয়িনী বা রক্ষিতাদের মধ্যে এক নিদারুণ অস্বস্তি। ভিতরের কামনার আগুনকে দমন করে বাইরের সামাজিক অস্তিত্বকে ভদ্রবেশে সাজিয়ে রাখার কী করুণ অন্তর্দাহ। সমগ্র উপন্যাস এক অনাবিল কাব্য-সৌন্দর্যে আবৃত যেন কবিতার ভাষাতেই জীবন আর জগতকে দেখতে চান তিনি। হিরোশিমার ক্ষত-বিক্ষত জাপান নয়, বুদ্ধ-ঐতিহ্যের নির্মান। স্বদেশী ঐতিহ্যের এই মমত্ববোধ 'থাউজেণ্ড-ক্রেন'এ অত্যন্ত স্পষ্ট। জাপানের 'চা-উৎসব' সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না-হলে ঐ উপন্যাসপাঠের অভিজ্ঞতায় বিদেশী পাঠক বারবার বাধা পাবেন। বারবার মনে হবে, হয় তো বা দেশজ প্রতীকের মধ্যেই অনেক কিছু হারিয়ে গেল, সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা ধরা গেল না। সাম্প্রতিককালে বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত আরও একজন জাপানী উপন্যাসিক ওসামু দাজাইর 'নো লংগার হিউম্যান'-এর পাশে কোয়াবাতার রচনা বিস্ময় সঞ্চার করবে—দাজাইর যুদ্ধক্ষত-জাপানের বিক্ষুব্ধ অশান্ত যৌবনের পাশে কোয়াবাতার স্বদেশে এখনও বুদ্ধের বরাভয়।

শুধু নোবেল পুরস্কারের আন্তর্জাতিক খ্যাতির মধ্যে নয়, কোয়াবাতার সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রচারিত সংবাদ—জাপানী সাহিত্যকে পশ্চিমের কাছে পরিচিত করার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করে আসছেন এবং জাপান 'পি-ই-এন' ক্লাবের তিনি একটানা সতের বছরের সভাপতি।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতীক ধর্মঘট

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারীদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে স্বাধীন ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার যে নিষ্ঠুর দমননীতি ও জিঘাংসাবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে গণতান্ত্রিক-চেতনাসম্পন্ন যে-কোন নাগরিক স্তম্ভিত না হয়ে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের ২৫ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী শুধুমাত্র জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক সর্বনিম্ন বেতন এবং উপযুক্ত দুর্মূল্যভাতার দাবি জানিয়ে ছিলেন। রাজনৈতিক বিক্ষোভ নয়, ট্রেড ইউনিয়নের বিধানসম্মত সর্বনিম্ন অধিকার প্রয়োগের অপরাধেই এই হৃদয়হীন সরকারের লাঠি আর গুলির আঘাতে বলিপ্রদত্ত হয়েছে ১২টি অমূল্য জীবন।

আর অর্ধ লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারীর ভাগ্যে জুটেছে গ্রেপ্তার ও চাকুরী খতমের নির্দয় নোটিশ।

এই প্রচণ্ড দমননীতির মুখে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় শ্রমিক-কর্মচারী যে অপূর্ব দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, যে-ভাবে 'নিয়ম মাফিক কাজ'-এর আন্দোলন সংগঠিত করে তাঁরা প্রায় অচল করে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বহু দপ্তর, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে তা দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই জঙ্গী আন্দোলন এবং সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের আমরণ অনশন ধর্মঘটের ফলেই শেষ পর্যন্ত হৃদয়হীন শাসকচক্রের অনিচ্ছুক হাত থেকে অন্তত আংশিক-ভাবেও ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে দমননীতি প্রত্যাহারের ঘোষণাপত্র; কিন্তু এই ঘোষণার ফলে অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকুরী খতমের নোটিশ প্রত্যাহৃত হলেও চোদ্দ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অবাধ অধিকার ন্যস্ত রয়েছে পুলিশ এবং পদস্থ আমলাদের উপর। আমরা বিশ্বাস করি, কেন্দ্রীয় সরকারের পাঁচশ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর জাগ্রত চেতনা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং কোটি কোটি গণতান্ত্রিক ভারতবাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্বার আন্দোলনের জন্ম দেবে, অর্জন করবে শ্রমিক কর্মচারীদের বাঁচার মত প্রয়োজনভিত্তিক মজুরী।

এই প্রসঙ্গে আমরা ধর্মঘটকে বে-আইনী করার আগুন নিয়ে খেলার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারকে সংযত হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ১৯৪৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কলকাতায় অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্স অফ ইণ্ডিয়ার বার্ষিক অধিবেশনে 'ধর্মঘট' সম্পর্কে তাঁদেরই প্রিয় নেতা জওহরলাল নেহরুর কয়েকটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি:

"ধর্মঘট হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু সংখ্যক আন্দোলন-কারীদের দ্বারা ধর্মঘটীদের ব্যবহার করার পরিণতি—এই কথা বলে ধর্মঘটের সংজ্ঞা নিরূপণ করা খুবই সহজ কাজ। একটি দেশে কি ঘটছে সে-সম্পর্কে খুব সুন্দর চিত্র তুলে ধরবে ধর্মঘট। বায়ুমান বা তাপমান যন্ত্রের মতো এ হল শিল্প-ব্যবস্থার স্বাস্থ্য সম্পর্কে একরকম নির্দেশ যন্ত্র…। আমাদের দেশে জীবনযাত্রার ব্যয়মান ও মজুরীর মধ্যে বিরাট এক ব্যবধান রয়েছে এবং এই ব্যবধানই ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অবশেষে ধর্মঘটের সৃষ্টি করে। আসল প্রশ্ন হল সারা ভারতবর্ষে আজ এই ব্যবধান বিদ্যমান এবং যদি এই ব্যবধানের অবসান ঘটানো না যায়, তাহলে শিল্পে অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। মূল্য হ্রাস করে অথবা মজুরী বৃদ্ধি করে

এই ব্যবধান দূর করা যায়। আজ আমি লক্ষ্য করছি যে, বিপুল সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। অপর দিকে বিপুল সংখ্যক মানুষ বিরাট মূল্যবৃদ্ধির বোঝার সম্মুখীন হচ্ছে। এই ধর্মঘটের প্রশ্ন আমরা কীভাবে মীমাংসা করবো? কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব বা সঙ্গত নয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ উপায়ে ধর্মঘট ভাঙ্গা খুব দুরূহ, কারণ কোন কোন সময় তার পরিণতি হয় খুবই খারাপ.....।"

কিন্তু ইতিহাস সত্যিই নির্মম। তাই আমরা অবাক-বিস্ময়ে ইতিহাসের অন্য এক প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট দেখছি, জওহরলালজীর শিষ্যদের হাতে তাঁরই মূল্যায়ন-নীতি কী নির্মমভাবেই না নিহত হচ্ছে!

ধনঞ্জয় দাশ

ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতির প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব

কলকাতায় ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিক একবছর আগে। পশ্চিম জার্মানীর ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, সেখানে নাৎসীবাদের পুনরাবির্ভাব এবং নয়া নাৎসীদের সক্রিয় ভূমিকাই গণতান্ত্রিক জার্মানী সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষকে ক্রমশ সচেতন করে তুলছিল। কেননা, তুলনায় গণতান্ত্রিক জার্মানী গ্যয়টে, ম্যাকসমুলার, মার্কস ও এঙ্গেলসের মহান ঐতিহ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শনও এই গণতান্ত্রিক জার্মানী। দেশটি আয়তনেও এমন কিছু বড় নয়, এর লোকসংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ। কিন্তু শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে এই দেশটি আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলির মধ্যে একটি। গণতান্ত্রিক জার্মানী এ বছরের সাতই অক্টোবর বিশবছরে পা দিয়েছে। এখন এই রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব অস্বীকার করার অর্থ ইতিহাসকেই অস্বীকার করা। দুঃখের বিষয়, ভারত সরকার এখন পর্যন্ত ইতিহাসকে অস্বীকার করে চলেছেন। তাঁরা নাৎসীবাদের উত্তরসাধক পশ্চিম জার্মানীকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছেন অথচ, গণতান্ত্রিক জার্মানীকে দেন নি। ভারতবর্ষ জোট-নিরপেক্ষ নীতির সমর্থক, শান্তি ও প্রগতির পূজারী বলেই ভারতবর্ষের বাইরে পরিচিত। কিন্তু, ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে তাঁদের আচরণের মিল নেই। ভারত সরকার যাতে জনমতের চাপে গণতান্ত্রিক জার্মানীকে দ্রুত স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন সেই অন্যতম কারণেও ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতির প্রতিষ্ঠা। এই সমিতি গত একবছর ধরে দেশের মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করবার

চেষ্টা করেছে, জনমত সংগঠিত করেছে এবং বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক জার্মানীকে স্বীকৃতি দেবার দাবি উত্থাপন করেছে।

গত ১৮ই আগস্ট রবিবার সকালে সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে (২৭ বি কলেজ স্ট্রীট) বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এখানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেসের নয়াদিল্লীর মুখ্য প্রতিনিধি আলফ্রেড নজো। বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি, ডঃ পঞ্চানন সাহাকে সাধারণ সম্পাদক ও দিলীপ বসুকে কোষাধ্যক্ষ করে আটত্রিশ জন পরিষদ-সদস্য নিয়ে সমিতির নতুন পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে।

প্রকাশ্য সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ১৯ শে আগস্ট, রবিবার সন্ধ্যায়, বিপুল জনসমাগমে সেদিন সমস্ত হলটি ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আর বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্দ্রেই রেডার, আলফ্রেড নজো, জ্যোতি বসু, বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অমিয়কুমার বসু, ডঃ এ, এম, ও, গণি, ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, সুচিত্রা মিত্র ও গীতা মুখোপাধ্যায়। প্রত্যেক বক্তাই তাঁদের বক্তৃতায় জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উপরে জোর দেন। সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, চিন্মোহন সেহানবীশ, তরুণ সান্যাল, ডঃ এ, এম, ও, গণি প্রমুখ। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সেদিন রাত্রি ৯ টায় সভার কাজ শেষ হয়। আশা করা যায়, সমিতি তাদের অন্যান্যদের কাজের সঙ্গে আগামী বৎসরের কার্যকলাপের দ্বারা ভারত সরকার কর্তৃক গণতান্ত্রিক জার্মানীকে স্বীকৃতি দানের পক্ষে আরও জোরদার আন্দোলনও গড়ে তুলতে পারবেন।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

বিয়োগপঞ্জী

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এক বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী, সর্বমানব হিতৈষী, কৃষকবন্ধু, শ্রমিকবন্ধু এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিকের তিরোধান ঘটল। তিনি ছিলেন বহুবিধ সামাজিক বিজ্ঞানগুলির এবং ধর্ম, দর্শন, তত্ত্ববিদ্যা, ইষ্টবিদ্যা ও নন্দনতত্ত্বের মধ্যালোকে এক চিরন্তন ও যথার্থ সীমান্তচারী। এই সীমান্তচারিতার পরিচয় তাঁর বহু গ্রন্থেই পাওয়া যায়, যেমন, The Borderlands of Economics, Political Economy of Population, The Social Structure of Values, The Dynamics of Morals, The Social Function of Art, Theory and Art of Mysticism, ইত্যাদি।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে ইষ্টবিদ্যার যে আড়াআড়ি ভাব দেখা গিয়েছে, রাধাকমল তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজবিজ্ঞানের এক ইষ্টমূল্যভিত্তিক সৌধ দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। 'সোশ্যাল ইকলজি' তথা 'হিউম্যান ইকলজি'-র একজন পথিকৃৎরূপে তিনি পণ্ডিতসমাজে আদৃত হয়েছিলেন। যাকে বলা হয় 'রিজিওন্যাল সোশিওলজি' বা 'আঞ্চলিক সমাজবিদ্যা', সেটাই ছিল বোধ হয় তাঁর সব চেয়ে প্রিয় বিষয়। তাঁর চোখে 'রিজিওন্যালিজম'-ই ছিল গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক যোজনার ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব পুনর্গঠনের প্রধান বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার। এ বিষয়ে রাধাকমল The Regional Balance of Man, Migrant Asia, Races, Lands and Food, The Regional Economics of India, Rural Economy of India, Planning the Countryside, Man and His Habitation প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ও অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় এশিয়দের বহির্বাসনের সপক্ষে তাঁর কণ্ঠস্বর নির্ভীকভাবে উত্থিত হয়েছিল। গ্রামের শহরায়ণ ধারণাটি প্রকাশ করার জন্য তিনি শেষোক্ত গ্রন্থে 'rurbanisation' নামক একটি অভিনব ইংরেজি শব্দ উদ্ভাবন করেছিলেন।

বিশ্ব জনবিদ্যায় (World Demography) ও ভারতীয় জনবিদ্যায় তাঁর অবদান স্বীকৃত। জনসংখ্যা ও খাদ্য সরবরাহের সামঞ্জস্য ছিল তাঁর চোখে জগতের ও ভারতের এক প্রধানতম সমস্যা। এই সমস্যার বিশ্লেষণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিচয় তাঁর বহু লেখায় (যেমন Food

Planning for Four Hundred Millions) পাওয়া যায়। The Foundations of Indian Economics গ্রন্থে তিনি ভারতীয় অর্থনীতি-বিদ্যাকে এক নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক শিল্পায়নকে অবশ্যম্ভাবী জেনেও তার অমঙ্গল থেকে ভারতকে বাঁচানোর জন্য তাঁর ব্যাকুলতা গান্ধীজীর চিন্তাধারাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর The Land Problems of India ভারতের ভূস্বত্ব ও ভূমিসমস্যা সম্বন্ধে স্মরণীয় গ্রন্থ। ভারতের কৃষিবিপ্লব সংক্রান্ত আলোচনায় সকল মার্কসীয় মনস্বীই এই গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তিনি যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, "ভারতে ভূমিহীন মজুরশ্রেণীর বৃদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত গণতন্ত্র খাপ খায় না।" জাতীয় কংগ্রেসের 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির' ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনায় ও নির্দেশনায় তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। ভারতে প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে বিরোধ ও অসাম্য সম্বন্ধে তাঁর সতর্কবাণী তাঁর বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদৃষ্টির পরিচায়ক। শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর The Indian Working Class নামক প্রামাণিক গ্রন্থের দ্বারা ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন উপকৃত হয়েছে।

সাহিত্যের প্রতিও তাঁর মনের আকর্ষণ ছিল। তিনি ৭৩ বৎসর 'উপাসনা' ও 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন এবং সাহিত্যের শিল্প ও আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি দিকপালদের বিসংবাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য' নামে একটি পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর 'দারিদ্রের ক্রন্দন' ও 'শাশ্বত ভিখারী', এই দুটি বাঙলা বই এককালে বহুপঠিত ছিল। বাঙলা দেশে 'প্রলেটারীয় সাহিত্যের' অভ্যুদয়কে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। দুঃখক্লিষ্ট, নিপীড়িত মানবের ভিতরেই তিনি তাঁর দেবতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং 'সোনিয়ার পদতলে প্রণতি'-র মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন সেই দেবতার কাছে শিল্পীর আত্ম-নিবেদনের দিব্যালেখ্য।

অল্প বয়সে তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং সেই মহামনীষীর প্রভাব তাঁর Democracies of the East, Principles of Comparative Economics প্রভৃতি গ্রন্থে সুস্পষ্ট। ছাত্রজীবনেই তিনি মেছুয়াবাজার বস্তিবাসীদের মধ্যে নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন এবং অন্যান্যপ্রকার বিদ্যাচর্চার ফাঁকে ফাঁকে এই ধরনের কাজে পঁয়তাল্লিশ বৎসর

ধরে নিত ছিলেন। বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করার কালে তাঁর বাবা পরিচালিত নৈশ ও বয়স্ক বিদ্যায়তনগুলিকে 'সন্ত্রাসবাদীদের কর্মকেন্দ্র' রূপে সন্দেহ করে ইংরেজ সরকারের পুলিশ ভেঙে তছনচ করে দেয়।

নিরপেক্ষতা ও নৈঃশব্দ্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মানবের সাযুজ্যসাধন করে, এই মিস্টিক মতবাদ পোষণ করেও রাধাকমল জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সামাজিক কর্তব্যপালন থেকে কখনও বিরত থাকে নি। লখনৌয়ে উত্তর প্রদেশের ললিত কলা অকাদেমীর এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ২৪শে আগষ্ট ১৯৬৮ তাঁর জীবনাবসান ঘটে। এই কিঞ্চিৎ অতীতমুখী আবার অত্যন্ত আধুনিক, বিজ্ঞানী, মানবপ্রেমিক, সত্যই অসাধারণ মানুষটির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

নরেশ মিত্র

প্রখ্যাত নট এবং নাট্য ও চিত্র পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্রর মৃত্যু (গত ২৫ শে সেপ্টেম্বর) শুধু শোক নয়, একটি সশ্রদ্ধ বিস্ময়বহ ঘটনা। কী অদম্য প্রাণশক্তি ও শিল্পনিষ্ঠার অধিকারী হলে ৮১ বৎসর বয়স পর্যন্ত একজন শিল্পী এমন অক্লান্ত উদ্যমে নিজের আরব্ধ কর্মে তন্নিষ্ঠ থাকতে পারেন, ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। মৃত্যুর দু'দিন পূর্বেও তিনি যাত্রামঞ্চে, যাত্রার মত একটি উচ্চগ্রামের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে গেছেন।

যে যুগে তিনি অভিনেতা হিসেবে মঞ্চে যোগদান করেন, নাট্যজগৎ সম্পর্কে সে যুগের অশ্রদ্ধা ও অনীহা সর্বজন বিদিত। কিন্তু সেদিনের উচ্চ শিক্ষিত ও বনেদী পরিবারের যুবক নরেশচন্দ্র অভিনয়কে শিল্প হিসেবে ভালোবেসে সমস্ত বিরূপতা ও প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করেই অভিনয় জগতে প্রবেশ করেছিলেন। এবং আমৃত্যু সেই শিল্পের অনলস সাধক হিসেবেই স্বস্থানে স্থিত ছিলেন।

নাট্যজগতে তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। শুধুমাত্র অভিনেতা নয়, সুযোগ্য এবং দক্ষ নাট্যপরিচালক হিসেবেও তাঁর অবদান আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। নাট্য ও চিত্র জগতের বহু সার্থক শিল্পীর স্রষ্টা হিসেবেও তাঁর নাম উল্লেখ্য। রচনাক্ষেত্রেও যে তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের নাট্যরূপ। যে নাট্যরূপ দেখে তৃপ্ত রবীন্দ্রনাথ নরেশচন্দ্রকে তাঁর ছোটগল্পগুলোর নাট্যরূপ দেবার জন্য সানন্দ অনুমতি দিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্র ক্ষেত্রেও নরেশচন্দ্র আজ একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। যখ যখন চলচ্চিত্রকে কিছুটা অন্ত্যজ জ্ঞানে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখত, সেই নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রকে একটি শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন তিনি এবং সাগ্রহে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। চলচ্চিত্র ক্ষেত্রেও সেদিনের, নির্বাক যুগের সেই 'দেবদাস' থেকে শুরু করে সর্বশেষ সবাক 'উল্কা' পর্যন্ত—বিভিন্ন রসের বহুবিধ চিত্রসম্ভারের মাধ্যমে নরেশচন্দ্র দর্শক মনে নিজের স্থান স্থায়ী করে নিয়েছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র— অন্নপূর্ণার মন্দির।'

বয়স বিচারে নরেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়তো তেমন শোকাবহ নয়, কিন্তু নাট্য জগতে তাঁর অবদান, অদম্য প্রাণশক্তি ও নিষ্ঠার কথা স্মরণে রেখে তাঁর মৃত্যুকে বাঙলা নাট্য জগতের একটি অপূরণীয় ক্ষতি বলে মানতেই হবে।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য জগতের একটি সাম্প্রতিক শোক, কথাশিল্পী স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু।

মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে দুরারোগ্য ব্রেনক্যানসার রোগে গত ১৯ আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

অখণ্ড সাহিত্য সাধক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকদের জন্য রেখে গিয়েছেন প্রচুর ছোট গল্প, প্রায় পঁচিশটি উপন্যাস এবং সাহিত্য নিষ্ঠার উজ্জ্বল উদাহরণ। রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অক্লান্ত এবং একনিষ্ঠ। শেষ দিকে, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার আশঙ্কা উপেক্ষা করেও, তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সাহিত্য সাধনায় অর্পণ করার জন্য দীর্ঘদিনের চাকুরিটি ছেড়ে দিয়ে যে মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সশ্রদ্ধ স্মরণীয়। বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদান, সাহিত্যমান বা খ্যাতির তুলনামূলক ও বিতর্কিত প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমরা ধ্যান জ্ঞান ও কর্মে সম্পূর্ণ শিল্পসমর্পিত তপ্রাণ একজন সাহিত্য-সাধককে হারালাম।

মিহির সেন

'পরিচয়ের' অকৃত্রিম সুহৃদ, বিশিষ্ট বুদ্ধিবাদী ও সাংবাদিক সরোজ আচার্য মহাশয় গত ১৯শে অক্টোবর লোকান্তরিত হয়েছেন। 'পরিচয়ের' পক্ষ থেকে আমরা শোক প্রকাশ করছি। তাঁর স্বজন বান্ধব ও পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

সম্পাদক-পরিচয়

উত্তর বাঙলাকে বাঁচান

মেদিনীপুরের বন্যার জল তখনো সম্পূর্ণ নামেনি। গ্রামে গ্রামে তখনো হাহাকার, ক্ষুধা আর রাজ্যপালের আমলাতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা। শারদীয় পূজার বিসর্জনের ঢাকের রেশ মেলাতে না মেলাতেই গর্জে উঠলো পাহাড়ের ধস, নেমে এলো উত্তর বাঙলায় প্লাবন, মৃত্যু আর সর্বনাশ। রাজ্যপালের শাসনে কৈফিয়তের দায় থেকে মুক্ত নিরঙ্কুশ আমলাতন্ত্র আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে সাধারণ মনুষ্যত্ব ও দায়িত্ববোধের অভাব আছে এই রাজ্যপালতন্ত্রের। প্লাবনের পূর্বসংবাদ জানিয়ে দিলে বাঁচতো জলপাইগুড়ির সহস্র সহস্র প্রাণ ও সম্পদ, বাঁচতো গ্রাম জনপদের দরিদ্র কৃষকের প্রাণ ও জীবন ধারণের যৎকিঞ্চিৎ সামগ্রী।—বাঙলা দেশে জনপ্রিয় শাসনকে কৌশলে অপসারণ করে, বে-আইনী চণ্ডরাজ ও পরে রাজ্যপালের দণ্ডশাসন আমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে এ কোন সর্বগ্রাসী অনিশ্চিতি, অসহায়তা, ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে! দেখছি, বন্যার পরেও ত্রাণ পুনর্বাসণ প্রভৃতির ছদ্মবেশে কেন্দ্রীয় শাসকদের পক্ষপুটাশ্রয়ী গোষ্ঠির স্বার্থে দলবাজী। উপপ্রধানমন্ত্রী জলপাইগুড়ির বিপন্ন, ত্রস্ত, ক্রুদ্ধ, ও অসহায় মানুষের মুখের উপর ছুঁড়ে দিলেন তাচ্ছিল্য। প্রধানমন্ত্রীর চোখের সামনে, জলোচ্ছ্বাসের দাঁত থেকে কোনক্রমে বেঁচে ফিরে আসা শ্মশানপুরী জলপাইগুড়িতে সর্বহারা ও শোকার্ত মানুষের মাথা ভাঙলো রাজ্যপালের লাঠি। আমাদের ঘৃণা জানাবার ভাষা নেই।

আমলাতন্ত্রী টালবাহানার সময় সঙ্কোচে আজ মনে পড়ে যায় স্বল্পস্থায়ী যুক্তফ্রন্টের শাসনে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার খরাত্রাণে জনপ্রিয় সরকারের অকুতোভয় আপ্রাণ নিষ্ঠা। বন্যানিরোধের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের সেচদপ্তরের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকটে অবিলম্বে কাজ শুরু করতে বিশ কোটি টাকা দাবি করা হয়-যে পরিকল্পনা কার্যকরী হলে মেদিনীপুর, উত্তর বঙ্গের প্লাবন অনেকখানি প্রতিরোধ করা যেতো। কেন্দ্রীয় সরকার, এবং পূর্বের কংগ্রেসী সরকার যদি ব্যাপ্ত পরিকল্পনাকে আগেই কাজে পরিণত করতেন, নেমে আসতোনা এই ধ্বংস, এই বিনাশ।

কেন এমন হয়, মেদিনীপুরে যখন বন্যা, সেখানে সেচখালে প্লাবিত ক'রে রুদ্রজলস্রোতের তাণ্ডব, ঠিক তখনই বর্ধমান-হুগলী জেলার জলহীন শুকনো সেচখালের মাটি ফুটিফাটা, মাঠের ধান আতঙ্কে পাণ্ডুর! কেন এমন হয়—উত্তর

বাঙলার যে বৃষ্টিপাত বন্যার করালগ্রাসের স্রষ্টা, সেই একই সময়ে সেই একই মেঘবিস্তারের বৃষ্টিপাতে নতুন জীবনে জেগে ওঠে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম-বর্ধমান-হুগলীর শস্যক্ষেত্র! এই দু-রকম ঘটনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী সেচের ও প্লাবননিরোধের অব্যবস্থাই দায়ী—আমরা জানি। এখন পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী ব্যাপক সেচ পরিকল্পনার মাস্টার প্ল্যান অবিলম্বে চালু করতে হবে, পুনর্মূল্যায়ণ করতে হবে ইতিমধ্যে কার্যকরী করা প্রকল্পগুলিও।

উত্তর বাঙলার মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমলাতন্ত্র নয়, বাঁচাবে সাধারণ মানুষ। ভুলিনি, শিলিগুড়ির মানুষের অকৃপণ সেবা, আতিথ্য ও সহায়তা জলপাইগুড়িতে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিল। শস্যহীন মাঠ,—গবাদি পশু, বীজধান ও অর্থে সর্বস্বান্ত উত্তরবঙ্গের চাষী—আচ্ছাদনহীন কর্দমাক্ত মৃত্তিকায় শূন্য চোখে দেখছে ভবিষ্যৎ। শিশুর মুখে এক ফোঁটা দুধ যোগান দেবার গাভীটিও কেড়ে নিয়ে গেছে প্লাবন। যেখানে গ্রামছিল, জনপদ ছিল—সেখানে রাক্ষসী তিস্তার নতুনখাত। নিমজ্জিত শহরে মহামারীর আতঙ্কের সঙ্গে দেখা দিয়েছে পরিজন ও সর্বস্ব হারানো মানুষের অসহায়তার উন্মত্ততার চিহ্ন। বস্ত্রহীন, আচ্ছাদনহীন মানুষের উপর নেমে এসেছে হিমালয়ের হিম হাওয়া, দুরন্ত শীত। পাথরচাপা হয়ে এখনো ছটফট করছে ধস-নামা জনপদের জীবিতের দল। কেন্দ্রীয় সরকারের বকলম রাজ্যপালের অপদার্থ শাসনে মৃত্যুদূতরূপী আমলাতন্ত্রের অবহেলার বোবা প্রত্যুত্তর দেবে এদেশের মানুষ। ঔষধ, খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ এবং ছাত্রদের জন্য পুস্তকাদির সহায়তা দিয়ে জীবনে পুনপ্রতিষ্ঠিত করে দেবার ব্রত নিতে হবে পশ্চিম বাঙলার সকল মানুষকে। আমরা দাবি করি অপরাধী আমলাতন্ত্রীদের উদাহরণমূলক শাস্তি, লালফিতার অপদার্থতার মূর্ত প্রতীক রাজ্যপালের অপসারণ এবং সমস্ত ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত। দাবি করি, কেন্দ্রীয় সরকারের অকৃপণ ও সৎ সহায়তা। আর আকাঙ্ক্ষা করি মানুষের জয়ের—প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, আমলাতন্ত্রের হৃদয়হীনতা, অপশাসন, জড়িমা ও অমানুষতার বিরুদ্ধে। আকাঙ্ক্ষা করি জনপ্রিয় শাসনের দ্রুত পুনঃপ্রবর্তন।

ফল : লেচিফল

পরিচয়

বর্ষ ৩৮ ॥ সংখ্যা ৪-৫
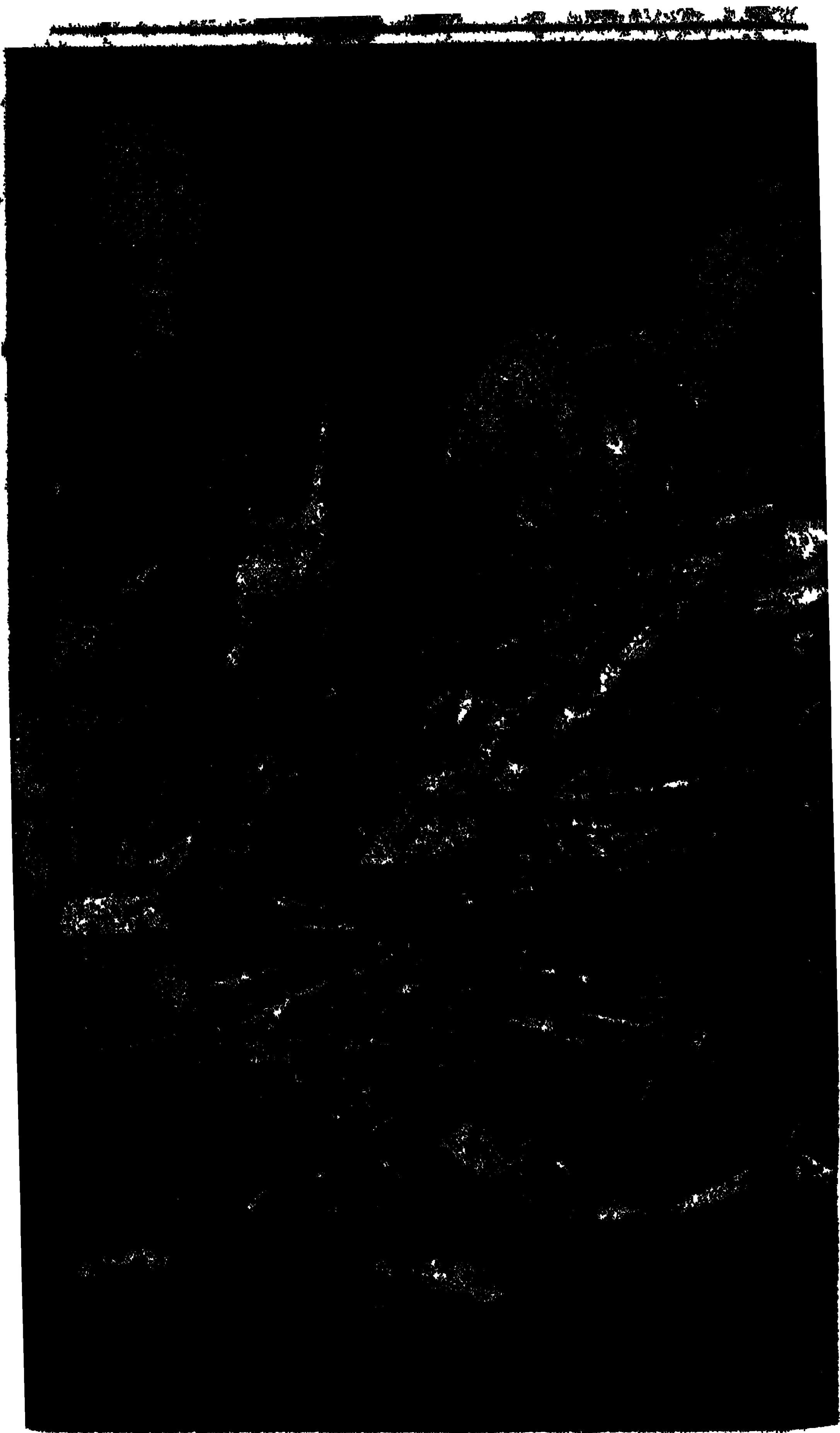
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ॥ ১৩৭৫

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

তুর্গেনেভ্ : জীবন-সাহিত্য। গুণময় দাস ৪৯১ ॥ জেলখানার চিঠি। রোজা লুকসেমবুর্গ ৫০৯ ॥ ভারতীয় বিজ্ঞানের ধারা। শঙ্কর চক্রবর্তী ৫৪৩ ॥ সরোজ আচার্য। গোপাল হালদার ৫৫৭ ॥ বন্যার জল নেমে গেলে। চিন্মোহন সেহানবীশ ৫৮৫

গল্প

বিজয়ী প্রেমের গান। ইভান তুর্গেনেভ ৫০৫ ॥ অক্ষক্রীড়ায় ক্যাবিনেট মিশন ও ভাঙা বাঙলার বুলা। জ্যোৎস্নাময় ঘোষ ৫০৮

কবিতা

ভিয়েন ফুয়ং ৫২৮। দক্ষিণারঞ্জন বসু ৫২৯। চিত্তরঞ্জন পাল ৫৩০। প্রফুল্লকুমার দত্ত ৫৩১। শুভাশিস্ গোস্বামী ৫৩২। কালীকৃষ্ণ গুহ ৫৩৩। রবীন সুর ৫৩৪। দীপেন রায় ৫৩৫। অমিতাভ চক্রবর্তী ৫৩৬। শুভ বসু ৫৩৭। জ্যোতীষ কর্ণী ৫৩৮

ভারত-সাহিত্য-পরিক্রমা

অরুণ সেন ৫৬২। অমলেন্দু চক্রবর্তী ৫৬৯। অমিতাভ দাশগুপ্ত ৫৭৭

পুস্তক-পরিচয়

সুবোধ দাশগুপ্ত ৫৯৩

চিত্র-প্রসঙ্গ

চিত্রযোধী ৬০০

চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গ

পরিমল মুখোপাধ্যায় ৬০৩

নাট্য-প্রসঙ্গ

কান্তি সেন। ৬০৮

সঙ্গীত-প্রসঙ্গ

প্রবোধ মুখোপাধ্যায়। ৬১১

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

তরুণ সান্যাল। ৬১৬

বিবিধ-প্রসঙ্গ

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। চাবাক সেন। ধনঞ্জয় দাশ। গৌতম সান্যাল। অনিমেষ পাল। শান্তিময় রায়। ৬১৯-৬৩৭

বিয়োগপঞ্জী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গোপাল হালদার। ৬৩৮-৬৩৯

পাঠকগোষ্ঠী

ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী। চিন্মোহন সেহানবীশ। ৬৪০-৬৪৩

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদপট

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

তুর্গিয়েনেফ্ : জীবন-সাহিত্য

১৮১৮—১৮৮৩

গুণময় দাস

"আমার জীবনই আমার সাহিত্য।"—তুর্গিয়েনেফ্

যে সমস্ত প্রতিভাধর সাহিত্যিকের রচনাসম্ভারে রুশ জাতীয় সংস্কৃতির গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন তুর্গিয়েনেফ্। লেনিন এঁকে "স্বনামধন্য রুশ লেখক" বলে অভিহিত করেছেন।

সামন্ত-ভূমিদাস প্রথা থেকে বুর্জোয়া-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে এক বিরাট পটপরিবর্তন হল, সেই এক সমগ্র ঐতিহাসিক যুগের রুশ জনজীবনের সার্থক প্রতিফলন দেখা যায় তুর্গিয়েনেফ্-এর রচনায়। এই বিরাট শিল্পী-রিয়ালিস্ট রুশ সমাজ-আন্দোলনের যে সব উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন তাদের সকারকাল উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল 'ছাত্র-চক্র' থেকে সুরু করে ১৮৭৪-'৭৬ খৃষ্টাব্দের 'জনগণের কাছে যাও' আন্দোলনের সময় পর্যন্ত।

গভীর স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন তুর্গিয়েনেফ্ এবং তারই উদ্দেশে পরিপূর্ণ-রূপে নিয়োজিত করেছিলেন আপন শিল্পক্ষমতাকে। তিনি বলতেন, "স্বদেশ ছাড়া সুখ নেই, স্বদেশের মাটিতে সকলে শিকড় চালিয়ে দাও।" ভূমিদাস প্রথার প্রতি তাঁর তীব্র বৈরভাব, জনগণের আবশ্যকীয় যা কিছুর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রাশিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ারের সঙ্গে তুর্গিয়েনেফ্-প্রতিভার বিকাশ নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত। তৎকালীন গণতন্ত্রী নেতা ও সাহিত্যকার বিলিন্স্কি, গিয়ের্ৎসেন, হার্ৎসেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মুখপত্র 'সাভরিমিয়েন্নিক'-এর ('সমসাময়িক') সাথে যুক্ত থাকাকালীন বছরগুলোতেই তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট রচনার সৃষ্টি।

নতুন যা কিছু সম্পর্কে গভীর চেতনা, সমসাময়িককালের জীবনে জীবন যোগ, এ সবই লেখক তুর্গিয়েনেফ্-এর বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে দাব্রালুবোফ্-এর মন্তব্য স্মরণীয় "সমাজচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট নতুন নতুন চাহিদা, নতুন নতুন ধ্যানধারণাকে তিনি দ্রুত অনুধাবন করতে পারতেন এবং তাঁর রচনার মাধ্যমে সাধারণতঃ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন (অবশ্য তৎকালীন পরিস্থিতি যতটা তাঁকে অনুমোদন করত) সেই সমস্ত প্রশ্নের প্রতি যেগুলো অনতি-বিলম্বে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, এবং যেগুলো ইতিমধ্যেই সমাজকে অনবরত উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।"

তুর্গিয়েনেফ্-এর রচনা স্বদেশপ্রীতির জারকরসে সিঞ্চিত, উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও জ্ঞানালোকিত ধ্যান-ধারণায় মণ্ডিত। সাল্তীকোফ্-শ্চেদ্রিণ লিখেছেন,—"নেক্রাসফ, বিলিন্স্কি এবং দাব্রালুবোফ্-এর সাহিত্যকর্মের সমান্তরালে তুর্গিয়েনেফ-এর সাহিত্যকর্মও আমাদের জনসমাজের পক্ষে একটা নেতৃত্বমূলক তাৎপর্য বহণ করে।"

জীবনের একটা প্রগতিশীল ও পজিটিভ বুনিয়াদের অনুসন্ধান করতে এবং তারই আলেখ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরতে তুর্গিয়েনেফ সদা উদ্‌গ্রীব থাকতেন, তাঁর সৃষ্ট পজিটিভ্ চরিত্রগুলির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমাজের প্রগতিকামী শক্তি-গুলিকে সরাসরি প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করে তুলত।

পুশ্কিন্ ও গোগোলের মহান ঐতিহ্যানুসারী, রুশ বাস্তববাদী উপন্যাস রচনাকারদের অন্যতম, অসাধারণ কথাশিল্পী তুর্গিয়েনেফ্ রুশ তথা বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন।

তুর্গিয়েনেফ-এর দেশ ও কাল

১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে "পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের পর রুশ জনসাধারণের মনে ভূমিদাসপ্রথার কলঙ্কমুক্তির স্পৃহা দুর্বার হয়ে উঠল, কিন্তু জার ও জমিদারশ্রেণীর একথা হজম হল না। তারা ভূমিদাস প্রথাকে পূর্বের মত জিইয়ে রাখল। যে মানুষগুলো কয়েকদিন আগে স্বদেশের জন্যে বুকের রক্ত ঢেলেছে তাদের গরু-ভেড়া-ছাগলের মত বেচা-কেনা, নৃশংস অত্যাচারে জর্জরিত করা বা সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো পূর্বের মতই চলতে লাগল। সারা দেশজুড়ে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হয়ে উঠল। যুদ্ধোত্তরকালে জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম আরও ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। এর আগে অবশ্য রাশিয়ার মাটিতে তিন-তিনটে বেশ বড়-সড় কৃষক বিদ্রোহ

হয়ে গেছে। আর প্রতিবারেই জারের সৈন্যদামন্ত দুর্বল অসংগঠিত পরিকল্পনাহীন এইসব কৃষকবিদ্রোহকে নিষ্ঠুরভাবে দলিত মথিত করে দমন করেছে।

এবারে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার লড়াইয়ে অংশীদার হলেন অভিজাত যুব সমাজের উদারহৃদয় প্রগতিকামী এক অংশ। ভূমিদাসত্ব ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পে তাঁরা জীবন পণ করলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে (দিকাবর) অভিজাত বিদ্রোহীদের গোপন সংস্থার উদ্যোগে জারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন 'দিকাব্রিস্ত্'রা। 'দিকাব্রিস্ত'রা পরাজিত হলেন। পাঁচজন 'দিকাব্রিস্ত'-এর ফাঁসি হল। অন্যান্যদের কাউকে পাঠানো হল সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে, কাউকে ককেশাসের যুদ্ধে সৈন্যহিসেবে। 'দিকাব্রিস্ত্'রা কিন্তু ছিলেন সম্ভ্রান্তবংশীয়, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে। জনগণের শক্তির উপর আস্থা না রেখে তাঁরা চেয়েছিলেন জনগণের জন্যে অথচ জনগণকে বাদ দিয়েই—সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাসনকর্তৃত্বের পরিবর্তন।

এরপরে শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কৃষকের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এলেন বিদ্রোহকামী গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা। এঁরা হলেন 'রাজনোচিনেৎস্' অর্থাৎ কর্মচারী, বণিক, যাজক, কৃষক, ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত প্রভৃতি নানা পরিবারের লোক। 'দিকাব্রিস্ত'দের থেকে এদের ধ্যান-ধারণা ছিল অনেক বেশি দূরপ্রসারী। এঁদের ধারণায় জনসাধারণের শক্তিই হল আসল হাতিয়ার যা দিয়ে বিপ্লব সফল হবে, স্বৈরতন্ত্র ও ভূমিদাসত্বের হবে বিলোপসাধন, কিন্তু এঁরা ছিলেন অসম্ভব কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রী, এঁরা ভাবতেন, রাশিয়ায় ধনতন্ত্র আসবে না, সামন্ততন্ত্রের পরেই আসবে সমাজতন্ত্র।

এমনকি শতাব্দীর ষষ্ঠদশকেও গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা ভাবতেন, কৃষকেরা বিপ্লব ঘটিয়ে দেশে সমাজতন্ত্র স্থাপন করবেন। তাঁরা তখনও রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর উৎপত্তি কল্পনা করতে পারেননি। রাশিয়ায় তখন ধনতন্ত্র সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাই তাঁরা তখন বুঝে উঠতে পারননি যে, কেবল শ্রমিকনেতৃত্বেই এবং শ্রমিকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েই কৃষকদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

যা হোক, সারা দেশজুড়ে যখন কৃষকবিদ্রোহ ভয়ঙ্কর রূপ নিল (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১২৬ জায়গায় কৃষক বিদ্রোহ ঘটে) তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল জার ও জমিদার শ্রেণী। তারা স্থির করল, আর দেরি করা নয়, 'নিচের তলা থেকে' ভূমিদাসরা কবে নিজেদের মুক্তি অর্জন করবে সেই প্রতীক্ষায় না থেকে

'ওপর তলা থেকে' ওদের বন্ধন মুক্তিতে প্রয়াসী হওয়া দরকার। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বৃহৎ সংস্কার-এর নামে ভূমিদাসপ্রথার অবসান হল।

কিন্তু কি হল তাতে? ভূমিদাসের মুক্তিপত্র স্বহস্তে রচনা করেছে জমিদার নিজের সুবিধামত করে। এ সংস্কারের মাধ্যমে তাই ভূমিসমস্যার সমাধান হলনা। ফলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দেই রাশিয়ার সতেরোশ'রও বেশি জায়গায় কৃষক বিদ্রোহ ঘটে।

শতাব্দীর সপ্ত দশকের বিদ্রোহকামী বুদ্ধিজীবীরা স্থির করলেন, গ্রাম জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে তাদের সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা শোনাতে হবে, জারের স্বৈরতন্ত্র ও জমিদারের ভূমিগ্রাসের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষুব্ধ করে তুলতে হবে। এইসব 'নারোদনিক' বা 'জনবাদী' ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে কৃষকের পোষাক এঁটে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু কৃষকজনতা এঁদের কথা বুঝতে পারলনা। অশিক্ষিত, নিঃস্ব গ্রাম্য চাষা-ভুষোরা বিশ্বাস করত, জার খুব ভালোমানুষ, আর সেজন্যই তিনি ওদের দুঃস্থ জীবনের কথা কিছুই জানেন না। সহজেই শত শত 'নারোদনিক'কে গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা গেল।

বিদ্রোহীরা কিন্তু এতে দমলেননা। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁরা 'জমি ও মুক্তি' ('জেম্‌লিয়া ই ভোলিয়া') নাম দিয়ে এক বেআইনী সংঘ গড়লেন। সংঘের সদস্যরা পুনরায় গেলেন কৃষক জনতার কাছে, শিক্ষক বা ডাক্তারের ছদ্মবেশে গাঁয়ে গাঁয়ে কাজ করে বেড়ালেন, আসল উদ্দেশ্য বিদ্রোহের আগুন ছড়ানো। কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হয়না। তখন এঁদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ সন্ত্রাসবাদের পথ ধরলেন। তাঁদের ধারণা, জার বা রাজপুরুষদের হত্যা করলেই দেশে বিপ্লব সুরু হয়ে যাবে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 'গণমুক্তি' ('নারোদনায়া ভোলিয়া') নামে সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সংঘ গঠিত হল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সন্ত্রাসবাদীরা জার দ্বিতীয় আলেক্‌সান্দারকে হত্যা করলেন। বিপ্লব তো হলই না, বরং প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল, গ্রেপ্তার ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন নেতৃস্থানীয়রা, সংঘ ভেঙে গেল।

তুর্গিয়েনেফ্‌-এর জীবনকালে (১৮১৮-১৮৮৩) এসব ঘটনা ঘটেছে একটার পর একটা।

বাল্যকাল:

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আরিওল শহরের অনতিদূরে

স্পাস্কয়ে-লুতাভিনাভো গ্রামে এক অগাধ সম্পত্তিশালী অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ইভান্ সির্গিয়েইভিচ্ তুর্গিয়েনেফ্।

তুর্গিয়েনেফ্-এর বাবা-মা ছিলেন বিরাট ধনী জমিদার। এঁদের অধীনে ছিল পাঁচহাজার ভূমিদাস চাষী। জমিদারের খামার বাড়িতে শুধু চাকরের সংখ্যাই ছিল চল্লিশ। জমিদারনী ভার্ভারা পেত্রোভনা-র (তুর্গিয়েনেফ্-এর মা) বর্বর অত্যাচারের কথা আশপাশের লোকেদের ভালোকরেই জানা ছিল। ভূমিদাসদের জন্যে তিনি যে সব ভয়ঙ্কর গা-শিউরে-ওঠা নিত্য নতুন নির্যাতনকৌশল উদ্ভাবন করতেন, তার কাহিনী লোকের মুখে মুখে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু ভূমিদাস নয়, আপন সন্তানদের প্রতিও তাঁর নিষ্ঠুরতা কম ছিলনা। প্রায় রোজই তুচ্ছ কথায় বিনা বিচারে তিনি বেত মারতে সুরু করতেন ছেলে ইভান্‌কে। ইভানের শত কাকুতি-মিনতিতে কর্ণপাত করতেন না। এক সময় গৃহশিক্ষকের দৃঢ় হস্তক্ষেপের ফলেই বালক তুর্গিয়েনেফ্ এই প্রাত্যহিক পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা কিন্তু স্বেচ্ছাচারিণী, খুঁতখুঁতেস্বভাবা, প্রভুত্বলোভী মহিলা ছিলেন তুর্গিয়েনেফ-এর মা। তাঁরই বিষাদখিন্ন বার্ধক্যের প্রতিরূপ তুর্গিয়েনেফ অঙ্কিত করেছেন কতকগুলি গল্পে ('মুমু', 'প্রেম প্রেম' 'জমিদারের ব্যক্তিগত কাছারি, 'স্তেপের রাজা লীয়র' 'পুনিন্ ও বাবুরিন্')। তুর্গিয়েনেফ-এর পিতাও ছিলেন তেমনি—প্রণয় বিলাসে দক্ষ ও দর্পিত অভিজাত জমিদার। আত্ম-জীবনচরিতমূলক গল্প 'প্রথম প্রেম'-এ তুর্গিয়েনেফ পিতার চরিত্রচিত্রণ করেছেন।

আপন গৃহে ঐরকম জীবন ইভান্-এর শিশুমনে এক কঠোর ছাপ ফেলেছিল, আর সেই থেকেই গড়ে উঠেছিল কৃষকের উপর জমিদারের প্রভুত্বের প্রতি বিরাগ, আর ভূমিদাস প্রথার প্রতি প্রবল বৈরভাব। বালক ইভান যখন তখন দৌড়ে পালাতো বাড়ির বাগানের টেনিস কোর্টের দিকে আর দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে চোখের জল ফেলতো। আর এইসব হতভাগ্য মানুষকে কি ভাবে সাহায্য করা যেতে পারে ভাবতে ভাবতে নিজের অক্ষমতার জ্বালায় জ্বলতো।

শুধু দরদ আর সমবেদনা নয়, অতিসাধারণ রুশ জনসমাজের অগাধ উদার ভালবাসার স্বাদ তিনি বাল্যজীবনে পেয়েছেন প্রাসাদরক্ষী এবং মায়ের সেক্রেটারী ফিওদর ইভানোভিচ লাবানোফ্-এর কাছে—যে তাঁকে ছোট-বেলায়

প্রাচীন রুশ কাব্যকাহিনী পড়ে শোনাতো। তার কথা ইভান্ সিরগিয়েইভিচ্ সারাজীবন বিস্মৃত হন নি। 'খুড়া' পারফিরি কুদ্রিয়াশোভ্ ছিল তাঁর ছেলেবেলাকার অকৃত্রিম সহচর। সরলমতি চাষা, অসাধারণ দক্ষ শিকারী ভীরন্দাজ আফানসির সঙ্গে তুর্গিয়েনেভ ছেলেবেলায় বহু জায়গায় শিকার করে বেড়িয়েছেন। চাষাদের মধ্যে আরও অসংখ্য বন্ধু ছিল তাঁর। সাধারণ রুশ জনসমাজের যত বেশি প্রতিভাধর মানুষের তিনি পরিচয় পেয়েছেন—ভূমিদাস প্রথার প্রতি তাঁর মনে তত বেশি দাউ দাউ করে বিদ্বেষাগ্নি জ্বলে উঠেছে।

যখন আরও বড় হলেন তখন তিনি ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামের শপথ নেন, এবং নিরলস সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন।

সুইস্ ও জার্মান গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে চলে তুর্গিয়েনেভ-এর বাল্য শিক্ষা। বাড়িতে ছিল প্রকাণ্ড লাইব্রেরী, তাতে ছিল বিশাল ফরাসী সাহিত্য সংগ্রহ। পিতৃগৃহে এইটিই ছিল তুর্গিয়েনেভ্-এর বড় আকর্ষণ।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে তুর্গিয়েনেভ-পরিবার উঠে আসে মস্কোতে। প্রথমে ব্যক্তিগত বোর্ডিং স্কুলে, পরে লাজারিয়েফস্কি ইনস্টিটিউটে বোর্ডিং-এ এবং তারপর গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করে মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তুর্গিয়েনেভ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। ওখানে এক বছর পড়ার পর চলে এলেন পিতেরবুর্গ (বর্তমান লেনিনগ্রাড) বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখানে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে দর্শন বিভাগে পাঠ শেষ করলেন।

ছাত্রজীবনের এই বছরগুলোতে যুবক তুর্গিয়েনেভ-এর প্রথম সাহিত্যানুরাগ গড়ে উঠতে থাকে। তিনি তখন কবিতা লিখছেন—শেক্সপীয়ার এবং বাইরণ অনুবাদ করছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ভূমিদাস প্রথার বিলোপ ছিল তাঁর মানস স্বপ্ন।

যৌবনকাল, বিদেশ ভ্রমণ ও সাহিত্য রচনায় প্রথম পর্ব

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তুর্গিয়েনেভ বিদেশভ্রমণে বেরোলেন। ঘুরে বেড়ালেন জার্মানী এবং ইতালীতে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়লেন ইতিহাস এবং দর্শন, বিশেষ করে হেগেলের দর্শন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরে এসে তিনি মস্কোয় বাস করতে লাগলেন। পিতেরবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে এম. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও লিখছেন আর মস্কোর সাহিত্য

চক্রগুলোতে বিপুল উদ্যোগে যাতায়াত করছেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ পরীক্ষায় পাশ করলেন, কিন্তু সাহিত্যানুরাগ পেল প্রাধান্য, তুর্গিয়েনেফ দর্শনের অধ্যাপক না হয়ে হলেন সাহিত্যসেবী। এই সময় বিলিন্‌স্কির কাছে তাঁর খুব যাতায়াত ছিল। বিলিন্‌স্কি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,—"অসাধারণ তীক্ষ্ণধী এই মানুষটি। সাধমিটিয়ে আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করতাম। ……এরকম মানুষের সঙ্গ খুবই ভাল লাগে, এঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী যে-কোন লোকের টনক নড়িয়ে দেয়, সত্যালোকের স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়।"

তুর্গিয়েনেফ-এর সাহিত্যরচনার ,প্রথম পর্ব ১৮৩৪ থেকে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ। এই পর্বের শুরু নাট্য-কবিতা 'স্তেনো' দিয়ে এবং সমাপ্তি কবিতাকারে গল্প 'পারাশা'তে।

'পারাশা' কবিতার আগে পর্যন্ত তুর্গিয়েনেফ রোমান্টিকতায় পরিপ্লুত। রুশ শিল্পকলা ও সাহিত্য যে ইতিমধ্যেই বাস্তববাদে মোড় নিয়েছে এ ব্যাপারটা তাঁর কাছে তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। 'পারাশা'তে প্রথম দেখা গেল রোমান্টিক-বাদ থেকে তাঁর পশ্চাদপসরণ। গ্রাম্য জমিদারের জীবনযাত্রার ছবি আঁকতে গিয়ে এই কবিতায় তুর্গিয়েনেফ দেখান, অভিজাত পরিবারের নিস্ফল জীবনের গণ্ডীতে যৌবনকালের যত কিছু উৎকৃষ্ট ধ্যানধারণা, যত্ন, প্রয়াস, কি ভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। 'পারাশা'র কবির মধ্যে বিলিন্‌স্কি খুঁজে পেলেন 'অসাধারণ কাব্য প্রতিভা,' তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, ললিত সূক্ষ্ম শ্লেষ, দেখতে পেলেন তাঁর মানসপুত্রকে যে "তাঁরই সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা, তাঁরই যত কঠিন জিজ্ঞাসার গুরুভার অন্তরের অন্তঃস্থলে বয়ে বেড়াচ্ছে।" তবে একথা ঠিক যে, প্রথম দিককার এইসব রচনায় বিষয়বস্তুর মধ্যে বড়োরকমের কোন সমাজ-স্বার্থকে তুলে ধরা হয়নি, তখনও হাত পড়েনি ভূমিদাসত্বের যুগে রুশ জন-জীবনের মূল প্রশ্নগুলোর উপর। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে তুর্গিয়েনেফ-এর এই সময়কার কাহিনীগুলির সঙ্গে দস্তয়েভ্‌স্কির 'অভাজন' এর ('বিয়েদনীয়ে ল্যুদি' ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তুর্গিয়েনেফ এলেন বার্লিনে। ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন বিলিন্‌স্কি। দুজনে একসঙ্গে জার্মানী ঘুরে বেড়ালেন। এই বছরেই তুর্গিয়েনেফ এলেন প্যারিসে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের প্যারিসের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে তিনি ইউরোপীয় রাজনৈতিক ঘটনার বিরাট পরিমণ্ডলে

বাস করতে লাগলেন, প্যারিসে বসবাসকারী দেশত্যাগী গিয়ের্তসেন-এরও ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তুর্গিয়েনেফ রাশিয়ায় ফিরে এসে কখনও স্পাস্কয়ে, কখনও মস্কো, কখনও বা পিতেরবুর্গে বাস করতে লাগলেন। ঐ সময়ে 'সর্দারের বাড়িতে প্রাতরাশ' ('জাফ্ত্রাক উ প্রিদ্‌ভোদিথেল্যা'), 'অবিবাহিত' ('খালাস্তিয়াক্'), 'প্রাদেশিকা' ('প্রাভিন্‌ৎসিয়াল্‌কা'), 'যেখানে পাতলা, সেখানেই ছেঁড়ে' ('গ্‌দিয়ে তোঁন্‌কো, তাম ই র্ভিয়োৎসা') প্রভৃতি তাঁর লেখা নাটকগুলো বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হচ্ছে।

নির্বাসন, সাহিত্যখ্যাতি

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গোগোল মারা গেলেন। তুর্গিয়েনেফ তাঁর উদ্দেশে লিখলেন এক প্রবন্ধ। যখন পিতেরবুর্গের সেন্সর বিভাগ এ লেখা ছাপাবার অনুমতি দিলনা তখন তিনি লেখাটাকে পাঠালেন মস্কোয়, ওখানে 'মাস্‌কোফ্‌স্কিয়ে ভিদোমস্তি' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। এভাবে সেন্সরবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে তুর্গিয়েনেফ্‌কে গ্রেপ্তার করে তাঁর নিজের জমিদারী স্পাস্কয়েতে পাঠানো হয়। শাপে বর হল। নির্বাসনে থেকে 'শিকারীর ডায়েরি' ('জাপিস্‌কি আখোৎনিকা') নাম দিয়ে লিখে চললেন একটার পর একটা গল্প। পেলেন অজস্র সাহিত্যখ্যাতি। রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। নির্বাসনকাল চলল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে পর্যন্ত। কিন্তু পড়াশোনা, সাহিত্য সাধনা, সঙ্গীতচর্চা, দাবাখেলা, শিকার ও অতিথিসৎকারে তুর্গিয়েনেফ-এর ঐ নির্বাসিত গ্রাম্যজীবনের দারুণ নিঃসঙ্গতা রঙীন হয়ে উঠল।

ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে মুখর প্রতিবাদই হল 'শিকারীর ডায়েরি'র মর্মবাণী। রুশ কৃষককুলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাতদের সর্বপ্রকার কুৎসার মুখোস খুলে দিয়ে তুর্গিয়েনেফ দেখালেন, ভূমিদাস কৃষকদের মধ্যেও প্রতিভাধর, বুদ্ধিমান্ ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের অভাব নেই। একই সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন ভূমিদাস জীবনের নিঃস্ব, জীর্ণ, করাল চেহারা: দুর্ভিক্ষ, দৈন্য, অসহ্য গুরুভার জীবনযন্ত্রণায় ভুগছে মানুষগুলো। ইউদিনী গ্রামে কোচ্‌ওয়ান ইয়াকিয়েই একটুকরো রুটি খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হ'ল। মুখে দেওয়ার মত এতটুকুও খাবার পেল না, এমন কি একটা শশা বা এক গ্লাস

কৃভাস্ও (এক প্রকার সস্তা পানীয়) খুঁজে পেল না সে। তুর্গিয়েনেফ দেখিয়েছেন—অতি সামান্য ত্রুটির জন্যে, এমন কি অনেক সময় বিনাদোষেও গৃহভৃত্যদের বেত মারা হচ্ছে ('বুর্মিস্তর' ও 'দুই জমিদার' গল্পে), ভূমিদাসদের ব্যক্তিগত জীবনে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সর্বনাশা বঞ্চনার বোঝা ('এর্মোলাই ও যাঁতাকলের মালিক' গল্পে), তাদের ওপর এমনভাবে হুকিতম্বি করা হচ্ছে, যেন তারা মানুষ নয়, অবোলা প্রাণীবিশেষ ('ল্-গোফ' গল্পে) তুর্গিয়েনেফ-এর সুপরিচিত 'মুমু' কাহিনীতে (১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লেখা) 'শিকারীর ডায়েরি'র গল্পগুলোরই বিষয়বস্তু ও মর্মবাণী প্রতিফলিত হয়েছে।

নির্বাসন থেকে মুক্তি পেয়ে পিতেরবুর্গে ফিরে এলেন 'শিকারীর ডায়েরী'র খ্যাতনামা লেখক তুর্গিয়েনেফ। প্রকাশিত হতে লাগল 'মুমু', 'প্রশান্তি' ('স্নাতিশে') প্রভৃতি নতুন নতুন গল্প এবং উপন্যাস 'রুদিন'। তারপরেই ক্রমশঃ প্রকাশিত হল বিখ্যাত সব উপন্যাস—'বাবুদের বাসা' (দভারিয়ান্স্কোয়ে গ্নিজ্দো), 'পূর্বক্ষণে' ('নাকানুনিয়ে'), 'পিতা ও পুত্র' ('আৎসী ই দিয়েতি'), 'ধোঁয়া' ('দীম্'), 'অনাবাদী জমি' ('নোভ্') —যে গুলোর প্রত্যেকটি রুশ সাহিত্যজগতে এক একটা অভূতপূর্ব ঘটনার মতো।

'রুদিন' তুর্গিয়েনেফ-এর প্রথম উপন্যাস (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)। এই উপন্যাসে তাঁর মনোযোগ বিশেষ করে আকৃষ্ট হয়েছে অভিজাত সমাজের মানসিক ও নৈতিক জীবনের প্রতি। উপন্যাসের মুখ্য নায়ক রুদিন শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকের রুশ অভিজাত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এক আদর্শ প্রতিনিধি। রুদিন কিন্তু সমকালীন রুশ জনসমাজের পক্ষে একজন 'অবান্তর মানুষ'। জীবনে সে না পেল কোন স্বীকৃতি, না খুঁজে পেল কোন সঠিক কর্মপথ। কত না যন্ত্রণা পেয়ে পেয়ে শুধু খুঁজে খুঁজে বেড়াল। কিবা কর্মক্ষেত্রে কিবা প্রেমজীবনে, কোন কিছুতেই তার স্বপ্ন সফল হল না, হলনা কোনও জিজ্ঞাসা-পূরণ। তবে একজন উদ্যমী আর প্রচারকুশলী ব্যক্তি সে। স্বাধীনতা, আত্মোৎসর্গ, কর্মানুরাগ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে সে অপরকে মুগ্ধ করতে পারে, অন্তরে সাড়া জাগিয়ে তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে, বিশেষ করে যুবজনদের। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করার ক্ষমতা নেই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতি এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। কত কিছুর জন্যেই না সে যুঝল, সব কিছুই পর্যবসিত হল ব্যর্থতায়।

রুদিনের সঙ্গে তুর্গিয়েনেফ-এর মিল অনেক। তুর্গিয়েনেফ্ "রুদিনকে সৃষ্টি

করেছেন আপন প্রতিরূপ ও সাদৃশ্যের মালমশলায়," পিয়ের্তসেন-এর একথা অনর্থক নয়।

তুর্গিয়েনেফ্-এর দ্বিতীয় উপন্যাস 'বাবুদের বাসা' (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) এতবেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, তখনকার দিনে এই উপন্যাসটি না পড়াটা যে কোন লোকের পক্ষে একটা লজ্জার ব্যাপার ছিল। এই উপন্যাস ছাড়া রুশ সাহিত্যের আর কোথাও মুমূর্ষু অভিজাত সমাজের এমন শান্ত বিষন্ন ছবি অঙ্কিত হয় নি। উপন্যাসের নায়ক জমিদার লাভ্‌রিয়েৎস্কি জীবনের শেষ অঙ্কে নিজের উদ্দেশ্যেই বলছে, "স্বাগত নিঃসঙ্গ বার্ধক্য! অবান্তর জীবন, ধীরে ধীরে এবার নিভে যাও।"

'পূর্বক্ষণে' (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) তুর্গিয়েনেফ্-এর তৃতীয় উপন্যাস। ভূমিদাসপ্রথা অবসানের পূর্বক্ষণে এবং রাশিয়ায় বৈপ্লবিক পরিস্থিতি যখন ক্রমবর্ধমান এমন একটা সময়ে রুশ সমাজ-জীবনের একটা বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এবারে আদর্শবাদী কল্পনাবিলাসী নয়, প্রাণবন্ত কর্মতৎপর নতুন সব মানুষ উপন্যাসের পাত্রপাত্রী। উপন্যাসের নায়িকা, কেন্দ্রীয় চরিত্র ধনী অভিজাত পরিবারের কন্যা এলেনা স্তাখোভার হৃদয়হরণ করতে পারল না হবু অধ্যাপক বেরসেনেফ বা ভাস্কর শুবিন্-এর মত প্রতিভা-

সম্পন্ন রুশ যুবকেরা। এলেনা শেষে কিনা প্রেমনিবেদন করে বসল ইন্‌সারোফ্ নামে এক গরীব বিদেশীকে—একজন বুলগেরীয়কে, যার জীবনের একমাত্র মহান্ লক্ষ্য হল তুর্কী অত্যাচার থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করা। তারই মধ্যে সে দেখতে পেয়েছিল প্রাচীন অখণ্ড হৃদয়াবেগ আর গভীর মননশক্তির সমন্বয়। এলেনার তীব্র স্বাধীনতা-স্পৃহার সুযোগ্য পুরুষ হয়ে, সাধারণের স্বার্থের সংগ্রামে বীরোচিত কান্তির সৌন্দর্যে তাকে মুগ্ধ করে তার হৃদয় জয় করল ইন্‌সারোফ্। ইন্‌সারোফ্-এর প্রত্যক্ষ ও নির্ভীক লৌহবলের ভাষা প্রাপ্যকে সম্মান দেখিয়ে সরে দাঁড়াল শুবিন্ ও বেরসেনেফ্। এলেনার এই 'নির্বাচনের' মাধ্যমে বুঝিবা স্পষ্ট হয়ে উঠল রুশ জনজীবনের আকাঙ্ক্ষার কথা,…কি ধরণের মানুষের প্রতীক্ষায় তারা আছে।

ইন্‌সারোফ্-এর মৃত্যুর পর এলেনা ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন, স্বদেশভূমি ছেড়ে স্বামীর আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করার জন্যে চলে গেল বুলগেরিয়াতে।

'পূর্বক্ষণে' উপন্যাস সম্পর্কে এক প্রবন্ধে দাবরালুবোফ প্রশ্ন রাখলেন,

"কখন আসবে আমাদের সেই শুভ দিন ?"—সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন "রুশ ইন্সারোফ্"-এর সত্বর আবির্ভাবের এবং আসন্ন বিপ্লবের বার্তা।

'পূর্বক্ষণে' উপন্যাসের তুলনায় পরবর্তী উপন্যাস 'পিতা ও পুত্র'তে (১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) তুর্গিয়েনেফ্ রুশ দেশের বাস্তব পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলোর উপলব্ধি ও উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এক নতুন পদক্ষেপ করলেন। শতাব্দীর পঞ্চ দশকের শেষ দিকে রুশ জনজীবনে যে সব "নতুন মানুষ," "রুশ ইন্সারোফ্" দেখা দিল (প্রগতিপন্থী ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন চের্নীশেফ্স্কি, দাব্রালুবোফ্ ও পিসারিয়েফ্) তাদের আদর্শ প্রতিনিধি হল এই নতুন উপন্যাসের নায়ক। এই 'নতুন মানুষটির' প্রতি তুর্গিয়েনেফ-এর মনোভাব পুরোপুরি স্পষ্ট ছিল না : বাজারোফ্ ছিল তাঁর "শত্রু", অথচ তার প্রতি এক "অনিচ্ছাকৃত টান" তিনি অনুভব করতেন। এই উপন্যাস সম্পর্কে তুর্গিয়েনেফ্ লিখলেন, "অগ্রসর শ্রেণী হিসেবে অভিজাতদের বিরুদ্ধেই লেখা সমস্ত কাহিনীটা"। আরও লিখলেন, "এ হল অভিজাততন্ত্রের উপর গণতন্ত্রের জয়োৎসব।"

বাজারোফ্ হল 'নতুন মানুষ' 'নিহিলিষ্ট' (নেতিবাদী) এবং রাজদ্রোহী, রাজনোচিনেৎস (অনভিজাত বুদ্ধিজীবী), গণতন্ত্রী, তার ঠাকুর্দা মাঠে চাষ করত একথা সে গর্বের সঙ্গে বলে। বাবা গরীব ডাক্তার। বাজারোফ্-এর কাছে দলে দলে আসে সাধারণ মানুষ. তাদের কাছে সে হল নিজের ভাইয়ের মত। চেহারায়, পোষাকে-আশাকে, কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে বাজারোফ্ একজন মূর্তিমান্ ডিমোক্র্যাট রাজনোচিনেৎস্। তার অসাধারণ কর্মাসক্তি, প্রখর বুদ্ধি, সে স্থির প্রতিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ। সে নাস্তিক, বিজ্ঞানভক্ত, বস্তুবাদে বিশ্বাসী।

'পিতা ও পুত্র' উপন্যাসের মত তুর্গিয়েনেফ্-এর আর কোনও রচনাকে কেন্দ্র করে এত বেশি তীব্র বাদানুবাদ হয়নি। লেখক নিজেই লক্ষ্য করেছেন, "এই উপন্যাস যেন আগুনে ঘি ঢালল"। আর বাস্তবিকই তো এক চরম রাজনৈতিক মুহূর্তে এই উপন্যাসের আবির্ভাব হয়েছিল !

পরবর্তী উপন্যাস "ধোঁয়া"তে (১৮৬৩-১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে লেখা) তুর্গিয়েনেফ্ প্রকাশ করলেন ভূমিদাস প্রথা অবসানের পর অভিজাত সম্প্রদায়ের যত সব প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত। একই সঙ্গে দেখালেন, রাশিয়ার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা

সম্পর্কে বিদ্রোহকামী গণতন্ত্রীদের অজ্ঞতা,—সব কিছুই তো বস্তুতঃ "ধোঁয়াতেই" পর্যবসিত হল।

সর্বশেষ উপন্যাস 'অনাবাদী জমিতে' (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) তুর্গিয়েনেফ্ রূপ দিলেন শতাব্দীর সপ্ত দশকে বিদ্রোহকামী জনবাদী আন্দোলনকে, গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি চিত্রিত করলেন জনগণের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ, কিন্তু বিপথগামী জনবাদী যুবকদের ট্র্যাজিডিকে। এই উপন্যাসে তুর্গিয়েনেফ্ বিদ্রোহকামী 'নারোদনিক' যুবকদের মহান্ কীর্তির প্রতিরূপ চিত্রণের মাধ্যমে দস্তয়েফ্স্কির বিদ্রোহবিরোধী কুৎসামূলক 'পিশাচেরা' ('বিয়েসী' ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) উপন্যাসের প্রতিবাদ জানালেন।

যাহোক, এই উপন্যাসের পর তুর্গিয়েনেফ্ লিখলেন, "যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। এবার আমার কলম বন্ধ করি।"

কলম অবশ্য তাঁর থামল না। লিখলেন আরও কতকগুলি গল্প আর কতকগুলি 'গদ্যাকারে কবিতা' (১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)। তুর্গিয়েনেফ্-এর সমগ্র রচনার বিষয়বস্তু ও মূল সুরের প্রায় সমস্ত কিছুই প্রতিফলিত হল তাঁর 'গদ্যাকারে কবিতাগুলিতে'। 'বাঁধাকপির সুপ' ('শি') 'দুই ধনী' ('দ্বা বাগাচা') এবং বিশেষ করে 'দেহলী'তে ('পারোগ') রুশ তরুণী বিদ্রোহিনীর অপূর্ব ট্র্যাজিক চিত্র লিপিবদ্ধ করলেন।

প্রবাসজীবন :

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তুর্গিয়েনেফ পুনরায় গেলেন বিদেশে এবং সেখানে তিনি কাটালেন তাঁর অবশিষ্ট জীবনকাল। অবশ্য প্রতিবছর তিনি একবার ফিরে আসতেন রাশিয়ায়, তবে স্পাস্কয়ে-মস্কো- পিতেরবুর্গ এই ছিল তাঁর অভ্যস্ত সঞ্চারপথ।

রাজনৈতিক মতবাদ

শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকের বছরগুলিতে রাশিয়া ও পশ্চিমী দেশগুলোর সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তুর্গিয়েনেফ-এর বহুমুখী সাহিত্যিক-সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের মধ্যে যেমন তীব্র বিরোধ, তেমনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল বহুল পরিমাণে। তলস্তয়, দস্তয়েফস্কি, গনচারফ, পিয়েত্তসেন, নেক্রাসফ-এর সঙ্গে দীর্ঘকাল চলেছিল তীব্র বিরোধ। 'পিতা ও পুত্র' ('আৎসী ই দিয়েতি') উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর প্রগতিপন্থী

সাহিত্যে সমাজতন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে মতবিরোধ এবং 'সাভ্রিমিয়েন্নিক' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কত্যাগের মধ্যে সে যুগের ভাবাদর্শ ও শ্রেণীগত রাজনৈতিক ও সাহিত্যসংক্রান্ত লড়াই একটা বিশিষ্ট রূপ নিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠদশকে 'সাভরিমিয়েন্নিক্' ('সমসাময়িক') পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যজগৎ দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। একদিকে তুর্গিয়েনেভ গনচারফ, তল্স্তয়, গ্রিগরভিচ, ক্রুঝিনিন্ প্রভৃতি ক্রমাগত ধীর সংস্কারের পক্ষপাতী উদারনীতিক, এবং রক্ষণশীল অভিজাত সাহিত্যিক, অন্যদিকে চেরনীশেফস্কি ও দাবরালুবাফ্ প্রভৃতি কৃষক-বিদ্রোহের সমর্থক গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা। এ ধরণের তীব্র মতবিরোধ শুধু প্রতিফলিত করল আর কিছু নয়, শ্রেণীগত শক্তির স্পষ্ট সীমানির্দেশ, যা ভূমিদাস প্রথা অবসানের পূর্বক্ষণে সমাজে ইতিমধ্যেই প্রতীয়মান হয়েছে।

তুর্গিয়েনেভ ভ্রান্তিবশেই জোর দিয়ে বললেন যে, সংস্কারোত্তর রাশিয়ায় প্রগতিশীল বিকাশের motive power হবে শুধু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। "শিক্ষিত সংখ্যালঘু" সম্প্রদায়ের উন্নতি ও সাম্প্রদায়িক ভূমিস্বত্বের মধ্য দিয়েই রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র আসবে, গিয়েৎসেন-এর এই ধরণের প্রত্যাশাকে অবশ্য একই সময়ে তুর্গিয়েনেভ ন্যায়সঙ্গতভাবেই অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছিলেন। সে যাহোক, রাশিয়ায় উদ্ভূত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে অনিবার্যভাবে জনমনে গনতান্ত্রিক দাবি-দাওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক আশাআকাঙ্ক্ষা ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তুলবে, একদিকে সে কথা তুর্গিয়েনেভ বুঝতে ছিলেন অসমর্থ। অন্যদিকে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতাজনিত ভয় ও জনগণের ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী মনোভাব তুর্গিয়েনেভকে অভিজাত বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অভিজাত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ ক্রমশঃ তুর্গিয়েনেভ-এরও মনে প্রতিবাদী মনোভাব সৃষ্টি করতে লাগলো। আবার শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের অন্তে এবং সপ্ত দশকের প্রারম্ভে লেখা অসংখ্য চিঠিপত্রে সংস্কারোত্তর রাশিয়ার জনগণের ক্লেশকর অবস্থা সম্পর্কে বহু তিক্ত সত্য তিনি প্রকাশ করেছেন। জার সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতির প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সম্পর্কেও তিনি প্রায়শই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তুর্গিয়েনেভ ছিলেন বিপ্লববিরোধী, কিন্তু গভীর মনোযোগ ও অকৃত্রিম উৎসুক্যতার সঙ্গে তিনি বিপ্লবীদের কার্যকলাপের উপর শুধু নজর রাখতেন না,

সেই মনোযোগ ও উল্লাসকে তিনি সুস্পষ্টভাবে আপন রচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করতেন।

সমাজ ও সাহিত্য সেবার স্বীকৃতি

রুশ সমালোচকদের দৃষ্টিকেন্দ্রে তুর্গিয়েনেফ-এর স্থান ছিল অপরিহার্য। তাঁর বিখ্যাত রচনাবলীকে ঘিরে অবিরত নির্মম বাদবিসম্বাদ পাক খেত। প্রবাসে থেকে তুর্গিয়েনেফ রুশ সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'মহান ঔপন্যাসিক' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন, প্যারিসে থাকার সময় তিনি মেরিমে, গঁকুর, দোদে, এমিল জোলা, মোপাসাঁ এবং ফ্লবেয়ের প্রভৃতি প্রগতিপন্থী ফরাসী বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন। তাঁরই অবিরাম উৎসাহপূর্ণ যত্নের ফলে এই সময়ে পাশ্চাত্যে রুশ সুকুমার সাহিত্য প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে রাশিয়ায় এসে তুর্গিয়েনেফ বিপুল অভ্যর্থনা পেলেন। লেখক হিসেবে তাঁর প্রতি সুদীর্ঘকাল ঔদাসীন্যের পর সপ্তম দশকের শেষে যুব সমাজ তাঁকে জানাল তাঁর সাহিত্য ও সমাজ সেবার স্বীকৃতি, জানাল আবেগপূর্ণ অভিনন্দন।

জীবনদীপ নির্বাণ :

তুর্গিয়েনেফ প্রায়ই রোগে ভুগতেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সুদীর্ঘ পীড়াদায়ক ব্যাধির (মেরুদণ্ডে ক্যানসার) প্রাথমিক লক্ষণগুলো প্রকাশ পেল। এই ব্যাধিই ডেকে আনল তাঁর মৃত্যু। প্রবাসে নিভল তাঁর জীবন দীপ (১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ২২শে আগস্ট। ফ্রান্স থেকে পিতেরবুর্গ এল তাঁর মৃতদেহ এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর ভালকোভো নামক কবরখানায় অভূতপূর্ব জনসমাবেশের মধ্যে তাঁকে সমাহিত করা হল।

বিজয়ী প্রেমের গান

ইভান তুর্গেনেভ

দিন চলে যায় রাত্রিতে যায় বসন্তেরে—শিলার

পুরনো এক ইতালীয় পাণ্ডুলিপিতে এ কাহিনী আমি পড়েছিলাম

ইতালীর ফেরেরা শহরে দু-জন যুবক বাস করতো। নাম ফাবিয়াস ও মুসিয়াস। ফাবিয়াস ছিল চিত্রী আর মুসিয়াস ছিল সঙ্গীতকার। ফাবিয়াসের চুলের রঙ ছিল হাল্কা। মুসিয়াসের ছিল ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ। দু-জনেই যে মেয়েটিকে ভালোবাসতো—নাম তার ভালেরিয়া। ভালেরিয়া যে কাকে ভালোবাসতো তা সে নিজেও বুঝতো না। কিন্তু সে বিয়ে করলো ফাবিয়াসকে। ভালেরিয়ার মাকে খুসি করেছিলো ফাবিয়াস। মুসিয়াস ফেরেরা ত্যাগ করে কোথায় চলে গেল। ফাবিয়াস আর ভালেরিয়াও ফেরেরার কাছাকাছি এক ভিলায় বাসা বাঁধলো। এমনি করে চার বছর গড়িয়ে গেল। বেশ সুখী তাদের জীবন। তবে একটাই তার খুঁত। কোন ছেলেমেয়ে হল না তাদের।

হঠাৎ একদিন মুসিয়াস ফিরে এলো। উঠলো এসে ফাবিয়াসদের মস্ত বাগান বাড়িতে। ভালেরিয়া আর ফাবিয়াস খুব খুশি হল। মুসিয়াস পুব দেশ ঘুরে এসেছে। পারস্য, আরব আর ভারত সে ঘুরেছে। সে দেশ-গুলিতে লোকজন কেমন নরম শস্পপুঞ্জের মত নধর শ্যামল! মুসিয়াসের সঙ্গে এসেছে এক মালয়বাসী বোবা চাকর। জিব নেই বটে, কিন্তু কেমন এক আশ্চর্য শক্তি যেন তাকে ঘিরে আছে সর্বক্ষণ। মুসিয়াস অনেক আজব আজব সাপের খেলা দেখালো। সে সব খেলা সে ভারতে ব্রাহ্মণদের কাছে শিখেছে। মুসিয়াসের সঙ্গে ছিল এক ভারতীয় বেহালা! তাতে সে সহজ অথচ বেদনাভরা কেমন এক গান বাজালো। সেই গানের সুর কেমন যেন একাকীত্বের। কেমন এক অজানা ধ্বনি স্পন্দন, কেমন যেন জয়ের আর আলো ঝলমলে বর্ণাধারা ঝরে পড়লো সেই বেহালা থেকে। মুসিয়াস বলে, এ হল বিজয়ী প্রেমের গান। সিংহল দ্বীপে এ গান সে শুনেছে। গান যখন বাজছিল ভালেরিয়া বিমর্ষ মুখে বসে রইলো। সে ভাবছিলো চার বছর

আগে এই মুসিয়াসকে কেমন একটুও ভয় করতো না তারা। মুসিয়াস ভালেরিয়া আর ফাবিয়াসকে সিরাজি দিয়ে আপ্যায়ন করলো।

সে রাতে অনেকক্ষণ ভালেরিয়ার চোখে ঘুম এলো না। তারপর এক সময় এক অদ্ভুত ঘুমের মধ্যে ডুবে গেল। সে যেন এক বিশাল অথচ বেশ নিচু একটি ঘরে প্রবেশ করেছে। একটা দরজা তার কালো মলমলের পর্দায় ঢাকা। হঠাৎ সেই দরজা দিয়ে মুসিয়াস ঘরে এলো। তারপর হেসে তাকে মুসিয়াস চুম্বন করলো! ঘুম ভেঙে গেল তার। ফাবিয়াসকে জাগিয়ে তুললো ভালেরিয়া। আর সে মুহূর্তে তারা শুনলো বিজয়ী প্রেমের সেই গান। মুসিয়াস তার বাগান বাড়িতে উচ্চগ্রামে বাজিয়ে চলেছে বেহালা।

পরদিন মুসিয়াস বললো, ভারি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছে সে। এক অজানা ঘরে সে যেন ঢুকে পড়েছে। আর সেই ঘরে রয়েছে তার প্রেমিকা। ঘুম ভাঙতেই বেহালা তুলে নিলো সে। বাজিয়ে চললো বিজয়ী প্রেমের গান।

পরের রাতে ফাবিয়াসের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখে, শয্যায় স্ত্রী নেই। বাগান থেকে হঠাৎ ভালেরিয়া ঘরে প্রবেশ করলো। ওদিকে বাগান বাড়িতে মুসিয়াস তখন বাজিয়ে চলেছে সেই বিজয়ী প্রেমের গান।

পরের রাতে ফাবিয়াস ঘুমোলো না। চোখ আর মন তার বাগানের দিকে। হঠাৎ সে দেখলো মুসিয়াসের চোখ দুটি বন্ধ, কিন্তু আচ্ছন্নের মত দু-হাত বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে সে। আর সেই মুহূর্তেই ভালেরিয়া তার দিকে এগিয়ে গেল। সে বাগানের দিকে চলেছে। ফাবিয়াস দরজা বন্ধ করে দিল। জানলা ডিঙিয়ে ভালেরিয়া বেরিয়ে যেতে চায়। ফাবিয়াসের সর্বদেহমন ক্রোধে জ্বলে উঠলো। ছুরি বের করে মুসিয়াসের বুকে বিঁধিয়ে দিল সে। ভালেরিয়া চিৎকার করে কেঁদে উঠে মেঝেয় পড়ে মূর্ছা গেল।

পরদিন ফাবিয়াস চললো সেই বাগান বাড়ির দিকে। দেখলো, মেঝের উপর মুসিয়াস পড়ে আছে। মৃত। বোবা মালয়ী হাতের ইসারায় তাকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললো। তারও পরদিন এক গুপ্ত দরজা দিয়ে ফাবিয়াস সেই বাগানবাড়িতে ঢুকলো। দেখে মুসিয়াস বসে আছে এক আরাম কেদারায়। তার সামনে এক অদ্ভুত লাল পোষাকে সেই বোবা মালয়ী হাত পা নাড়ছে, ইঙ্গিত করছে—আর তালে তালে মুসিয়াসও হাতপা নাড়ছে। বোবা মালয়ী গোঙাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুসিয়াসও গুঙিয়ে উঠছে। তারও পরদিন মালয়ীটির সাহায্যে সেই বাগান বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো মুসিয়াস।

ঘোড়ায় চাপলো। চোখ ফেরালো জানলার দিকে। সেখানে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে কাবিয়াস।

সময় গড়িয়ে যায়। একদিন অর্গানে সুর তুলছে ভ্যালেরিয়া। তার একেবারে অজানতে হঠাৎ তার আঙুলের ছোঁয়ায় বেজে উঠলো সেই বিজয়ী প্রেমের সুর মূর্ছনা। আর ঠিক তখুনি সে অনুভব করলে তার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে নতুন এক জীবন !···

এর অর্থ কি ? সত্যি···কি অর্থ এর

অনুবাদ : শুভব্রত রায়

লেনিনগ্রাদের ইনস্টিটিউট অব রাশিয়ান লিটারেচর-এর শ্রীযুক্তা তাতিয়ানা দেহ্‌ন তুর্গেনেভ-বিষয়ে প্রধানতম বিশেষজ্ঞ। তুর্গেনেভ-এর চিঠিপত্র ও শেষবয়েসের অপ্রকাশিত রচনাসমূহ সম্পাদনাকালে তিনি একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসের খসড়া পান—তাতে ভারতবর্ষের উল্লেখ থাকায় তিনি গত বর্ষ শেষে শ্রীগোপাল হালদারকে জানান (১৯৬৩)। সেই সারাংশের অনুবাদ আমরা তুর্গেনেভ-এর ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশ করলাম। সম্পাদক

অক্ষক্রীড়ার ক্যাবিনেট মিশন ও ভাঙা বাঙলার বুলা

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

মাগো, আমি তোমাদের জাত-ধর্ম-কুলনাশিনী মেয়ে, অনেক দূর থেকে তোমাকে লিখছি। ব্যথায় যখন বুকটা টনটন করে ওঠে, আমার আজন্মের সংস্কার যখন কুল্‌কুলাইয়ার মতো কেবলই আমাকে দিক্‌ভ্রান্ত করে দেয়, নানা হাতে সাজানো আমার এই জীবনের অঙ্কটা যখন আর কিছুতেই মেলাতে পারি নে, তখন মাগো, ঠিক তখনই দুর্গা প্রতিমার মতো তোমার মুখখানা আমার সামনে ভেসে ওঠে। আমার গ্লানির কথা, মাগো, আমার অসম্মানের কথা, ইতিহাসের কালান্তক আগুনে পুড়ে পুড়ে ঝলসে যাওয়া আমার এই বাইশ বছরের জীবনের কথা, মাগো, তোকে ছাড়া আর কাকে বলব! তুই আমার মা, তোর জাত নেই ধর্ম নেই কুল নেই, তুই শুধু আমার মা, তুই বেদান্তবাগীশের শাস্ত্রপড়া মেয়ে নোস, সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থের স্ত্রী নোস, তুই আমার মা, এই তোর সত্য পরিচয়. তোর অস্তিত্বের গভীরে একদা তুই ধারণ করেছিলি আমাকে, আমি তোর সেই বুকের অস্তিত্বের দোসর, আমার ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয়ের সীমাহীন বেদনার অংশ, মাগো, তোকে ছাড়া আর কাকে দিই!...

পূব বাঙলার যে-শহরে একদা আমার সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থ পিতার বীজ আমাকে এই প্রাণময় পৃথিবীর সঙ্গে ঐক্যসূত্রে গেঁথে দিয়েছিল, যেখানে আমার শৈশব কৈশোর এবং ছুঁই-ছুঁই যৌবন কেটেছে, যেখানে মানুষ চিনেছি, ফুল বৃক্ষ নদী আকাশ লতা-গুল্ম অরণ্য চিনেছি, আমার প্রতিনিয়ত "হয়ে ওঠার" পুলকিত রহস্যের বিপুল বিস্ময়ে যেখানে রোমাঞ্চিত হয়েছি, সেখানে সেই শহরেই পৃথিবীর এই ভূ-খণ্ডের ইতিহাসের বিধাতাপুরুষ আমার ললাটে দুর্ভাগ্যের কলঙ্ক-তিলক এঁকে দিয়েছিল।

সে-রাতের কথা তো ভুলতে পারি নে। সে-কথা মনে হলে আতঙ্কে

এখনো নীল হয়ে যাই। বিকেল থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল কিছু একটা হবে। অথচ দুপুর পর্যন্ত সব কিছুই স্বাভাবিক মনে হয়েছে। টু-পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল, তাতে কিছু বুঝতে পারি নি। হেডমিস্ট্রেস আমাদের তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, আড্ডা দেবে না কোথাও। বাড়ি চলে যাবে সোজা। টেস্ট পরীক্ষা সামনে মনে রেখো। বাজারের রাস্তা দিয়ে যাবে না। কিছুতেই কথা শোনো না তোমরা। বেরিয়ে এসেই মুখ টিপে হেসেছিলাম সবাই। আমরা জানতাম বাজারের রাস্তা সম্পর্কে বাবেয়াদির একটা অহেতুক ভীতি আছে। আসলে বকুলতলার মোড়ে কলেজের ছেলেদের এবং বেকার আওয়ামী যুবকদের স্থায়ী ঠিকানার আড্ডাটি শহরের তাবৎ অভিভাবকদেরই তখন অপছন্দ, বাবেয়াদিরও। আমরা জানতাম কণ্ঠ উঁচুপর্দায় বেঁধে ওখানে ওরা রাজনীতি সাহিত্য খেলাধুলো এবং নারী-প্রসঙ্গ নিয়ে বেপরোয়াভাবে আলোচনা করে, এমন কি মারামারি পর্যন্ত; আমাদের দেখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওদের খারাপ লাগেনি আমাদের, ওদের হাতে ছিল আমাদের আর-এক গভীরতর অস্তিত্বের বার্তা।

বাজারের রাস্তা ধরেই এসেছিলাম আমরা। বকুলতলার মোড় আসতেই পপি আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠলে, সি এইচ সি এইচ মানে চন্দন। বকুলগাছের তলায় চন্দন ফিরোজ বুলবুল এবং আনোয়ার দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা সবাই এক নজর দেখল আমাদের, মুহূর্তেই নিজেদের আলোচনায় ডুবে গেল। কেমন যেন নিষ্প্রাণ উন্মনা দেখাচ্ছিল ওদের। আমরা ভেবেছিলাম বুঝি কারো সঙ্গে মারামারি করেছে ওরা। চন্দন ফিরোজ একসঙ্গে থাকলে নানা অঘটন ঘটতে পারে, তা জানা ছিল আমাদের। হাঁটতে হাঁটতে এ-সবই আলোচনা করছিলাম আমরা। পপি একসময় বলেছিল, রুণার মনটা ভার ভার ক্যানো রে। দাদা তাকায় নি বুঝি। ফিরোজ পপির দাদা, রুণা ঝঙ্কার দিয়ে বললে, নিজেরটা ভাব, আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না।...

বেশ হালকা মনেই বাড়ি এসেছিলাম। আমাকে দেখে তুমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলে মা, বলেছিলে, তুই আইছস! তুমি যেন ধরেই নিয়েছিলে আমি আর ফিরব না; আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার মানে? তুমি এবারে কেঁদে ফেলেছিল, আতঙ্কে তোমার গলা বুজে বুজে যাচ্ছিল, সর্বনাশ হইয়া গেছে রে! কেন্দুয়ার ভট্টাচার্য গো কাইল

রাইতে সব কাইটা ফ্যালাইছে। আইজ রাইতে এই শহর আক্রমণ করবো অরা। কথাটা বুঝতে সময় লেগেছিল, তারপর তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। আমার মাথাটা ধীরে ধীরে কোলের ওপর টেনে নিয়েছিলে তুমি, বলেছিলে, ডরাইস না মা। ভয় কি, আমরা আছি না। ছোটবেলায় ভয় পেলে তুমি এমনি করেই সাহস দিতে মা, তখন বলতে, ভয় কি, আমি আছি না।...তারপর গলায় উদ্বেগ নিয়ে বললে, সেই যে দুইজন দাঁতে রইদ্ লাগাইয়া বাইরাইলো, তাগো নাকি আর পাত্তা আছে। সবেই তাগো আগে যাওন চাই। আমার হইছে যত মরণ। দুইজন মানে চন্দন আর দাদা। চন্দনকে যে আমি ফিরোজদের সঙ্গে দেখেছি, আমার মনে হয়েছিল সে-কথা তোমাকে বলা যায় না মা। তুমি মাঝে মাঝেই বলছিলে, পরের পোলা লইয়া আমার যত বিপদ। বাপ-মা পড়তে দিছেন তারে, কলেজে যে তিনি কি পড়তে আছেন তা মা দয়াময়ীই জানেন। শহরে আইস্যা কের ডানা গজাইছে বাবুর। এ পোলার দায়িত্ব আমি নিতে পারুম না। ভালয় ভালয় কাইট্যা যাউক সব কিছু, তারপর...

বিকেল থেকেই মুখে মুখে গড়ে ওঠা গুজবটা ক্রমশ নিশ্চিত সংবাদের আকার পাচ্ছিল। শরৎকালের পরিচ্ছন্ন আকাশের তলায় ধীরে ধীরে নামহীন আকারহীন বিভীষিকার মেঘেরা ঘন হয়ে আসছিল। ওরা বড় মসজিদে তখন দু-একটা করে জড়ো হচ্ছিল। চন্দন আর দাদা মাঝে মাঝেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, স্থির হয়ে বসতেই পারছিল না, ওদের মুখ ক্রমশই ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল, আমার শরীরটা একটু একটু করে ওদের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে গলে পড়ছিল। সন্ধ্যের মুখপাতে শেষবারের মতো ঘুরে এলো ওরা। আমি আমার ঘরে তখন শুয়ে। বড় ঘরে তোমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা, চাপা চাপা গলায়। চন্দন একসময় আমার ঘরে এলো, চৌকির পাশে বসল, আমার হাত তুলে নিয়ে বলল, ভয় কি বুলা, আমি তোমার পাশে আছি, ভরসা হয় না? মোটা হাড়ের দীর্ঘ গড়নের চন্দনকে অন্ধকারে কোনো পৌরাণিক বীরের মতো মনে হচ্ছিল, চন্দনের কোলে মুখ গুঁজে দিয়েছিলাম। ও আমার চুলে বিলি কাটছিল, ওর নিঃশ্বাসের গরম ভাপ ঘাড়ে কানের লতিতে চুলের গুবকে গুবকে, আমার ভয় আতঙ্ক ক্রমে ক্রমেই এক অনাস্বাদিত তীব্র আনন্দের রূপ নিচ্ছিল, ওর অঞ্জলিবদ্ধ দুহাতে আমার চেতানো

মুখ, আমার সারা দেহে এবং দেহের অন্তরস্থিত সমগ্র চৈতন্যে চন্দনের সুঘ্রাণ, চন্দন আঃ চন্দন, চন্দন কাঁপছিল, আমি কাঁপছিলাম, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্কোণের অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠছিল·

চন্দন চন্দন, শঙ্কর—

বাইরের কোনো শব্দ তখন স্পষ্ট করে আমার কানে আসছিল না, মনে হলো যেন অনেক দূর থেকে অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে চন্দন আর দাদাকে কে ডাকল। চন্দন ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল, ওর যেন জানা ছিল ডাকটা আসবে, দাদা তখন উঠোনে, শুধু দাদা নয়, তোমরা সবাই। তুমি বোধহয় ওদের বাধা দিতে চেয়েছিলে মা, শাসনের স্বরে বলেছিলে, সদর দরজা খুলবি না কেউ। চন্দন যেন বলেছিল, ফিরোজ ডাকছে মাসীমা। তুমি বলেছিলে, কাউকে আর বিশ্বাস করি না আমি। তোমার কথার জবাব দিলে না, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ওরা। আমার হৃদ্‌পিণ্ডের ঘুঙুরের বাজনাটা থেমে গিয়েছিল একসময়, ধীরে ধীরে ভয়ের ছায়া ঘনিয়ে এলো সেখানে; ওরা ফিরছে না কেন, চন্দন দাদা···ভগবান ফিরছে না কেন ওরা, চন্দন চন্দন···বালিশে মুখ ডুবিয়ে মনে মনে বলেছিলাম, চন্দনকে ওরা মেরে ফেলেছে, টিকটিকি ডাকে নি. বলেছিলাম, চন্দন বেঁচে আছে, টিকটিকি ডাকে নি। মনে হচ্ছিল, কতো যুগ আগে যেন বায়ুতরঙ্গে দরজা খোলার শব্দটা উঠেছিল, আমার অন্তর্গত ভয় আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল, একঘর অন্ধকারের বুকে জটিল জ্যামিতিক নকশার নানা ভয়ের ছবি অশরীরী প্রেতিনীর দৃষ্টিতে আমার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল···

অবশেষে ওরা ফিরে এলো একসময়। বড়ো ঘরে খুব কাছাকাছি সবাই আমরা বসলাম। চন্দনই প্রথম কথা বলল, ওর গলার স্বর ব্লটিং-এর মতো খসখসে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছিল ও, দয়াময়ী বাড়িতে অনেকেই উঠে যাচ্ছে। ওখানে পাইক-বরকন্দাজ আছে, বন্দুক আছে। রাতটা ওখানে কাটানোই ভালো। বাবা এ-প্রসঙ্গে এই প্রথম মন্তব্য করলেন এবং আমরা জানতাম বাবার মন্তব্য আর সিদ্ধান্তে কোনো পার্থক্য নেই, বললেন, নিরাপত্তার কথা বলতেছ তু। ভগবানে আস্থা রাখ। কুলবিগ্রহ পরিত্যাগ কইরা আমি যাইতে পারি না। বিগ্রহ রক্ষার কর্তব্য আছে আমার। তোমরা বরং যাও। মা, তুমি বলেছিলে, তা হয় না; মরতে

হইলে একসাথে মরাই ভাল। কাজেই আমাদের যাওয়া হলো না। তুমি বাবার কথা ভেবেছিলে মা, বাবা তাঁর বিগ্রহের নিরাপত্তার কথা ভেবেছিলেন. ঈশ্বরের নিরাপত্তার দায় মানুষেই বর্তেছিল সেদিন; চরম ক্ষতি বলতে তোমরা মৃত্যুকেই বুঝেছিলে, মৃত্যুর থেকেও অমোঘ কোনো সর্বনাশ থাকতে পারে—তা তোমাদের ভাবনায় আসে নি মা; তোমাদের এই একচক্ষু হরিণের যে চিন্তা—তার বিপরীত দিক থেকেই সর্বনাশের বানটা এসেছিল। কিন্তু, মাগো, সে-দিন আমার কথা স্বতন্ত্র করে তোমাদের মনে পড়ে নি।···

রাত তখন প্রায় বারোটা। লণ্ঠনের সলতে কমিয়ে দিয়ে বড়ো ঘরে আমরা পাঁচজন পাঁচটি ছায়ামূর্তির মতো বসে আছি। দাদা আর চন্দনের কোলে দুখানা লাঠি। দাদা বলছিল, মুসলমান যুবকেরা প্রাণ দিয়ে দাঙ্গা রুখবে। উত্তর প্রদেশ-থেকে-আসা উদ্বাস্তু কিছু গুণ্ডা গুলি-খাওয়া বাঘের মতো হিংস্র হয়ে আছে, ভয় ওদের নিয়েই। দাদার কথাটা তখনো শেষ হয়নি, চন্দন লাফিয়ে বাইরে চলে গেল; ওখান থেকেই নিচু গলায় ডাকল, শঙ্কর।

পুবের আকাশ লালে লাল হয়ে গিয়েছে, বাতাসে দূরের মানুষের আর্তনাদের সুর। বড়ো ঘরের বারান্দায় আমরা দাঁড়িয়েছি, আগুনের তাত যেন আমাদের গায়ে লাগছিল; দাঁতে দাঁত চেপে একটা নিদারুণ কম্পনের বেগ ঠেকিয়ে রাখছিলাম আমি। ঠিক এই সময়ই চারধার কাঁপিয়ে আওয়াজটা উঠল, আ-ল্-লা-হু-আক্-বর। আমি পড়ে যাচ্ছিলাম, দুহাতে প্রাণপণে সামনের থামটা চেপে ধরেছিলাম, মাটি চেপে বসে পড়েছিলে তুমি, বাবা পুজোর ঘরের পৈঠায় কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন, চন্দন আর দাদা দলপতিহীন সৈনিকের মতো দিশেহারাভাবে উঠোনময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। আওয়াজটা একবার উঠেই থেমে গিয়েছিল, তারপর নেমে এলো এক কালান্তক নৈঃশব্দ্য, সে-নৈঃশব্দ্যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, শিরা উপশিরা স্নায়ু ইন্দ্রিয় গ্রন্থি চৈতন্যপ্রবাহ শিথিল হয়ে যাচ্ছিল, সে নিস্তব্ধতা আমি সইতে পারছিলাম না মা···

তারপর শব্দের তরঙ্গ উঠল, সদর দরজায় ঘা পড়ল, ওরা পৈশাচিক আনন্দে ঈশ্বরের নাম বাজাতে থাকল। চন্দন আর দাদা যেন ঘা খেয়ে জেগে উঠল, চন্দন চাপা গলায় ডাকল, মাসীমা বুন্না নেমে আসুন।

কিন্তু থেমে যাওয়ার শক্তি ছিল না আমাদের ; মা, দাদা তোমাকে আর চন্দন আমাকে টানতে টানতে বাড়ির পেছনকার বাঁশ তুমুর বেত গাব জলপাই আমলকি পিতরাজ হরিতকি এবং আরো নানা গাছ-আগাছা লতা-গুল্মের ঘন বুনটের জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল। চন্দন বাবাকে ডেকেছিল, মেসোমশাই চলে আসুন। বাবা বলেছিলেন, আমার বিগ্রহ— কিন্তু কথাটা শেষ না করে তিনি অবিন্যস্ত ছন্দে ছুটে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছিলেন, প্রচণ্ড শব্দ করে আমাদের সদর দরজা সেই মুহূর্তে ভেঙে পড়ল।

অনেকক্ষণ চলার পর চন্দন থেমেছিল, জলপাই গাছে পিঠ ঠেকিয়ে জোরে জোরে দম নিয়েছিল, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কখনো ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের পেশি পরখ করার মতো করে ও টিপছিল, কোরবানির পশুকে যেমন করে যাচাই করা হয় অনেকটা সেইভাবে। চন্দনের পায়ের কাছে আমি পড়েছিলাম, যেন ঈশ্বরে সমর্পিত কোনো দেবদাসী। সে-সময় তোমাকে কাছে পেতে চাইছিলাম মাগো, কিন্তু তুমি বাবা দাদা আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে, আমি দাঁড়াতে চাইছিলাম, পালা জ্বরের রোগীর মতো ঠকঠক করে কাঁপছিলাম আমি। আমাদের চারধারে অন্ধকার তরল, পত্রপল্লবের গা বেয়ে বেয়ে পৌর্ণমাসী রাতের সবুজ জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছিল। বাড়ির ভেতর থেকে মদ না খেয়েও মাতাল হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর হল্লার আওয়াজ আসছিল, জিনিসপত্র ভাঙাচোরার শব্দ। চীৎকার করে কেউ বলেছিল, আহমি জোগ সব ভেগে গেল উস্তাদ। ভারী গলার আদেশের সুর শোনাগেল, পাত্তা লাগাও, চন্দনকো আমি চাই ইরকান। জলপাই গাছের প্রবীণ অন্ধকারের তলায় চন্দন কেঁপে উঠেছিল, ধরা গলায় ও বলল, বুলা, রমজান রমজানের দলেরা এসেছে। বকুলতলার মোড়ে ইউ-পির উদ্বাস্তু দুর্দান্ত রমজানকে চন্দন এক সময় প্রচণ্ড পিটিয়েছিল, ওর বন্ধু শহীদের বোনকে রমজান অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল। সে-সময় কিম্বা তার পরেও রমজান বা তার দলকে ভয় করেনি চন্দন, ও বলত, একটা গুণ্ডাকে ভয় করে চলতে হবে নাকি ? কিন্তু রমজান আজ গুণ্ডা নয়, ও মুসলমান আর চন্দন হিন্দু ; চন্দন ভয় পেলো না। আমার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, বুলা ওঠো, এখানে আমরা নিরাপদ নই বুলা। আমি উঠতে পারি নি, আমার কাঁপুনির বেগটা আরো বেড়ে গিয়েছিল, চন্দনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম,

চন্দন আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, আমি পড়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, চন্দন ওর শরীরের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে নিলে, আমার মুখ আমার বিষকলের অস্তিত্ব আমার তলপেট অজস্র সর্বশরীরে চন্দন চন্দন, আমার জিভ শুকিয়ে কাঠ ক্রমশই তা ভেতরের দিকে চলে আসছিল, আমার শরীর হিম, চন্দনের সুগোল পৌরাণিক বাহু বিস্তৃত বক্ষপট তলপেট শাল বৃক্ষের উরু এবং সব কিছুতেই ভরা মাঘের শীতল অনুভূতি। ঠিক এমনি সময় অন্ধকার কাঁপিয়ে আওয়াজ হলো, কোন হায়, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল চন্দন, আমার দুচোখের সামনে অন্ধকার দুলে দুলে উঠল, আমি ছুটতে চেয়েছিলাম, ছিন্ন নাভিকুণ্ডলীর সূত্র ধরে ধরে তোমার জঠরের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে চাইছিলাম মাগো, কিন্তু অদৃশ্য কোন খেলোয়াড়ের হাত থেকে পাশার দান তখন পড়ে গেছে :

"দুঃশাসন তর্জন করে তাঁর কেশ ধরলেন, যে কেশ রাজসূয় যজ্ঞের মন্ত্রপূত জলে সিক্ত হয়েছিল। দুঃশাসনের আকর্ষণে নতদেহ হয়ে দ্রৌপদী বললেন, মন্দবুদ্ধি অনার্য, আমি একবস্ত্রা রজস্বলা, আমাকে সভায় নিয়ে যেয়ো না। দুঃশাসন বললেন, তুমি রজস্বলা একবস্ত্রা বা বিবস্ত্রা যাই হও, দ্যূতে বিজিত হয়ে দাসী হয়েছ, আমাদের ভজনা কর।...

"দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধ'রে সবলে টেনে নেবার উপক্রম করলেন। লজ্জা থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণ বিষ্ণু হরিকে ডাকতে লাগলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম বস্ত্রের রূপ ধ'রে তাঁকে আবৃত করলেন। দুঃশাসন আকর্ষণ করলে নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং শুভ্র শত শত বসন আবির্ভূত হতে লাগল।"*

আমি আমার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তোমাদের ঈশ্বরকে ডেকেছিলাম মা, কিন্তু মাগো, বারো হাতের পরেই আমার শাড়ি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, আমি প্রাণপণে একটা পিতরাজ গাছ আঁকড়ে ধরেছিলাম, ও আমাকে পেছনে টানছিল ফেলে দিতে চাইছিল মাঝে মাঝে খ্যাপা জানোয়ারের মতো পেছন থেকে চেপে ধরছিল হায়েনার মতো চীৎকার করছিল, একসময় আমার পা ধরে ও সবলে নিচের দিকে টানতে লাগল, আমার প্রতিরোধের ক্ষমতা ক্রমশই কমে আসছিল, পা অবশ, ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছিলাম আমি, আমার হাত বুক পাঁজরার ছাল ছড়ে যেতে লাগল, মাটিতে শব্দ করে পড়ে

* মহাভারত : সভাপর্ব : পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪ : রাজশেখর বসু কৃত অনুবাদ

গেলাম আমি। ঠিক সেই সময় অন্ধকার কাঁপিয়ে আর-একটা আওয়াজ হলো, খবরদার। রমজান পেছন ফিরে দাঁড়াল, সামনের মানুষটি সতর্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো, তখন আঁধারে ফিরোজকে আমি চিনতে পারলাম। রমজান কোমর থেকে ছুরি টেনে নিলো, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শালা হিন্দুকা কুত্তা. ইধার আয়া কিন। ফিরোজ অনুদ্বেজিত, ওর ছুরির ফলা জ্যোৎস্নায় চকচক করে জলছিল, দুর্গা প্রতিমার হাতে আয়ুধগুলো যেমন ঝলমল করে জ্বলে। ফিরোজ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, রমজান, তোমার নানা অপরাধের যে আজ মাশুল দিতে হয়। রমজান আওয়াজ তুলে ফিরোজের দিকে এগিয়ে গেল, ফিরোজ শরীরটাকে বাঁ দিকে একটু সরিয়ে নিতে রমজান টাল সামলাতে পারলে না, ঠিক সেই মুহূর্তেই ফিরোজের ডান হাত ওর পেটের দিকে এগিয়ে গেল, রমজান তীব্র চীৎকার করে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, ফিরোজ ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল, তারপর ওকে চিৎ করে দিলে মাগো—আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। ফিরোজ আমার দিকে এগিয়ে এলো দ্রুতপায়ে, আমার কাছাকাছি এসে অসহায় বোধ করল, চারদিকে তাকিয়ে কিছু খুঁজতে লাগল, তারপর ছুটে গিয়ে পিতরাজ গাছের তলা থেকে আমার শাড়িটা নিয়ে এলো, ছুঁড়ে দিলো আমার দিকে, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে চীৎকার করে বলল, মুকবুল, এদিকে আমি।' অনেক কণ্ঠের আওয়াজ উঠল, চন্দনদের পেলি রোজ।

রমজানের লাশ, আমাকে এবং ফিরোজকে দেখে ব্যাপারটা ওরা বুঝে নিয়েছিল। মুকবুল ফিরোজের দু-হাত ঝাঁকিয়ে আবেগে বলেছিল, কনগ্র্যাচুলেশন রোজ। জানোয়ারটা অনেক জ্বালাইছে। ফিরোজ এবার আমার কাছাকাছি এগিয়ে এলো, জিগ্যেস করল, চন্দন শঙ্কর আপনার বাবা মা—? আমি কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, পারি নি। ফিরোজ আমার অবস্থাটা ধরতে পেরেছিল, বলেছিল, একটু বসে নিন। কোনো ভয় নেই আপনার। অনেকক্ষণ বাদে আমি কথা বলতে পেরেছিলাম। আমার কথা শেষ হতেই জঙ্গলের নানা দিকে মুখ করে ওরা চেঁচিয়ে উঠল, চন্-দ-অ-ন, শং-ক-অ-র, এ-ই, এখানে আমরা, চন্-দ-অ-অ···

চন্দন দাদা কিম্বা তোমাদের কারো জবাব পাওয়া যায় নি, চীৎকার করে করে হয়রান হয়ে ওরা থামল একসময়, খন হয়ে নিচু গলায় পরামর্শ করল, ফিরোজ তারপর আমার কাছাকাছি এলো, কথা বলার আগে বেশ কিছু সময়

ভাবল, মনে মনে শব্দগুলো যেন সাজিয়ে নিয়ে বলল, আপনি তো পপির ক্লাস-ফ্রেণ্ড, পপি আমার বোন, এ-রাতটা পপির সঙ্গে যে থাকতে হয়, আর কোনো ব্যবস্থার কথা আমাদের মাথায় আসছে না। আপনার যদি বিকল্প কোনো ব্যবস্থার কথা জানা থাকে বলুন। সে-রাতে আমি কোন বিকল্প আশ্রয়ের কথা বলতে পারতাম মা তুমিই বলো। ফিরোজ বলল, তা হলে আসুন আমাদের সাথে। উঠতে গিয়েও পারি নি, পা-টা অবশ অবশ মনে হচ্ছিল, ফিরোজ ওর ডান হাত বাড়িয়ে দিলে, যে-হাত দিয়ে খানিক আগেও রমজানের পেটে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল; বললে, বিপদের দিনে কোনো অনিয়মটাই অনিয়ম নয়। ফিরোজের প্রসারিত হাতের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম আমি, সে-হাতের কথা তোমাকে কি করে বোঝাই মা, একটা গোটা মানুষের এমন পরিপূর্ণ হাত এর আগে বা পরে আর কখনো দেখি নি মা। তাই ফিরোজের হাত সেদিন অসীম বিশ্বাসে চেপে ধরেছিলাম।

ওরা কোত্থেকে যেন একটা রিক্সা জোগাড় করে ফেললে, ফিরোজ বললে, উঠুন। ফিরোজকে আমি শক্ত করে ধরে ছিলাম, ওকে ছাড়তে চাইছিলাম না, ফিরোজ বিব্রত মুখে ওর বন্ধুদের দিকে তাকালে, মুকবুল বললে, তুইও ওঠ রোজ। ওঁর সাহায্য দরকার। ফিরোজ আমার বাঁ দিকে বসল, শহীদ রিক্সার হুড তুলে দিয়েছিল, বলেছিল, এ-রাতে খোলা রিকসায় যাওয়া ঠিক নয়। মুকবুল রিক্সার চালকের আসনে, আমাদের আগে-পিছে ওদের বন্ধুরা। বড়ো রাস্তা নির্জন খা-খা, ঘর-বাড়ি দোকান-পাট চারপাশের সব কিছু ঘিরে আলো-আঁধারির কুহক। ফিরোজের কাঁধে মাথা রেখে আমি অবসন্নের মতো পড়েছিলাম, আমার মাথা দুলছিল, ফিরোজের কাঁধ পাঁজর কাঁপিয়ে আমার নিঃশ্বাস পড়ছিল, ফিরোজ মাঝে মাঝে বলছিল, সকাল হলেই আপনার বাবা-মার খোঁজ পাওয়া যাবে। এত ভাববার কি আছে।

আমাদের রিক্সা ধীরে ধীরে চলছিল, কখনো এঁকেবেঁকে কখনো সোজা কখনো অর্ধবৃত্তাকারে, মুকবুলের হাতের শাসনে হ্যাণ্ডেল বাগ মানে নি, ওরা দুপাশ থেকে গিয়ে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরলে, প্যাডেল থেকে পা তুলে নিলে মুকবুল, আমাদের ওরা ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলল। হঠাৎ শব্দ করে পেছন থেকে আমাদের রিক্সার বাঁ পাশে একটা জিপ এসে থামল, গলা বাড়িয়ে কেউ জিজ্ঞেস করল, তোমরা? মুকবুল ব্রেক কষে বললে, আমরা চাচা। আর-একজনের গলা শোনা গেল, ব্যাপার কি! জিপ থেকে নেমে এলেন ওঁরা,

হায়দার মল্লিক আর সামস মিঞা। মল্লিকসাহেব নেমেই প্রশ্ন করলেন, রিক্সায় কে? উত্তরের অপেক্ষা না করে হুডের তলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে ডাকলেন, সামস! হুডটিকে তিনি চাপ দিয়ে নামিয়ে দিলেন। সামস মিঞা যেন আতকে উঠলেন, কয়ছস কি তরা। মল্লিকসাহেব হাহাকারের স্বরে বললেন, ছাখ সামস ছাখ, আমার কীতিমান সন্তান—হারামজাদা···বলে তিনি উন্মত্তের মতো ফিরোজের গালে চড় বসিয়ে দিলেন, ফিরোজ টাল সামলাতে পারল না, আমার গায়ে ঝুঁকে পড়ল, বিমূঢ় কণ্ঠে বলল, বাজান। মুকবুলরা চেঁচিয়ে উঠলে, চাচা। আবার হাত তুলেছিলেন মল্লিকসাহেব, আঘাতটা আমার বেজেছিল মা, ফিরোজের মুখ দুহাতে আমার বুকের ওপর চেপে ধরে বলেছিলাম, না না···, বিস্মিত মল্লিকসাহেব হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। মুকবুল সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘটনা বলতে শুরু করলে, সব কিছু শোনার পর মল্লিকসাহেবের বুক কাঁপিয়ে একটা আওয়াজ উঠল, আ-আ···! বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে ডাকলেন, সামস। সামস মিঞা খুশির স্বরে হাসলেন। মল্লিকসাহেব ওদের দিকে চেয়ে বললেন, ভিতরে উঠ। আমাকে বললেন, আইস মা আইস। ফিরোজ আমার হাত থেকে হাত টেনে নিলে, অভিমানের স্বরে বললে, আমি হেঁটে যাব। মল্লিকসাহেবের দুচোখে কৌতুক, সামস মিঞার দিকে মুখ করে বললেন, ছেলের আমার সম্মানে লাগছে, অ-সামস, গোসা হইছে বেটার—বলে চারধারের নির্জনতার বুকে দোলা দিয়ে মল্লিকসাহেব হা-হা করে হেসে উঠলেন।

ওরা তোমাদের নাগাল পায় নি মা। সে-রাত জানিক শেখের আশ্রয়ে কাটিয়ে পরদিন ভোরের ট্রেনেই তোমরা সীমান্তের ওপারে পাড়ি দিয়েছিলে। আমার কথা তোমাদের মনে হয় নি, কুলবিগ্রহের কথা ভুলে গিয়েছিলেন আমার সাংখ্যস্মৃতিতীর্থ ধর্মিষ্ঠ পিতা, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের ছন্দ সে-দিন তোমরা হারিয়ে ফেলেছিলে মা, নিরাপত্তার শরীরটাকে সে-দিন তোমরা ছুঁতে চাইছিলে শুধু। দর্শনা পেরিয়ে গিয়ে সাংবাদিকদের কাছে তোমরা যা বলেছিলে তা পড়তে পড়তে লজ্জায় গ্লানিতে অপমানে তোমাদের অভিসম্পাৎ দিয়েছি, রমজানের মতো কোনো গুণ্ডার ছুরিতে এর চাইতে তোমাদের যে মরে যাওয়াও ভালো ছিল মা। কাগজখানা ফিরোজই নিয়ে এসেছিল, হাসতে হাসতে বলেছিল, পড়ে দেখুন। এর নাম হলো সৎ সাংবাদিকতা। তারপর গম্ভীর

হয়ে গিয়েছিল, একবুক জ্বালা নিয়ে বলেছিল, আগুনটাকে কিছুতেই নিবতে দেবে না এরা। বড়ো বড়ো হরফে সংবাদের শিরোনাম সাজিয়েছিল ওরা: "পূর্ব পাকিস্তানের শহর-গ্রামে হিন্দুমেধ যজ্ঞ"···স্টাফ রিপোর্টারের কলমে পঞ্চম পৃষ্ঠায় তোমাদের বিবরণ এবং বিবৃতি···"প্ল্যাটফরমের এক নিভৃত কোণে · শহর হইতে সত্ত আগত পরিবারটি বসিয়াছিল। শ্রীতারাকিঙ্কর ভট্টাচার্য সাংখ্যস্মৃতি-তীর্থ মহাশয়ের পূর্ব বাঙলাব্যাপী খ্যাতি ছিল। স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত কিছু সমেত পাণ্ডিত্যের এই সম্পদটিও তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে। আর ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে তাঁহার একমাত্র কন্যাকে। তিনি বলেন যে, বাটির পশ্চাৎসংলগ্ন অরণ্যে সপরিবার তাঁহারা আত্মগোপন করিয়াছিলেন। নরপিশাচ হানাদারেরা সেখানেও আক্রমণ চালাইয়া পিতামাতার সম্মুখ হইতে তাঁহাদের একমাত্র কন্যাটিকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। সাংখ্যস্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলেন, সমগ্র মুসলমান জাতিটাই আজ খেপিয়া গিয়াছে, জীবনের সব মূল্যবোধগুলি উহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে।···" আমি ফিরোজের দিকে তাকাতে পারছিলাম না, ও আমার খানিকটা দূরেই বসে ছিল। চোখ-মুখ জ্বলছিল আমার কপালের শিরা দুটো দপদপ করছিল, মস্তিষ্কের কোষে কোষে অসহ্য যন্ত্রণা, কাগজটাকে দুমড়ে মুচড়ে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। মুসলমান পাড়ার বর্ষীয়ান কৃষক জানিক শেখ তার স্ত্রী ফতেমা বিবির কথা তোমরা কি করে ভুলে গেলে মা, এরা তোমাদের আশ্রয় দিয়েছে, ভোর ভোর রাতে চারজন মুসলমান চাষীর প্রহরায় এরাই তোমাদের স্টেশনে পৌছে দিয়েছে, কলকাতা অব্দি তোমাদের যাওয়ার খরচা দিয়েছে এরাই, পরিশুদ্ধ বিবেক এই মানুষগুলোর যে মূল্যবোধ—তার কোনো স্বীকৃতিই তোমরা দিলে না মা। ফিরোজের কথাটাই হয়তো সত্যি, ও বলেছিল, মানুষের ইতিহাসে কখনো কখনো দুঃসময়ের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। সে-আঁধারে শত্রু-মিত্র স্পষ্ট করে চিনে নেয়া মুস্কিল। এর জন্যে কাউকে দোষ দিয়ে লাভ কি বলুন।···

· ·

মল্লিক সাহেবের পরিবার আমাকে নিয়ে ক্রমশ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। সে-রাত তো একরকম করে কেটে গেল। পরদিন ভোর থেকেই সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে বসেছিলেন ওঁরা, মল্লিকসাহেব মল্লিকসাহেবের স্ত্রী পপি অনেকক্ষণ ধরে সঙ্গোপনে আলোচনা করেছিলেন, ফিরোজের মা তারপর আমাকে বলেছিলেন, তোমার কোনো দোষ নাই, এই বেলাটা জল খাইয়া কষ্ট

কইরা কাটাইতে হইব মা। তোমার বাপ-মার খবর এ্যার মধ্যেই পাওয়া যাইবো। তা ছাড়া, দয়াময়ী বাড়িতে তোমার স্বজাতিরা সব আছেন। সেইখানেও থাকতে পারবা। ঐ বেলার মধ্যে একটা কিছু ব্যবস্থা ঠিকই হইয়া যাইবো, ভাইব না মা।

দুপুরে ফিরোজ ফিরে এলো, জানা গেল তোমরা আর এখানে নেই। তার কিছুক্ষণ বাদেই মল্লিকসাহেব ফিরেছিলেন, তাঁর সারা মুখে চিন্তার ছাপ, আমাকে ডেকে বিপন্নের মতো হেসে বলেছিলেন, তুই এইখানেই থাক মা। নিজে রাইন্ধা খাইতে পারবি তো। তরে যেখানে সেখানে পাঠাইতে পারি না, আমার একটা দায়িত্ব আছে রে। পরে জেনেছিলাম মা, দয়াময়ী বাড়িতে আমার 'স্বজাতিরা' আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি হন নি, ফিরোজ এবং আমাকে জড়িয়ে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করেছিলেন ফুলবেড়ের চ্যাটার্জি কাকা, মল্লিকসাহেব বলেছিলেন, চ্যাটার্জি, সময়টা খারাপ, তাই তুমি বাইচা গেলা হে।…

মল্লিক সাহেবের বাড়িতে না থেকে আমার উপায় ছিল না মা। পাপপুণ্য শুচিতা ইত্যাকার সব অনুষঙ্গী বোধগুলো এবং তোমাদের মারফৎ পাওয়া হিন্দু সমাজের জটিল সংস্কারগুলো এই সময় থেকেই আমার ভেতর ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে লাগল, ক্রমশই এ-ধরনের একটা ধারণা গড়ে উঠতে লাগল যে চতুর এবং করায়ত্ত কৌশলের মানুষেরা অপরের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বাজারে যেমন করে অচল মুদ্রা চালিয়ে থাকে তেমনি করে কিছু সংস্কার কিছু বোধ তোমরা আমাদের ভেতর চালিয়ে দিয়েছিলে। তিনদিন পর ফিরোজের মা-র রান্না খেতে আমার কোনো সংস্কার তাই আহত হয় নি মা। যে-সমাজ আমাকে রক্ষা করতে পারে নি, বিপদের বড়ো ঘূর্ণির আবর্ত থেকে নিরাপত্তার কোনো দ্বীপে আমাকে পৌঁছে দেয় নি, অথচ আমার সর্বাঙ্গে দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে যে-সমাজ এবং সমাজের মানুষগুলোর বাধেনি, সে-সমাজের কোনো বিধান কোনো সংস্কার মেনে চলতে হলে নিজেকে আরো অনেক অনেক নিচে নামিয়ে আনতে হতো মা।

অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসতেই ওদের সমাজেও কথাটা উঠেছিল, মুখে মুখে তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল, দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পরেও বয়স্কা হিন্দু মেয়েটাকে মল্লিকসাহেব রেখেছেন কেন। যে-দিন মল্লিকসাহেব এবং তাঁর স্ত্রীর উদ্বিগ্ন আলোচনা শুনতে পেলাম, তার পরদিনই মল্লিকসাহেবকে

বলেছিলাম, আমি হিন্দুস্থানে চলে যেতে চাই। এর ঠিক পঁচিশ দিন বাদে মল্লিকসাহেব বলেছিলেন, তোমার বাপ-মার ঠিকানা পাইছি। শেরপুরের তিন আনির নায়েব মশয় আইছিলেন বিনিময়ের বন্দবস্ত করতে, তার কাছেই শুনলাম সব।

এবং তিনদিন পর ওরা সকলে মিলে আমাকে ট্রেনে তুলে দিলে। সবাই কাঁদছিল ওরা, মাগো, আমিও কাঁদছিলাম, মল্লিকসাহেব এবং তাঁর স্ত্রীকে জোর করে প্রণাম করেছিলাম; দেখতে দেখতে সিংজানী স্টেশন স্টেশনের স্টাফ কোয়ার্টার পি-ডবলু-আই-এর বাংলো জোড়া কৃষ্ণচূড়া শহর নাট্যমন্দির আমার আবাল্যের শহর দৃষ্টির পরিধি থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল, একবুক শূন্যতা নিয়ে আমি হাহাকার করে উঠেছিলাম।

ফুলছড়ি ঘাটে এ-পারের ট্রেনে চেপেছিলাম রাত প্রায় আটটায়। ফিরোজ চা নিয়েছিল, আমাকে দিয়েছিল। সারাটা পথ কোনো কথা বলে নি ও, গম্ভীর মুখে বই পড়েছে। মল্লিকসাহেবকে যেদিন বলেছিলাম আমি হিন্দুস্থানে চলে যেতে চাই, তারপর থেকেই ফিরোজ আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত। ট্রেন চলতে শুরু করল, এক সময় জেটি স্টিমার যমুনার অস্পষ্ট গাত হাজাকের আলোয় উদ্‌ভাসিত হোটেল ক্রমশ মিলিয়ে গেল। ফিরোজ আমার খানিকটা দূরে পা ছড়িয়ে দিয়ে বই পড়ছে, ওর সারা মুখে মুখোশের গাম্ভীর্য। পরিমিত আলোকের কামরায় আমরা ছাড়া যাত্রী আর দুজন, ট্রেন চলার সঙ্গে সঙ্গে একজন র‍্যাপার জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অপরজন একটা মোটা ফাইল খুলে পড়ছে—লাল রঙের মোটা পেন্সিল দিয়ে কাগজে দাগ কাটছে। বাইরের চলমান রাত থুম থুম অন্ধকার আর কুয়াশায় জড়ানো।

ফিরোজকে আমি নিষ্পলকে দেখছিলাম, ওর এই নিস্পৃহ আচরণে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, দুচোখে যন্ত্রণা নিয়ে এক সময় জিগ্‌গেস করেছিলাম, কথা বলবেন না? প্রশ্নটা মনোযোগ দিয়ে শুনল ও, চোখে চোখ রাখল, শব্দ করে বইখানা বন্ধ করল, তারপর হালকা সুরে বলল, বলুন কি জানতে চান? আমার বুকের ভেতর জমে থাকা চাপ চাপ বেদনা, মাগো, ঠিক এই সময়ই এক প্রবল অভিঘাতে তরলিত কান্নায় গলে গলে পড়ল, কামরার ভেতরকার পরিমিত শরীরের রাত বাইরের চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত থৈ থৈ নিশা সাদা কালো স্ট্রাইপের সুসজ্জিত পুলওভারের ফিরোজ ক্রমশ এবং ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল। জানালায় ভাঁজকরা হাতের ওপর মুখ

শুয়ে আমি অশিক্ষিত গ্রাম্য রমণীর মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগলাম ; চলমান ধাতব ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ফিরোজের অপ্রস্তুত কণ্ঠ বাজতে থাকল, এই, কি হলো, এই—

রাত তখন গভীর, কাছের এবং দূরের ছায়া ছায়া দৃশ্যপট ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমরা চলেছি, ইলা মিত্রের নাটোরের ওপর দিয়ে আমরা তখন যাচ্ছি, ফিরোজের হাতে আমার হাত, বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া আমাদের চোখে মুখে, মাঝে মাঝে শিরশির করা একটা অনুভূতি শিরদাড়া ঠেলে ঠেলে ওপরের দিকে উঠছে, ঠোঁট জমে বরফ ; দূরের আকাশে কোথাও চাঁদ উঠেছিল হয়তো, অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছিল। এমনই একটা মুহূর্তে ব্রতকথা বলার ঢংয়ে ফিরোজ কথাগুলো বলেছিল, পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে যখন বাজি ধরা হয়, দ্রৌপদী তা জানতেন না। কিন্তু জুয়াড়ি স্বামীর প্রলোভনের পরিণতি থেকে তিনি রেহাই পান নি। উপ-মহাদেশ সদৃশ আমাদের এই ভারতবর্ষে তেমনি এক রাজনৈতিক জুয়াখেলায় আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের বাজি ধরেছিলেন কিছু ক্লান্ত আর ফুরিয়ে যাওয়া নেতা। দেশটা ভাগ হয়ে গেল, তার সাথে সাথে আমরাও। একটা ঘটনার কথা মনে আছে। আমার বাবা, আজীবন যিনি মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেছেন, দেশভাগের কিছুদিন বাদেই তিনি আমাকে বলেছিলেন, মুন্না, এ-দেশে আর থাকা যাবে না রে। কাদের মিঞা সামসকে ডেকে নিয়ে বলেছে, আপনাদের উপর সকলেই খেপে আছে। ভালো চান তো লীগের মেম্বর হয়ে যান। না হলে বিপদ আপনাদের পায়ে পায়ে। মল্লিকসাহেবকেও বলবেন। বাবা বলেছিলেন, এ-দেশ থেকে হয়তো চলেই যেতে হবে। ঠিক এর কিছুদিন বাদেই কোলকাতায় দাঙ্গা শুরু হলো। প্রতি দিনই খবরের কাগজ খুলে দু-চোখে ঘষা ঘষা দৃষ্টি নিয়ে বাবা আত্মনাদের সুরে বলতেন, মুন্না, গান্ধিজী জওহরলাল মওলানা—ওঁরা কি হেরে যাচ্ছেন, মুন্না ? বাবার বিশ্বাসের অখণ্ড ভূমিটাতে কি করে ধীরে ধীরে ধস নামল, তা আমি দেখেছি। আমার আজীবনের সংগ্রামী পিতা সংগ্রামের কথা ভুলে গেলেন। কোনো জাতির জীবনে এর চাইতে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি আর কিছু হয় না। আজ আমরা সেই ট্র্যাজেডির কোনো একটা অঙ্কের কোনো একটা দৃশ্যের পাত্রপাত্রী। আমি আপনাকে দর্শনা অব্দি পৌঁছে দেবো, আপনাকে আপনার নিজের দেশে যেতে হবে, যে-দেশ আপনি চেনেন না যে-দেশের মানুষের সাথে আবেগের কোনো মেলবন্ধন আপনার ঘটে নি যে-দেশের আকাশ বাতাস নদী নক্ষত্র

পত্র পুষ্প সব কিছুই আপনার অচেনা যে-দেশের পথ সুস্পষ্ট কোনো ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার প্রতীক কিনা তা আপনি জানেন না ; অথচ সে-দেশের কোনো অচেনা যুবক প্রথম পরিচয়েই কত সচ্ছন্দেই না আপনাকে বলতে পারবে, বুলা তোমাকে আমি ভালোবাসি—

মাগো, দেহ-মনের সমস্ত তন্ত্রিগুলো যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ফিরোজ কামরা থেকে নামল, জানালার কাছে এসে বলল, সাবধানে যাবেন। একা একা পথ চলার তো অভ্যেস করেন নি। চিঠি দেবেন, পৌঁছলেন যে সে খবরটা অন্তত। আমরা যারা এ-পাড়ে আছি, তাদের সম্পর্কে কোনো মিথ্যে ধারণাকে প্রশ্রয় না দিলে ভালো লাগবে। ট্রেন চলতে শুরু করল, ট্রেনের সমান্তরালে ফিরোজ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল, বলল, আপনাদের হিন্দু সংস্কার সম্পর্কে আমার কিছু ভীতি আছে। সম্মানের আসনখানা যদি সেখানে খুঁজে না পান, নিজের দেশ এবং আমাদের কথা সেদিন ভুলে যাবেন না, ফিরে আসবেন, ফিরে আসবেন, ফিরে···

গাড়ির শব্দে ফিরোজের উঁচু পর্দার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল, সারা শরীরে অসহায়তার মুদ্রা এঁকে মাঝ প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, হাত তুলে প্রাণপণ চীৎকার করে কিছু একটা বলল, তা আমার কানে পৌঁছল না, ওর বলিষ্ঠ চওড়া ফ্রেমের শরীর আমার বিস্ফারিত দু-চোখের আয়তনে নানা আকার নিয়ে অবশেষে একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আমার দেহ আমার মন হৃদয় এবং অনুভবের তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যে-শব্দ এতক্ষণ নিচু পর্দায় আলাপের মতো বাজছিল—সেই মুহূর্তে তিন ভুবনের আকাশ এবং বায়ুস্তরে দোলা দিয়ে তা গমগম করে বেজে উঠল, রোজ রোজ রোজ······

আলোকিত পথ উজ্জ্বল ছিমছাম দোকানপাট অনেক মানুষ এবং যানবাহনও শহরের শেষ প্রান্তে নতুন গড়ে ওঠা উপনিবেশে রিক্সাওলা আমাকে নামিয়ে দিলো, বলল, এটাই নোতুন পল্লী। ভেতরে যেতে সাহস করি না আমরা। ভাড়া নিয়ে ভীষণ কুচ্‌কচালেপনা করে এরা, দল বেঁধে ঠ্যাঙায় পর্যন্ত। ভেতরে গিয়ে জিগ্‌গেশ করুন, পেয়ে যাবেন ঠিক।

নতুন পল্লীর পথ অন্ধকার, বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ, কাছের আকাশে

অন্ধকারে একটা আকাশপ্রদীপ জ্বলছে। খানিকটা হাঁটতেই ডান হাতে চায়ের দোকানটা পেলাম, অনেক কণ্ঠের জটলা সেখানে, তোলা উনুনে টগবগ করে জল ফুটছে, হ্যারিকেনের পরিমিত আলোয় জটলার মানুষগুলোকে অস্পষ্ট ধন্দা ধন্দা মনে হচ্ছিল। আমাকে দেখে ওরা থামল, অগাধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল, ঠিকানা লেখা কাগজটা ওদের দিকে বাড়িয়ে দিলাম আমি, কাগজখানা হাতে হাতে ঘুরল, আর ওদের দৃষ্টি আমাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে লাগল, অবশেষে একজন প্রশ্ন করল, আপনি পণ্ডিত মশাইর মেয়ে?

......

অ। পাকিস্তান থেকে আসছেন?

......

তার মানে—

আপনেরেই মোসলারা ধইরা লইয়া গেছিল? পুংগির পুইত্‌ গো অ্যাকবার পাইলে—

হালারা আপনেরে ছাইরা দিল ক্যান?

আরে 'ভুগ' করা তো হইয়াই গ্যাছে, বুঝলা না, হ।

আঃ, কি হচ্ছে! বলে ভেতর থেকে একজন উঠে এলো। কাছাকাছি এসে বলল, আসুন আমার সাথে।

আমি গলায় পষ্টাপষ্টি কথা কই—

কই আসুন। বলে সে আবার ডাকল।

আমার পা উঠছিল না, সারা শরীর পাথরের মতো ভারী, আমার চারপাশের অন্ধকার কাঁপছিল, অন্ধকারের বুকে রাশি রাশি আতসবাজি জ্বলছিল নিবছিল নিবছিল জ্বলছিল···

রাস্তায় আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে একটা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল সে, খানিকবাদে তোমার চীৎকার ভেসে এলো, তারপর শুনতে পেলাম তোমাদের নিচু গলার ফিশফিশানি, অস্বস্তি আতঙ্ক এবং অজানা সব বিভীষিকার মেঘেরা আমার বুকের ভেতর গুরগুর করে ডেকে উঠল, দু-চোখে অন্ধকার নিয়ে জিয়লগাছের তলায় পড়ে যেতে যেতে দু-হাতে মাটি আঁকড়ে বসে পড়লাম আমি। একসময় বেরিয়ে এলেন আমার সাংখ্যস্মৃতিতীর্থ জনক, দূরত্ব বজায় রেখে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গ বেষ্টন করে শুভ্র যজ্ঞোপবীত, তাঁকে দেখে সে-রাতে ভয় পেয়েছিলাম মা, তিনি ভরাট গলায় তাঁর সিদ্ধান্ত

জানালেন, এইখানে তোমার কোন স্থান নাই। তোমারে আমরা কেউ ফিরে চাই নাই, তোমারে আমি গ্রহণ করতে পারি না। বলে ভেতর বাড়িতে ঢুকে গেলেন তিনি। আমার চোখের সামনে অন্ধকারের ব্যাপক রোমশ শরীর দুলে দুলে নাচতে লাগল, পায়ের তলাকার মাটিতে ভূমিকম্পের দোলা, পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আকাশপ্রদীপ একচক্ষু প্রেতের মতো হিমশীতল চোখে নিষ্পলকে আমার দিকে চেয়ে রইল, আমার চারধারে শ্বাসরোধী শূন্যতা, আমার সজ্ঞান সত্তা ক্রমে ক্রমে বায়ুভূত নিরাশ্রয় নিরালম্ব হয়ে সে শূন্যতার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল, এই সময়ই যেন তোমার চাপা চাপা গলা শুনতে পেয়েছিলাম, কোন মুখে ফিরা আইলি তুই! তুই আইলি ক্যান, বুলা, বুলারে, তুই আইলি ক্যান! কক্ষপথের এই পৃথিবী থেকে ঘূর্ণমান গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে আমাকে যেন ছুঁড়ে দিলো কেউ, পাক খেতে খেতে শূন্যতা থেকে গভীরতর শূন্যতায় অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারে ভাসমান ভেলার মতো আমি চলতে লাগলাম, বানের মুখে কুটোর মতো এক সময় হারিয়ে গেলাম।···

ভেজা ভেজা মেঝের একটা ঘরে যখন জেগে উঠলাম, বাইরে তখন অনেক লোকের উচ্চকিত জটলা; পচা গোবর এবং গরুর চোনার গন্ধে ঘরের হাওয়া ভারী, চেঁচা বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে হুহু করে আসছিল হৈমন্তিক বাতাস, ঘরময় মশার গুনগুন শব্দ, চারধার থেকে আমাকে ঢেকে ধরছিল ওরা. বাইরের জটলার কথাবার্তা আমার কানে আসতে লাগল, হুঁকো টানার আওয়াজ, হ, এইটা আপনে ঠিকৈ কইছেন। সমাজ টিকাইয়া রাইখতে হৈলে তার বিধানগুলাও মাইনা চইলতে হৈব, সে বিধান কঠিন হইলেও তা মাইনতে আমরা বাইধ্য।

আমার একটা কথা আছে। এটা যদি বিচারসভা হয়, তা হলে স্পষ্ট করে বলি—আমার বাবা এ-সভার বিচারক হতে পারেন না। নিজের মেয়েকে মুসলমান গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে উনি প্রাণ দেন নি কেন জিগ্গেস করুন আপনারা—

শব্দর!

শুধু আমার বাবা নয়, বিচার করার যোগ্যতা আপনাদের কারুরই নেই। বাস্তুভিটা কুলদেবতা আজন্মের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে রাতের অন্ধকারে যারা

পালিয়ে এসেছেন, সেই পলাতকদের কোনো বিচার কোনো বিধান আমরা মানি না। বুলা এখানে থাকবে।

হারামজাদা—

বাবা বোধহয় দাদাকে মারলেন, দাদা বাইরে চলে গেল। তারপর অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল ওরা, হুঁকো টানার শব্দটা জেগে থাকল শুধু। হঠাৎ আমার কানের গোড়ায় একটা শব্দতরঙ্গ উঠল, হায়্-বা, দুর্গন্ধের এই ঘর এবং জটলার আঙিনায় আওয়াজটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘুরপাক খেল, নৈঃশব্দ্যের জটলায় প্রাণ ফিরে এলো, দরাজ কণ্ঠে কেউ মন্তব্য করল, মা ভগবতী পর্যন্ত মাইয়াটার লগে থাকতে চাইতেছেন না, আর উনি শাসাইয়া গেলেন, বুলা এইখানে থাইকব। উগ্রবীর্যের এই অর্বাচীনগো হাতে আমাগো ধর্ম সংস্কার কোন কিছুই রক্ষা পাইব না, এ-ই হইল তার ইঙ্গিত।

ভাবনের অনেক কিছুই আছে, বুঝলা। কথাটা অবশ্য শঙ্করবা ভাল কয় নাই। তবে এইটা তো সত্যই, পোলাপানের চোখে আমরা ছোট হইয়া গেছি, হাইরা গেছি আমরা। গোসাইজী কি কন।

হু—ম।

আমি একটা কথা কই। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কর একটা, সৎ ব্রাহ্মণ দেইখা কিছু দানধ্যান কর, মস্তিষ্ক মুণ্ডন করাইয়া পঞ্চগব্য খাওয়াইয়া মাইয়াটারে পরিশুদ্ধ কইরা লও। মাইয়াটা না ফেলে যাইব কৈ কও? তারাকিঙ্কর, তুমি কি কও?

আমি তা পারি না খুড়ামশয়। যবনের স্পর্শদোষ ঘটছে যে মাইয়ার, তারে আমি স্থান দিতে পারি না। পিতৃপুরুষরে আমি নরকে পাঠাইতে পারি না। এই পরামর্শ আপনেরা আমারে দিবেন না।

ত্যাখ, যা ভাল বোঝ কর।

এরপর যে যার বাড়ি চলে গেলেন, অন্ধকার উঠোন থেকে তোমার চাপা-গলার কান্না শোনা গেল মা, বাবার ভারী গলার আওয়াজ উঠতে লাগল মাঝে মাঝে, মা জগদম্বে মাগো—তোমরা দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের দুই সঙ্গী সেই নাগরিক অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন দুটি দ্বীপের মতো বসে রইলে, রাত ক্রমশ বেড়ে চলল, মশার গুঞ্জন নিদ্রিত পাড়ার জরাট নিঃশ্বাস দুর্গন্ধের বাতাস আতঙ্ক আর অস্বস্তিতে মুহূর্তগুলো কাটতে লাগল আমার, খড়মের শব্দ তুলে

উঠোনময় পায়চারি করতে লাগলেন বাবা, পায়চারি করতে করতে বললেন, শঙ্কররে এই সংসারে আর স্থান দেওয়া চলে না। কথাটা অরে জানাইয়া দেওয়া ভাল। শুনতাছ নাকি? তোমার কান্না থেমে গিয়েছিল, কথাটা বুঝতে অনেকটা সময় নিয়েছিলে তুমি, তোমার গলায় বাংগলা নয় মা, নিরাপত্তা-হীনতার আতঙ্ক ফুটে উঠল, শঙ্কর চইলা গেলে খামু কি আমরা? অর চটকলের চাকরিটাই তো আমাগো ভরসা। মা দয়াময়ী, এত লোক মরলো আর এই মাইয়াটারেই তুমি বাঁচাইয়া রাখলা মা! আমার সংসারে সর্বনাশের আগুন লাগাইয়া দিল মাইয়াটা। কি যে হইব। আমি আর ভাবতে পারি না। ভগবান···

তোমাদের স্বস্তির সংসার ছেড়ে আমি চলে এলাম মা। রাত তখন অনেক, আঁধার ফিকে হয়ে আসছিল, দরজা ঠেলে বাইরে এলাম আমি, নৈঃশব্দ্যের রাত, হাওয়ায় শীতের আমেজ, বিস্তারিত আকাশে অনেক নক্ষত্রের ঝাঁকিবুকি, নতুন পল্লীর সারি সারি বাড়িগুলোকে বন্ধ্যারমণীর জরায়ুর মতো মনে হচ্ছিল, তোমাদের পথগুলো বড্ডোই সঙ্কীর্ণ, তোমাদের ছেড়ে আসতে আমি এক ফোঁটাও চোখের জলের অপব্যয় করি নি মা, আমার অন্তর্গত ক্লান্তির শরীরটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিচ্ছিল না আমাকে, বুকের ভেতরটা ধ্বক ধ্বক করে ক্রমাগত বেজে চলছিল, আমি পড়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, হামাগুড়ি দিয়ে চলছিলাম, পাহারাওলা কুকুরের মতো তোমাদের স্বস্তির সংসারটা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মা···

পথের শেষে তবু পৌছতে পারি নি মা, পৃথিবীর এই গোলার্ধে আমার একটিমাত্র আশ্রয়ই আছে, সম্মানের সিংহাসন আর একবুক ভালোবাসা নিয়ে ফিরোজ সেখানে প্রতীক্ষায়, সেখানে পৌছতে পারি নি, আমার সংস্কার সেখানে আমাকে পৌছতে দিচ্ছে না, আমার সংস্কারের দুর্গে আজ আমি স্বেচ্ছাবন্দী, আমার রক্তস্রোতের পাকে পাকে জড়ানো এই শৃঙ্খলটাকে আমি টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলতে চাইছি, আমার অন্তর্গত আমির কাছে আমি হেরে যাচ্ছি মা।···

আমি যেখান থেকে লিখছি, দুটো দেশের সীমান্ত সেখানে মিশেছে। দু-পা হাঁটলেই আমি আমার দেশ এবং ফিরোজের কাছাকাছি চলে যেতে পারি,

ওপারের বিস্তীর্ণ সবুজ ধান-খেত ঘন নীলের গাছগাছালি অম্লান আকাশ এবং এ-সবের মাঝখান দিয়ে একটি ভালোবাসার মনের আমন্ত্রণ সব সময় আমার কাছে পৌছয়, সে-আমন্ত্রণে সাড়া দেবার শক্তি কখনো পাব—এ-বিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে আছি মা। ইতিহাসের আর-এক কালান্তক দাবানলে আমাদের সংস্কার আমাদের সঙ্কীর্ণতা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তার হাত সেদিন তুলে নেব আমি, বলব, রোজ রোজ, সে আমার হাত তুলে নেবে, বলবে, বুলা বুলা বুলা। মাগো…

বিজয়ের বসন্তে

ভিয়েন ফুয়ং

চার বছর পূর্ণ হলো।   সময় কী দ্রুত চলে যায়
আমাদের সৈন্যদল গড়ে ওঠে অরণ্যের গাছের মতন
আমাদের পদক্ষেপে পেন্টাগন কাঁপে
প্রায় গোটা দেশটাই আমাদের করতলগত।
অনেক অনেকখানি বিমুক্ত এলাকা
এই ব্যাপ্ত আকাশের নিচে আমি দয়িতাকে কাছে পেলাম না।
এখন উৎসব রাত্রি।   কী ভাবি তোমায় নিয়ে বলো :
চারটি বছর গেল, তবু আমরা মিলতে পারি নি।

শুধু একবার আমি ছোট্ট একটি চিরকুট পেয়েছি।   জনৈকা
সংবাদবাহিকা সেই চিঠিখানি পৌঁছে দিয়েছিলেন,
চিঠিতে রক্তের ছিটে, পথিমধ্যে শত্রু তাঁকে মেরে ফেলেছিল
মারা গেলেন, তবু সেই চিঠিখানি ঠিক পৌঁছেছিল
আর তাঁর শেষবার্তা :   "ও তোমায় ভালোবাসে, ভাবে।
ও রয়েছে শহরেতে সংগ্রামী বাহিনীর পুরোভাগে জেনো।"

আমার বুকের মধ্যে সায়গন ভাই প্রিয়তর
পথে পথে যেন দেখি তোমারই ছায়ার সকার
মেদিনীকাঁপানো যুদ্ধে সমপিত 'অগণন' সৈনিকের রনরোলে শুনি
তোমারই কণ্ঠস্বর !
উৎসবের রাত !   তবু মোছেনি রক্তের দাগ সাইগনের পথে
অসুরেরা কখনও বসন্ত চায় না জনতার।

তবুও আনন্দ জাগে হৃদয়ে হৃদয়ে :
বিজয়ের দেরি নেই, নতুন পোষাক পরে যুদ্ধে যেতে হবে।
তোমাদের স গ্রাম মহীয়ান। রাইফেল হাতে
সাইগনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাব, কণ্ঠে নিয়ে স্বাধীনতার গান
মহান নগরে আমি পুঁতে দেবো বিজয় পতাকা
হিরণ্ময় তারা জ্বলবে হো চি মিনের শহরের মাথার ওপর।

তোমার প্রতীক্ষা করি। এবার নতুন সাজে সাজো
কামানেরা স্তব্ধ হলে আমাদের পরিণয় হবে।
মুক্ত শহরের 'পরে নীলাকাশে বিজয়ের বসন্ত উৎসবে
দুটি শ্বেত কবুতর ডানা মেলে দেবে।

অনুবাদ : শিবশম্ভু পাল

কর্মসংস্থান অফিসের সামনে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

তার চেয়ে চলো অন্য কোথাও দল বেঁধে যাই,
হাড়ের মালা গলায় পরে পথ চলি চলো।
চোখের জলে ভিজবে চিঁড়ে, হয় কখনো?
হাত কচলে নকরি পাওয়া স্রেফ দুরাশা।
কীর্তিনাশার নেশায় মেতে করলে কিছু
এইটুকুতো হবেই হবে, লাগবে চমক—
কালাপাহাড় কালাপাহাড় কালাপাহাড়।

লাইনে বসে দাঁড়িয়ে থেকে দিন কেটে যায়,
নাটক-নভেল শেষ হয়ে যায় পরের পরে ;

এইভাবে কি সহজ ব্যাপার ধৈর্য ধরা ?
তার চেয়ে চলো অন্য কোথাও দল বেঁধে যাই,
ভেঙেচুরে পথ করে নিই আপন হাতে—
কালাপাহাড় কালাপাহাড় কালাপাহাড় !

কীর্তিনাশার নেশায় যেতে করলে কিছু,
বানের জলে ভাসিয়ে দিলে সারাটা দেশ ,
এইটুকুতো হবেই হবে, লাগবে চমক
কালাপাহাড় কালাপাহাড় কালাপাহাড় !
অনাহারী ছিন্নবসন নিরাশ্রয়ের
আর কত লোক এমনি হবে আত্মঘাতী ?
কালাপাহাড় কালাপাহাড় কালাপাহাড় !

রাত্রি

চিত্তরঞ্জন পাল

বাদুড়-ডানায় সন্ধ্যা নামে ধীরে জাহ্নবীর তটে।
দিগন্তে ধূসর ক্লান্তি। গ্রামান্তরে বয়োবৃদ্ধ বটে
রাত্রির আবাসে ফেরে দিনান্তের বিচঞ্চল পাখি।
ঝিঁঝিঁর নবৎ বাজে। তমসার হাতে বাঁধে রাখী
নিদ্রার অদৃশ্য দূতী। স্তরে স্তরে অন্ধকার জমে।
উৎকর্ণ ঘুমের ছন্দ। নিশাচর পশুরা বিক্রমে
ঘোরে ফেরে। আরণ্যক চোখ খোঁজে সুলভ শিকার।
ফেনিল মদিরা পাত্র। বর্ণোজ্জ্বল স্ফূর্তির বিকার
পলকে পলকে আঁকে লালসার কলঙ্কিত ছাপ।
বিবশ চৈতন্য কারও। কারো ঘরে চন্দ্রবেণী পাপ।

কত হাসি বেশরম। কত অশ্রু উষ্ণ উপাধানে।
দুশ্চিন্তায় দীর্ঘশ্বাস। মন খোঁজে অন্য কোনো মানে
সন্তঃসহ বেদনায়। পূর্বাশায় উষা শিবারবে।
শুকতারা দৃষ্টি হানে সোনালী সূর্যের অবয়বে।

একুশ বছর আগের কথা

প্রফুল্লকুমার দত্ত

প্রত্যহ সন্ধ্যায় একটু ঈষদুষ্ণ জ্বর, ওতে মানুষ মরেনা।
সামান্য যা রোগা হয়ে গেছো—
ভালো খাওয়া-দাওয়া, কিছু ওষুধ এবং
বিশ্রাম কয়েকটা দিন—সব সেরে যাবে।
একুশ বছর আগে এইসব কথা বলেছিলাম তোমাকে

ভালো খাওয়া-দাওয়া, এই কথাটার মূল্য যথাযথ
বুঝিনি, ওষুধ মেলে কী দিলে, বুঝিনি ; কিংবা বিশ্রাম শব্দটা
বাস্তবে কখনো সত্য কি না, তা বুঝিনি—
প্রবীণ বাগ্মিতা কিছু শুনে শুনে বলেছি যদিও
এ-সবের অর্থ সেই একুশ বছর আগে কিছুই বুঝিনি !

স্বচক্ষে দেখেছি—ভালো খাওয়া-দাওয়া, ওষুধ বিশ্রাম—
তুমি কিছু পাওনি ! একটা নাবালক শিশুর মাথায়
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বোঝা নেমে আসছে, নেমে আসছে দেখে
প্রচণ্ড ঘৃণায় শেষ রক্তবিন্দু বমি করে, থুথু ফেলেছিলে
সংসারের মুখে ! আমি তখন কি জানতাম, রক্ত এতো মূল্যবান ?

প্রতিটি স্বপ্নের বুকে রক্তকরবী বৃন্ত, মৃতদেহ, জনাকয়
শ্মশানবন্ধুর চাপা কণ্ঠস্বর। তুমি ঠিক মৃতদেহ নও—
অন্যায় যুদ্ধের শেষ প্রতিবাদ! প্রতিবাদ বলেই কি একটা নাবালক
শিশুর মাথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বোঝা
চেপে আছে দেখে, তুমি স্বপ্নের প্রতিটি বৃন্তে আজো

তেমনি রোগা হয়ে আছ?

সেদিন অতটা পথ যেতে যেতে শুধু কি আমারই কথা ভাবছিলে?
শুধু কি ভালো খাওয়া-দাওয়া, কিছু ওষুধ এবং
বিশ্রাম নামক শব্দটার
প্রকৃত তাৎপর্যটুকু চোখ বুজে ভাবছিলে? কিন্তু আমি
এ-সবের অর্থ সেই একুশ বছর আগে কিছুই বুঝি নি।

পথের সূচনা

শুভাশিস্ গোস্বামী

যেরকম ধারাক্লান্ত মেঘ ভেঙে

রৌদ্র নয়, রৌদ্রের আভাস—

তেমনই নিশ্চেতন ছাব্বিশ ঋতুচক্রে

শান্তি মেনে নিয়ে

মনে হয় নিগ্রন্থি পথের সূচনা

হয়তো বা পাওয়া যাবে।

মাঝে মাঝে পৃষ্ঠদেশে পারিপার্শ্বিকের কড়া চাবুক

নির্মম আঘাত হানে,

তবুও তো মায়ের ভয়ের মুখে পদাঘাত ক'রে

রক্তকরবী আনে উদ্দাম কিশোর।

এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।
এভাবেই খুঁজে পেতে হবে সেই হরিণী-নিলয়।

মনে হয় নিগ্রন্থি পথের সূচনা
হয়তো বা পাওয়া যাবে।
গন্তব্য জানিনা, তবু যাত্রাই ধ্রুব
তীর্থযাত্রা নয়, তবু যাত্রাই ধ্রুব
একাকী যাত্রা নয়,
অন্ধকার যামিনীর একলা পথিক নয়,
হাতে হাত ধ'রে
মিছিলে মিছিলে মিশে
রক্তকরবী আনবে উদ্দাম কিশোর।

যে রকম মেঘ ভেঙে রৌদ্র নয়, রৌদ্রের আভাস
তেমনই নিগ্রন্থি পথের সূচনা
হয়তো বা পাওয়া যাবে।

প্রথমদিনের সূর্য

কালীকৃষ্ণ গুহ

প্রথমদিনের সূর্য
অগ্রাণমাসের ধানের ক্ষেতের সূর্য —
আমি তাকে চিনি, তাকে

উত্তরায়ণের পথে অবিকল্প অস্ত যেতে দেখেছি
বীজকণ্ঠ, ছড়িয়ে-পড়া শেষ আলো
সোনালী—

দিগন্তরেখার আকাশ বারবার চোখে পড়ে, দূরের
শালবন চোখে পড়ে, নম্র দিনান্তছটায়
সোনালী—

জীবনের পাশে এসে দাঁড়ায়
সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত. পাতা ঝরে
অবিরাম পাতা ঝরতে থাকে

আনন্দে বিপদে ঝরে জীবনের দিন
আদিগন্ত ছায়া, দীর্ঘ
ছায়া, যেমন

অন্তর-প্রকৃতির উৎসে বসে থাকেন ব্যক্তি
উত্তরের হাওয়ায় লুটিয়ে দেন, ওড়ে
রুক্ষ চুল, বাজে

আনন্দ-ভৈরবী, লাল ধুলো ওড়ে, পথে
পথে পথে সূর্যোদয়ের গান
সূর্যাস্তে করুণ, পথে

উত্তরায়ণের আলো, উত্তরের
হিম-হাওয়ায় লুটানো কিংশুক, বীজকণ্ঠ, ছড়িয়ে-পড়া
অগ্রাণমাসের ধানের ক্ষেতের সূর্য—

প্রথমদিনের সূর্য, যাকে পাতা-ঝরে-যাওয়া-মাঠে অবিকল্প অস্ত যেতে দেখেছি।

জন্মান্তর

রবীন সুর

রূপান্তরে তুমি নব রাজকন্যা শিল্পের উত্থান।
তুমি কী প্রাচ্যের ভাণ্ডী, জেটি ক্রেন, বিদীর্ণ হটারে
কেন্দ্রিত শ্রমের সিন্ধু প্রত্যহের যৌথ উৎপাদনে
রপ্তানি বোঝাই লরি সারারাত দ্রুত যাতায়াত,

অসংখ্য স্টীমার লঞ্চ, গাদাবোট ফেনিল স্রোতের
বাণিজ্যের উদ্বোধনে কটিকক্তি বিস্তরিত ভারতবর্ষের
প্রদেশ ধর্মের ধারা অব্যাহত নবীন প্রয়াগে
মন্দির মসজিদ গির্জা উদ্ভাসিত দীপ্ত গুরুদ্বার।

বারো-ঘর-এক-উঠানের বস্তি, গুমটি ঘরের
লেবেল ক্রসিং, রাস্তা, আগুনটানা ইঞ্জিনের
কানকাটা হুইসিল, সরগরম লোকোশেড, শান্টিং ঝংকারে
ব্যস্ততা ছড়িয়ে পড়ে, জড়িবুটি মাদুলি পাথরে
মাতাল মানুষগুলি জগদ্দলে মহরম গণেশ মিছিলে
তাড়িমদে এন্তোয়ার, রাসমেলা, ঘোষপাড়ার দোলের রাত্তির।

কররেখা খুলে পড়লে

দীপেন রায়

কররেখা খুলে পড়লে মানুষের মুখের চেহারা
অন্ধকারে
মাঠে ময়দানে
আলো ফেলে খোঁজে জন্মের নোঙর
কোন ঘাটের জলেতে বাঁধা আছে
মূল,
মূলে জীবনের রং
সাত ডুবুরীর হাতে
সাত ঘড়া হীরের মোহর।

কররেখা খুলে পড়লে মন জানে অচেনা ঝড়ের গন্ধ,
কার ঘর পোড়ে
কোনদিকে
মনের ভিতরের গন্ধ
শালবনের দাউ দাউ লাগে—
কোষগুলি
শরীরের ও মনের
শুষে নিচ্ছে
অন্তহীন জলের পিপাসা।

কররেখা খুলে পড়লে আছি স্বজন ভূগোলে,
ক্রমবিস্তারিত পটে
দাগ
পায়ের আঙুলের
দীর্ঘ চলাফেরায়,
পরিচিত মুখের আবরণ মুছে
বেরিয়ে আসে লাল
লাল কাঁকুরে পথের ধুলো
সারা দেহের দীর্ঘতায়।

রক্তাক্ত মধ্যাহ্নে আজ

অমিতাভ চক্রবর্তী

কোনো একদিন
আমের মুকুল ছিল
কামরাঙা পাখির অধর।

ধানীরঙ শাড়ি প'রে
হেসেছিল কবেকার রঙীন শৈশব।

মানুষ বন্দর-দ্বীপ
মিছিলের ঢেউ—
তারই মধ্যে ঘাসের সিঁদুর
বলেছিল রূপোলী কথার গল্প।

নিষ্কম্প খুশির আলো জেলেছিল কেউ
চিত্রিত আঁধারে।

রক্তাক্ত মধ্যাহ্নে আজ···

গেরস্থ ঘরের ছায়া সন্তর্পণে
পায়ে পায়ে···চৌকাঠ পেরোয়।

পূর্ণতার কথা মনে রেখে

শুভ বসু

অসংখ্য রাত ঘুম কেড়েছিস চোখে
অসংখ্য দিন হৃদয় জুড়ে জ্বালা
তোরই জন্য এই লোকে ঐ লোকে
সবাই সাজায় সোনার বরণডালা ॥

অথচ এ-বন্ধ্যাভূমি নিজেকে বৃষ্টির জলে
স্নাত দেখে নাই, এখানে দেখেনি কেউ
আদিগন্ত খোয়াই-এর অনন্ত বিস্তার—
অনুভব করে নাই ধবল তুষার
যেমন সূর্যের সাথে অনুভব বিনিময় করে।

শীতলপাটির দিন—সে কবে গিয়েছে চ'লে
অনন্ত প্রবাসে—এখন প্রবাস শুধু
আমাদের এই দেশকাল—আমাদের মনে ও মননে
এখন স্মৃতিও নয় সেসব আলাপ
যা শুধু সম্ভব স্বপ্নে—স্নাত অনুভবে।
অথচ ছিল কী সব আমাদের বিগতজীবনে?
স্বপ্ন আর সাধ ছিল—জাগরণঘুম,
দু-চারজনের মধ্যে বিনিময় ছিল, দু-চার নারীর মধ্যে
নির্ভেজাল রমণীয় ছিল—ছিল না পূর্ণতা,
কারণ পূর্ণতা এলে কোনোদিন এই ক্ষিতিময়
বর্তমান এরকম রিক্ততা হতো না।

যেহেতু তোরই জন্যে এখনো এখানে
নিরবধি অসংখ্য হৃদয় গান করে :

অসংখ্য রাত ঘুম কেড়েছিস চোখে
অসংখ্য দিন হৃদয় জুড়ে জ্বালা
তোরই জন্য এই লোকে ঐ লোকে
সবাই সাজায় সোনার বরণডালা ॥

নমস্কার করুন

জ্যোতীষ কণী

হাতে ডুগডুগি নিয়ে
নমস্কার করুন—
নরম গুড়ে চেটে নিচ্ছে
এই পিঁপড়েটাকে।

নমস্কার করুন—
(আপনার) বাড়ির নিচে ফাঁকা করছে যে
উইপোকা, তাকে।

মৌন-যুগে আক্রান্ত দেয়ালকে— নমস্কার!
কুকুরের বাঁকা লেজকে— নমস্কার!
অন্ধকারের পুরীকে ডুবিয়ে দেওয়া রাতকে—নমস্কার!
নিষ্ক্রিয় ওপরে জাতিকে— নমস্কার!
পেট ধরে জানালার কাছে হাসাকে— নমস্কার!
ইঁদুরের সমস্ত গর্তকে — নমস্কার!
আপনার—
এই বন্দরকে — নমস্কার!
—নমস্কার!
—নমস্কার!
হাতে ডুগডুগি নিয়ে করি—নমস্কার!

সুভাষচন্দ্র পাল

ডুকবাঙ্গি কবিতার ভাবানুবাদ।

জেলখানার চিঠি। রোজা লুকসেমবুর্গ

পঞ্চাশ বছর আগে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানির শ্রমিকশ্রেণী একচেটিয়া মূলধনপতি ও জুঙ্কার ভূম্যধিকারী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠন করেন। সুবিধাবাদী তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের দেউলিয়াপনায় ও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণে ঐ বিপ্লব রক্তস্নানে দমন করা হয়। জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর বীরনেতৃদ্বয় কার্ল লাইবনেখট ও রোজা লুকসেমবুর্গকে ১৯১৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি মূলধনপতিদের ঘাতকদল হত্যা করে। রোজা লুকসেমবুর্গ ১৮৭১ সালে পারী কমিউনের বছরে পোল্যাণ্ডে জন্মেছিলেন। তিনি ১৮৮৭ সালে মার্কসবাদের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৯৩-১৮৯৭ জুরিখে রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন এবং আইনে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে জার্মান দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধের পক্ষে ভোট দেন—কিন্তু রোজা লুকসেমবুর্গ ও কার্ল লাইবনেখট সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার আদর্শে অবিচল থাকেন। ১৯১৪ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯১৫ সালে জেলখানাতেই তিনি বিখ্যাত 'জুনিয়াস' প্যাম্ফলেট রচনা করেন এবং যুদ্ধলিপ্সু সাম্রাজ্যবাদ ও 'লাল সমাজতন্ত্রী'দের মুখোশ খুলে দেন। ১৯১৬ সালে পাঁচ মাসের জন্য জেলখানা থেকে ছাড়া পান। পুনরায় গ্রেপ্তারের পর তাঁকে রোংকি (পোজেন) এবং ব্রেসলাউ জেলে বন্দী করে রাখা হয়। ১৯১৮ সালে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থানে তিনি মুক্ত হন। রোজা লুকসেমবুর্গ ও কার্ল লাইবনেখট জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত করেন। রোজা লুকসেমবুর্গ-এর বহুবিধ রচনার মধ্যে 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির সঙ্কট' 'এ্যাকুমুলেশন অফ ক্যাপিটাল' যে কোনো সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি-জিজ্ঞাসুর কাছে এখনও জীবন্ত গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থটি সম্প্রতি বৃটিশ অর্থনীতিবিদ শ্রীযুক্তা জোয়ান রবিনসন-এর সম্পাদনায় দীর্ঘ মুখবন্ধ যুক্ত হয়ে পুনরায় ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়েছে।

নিচের চিঠিগুলি কার্ল লাইবনেখট-এর পত্নী সোনিয়া লাইবনেখট-এর কাছে লেখা। অনুবাদক

রোৎকি, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭

…মার্থার কাছ থেকে কার্ল-এর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকারের ছোট্ট বর্ণনা পাওয়া গেল। কেমনভাবে তুমি গরাদের ওপাশে তাঁকে দেখলে আর কিভাবে তুমি তা সহ্য করলে! অনেক দিন ধরে তো আমার বহু অভিজ্ঞতা হলো—তবু বলি, আমাকে তা গভীরভাবে বিচলিত করেছে। এসব আগে আমাকে জানাও নি কেন? আমারও তো তোমার দুঃখের অংশভাগিনী হবার অধিকার আছে। এ-অধিকারের কোনো ছিঁটেফোঁটাও আমি ছাড়তে নারাজ। প্রসঙ্গত, দশ বছর আগে ওয়ারশর দুর্গে আমার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি আবার স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। সেখানে আমি এক জোড়া-জালের খাঁচার মধ্যে থেকে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে পেতাম। অর্থাৎ, একটি ছোট খাঁচা বড় খাঁচার মধ্যে বসানো থাকত, আর সেই জোড়া খাঁচার জালের মধ্য দিয়ে এ-ওকে একটু একটু দেখতে পেতাম। তখন সবে আমি ছ-দিনের অনশন ধর্মঘট পার করেছি, কাপ্তেন সাহেব (দুর্গাধিনায়ক) আমাকে তো প্রায় পাঁজাকোলা করে ভিজিটারস রুমে পৌঁছে দিলেন। দু-হাতে আমাকে গরাদ চেপে ধরে থাকতে হচ্ছিল। মনে হয়, এতে করে চিড়িয়াখানার বুনো জন্তুর একটা আদলও আসছিল। খাঁচাটা আবার ঘরের এক প্রায়ান্ধকার কোণে দাঁড় করানো। আমার ভাই খাঁচার জালে মুখ চেপে ধরে বারবার ডাকছিল, "কোথায় তুমি"? নাকের পাশনে চশমা চোখের জলে ঝাপসা হয়ে তার দৃষ্টি ঘোলাটে করে তুলছিল, ঘন ঘন সে চশমা মুছছিল। কত খুশী হতাম যদি এখন লুকাউ-এর খাঁচায় আমি কার্ল-এর স্থান নিতে পারতাম! …

ব্রেসলাউ, মধ্য ডিসেম্বর, ১৯১৭

সোনিচকা, এখানে আমার এমন এক তেতো অভিজ্ঞতা হলো! যে উঠোনে আমি একটু হাত-পা খেলাই, সেখানে প্রায়ই দেখি সামরিক গাড়ি আসছে, কখনো বস্তা কখনো বা সৈন্যদের পরিত্যক্ত রক্তমাখা উর্দি-শার্ট নিয়ে…। এখানে ওসব নামিয়ে জেলখানার খুপরিগুলোতে বেঁটে দেওয়া হয়; সেলাই-তাপ্পি লাগানোর পর সেগুলি আবার ফেরৎ নিয়ে সৈন্যবাহিনীতে পাঠানো হয়ে থাকে। কদিন আগে এমনি একটি গাড়ি এলো। কিন্তু ঘোড়ার বদলে দেখলুম মহিষ জোতা রয়েছে। এমন পশু আমি এই প্রথম খুব কাছ থেকে দেখলুম। আমাদের দেশের পশুগুলির চেয়ে এগুলি বেশ বলিষ্ঠ আর

ঘাড়ে গর্দানে তন্নাট। এদের মাথা দিব্যি চ্যাটাল, তাতে আছে বেশ ছড়ানো শিঙ, ফলে মাথাগুলি অনেকটা ভেড়ার মাথার আদল আনে। আর আছে কালো কুচকুচে বড় বড় ভারী মিষ্টি নরম চোখ। রুমানিয়া থেকে এরা এসেছে বিজয় উপঢৌকন হয়ে।···যে সৈন্যরা ঐ গাড়ির সঙ্গে ছিল, তারা বলে—এই বুনো জানোয়ারগুলোকে ধরা বড় কঠিন, আর ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে পোষ মানানো আরও শক্ত। ওরা স্বাধীন পশু কিনা! এমন নির্মমভাবে ওদের পেটানো হয়, যে মনে হয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের দুর্ভাগ্য দায় কেবল ওদেরই···এই ব্রেসলাউতেই নাকি এমন প্রায় শ-খানেক পশু রয়েছে। রুমা-নিয়ার সরস গোচারণ ভূমির সঙ্গে যাদের নিবিড় পরিচয় ছিল, তাদের আজ যৎসামান্য ও বিশ্রী খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। হরেক রকম বোঝা টানবার জন্যে ওদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়, আর তার ফল হলো দ্রুত পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। যাই হোক, এই ক'দিন আগে বস্তাভর্তি একটি গাড়ি এলো। বস্তাগুলো এত উঁচু করে সাজানো যে মোষগুলি দেউড়ির সামনের পাথুরে ইঁটের রাস্তায় আর গাড়ি টানতে পারছিল না। গাড়োয়ান সৈন্যটিও ছিল অমানুষিক নিষ্ঠুর। পশুগুলিকে সে চাবুকের গোড়া দিয়ে এমন নির্মমভাবে পিটতে শুরু করল যে জেলখানার পাহারাদার মেয়েটি ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে গিয়ে বাধা দিতে চাইল, বলল, "জন্তুগুলির উপরে একটু দয়ামায়াও হয় না!" "আমাদের মতো মনিষ্যিদের ওপর কারোই কৃপা হয় না" কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে সৈন্যটি জবাব দিলো। সে আরও বেশি বেশি করে পেটাতে লাগল···পশুগুলি শেষে পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়িটিকে টেনে আনল। তবে, একটি পশুর গা দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝর-ছিল।···সোনিচকা, লোকজন কথাতেই বলে মোষের চামড়ার মতো পুরু আর শক্ত, তবু সে চামড়াও ছিঁড়ে কেটে গেল। যখন গাড়ি থেকে বস্তাগুলি নামানো হচ্ছিল, পশুগুলি ক্লান্তিতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তাদের মধ্যে একটির কালো মুখে আর নরম কালো চোখে এমন একটা ভাব ছিল যেন সে এইমাত্র কোনো শিশুর মতো কেঁদেছে, যে-শিশু দারুণ শাস্তি পেয়েছে—অথচ কেন তার শাস্তি, কীই বা তার অপরাধ, এই যন্ত্রণা আর পাশব শক্তির হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাওয়া যায় যে জানে না।···আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর সেই পশুটি আমারই দিকে তাকিয়ে রইল। আমার দু-চোখ দিয়ে দু-গাল বেয়ে জল ঝরছিল—সে অশ্রুজল তো তারই চোখের জল। আমি তার মূক বেদনায় সাহায্য করতে না পেরে যে যন্ত্রণা সহ্য করলাম, কোনো প্রিয় ভাইয়ের জন্যও এত

বেশি মুচড়ে-ওঠা-দুঃখ কেউ অনুভব করবে না। সেই অন্তিমুর মুক্ত স্বাধীন সরস শ্যামল রুমানিয়ার তৃণপ্রান্তর চিরদিনের জন্য তার কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে। সেই রৌদ্র, সেই বাতাস,সেই পাখির গান, সেই রাখাল ছেলেদের সুরেলা গলার ডাক—আহা, সেসব কেমন অন্য আরেক রকম ছিল! আর এখানে—ভয় দেখানো অপরিচিত এই শহর, ঘিঞ্জি আস্তাবল, জমাট বাঁধা খড়ের সঙ্গে মেশানো পচা নাড়ার গা গুলিয়ে তোলা দুর্গন্ধ, অচেনা এই ভয়ঙ্কর জনতা—চাবুক, টাটকা কাঁচা রক্ত ঝরে পড়ছে ঝরঝরিয়ে।

হায়রে আমার হতভাগ্য মহিষ, আমার দুর্ভাগা ভাই, আমরা দুজনে এখানে দাঁড়িয়ে আছি মুখোমুখি—অসহায় বেদনার্ত—আমাদের সাধারণ বন্ধনসূত্র এখন যন্ত্রণা অসহায়তা আর মুক্তির কামনা!

যখন বন্দীরা ভারী বস্তাগুলি গাড়ি থেকে খালাস করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে ব্যস্ত, সেই সৈন্যটি তখন হাত দুটি দু-পকেটে পুরে উঠোনময় পায়চারি করছিল। হাসিমুখে শিস দিচ্ছিল, জনপ্রিয় একটি সুর। আর আমার চোখের সামনে দিয়ে বিপুল মহাযুদ্ধের এক বাহিনীপুঞ্জ চলচ্চিত্রের মতো চলে গেল···

তাড়াতাড়ি চিঠি লিখো কিন্তু। আমার আলিঙ্গন, সোনিচকা,

তোমারই রোজা

সোনয়ুচকা, আমার প্রিয়তম, যা কিছুই ঘটুক না কেন, স্থির থেকো, মন প্রফুল্ল রেখো। জীবন ঠিক এমনিই, আর সাহসের সঙ্গে তার মুখোমুখি হতে হয়—কোনো খেদ না রেখে, হাসিমুখে—যা কিছু হোক, সব সত্ত্বেও।

অনুবাদ : তরুণ সান্যাল

ভারতীয় বিজ্ঞানের ধারা

শঙ্কর চক্রবর্তী

ভারতবর্ষে বছরের বিভিন্ন সময়ে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে বিরাট বড় বড় বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের আয়োজন করার একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা খবরের কাগজে সেইসব সম্মেলনের জ্ঞানগর্ভ রিপোর্ট পড়ি, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলির কর্মপ্রচেষ্টার সুললিত বর্ণনার কথা শুনে পুলকিত হই এবং কিছু কিছু বৈজ্ঞানিকের স্বদেশীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতা ও বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে লক্ষ্যহীনতার অভাব-জাতীয় আত্মসমালোচনামূলক বিবৃতি পাঠ করে তাঁদের সংনিষ্ঠা ও বিচারবুদ্ধির তারিফ করি।

বর্তমানে একটা বিষয় বোধহয় অনেকেই লক্ষ্য করছেন যে বিজ্ঞানবিষয়ক সরকারী দপ্তর এবং বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রতিষ্ঠান—সবত্রই আত্মসমালোচনার বহরটা একটু বেড়ে উঠেছে। সকলেই বলবেন, আত্মসমালোচনা ব্যাপারটা মন্দ নয় এবং এটা বরং ঘনঘনই হওয়া উচিত, তাতে যেটুকু কাজ হলো তার মূল্যায়ন যেমন সম্ভব হচ্ছে, তেমনি অতীতের ভুলভ্রান্তিগুলি কাটিয়ে ভবিষ্যতে সঠিক পদক্ষেপের ব্যবস্থাটাও হতে পারছে।

প্রশ্নটা হলো—বৈজ্ঞানিক সম্মেলন, বৈঠক, আলোচনা, পরামর্শসভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেশের বিজ্ঞানবিষয়ক কাজ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে যেগুলি মূল সমস্যা, তার প্রতি সঠিকভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে কি না। আরো একটা বড় প্রশ্ন হলো, দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি রূপায়নের কাজে এবং ক্রমবর্ধমান শ্রমশিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে; দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারক ও বাহক—সরকারী ও বেসরকারী গবেষণা-কেন্দ্রগুলি—সেই সমস্যা পূরণের যে-বিরাট কাজ ও দায়িত্ব, তার কতটুকুই বা পালন করছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সাধারণ মানুষ মাত্রেরই মনে বিশেষ করে জেগে ওঠে, যখন তাঁরা দেখেন যে সারা দেশ জুড়ে বন্যার তাণ্ডব আমরা শুধু বছরের পর বছর প্রত্যক্ষ করছি অথচ কোনো সক্রিয় বন্যা-প্রতিরোধের ব্যবস্থা এখনো গড়ে তোলা সম্ভব হলো না। কৃষিকাজের জন্যে আজও আমাদের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, ব্যাপক সেচ-পরিকল্পনা এখনো আমাদের আয়ত্তের বাইরেই রয়ে গেছে। খাদ্যসমস্যাকে মেটানো দূরের কথা, নিত্য-

ব্যবহার্য প্রতিটি খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের সূচক (ইনডেক্স) ক্রমেই বেড়ে চলেছে, অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রীর তো কথাই নেই। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা এখনো জনসাধারণের এক বিরাট অংশের নাগালের বাইরে।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির দৌলতে দেশে কিছুটা উন্নতি যে হয়েছে, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বা উন্নতির মধ্যে কোথাও যে গলদ রয়েছে, তা বুঝতে পারি যখন দেখি বিদেশের কাছে আমাদের ঋণ বেড়েই চলেছে, দ্রুত অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতার আশা ক্রমেই বিলীন হচ্ছে এবং সারা দেশ জুড়ে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে এক বিরাট মন্দা জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ডটার মধ্যে ঘুণ ধরাবার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন শিল্পসংস্থাগুলো ব্যাপকহারে শ্রমিক ছাঁটাই ও লে-অফ প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের মুনাফার অঙ্কটা বাড়তির দিকে রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণের স্বার্থবিরোধী কাজগুলো করার সময় দোহাইটা কিন্তু পাড়া হচ্ছে এই বলে যে সেটা না হলে নাকি জাতীয় উন্নতির সামগ্রিক মানকে বজায় রাখা সম্ভব হবে না। দেশের সামগ্রিক সমস্যা ও সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিজ্ঞানবিষয়ক কাজ ও গবেষণার ধারা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমরা এই প্রবন্ধে গ্রহণ করবার চেষ্টা করব।

জাতীয় বিজ্ঞানবিষয়ক নীতি

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পরেই ১৯৪৮ সালে শিল্পসংক্রান্ত নীতি-বিষয়ক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবের মধ্যে ভারতে টেকনোলজি বা প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ও বিদেশ থেকে এই বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করা সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। কিন্তু ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫১-৫৬) সময় থেকেই নানা জায়গায় বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র গড়ে উঠতে শুরু করে।

প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে ভারত সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার খাতে বাৎসরিক চার কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। পরিকল্পনার শেষ বছর ১৯৫৫-৫৬ সালে এই বরাদ্দ তের কোটি টাকায় এসে দাঁড়ায়। ১৯৬০-৬১ সালে এই পরিমাণ বেড়ে ত্রিশ কোটি টাকায় পৌঁছয়, যার প্রায় অর্ধেকটাই বিনিয়োগ করা হয় পারমাণবিক গবেষণার কাজে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার খাতে আমাদের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি টাকার মতো; আমাদের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ০·৪ ভাগ থেকে ০·৫ ভাগ আমরা এখন এই খাতে খরচা করছি।

১৯৫৮ সালের ৪ঠা মার্চ ভারতের লোকসভায় একটি 'বৈজ্ঞানিক নীতি-সংক্রান্ত প্রস্তাব' গ্রহণ করা হয়। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের ব্যাপারে এই প্রস্তাবের গুরুত্ব কম নয়। এই প্রস্তাবে স্বীকার করা হয়েছিল যে, বর্তমান যুগে জাতীয় সমৃদ্ধির চাবিকাঠি প্রধানত তিনটি বিষয়ের মধ্যে কার্যকরী যোগসূত্র স্থাপনের ওপর নির্ভর করছে। সেগুলি হলো যথাক্রমে প্রযুক্তিবিদ্যা, নতুন প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পুঁজি। প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, কারণ নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং তাকে কাজে নিয়োগ করার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রাচুর্যতাকে যেমন কাটানো যায়, তেমনি পুঁজির ওপর দাবিটাও কমে আসে। ভারতে বিশুদ্ধ, ফলিত এবং শিক্ষামূলক—সর্ববিধ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানচর্চা এবং গবেষণাকে চালু করা এবং সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া, দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী অত্যন্ত উচ্চস্তরের গবেষক বৈজ্ঞানিক গড়ে তোলা ও তাঁদের কাজের গুরুত্বকে স্বীকৃতি জানানো এবং কাজের শর্ত হিসেবে গবেষক কর্মীদের সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধে দেওয়া প্রভৃতি বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুফল যাতে দেশের জনসাধারণের সর্বস্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে, সে-সম্বন্ধেও একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়।

ভারত সরকারের বিজ্ঞানবিষয়ক এই জাতীয় নীতি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে কি না, তা বিচার করার জন্যে ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে, ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে এবং ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে কতকগুলো গোলটেবিল বৈঠকের মতো ডাকা হয়। প্রতিটি বৈঠকের আলোচনায় যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছিল, তার বিচার করলে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানবিষয়ক জাতীয় নীতিগুলি যে কার্যকরী হচ্ছে না, সে-সম্পর্কে সবাই একমত। তা না হবার জন্যে অনেকে বিজ্ঞান-গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে দায়ী করেছেন। আবার কেউ যথেষ্ট অর্থ এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য না দেওয়া কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

আসল কথাটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, আমাদের জাতীয় বিজ্ঞানবিষয়ক একটি নীতি কাগজে-কলমে রয়েছে, এই সান্ত্বনাটুকু নিয়েই আমরা গত দশটা বছর কাটিয়ে দিলাম। কেন ঐ নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হলো না, এ-নিয়ে কারুর বিশেষ মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। তাহলে বলতে বা

শুনতে খারাপ শোনালেও ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এই, বর্তমানে আমাদের ভারত সরকারের আদৌ কোনো জাতীয় বিজ্ঞানবিষয়ক নীতি কার্যকরী নেই।

ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াল, দেখা যাক। কোনো জাতীয় বিজ্ঞানবিষয়ক নীতি নেই, অথচ বৈজ্ঞানিক গবেষণার খাতে বর্তমানে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় করা হচ্ছে এবং নানা শ্রেণী মিলিয়ে ভারতে প্রায় ২০০টি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার চালুও রয়েছে। এ-পরিস্থিতি দেখে কেউ যদি বলেন যে, এ-হলো নিতান্তই এক অরাজক অবস্থা, দিকভ্রান্তের মতো একটা জাহাজ যেন সাগরে পাড়ি জমিয়েছে; তাহলে তাকে বড় দোষ দেওয়া যায় না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র

আমাদের দেশে যথেষ্ট ভালো গবেষক কর্মী অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা দেশের গবেষণার ধারাকে দেশের সমস্যার কাছাকাছি নিয়ে আসতে চান। এ-জাতীয় কিছু কিছু কাজও কোনো কোনো গবেষণাকেন্দ্রে হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। ভারতে গবেষণাগারগুলিকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করা যায়: [১] কেন্দ্রীয়-কাউনসিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর অধীনে জাতীয় গবেষণাগারসমূহ এবং ইণ্ডিয়ান কাউনসিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, মেডিকেল রিসার্চ কিংবা ডিফেন্স রিসার্চ জাতীয় স্বয়ংশাসিত গবেষণাগারগুলি, [২] কেন্দ্রীয় সরকারের নানা দপ্তরের অধীন গবেষণাগারসমূহ [৩] রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন গবেষণাগার [৪] বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার এবং [৫] বিভিন্ন শিল্পসংস্থা কিংবা অন্য কোনো বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণাগার।

এই বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে প্রায় বারো হাজারের মতো গবেষক কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। এই বিপুলসংখ্যক গবেষণাগারের যে কোনো একটিতে উঁকি দিলে হয়তো দেখা যাবে কর্মীরা ব্যস্ত, মগ্ন ও আনন্দিত। অন্তত এই ছবিটাই আমরা মনে মনে কল্পনা করতে ভালোবাসি। কিন্তু ওয়াকিবহালরা জানেন অধিকাংশ গবেষণাগারেই ভেতরের ছবিটা আজ সম্পূর্ণ বিপরীত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিকের দল হতাশ, নিরাশ, ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ। এর একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন-এর অধীন সংস্থাগুলি।

বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে এই হতাশার মূলে অনেকে নানা কারণকেই উল্লেখ করে থাকেন। যেমন, গবেষণার ক্ষেত্রে উপযুক্ত লক্ষ্য, পথনির্দেশ ও সুযোগ্য

নেতৃত্বের অভাব, কর্তৃপক্ষের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, গবেষক কর্মীর কাজের উপযুক্ত সমাদরের অভাব প্রভৃতি। এই পরিবেশের মধ্যে কিছু গবেষককর্মী যেমন কেরিয়ারিজম-এর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তেমনি আবার কিছু বিবেকবান গবেষক দেশের জনসাধারণের সামগ্রিক অভাব এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের গবেষণাকাজের লক্ষ্যহীনতা ও অপ্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে থাকেন। আবার কেউ ভালোভাবে কাজ করার সুযোগের অভাবে দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে পা বাড়ান। এভাবে বহু ভালো বিজ্ঞানকর্মীকে আমরা হারিয়েছি। এ-প্রসঙ্গে বর্তমানের সবচেয়ে বড় যে ঘটনাটির কথা আমাদের মনে পড়ছে, তা হলো—এ-বছরের শারীরবিজ্ঞান ও ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের ঘটনাটি। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানীর সঙ্গে এই পুরস্কার লাভ করেছেন। খোরানা বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক। জৈবরসায়নবিদ্যা-সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাকাজ যাতে তিনি ভারতবর্ষেই করতে পারেন, তার জন্যে খোরানা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। কিন্তু ভারতের তৎকালীন বৈজ্ঞানিক-প্রশাসন-বিভাগের নিতান্ত আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের ফলে খোরানা স্বাধীন-ভাবে কাজ করার কোনো সুযোগই পেলেন না। ফলে নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন, তা না হলে আজ ভারতীয় বিজ্ঞানীরূপেই খোরানা বিজ্ঞানজগতের সবশ্রেষ্ঠ সম্মানটি অর্জন করতে পারতেন।

খোরানার ঘটনা ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে-ছবিটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে, তা নিয়ে অনেক ভাববার আছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এ-নিয়ে আলোচনাও কম হয় নি। নিছক ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধের জন্যে যেসব বৈজ্ঞানিক কর্মী আমেরিকা বা অন্য দেশে যাচ্ছেন, তাঁদের কথা আমরা ভাবছি না। কিন্তু স্বদেশে কাজের সুযোগের অভাবে, বিজ্ঞানের বৃহত্তম স্বার্থের জন্যে যদি আমাদের প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা বিদেশে যেতে বাধ্য হন, তাহলে ব্যাপারটাকে যথেষ্ট দুঃখজনকই বলতে হবে। সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই বলবেন, এ-জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞানবিষয়ক নীতির সমস্যা

ভারতের বিজ্ঞানবিষয়ক একটি নীতি থাকা সত্ত্বেও সেই নীতি-পরিচালনার জন্যে কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শবাদ ছিল না বললেই চলে। একটি বিজ্ঞানবিষয়ক নীতি গঠনের জন্যে যে পরিমাণ খবর, তথ্য, পরিসংখ্যান এবং

অন্যান্য বিষয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তা যোগানোর মতো একটি উপযুক্ত সংস্থাও ঐ নীতি তৈরির সময় গড়ে ওঠে নি। অনেকে বলেছেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার খাতে অর্থের বিনিয়োগকে জাতীয় আয়ের শতকরা ০·৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা এক ভাগ করা হোক। কিন্তু এই পরিমাণ অর্থকে কাজে লাগানোর মতো উপযুক্ত গবেষণার ক্ষেত্র ভারতে এখনো তৈরি হয়েছে কিনা, এ-প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠবে। অনেক বেশি অর্থ নিয়োগ করলেই যে বেশি কাজ বা ফললাভ করা যাবে, এমন কোনো কথা নেই। এ পর্যন্ত আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে-পথে চলেছে, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনো সঙ্গতি নেই। এর ফলটা যে কতখানি ক্ষতিকারক হয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিজ্ঞানবিষয়ক নীতির অভাবটা বৈজ্ঞানিক কর্মীদের ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারেও গুরুতর ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ভারতের এক বিরাট এলাকায় জরিপের কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভূ-বিদের সংখ্যা হলো পাঁচ হাজারের মতো, প্রয়োজনের তুলনায় যা খুবই কম বলা যেতে পারে। অথচ নিতান্ত আশ্চর্যের ব্যাপারটা হলো এই যে, বেশ কয়েকজন শিক্ষিত ভারতীয় ভূ-বিদ বেকার অবস্থায় রয়েছেন। অন্যদিকে ভারতে ভূতাত্ত্বিক জরিপের কাজ কয়েকটি বিদেশী কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে বেশ কয়েক কোটি বৈদেশিক মুদ্রা প্রতি বছর আমাদের হারাতে হচ্ছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতেই বিজ্ঞানকর্মীর প্রয়োজনীয় সংখ্যাকে নিরূপণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু পরিকল্পনার নকশা, পরামর্শ এবং ভারী যন্ত্রপাতি সবই বিদেশ থেকে আনানো হচ্ছে, সেখানেই যত গোলযোগের মূল।

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিকাশলাভের জন্যে বৈদেশিক সহযোগিতা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ গবেষণাকাজ—এ-দুটিরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ-দুটি বিষয় যখন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়, নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্তভাবে, তখন তা বিপুল পরিমাণে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন বৈদেশিক সহযোগিতার চাপে দেশের গবেষণাকাজ অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে বা গুরুত্ব হারিয়ে বসে, যেমন ভারতে ঘটছে, তখন তার ফলটা খুবই শোকাবহ হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি জাপানও বাইরে থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা বা কারিগরী সহযোগিতাকে আমদানি করে বটে, কিন্তু নিজের দেশের গবেষণার বিকাশের জন্যে তুলনামূলকভাবে পাঁচ-ছ গুণ

বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকে। জাপান আজ পর্যন্ত কোনো প্রযুক্তিবিদ্যাকেই দুবার আমদানি করে নি।

ভারতের ভারী শিল্পে লগ্নির পরিমাণ হলো প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা। এখানে অতিরিক্ত পুঁজির বিনিময় ঘটেছে বলা যায়, কারণ এই পুঁজির মোট সামর্থ্য বা capacity-র প্রায় শতকরা সত্তর ভাগ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে, অথচ ভারতকে প্রতি বছর বিদেশ থেকে ছশ কোটি টাকার মতো যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হচ্ছে। এর অর্ধেক সামর্থ্যকেও কাজে লাগাতে পারলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দূর হতে বেশি সময় নেবে না।

বিদেশ থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা ধার করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমব্যবস্থার মাধ্যমে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু দেশের গবেষণাকে উন্নত পর্যায়ে না এনে ভারত সরকার বারেবারে বৈদেশিক সহযোগিতার পথই বেছে নিয়েছেন। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানির জন্যে যে সব সময়ে বৈদেশিক সহযোগিতার পথ বেছে নেওয়া হয়েছে তা অবশ্য নয়, বরং সরকারী নিষ্ক্রিয়নীতির ফল স্বরূপ দেশে পুঁজিসংগ্রহে ব্যর্থ হয়েই সরকারকে অনেক সময় ঐ পথ গ্রহণ করতে হয়েছে।

ভারতের সব বৃহৎ গবেষণা-সংস্থা

গবেষককর্মীদের মধ্যে যে-হতাশার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, তার সবচেয়ে চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় কাউন্সিল অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ (CSIR)-এর গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে। এই সংস্থাটি গড়ে উঠেছিল ১৯৪২ সালে, কিন্তু ১৯৫০-এর দশকেই এর দ্রুত বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। বর্তমানে প্রায় ত্রিশটি জাতীয় গবেষণাকেন্দ্র এই সংস্থার অধীনে রয়েছে এবং প্রায় তিন হাজার গবেষক কর্মী সেগুলোতে কাজ করছেন। দেশের মানুষ প্রধানত CSIR-এর কাজের ভিত্তিতেই ভারতীয় বিজ্ঞান-গবেষণার গতিপ্রকৃতিকে বিচার করে থাকেন।

CSIR সংস্থাটি দেশের শিল্পসংস্থাগুলোকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্যেই গড়ে উঠেছিল। ১৯৬২-৬৯ সাল পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, ভারতের শিল্পক্ষেত্রে যতটুকু বিকাশ ঘটেছে, তাতে এই সংস্থাটির কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। জাতীয় গবেষণাকেন্দ্রগুলির কাজের ধারা ফলে একটা লক্ষ্যহীন অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৬১-৬৬) সময়ে CSIR সংস্থাটি দেশের

শিল্পগত বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী অবদানের এক জোয়ালো প্রভাবকে কার্যকরী করে তোলার জন্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এর জন্যে এক পরিকল্পনাভিত্তিক গবেষণাকাজকে চালু করা হলো এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে আমলাতান্ত্রিক পরিবেশকে অপসারিত করে তরুণ বিজ্ঞানীদের দায়িত্বশীল পদে বসানো হলো। CSIR ও বিভিন্ন শিল্পসংস্থাগুলির এক মিলিত সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হলো। চারিদিকেই বেশ একটা উৎসাহের আবহাওয়া। বিদেশ থেকে আমদানি কমিয়ে একটি আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতিকে গড়ে তোলবার তাগিদ সবাই অনুভব করলেন। বিদেশ থেকে প্রতিভাবান ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্যে একটি 'scientists' pool'-ও তৈরি করা হলো।

কিন্তু এই উৎসাহের আবহাওয়া বেশিদিন টিঁকল না। ভারতের মুদ্রামূল্য-হ্রাস এবং প্রায় ঢালাও আমদানি-নীতি চালু করার ফলে, দেশের উৎপাদনের সাহায্যে বিদেশ থেকে আমদানির জায়গা পূর্ণ করা এবং স্ব-নির্ভর অর্থনীতির স্লোগানগুলো খুব তাড়াতাড়ি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বিজ্ঞানীদের pool-টিও আকারে ছোট হয়ে এলো। CSIR-এর আভ্যন্তরীণ গলদের ব্যাপার নিয়ে চারিদিকে নানা কথাবার্তা শুরু হলো এবং তার অনুসন্ধানের জন্যে পার্লামেণ্ট থেকে এক কমিটি নিয়োগ করা হলো। এই কমিটির কাজ এখনো চলছে।

CSIR-এর অধীনস্থ বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের দেশের শিল্পসংস্থাগুলো যে কখনোই বিশেষ উৎসাহ বোধ করে নি, তা একটি তথ্য থেকেই ধরা পড়বে; জাতীয় মোট পরামর্শের শতকরা মাত্র ·০০১ ভাগ ওরা CSIR-এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছে, বাকি সবটাই বিদেশ থেকে পাওয়া। ব্যাপারটা যে খুবই দুঃখজনক, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই!

বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা:

কিছু কিছু জাতীয় গবেষণাগার আমাদের দেশের বিপুল সম্পদকে কাজে লাগানো এবং তার বিকাশ সাধনের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। জাতীয় গবেষণাগারগুলি এ-পর্যন্ত ৩৫০টির মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন, যার মধ্যে ২২৫টি ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগানোর পর্যায়ে রয়েছে। দেশের বিভিন্ন শিল্পসংস্থা এর মধ্যে মাত্র ৮৫টিকে নিয়ে কাজে লাগিয়েছে। নতুন

কোনো পদ্ধতিকে ব্যবহার করা সম্পর্কে সংকোচ ওরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলেই মনে হয়।

অন্যতম জাতীয় গবেষণাকেন্দ্র দিল্লীর ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি ইলেকট্রনিক সাজসরঞ্জাম এবং কার্বনজাত বস্তু তৈরির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এখানে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী দেশের রেডিও, টেলিফোন, র‍্যাডার, টেপ রেকর্ডার, কমপিউটার প্রভৃতি যন্ত্রনির্মাতাদের চাহিদা মেটাচ্ছে। পিলানিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিকস এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট দেশে তৈরি উপাদানের সাহায্যে টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা করেছেন।

কলকাতার কেন্দ্রীয় 'গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট' যে অপটিকাল কাঁচ তৈরি করেছেন, তা অণুবীক্ষণ দূরবীন ও ক্যামেরা প্রভৃতি যন্ত্রের লেন্স ও প্রিজম তৈরির কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এই গবেষণাকেন্দ্রটি বর্তমানে গোটা দেশের অপটিকাল কাঁচের সমগ্র চাহিদাকে মেটাচ্ছে। আমাদের দেশের ইস্পাত কারখানাগুলির অতি উচ্চ তাপবিশিষ্ট ফার্নেসের জন্যে অভ্রের ইনসুলেটিং ব্রিকস্ তৈরি করে এই কেন্দ্রটি বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়েছেন।

এ-ছাড়া নিজস্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দেশের শ্রমশিল্পের প্রয়োজনীয় চাহিদার অনেকটা মিটিয়েছে যে-জাতীয় গবেষণাগারগুলি, তারা হলো—জামশেদপুরের ন্যাশনাল মেটালার্জিকাল ল্যাবরেটরি, মহীশূরের কেন্দ্রীয় ফুড টেকনলজিকাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, লক্ষ্ণৌর কেন্দ্রীয় ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, পুনার ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, ধানবাদের কেন্দ্রীয় ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, নতুন দিল্লীর কেন্দ্রীয় রোড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এবং রুরকির কেন্দ্রীয় বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

ইণ্ডিয়ান কাউনসিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এর অধীনস্থ গবেষণাকেন্দ্রগুলি কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক কাজ করেছেন। ভারতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের এক বিরাট সামর্থ্য রয়েছে, যার অনেকটাই কাজে লাগানো যায় নি। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জলবায়ু, জমির প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার মধ্যে বিরাট তারতম্য দেখা যায় এবং ভারতের জলসম্পদ যদিও অপর্যাপ্ত, তবুও এখানকার জমি অল্প কিছুদিন বাদেই জৈবপদার্থ হারিয়ে উর্বরাশক্তির বিচারে দুর্বল হয়ে পড়ে। কৃষিবিজ্ঞানীরা তাই সকল দেশের মধ্যে একটি সামগ্রিক ও

বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছেন। তাঁরা প্রজননবিতার পদ্ধতিতে গবেষণাগারে এমন এক জাতের বীজ তৈরি করতে পেরেছেন, যা চাষ করতে কোনো ঋতুসাপেক্ষ বাধ্যবাধকতা নেই; যে কোনো জমিতে এদের বপন করা চলবে এবং খুব কম সময়ে এরা ফসল ফলাতে পারবে। এইসব বীজের থেকে ফসলের পরিমাণও হবে অনেক বেশি—প্রতি হেকটরে ৮৫ থেকে ৯০ কুইন্টালের মতো।

কৃষিবিজ্ঞানীরা একই জমিতে তিনটি থেকে চারটি ফসল ফলানোর উপায়ও উদ্ভাবন করেছেন, যার ফলে প্রতি হেকটর জমি থেকে ২৫ টনের মতো ফসল পাওয়া যাবে। এইসব ফসলের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা যেমন অনেক বেশি হবে, তেমনি সাধারণ ফসলের তুলনায় প্রোটিনের পরিমাণেও এরা বেশি সমৃদ্ধ হবে। এই নতুন পদ্ধতিতে চাষের কাজ করতে পারলে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন থাকবে না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে-ক্ষেত্রটিতে ভারতের দ্রুত সমৃদ্ধি সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটি হলো পারমাণবিক শক্তি। হোমি ভাবার নেতৃত্বে ও প্রেরণায় বোম্বাই শহরের কাছে ট্রম্বেতে যে পরমাণু গবেষণাকেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল, আজ তা ভারতের শ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গবেষণাকেন্দ্রটি বর্তমানে ভাবার নামাঙ্কিত।

বর্তমানে ভারতে তিনটি পারমাণবিক রিঅ্যাকটর যন্ত্র রয়েছে। এগুলো নিয়ে যেমন গবেষণাকাজ চলেছে, তেমনি এদের মধ্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হচ্ছে। এইসব আইসোটোপ ভারতের কৃষি, শিল্প, ভেষজবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন কাজে লাগছে; তেমনি এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে এই আইসোটোপ রপ্তানিও করা হচ্ছে।

ইণ্ডিয়ান অ্যাটমিক মিনারেলস ডিভিশন জামশেদপুরের কাছে যদুগুড়াতে ভারতে প্রথম ইউরেনিয়াম আবিষ্কার করার পর, পারমাণবিক শক্তির এই মূল্যবান জ্বালানীটিকে কাজে লাগাবার পর্যায়ে আনবার জন্যে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা একটি কারখানা তৈরি করেছেন। এছাড়া কেরালার উপকূলের বালি থেকে যে থোরিয়াম পাওয়া গেছে তাকে কাজে লাগাবার জন্যে কেরালার আলওয়েতে একটি কারখানা বসানো হয়েছে। পারমাণবিক শক্তির জ্বালানী তৈরির কাজে থোরিয়ামের ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পারমাণবিক শক্তির আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানী প্লুটোনিয়ামকে অন্যান্য মিশ্র উপাদান

থেকে আলাদা করার জন্তে একটি কারখানা চালু করা হয়েছে। [illegible] রিঅ্যাকটরে ব্যবহৃত জালানীর মধ্য থেকে প্লুটোনিয়ামকে বার [illegible] পদ্ধতিকে পৃথিবীর যে পাঁচটি দেশ কার্যকরভাবে চালু করেছে, [illegible] তাদের মধ্যে অন্যতম।

ভারতে বর্তমানে তিনটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে, যেখানে পারমাণবিক রিঅ্যাকটরের মধ্যে সঞ্চিত তাপশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। প্রথমটি তৈরি হচ্ছে গুজরাটের তারাপুরে, ১৯৬৯ সালের মধ্যেই এটি চালু হবার কথা—দ্বিতীয়টি রাজস্থানের কোটা-র কাছে রাণা প্রতাপসাগরে এবং তৃতীয়টি মাদ্রাজের মহাবলীপুরমের কাছে কলপাক্কমে। এই তিনটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র তৈরির কাজ ভারতের 'চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র শেষের দিকে (১৯৭০-৭১ সাল নাগাদ) সম্পন্ন হবে।

ভারতের তিনটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ তৈরির মোট সামর্থ্যের পরিমাণ হবে ১১৮০ মেগাওয়াটের (এক মেগাওয়াট = ১০ লক্ষ ওয়াট) মতো। আশা করা হচ্ছে, এরা ভারতের তিনটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা মেটাবে।

মহাকাশ গবেষণা:

পৃথিবীর পারমাণবিক মানচিত্রে যে-মানুষটি ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই হোমি ভাবার জীবনের সর্বশেষ প্রচেষ্টায় ভারত আজ মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য বিজ্ঞানসমৃদ্ধ দেশগুলির অংশীদার হতে পেরেছে।

ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে ত্রিবান্দ্রামের কাছে থুম্বাতে একটি মহাকাশ গবেষণা-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। থুম্বা পৃথিবীর ভূ-চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর অবস্থিত। পৃথিবী থেকে বেশ খানিকটা দূরত্বে এই বিষুবরেখার ওপর একটি বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়। এই বিদ্যুৎস্রোতের প্রবাহ এবং ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলের গতিবিধি ও তাপমাত্রা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে থুম্বা থেকে মাঝে মাঝে রকেট ছোঁড়া হচ্ছে। প্রথম রকেটটি পাঠানো হয়েছিল ১৯৬৩ সালের ২১শে নভেম্বর। ঐ রকেটটি অবশ্য ভারতে নির্মিত ছিল না। আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স প্রভৃতি পৃথিবীর কয়েকটি বিজ্ঞানসমৃদ্ধ দেশ থেকে এর 'প্রয়োজনীয়' সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল; ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সেগুলোকে একত্র করে রকেটটিকে ঊর্ধ্বাকাশে পাঠাবার উপযোগী করে তোলেন।

এ-বছর গত ৩১শে আগস্ট থুম্বা থেকে রোহিনী নামে দুটি রকেট ছোঁড়া

হয়েছে। ঘটনাটির বিশেষত্ব হলো এই, রকেটগুটির সমগ্র অংশ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দেশেই তৈরি করতে পেরেছেন। দুই-স্তরবিশিষ্ট ঐ রকেটগুটি পৃথিবী থেকে ৬০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত পৌঁছয় এবং ওদের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে।

থুম্বার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্তে শান্তিপূর্ণ কাজে মহাকাশ গবেষণায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কয়েক মাস আগে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে থুম্বাকেন্দ্রটি রাষ্ট্রসংঘের হাতে সমর্পণ করেন। থুম্বা বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া-গবেষণাকেন্দ্ররূপেও গড়ে উঠেছে। সেখানে এ-পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা একসঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

মহাকাশে পরিক্রমারত পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহদের সঙ্গে বেতারের মাধ্যমে সংবাদ আদানপ্রদানের জন্তে ভারতে একটি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা হোমি ভাবাই করে গিয়েছিলেন। গত প্রায় দু-বছর আগে আমেদাবাদে যে 'এক্সপেরিমেণ্টাল স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনস' আর্থ স্টেশন'টি গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে ভাবার স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করেছে। এই কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহদের কাছ থেকে বেতার ও টেলিভিশনের সংকেত সংগ্রহ করে সেগুলিকে বিশ্লেষণের কাজ করে চলেছেন।

বিশুদ্ধ গবেষণার ধারা

ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলির কাজের খানিকটা পরিচয় আমরা আগের আলোচনার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলাম। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণাগার ও সমস্থানীয় গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে যে গবেষণা চলেছে, তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। প্রযুক্তিবিদ্যা বা কারিগরীবিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন অনেককাল আগে আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতি বা বস্তুকে নতুন করে আবিষ্কার করার কাজকে আমরা তারিফ করতে পারি না, তেমনি অন্ত কোনো দেশে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ বা তত্ত্বীয় ক্ষেত্রে নিষ্পন্ন কোনো কাজের দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ ভাষ্য তৈরির প্রচেষ্টাকেও সাধুবাদ দেওয়া যায় কি? অবশ্য বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও সব কাজকে এক পংক্তিতে ফেলা যায় না। এই বিভাগেও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের দেশে হয়েছে এবং বাইরের বিজ্ঞানজগতে কিছুটা স্বীকৃতিও লাভ করেছে, কিন্তু সে জাতীয় কাজের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

ভারতের মতো একটি অনুন্নত দেশে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণাও যে একটা কুঁইফোড় বস্তু হয়ে উঠতে পারে না, সেটা অনুধাবন করার সময় নিশ্চয়ই এখনো পেরিয়ে যায় নি। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে যে অর্থব্যয় করছি, দূরভবিষ্যতে দেশের উৎপাদন এবং সম্পদবৃদ্ধির কাজে তা কতটুকু কার্যকরী হবে, আজ যেমন এ-প্রশ্ন উঠেছে, তেমনি আর-একটা প্রশ্নও উঠছে যে এই খাতে বর্তমানে যে খরচটা হচ্ছে, তা যথেষ্ট সুষ্ঠুভাবে এবং যোগ্যতার সঙ্গে করা হচ্ছে কি না!

অনেকে বলবেন, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে তার প্রয়োগের প্রশ্নটাকে আবার টেনে আনা কেন। এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। পৃথিবীর অন্যান্য বিজ্ঞানসমৃদ্ধ দেশগুলোতেও এ নিয়ে তাঁরা ভাবছেন। ঐ দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রয়োগের জন্ম তুলনামূলক অর্থব্যয়ের একটা হিসেব দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমেরিকাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যত অর্থব্যয় হয়, ঐ গবেষণাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যে তার তিনগুণ বেশি অর্থ খরচ করা হয়ে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে দুই দিকে ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় সমান সমান এবং ব্রিটেনে এই অনুপাত কিছুটা কম। ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণায় যা ব্যয়, তার প্রয়োগের জন্ম ব্যয়ের পরিমাণ তার তুলনায় অতি সামান্য।

আসল কথাটা হলো, দেশের সমস্যাগুলোকে ভুলে গিয়ে, বিশুদ্ধ বা প্রয়োগগত—বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রেই গবেষণার ধারা তৈরি হতে পারে না। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ইন্দোনেশিয়াকে বাদ দিয়ে আর প্রায় সব দেশেরই তলায় রয়েছে। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিকাশের বিচারে এশিয়ার মধ্যে জাপান ও চীনের পরেই ভারতের স্থান। ভারতের এই যে একটা অসঙ্গতির চেহারা, এটা নিয়ে বাইরের দুনিয়ার কাছে আমাদের গর্ব করবার মতো কিছু নেই।

'কাস্টেশিয়া'

গত আগস্ট মাসে দিল্লীতে এশিয়ার উন্নতিশীল দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের সমস্যা নিয়ে 'ইউনেস্কো'র আহ্বানে এক সম্মেলন বসেছিল। এশিয়ার চব্বিশটি দেশের প্রতিনিধি এতে উপস্থিত ছিলেন; এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ ও কয়েকটি

আন্তর্জাতিক সংস্থাও এই সম্মেলনে পরিদর্শক পাঠিয়েছিলেন। দশদিনব্যাপী সম্মেলনে অনেক কথাবার্তা হয়েছে, অনেক প্রস্তাব পাশ হয়েছে, বৈঠকও অনেক হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিকাশের বিচারে পৃথিবীর শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির তুলনায় উন্নতিশীল দেশগুলি নাকি এতটাই পেছনে পড়ে আছে যে ব্যাপারটা ক্রমেই দৃষ্টিকটু ঠেকছে। এই ফাঁকটা পূরণের জন্যে দিল্লীর 'ক্যাস্টেসিয়া' সম্মেলন থেকে কিছু রাস্তা বাতলে দেবার চেষ্টা হয়েছে। এই রাস্তায় চলবার মতো প্রস্তুতি ও সামর্থ্য ভারতের রয়েছে কিনা, তা হয়তো দেশের নেতারা ঠিক করবেন। তবে দেশের সাধারণ মানুষ বড় বড় সম্মেলনের সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব ও মারপ্যাচ বড় একটা বোঝেন না, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কিছুটা আঁচ গায়ে লাগলেই তাঁরা খুশী হবেন।

সরোজ আচার্য

গোপাল হালদার

"সরোজ আচার্য নেই"—পনের দিন পূর্বেও কথাটা ছিল অকল্পনীয়। পনের দিন পরেও মনে হয় অবিশ্বাস্য। আরো অনেক পনের দিন লাগবে কথাটা সহনীয় হয়ে উঠতে। অন্তত আমাদের কারও কারও পক্ষে। আমার সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক, তাতে এখনো শুধু সেই আত্তবাণীই বারে বারে মনে আসে যা তাঁর ও আমার স্নেহভাজন অগ্রজ প্রদ্যোৎ গুহ স্মরণ করেছেন :

> I weep for Adonais—he is dead !
>
> O' weep for Adonais though our tears
>
> Thaw not the frost which binds so dear a head.

—So dear a head, and heart. সেই বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল বিনম্র প্রতিভা, শান্ত সরল প্রীতির আধার সেই স্নিগ্ধ হৃদয়। সরোজ আচার্যকে হারানোর অর্থ আমার হৃদয়-মনের শুভ্রতম এক কেন্দ্রভূমি থেকেই আমার নির্বাসন।

বয়সে অবশ্য সরোজ আচার্য আমার অপেক্ষা তিন-চার (কিংবা পাঁচ ?) বছরের ছোট ছিলেন। প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের কৈশোরে হয় নি, যৌবনেও প্রায় না। আমাদের সান্নিধ্য সম্ভব হয় আমি যখন প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সম্মুখীন, আর তাঁরও মধ্যযৌবন অংশত অতিক্রান্ত। তার পরেকার এই পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর—যে যেখানেই থাকি, দূরে বা নিকটে—আমাদের আশা-নিরাশা-স্বপ্ন ও সঙ্কট আলোড়িত প্রৌঢ়-চেতনার কাল। অবসর তাঁরই ছিল কম, সংসারের ও জীবিকার নানা দায়ে অবকাশহীন ছিল তাঁর দিন-রাত্রি। তথাপি সেই পরিশ্রম-চিন্তা ও কর্মভারের মধ্যেও শুধু আমি কেন, পরিচিত সকলেই ছিলেন তাঁর কাছে স্বাগত। অবাধে লাভ করেছি তাঁর সঙ্গ, তাঁর আতিথেয়তা। তাঁর প্রতিভা ও প্রীতি সকল সংশয় ও সঙ্কটের মধ্যে আমাকে বরাবর দিয়েছে একান্ত আশ্রয়, আত্মপরীক্ষায় ও বিশ্ববীক্ষার সক্রিয় অবকাশ। অনেক স্বচ্ছন্দ বা অবসন্ন সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে বসে কাপের পর কাপ চা ও প্লেটের পর প্লেট খাবার শেষ করতে করতে একসঙ্গে দেখতে চেয়েছি আমাদের কালের মুখচ্ছবি, দিশাহারা দেশের আত্মপ্রবঞ্চিত রূপায়ণ। জানতে চেয়েছি "ততঃ কিম্ ?"

নীরবে প্রার্থনা করেছি "ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ।" শেষে বিদায় যখন নিয়েছি, বিদায় নিয়েছি আত্মার আত্মীয়তায় স্নিগ্ধ হয়ে সঞ্জীবিত চেতনায়; অনেকগুলি অবিস্মরণীয় মুহূর্তের সার্থক দান সঙ্গে নিয়ে।

সেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরোজ আচার্য অপরিমেয় এবং এখানে আলোচ্য নন। 'পরিচয়'-এর সঙ্গে সরোজ আচার্যের পরিচয়ের অধ্যায়টিই শুধু আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি।

সরোজ আচার্য নেই, 'পরিচয়'-এর পাঠকেরা যথাসময়ে সে-সংবাদ জেনেছেন। সংবাদ হিসেবে তার অর্থ যে কী, সম্ভবত 'পরিচয়'-এর পাঠকদের তা খানিকটা অনুভব করা অসাধ্য হয়নি। প্রায় বিশ বৎসরকাল 'পরিচয়' প্রায়ই তাঁর স্বাক্ষর বহন করেছে, আর সে-স্বাক্ষর প্রতিবারই সে-পত্রের পৃষ্ঠা থেকে মন-বুদ্ধি-চিন্তায় ফুটে উঠত। পিছনের সংখ্যাগুলির পৃষ্ঠা ওল্টালে সহজেই তাঁরা বুঝতে পারবেন—'পরিচয়' কী বন্ধুকে হারিয়েছে।

অথচ 'পরিচয়'-এ তিনি কতটুকুই বা লিখবার অবকাশ পেয়েছেন? সেজন্য আমরাও এক অর্থে দায়ী। বহু ভার-পীড়িত এই বন্ধুকে 'পরিচয়' তার দাবি জানিয়ে আরও পরিশ্রান্ত করতে সর্বদাই সঙ্কুচিত বোধ করেছে, লেখার জন্য তাঁকে তাড়না করতে আমরা ছিলাম অসমর্থ। জানতাম আপন অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি প্রায় কোনো পত্রিকার অনুরোধই উপেক্ষা করতে পারতেন না। 'পরিচয়' জানত তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন কত বেশি, আর তা থেকে তিনি কত বঞ্চিত। নিজের শুধু সময় নয়—স্নায়ু ও আয়ু ক্ষয় করেও যিনি ভদ্রতার দেনা শুধতেন, তাঁকে আরও উদ্ব্যস্ত করা শুধু অবিবেচনা নয়—মনে হয়েছে অপরাধ; শুধু আপনজনের প্রতি অত্যাচার নয়—দেশের এবং সাহিত্যের প্রকৃত সম্পদেরও অপচয়। সে মূঢ়তা থেকে আমরা হয়তো সম্পূর্ণ মুক্ত নই—যদিও জানি 'পরিচয়' তাঁর সহায়তা পেয়েছে সর্বদাই তাঁর অন্তরের তাগিদে, 'পরিচয়'-এর সঙ্গে তাঁর যোগ প্রথমাবধিই নাড়ির যোগ—বুদ্ধির, যুক্তির, মনস্বিতার; সেই সঙ্গে মতাদর্শের—এবং তার বেশি—আদি-অন্ত আদর্শের—যার থেকে বড় বলে সরোজ আচার্য পৃথিবীর অন্য কোনো যোগকেই জীবনে স্বীকার করতেন না।

আবাল্য সরোজ আচার্য আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সম্ভবত এই আদর্শ-নিষ্ঠা তাঁর পৈত্রিক উত্তরাধিকার। যৌবনের ধ্যান ও কর্মে, বিপ্লবী মতাদর্শ-সন্ধানেও তিনি প্রবৃত্ত হন যুক্তিনিষ্ঠ আদর্শবাদিতা নিয়ে। মার্কসবাদেই সরোজ-

বাবু তাঁর সেই আদর্শের সমকালীন রূপ দেখতে পান, প্রাণে-মনে তিনি তা গ্রহণ করেন, যুক্তি-বুদ্ধি নিয়ে আজীবন তার সদ্বিচার করেন, আর আমরণ কার্যতও তা আপন বিশিষ্ট ও সীমিত বৈষয়িক জীবনের মধ্যে উদ্যাপন করে যান। এ-কথা অনেকের নিকট অত্যুক্তি মনে হবে—তা জানি। আমরা সরোজ আচার্যকে তার চেয়েও বেশি জানি বলেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে জোর করে আজ এই কথা বলতে বাধ্য। আমাদের থেকে অনেক বেশি ভালো করেই তিনি জানতেন—মার্কসবাদ ধ্যানের বিষয় নয়, কর্মে তাকে রূপ দিতে হয়; কার্যে তার পরীক্ষা, পৃথিবীর রূপান্তরে তার সার্থকতা। আরও জানতেন, কর্মক্ষেত্রে যেভাবে তা উদ্যাপন তাঁর ব্যক্তিগত কামনা ছিল, ঠিক সেভাবে কার্যত তা উদ্যাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সে-সাধনা ছিল, সাধ্য হয়নি—অবশ্য তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না বলেই।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি আস্থা হারাননি। আমৃত্যু বিশ্বাস করেছেন: "মোট কথা, বলশেভিজম, কমুনিজম কোন দেশের, দেশের মেহনতী জনসাধারণের প্রকৃত উন্নতি কখনই করতে পারে না, এটাই মার্কস-লেনিনবাদ-বিরোধীরা নানাভাবে প্রচার করছেন এবং করেন। এই বিকৃত বিদ্বেষদুষ্ট প্রচার মূলতঃ মিথ্যা, আজকের সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তিসামর্থ্য, জনজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, সাংস্কৃতিক উৎসাহ তার নিঃসংশয় প্রমাণ। ব্যক্তিগত মালিকানা-ব্যবস্থা ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর আধিপত্য বিলুপ্ত করে জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব ও সার্থক, সোশ্যালিজমের এই প্রতিশ্রুতি এককালে ছিল কল্পনার সামগ্রী, আইডিয়া মাত্র। বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস এই আইডিয়াকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। একথা বলি না, এই বাস্তব রূপে কোথাও খুঁত নেই, কোন সমস্যা নেই কিংবা থাকবে না। সিডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েব যাকে বলেছেন 'নতুন সভ্যতা' তার দিগন্ত এখন সোভিয়েট ইউনিয়নে ও তার বাইরেও বহু দূর প্রসারিত। এটাই আমার আনন্দের কথা।"

['বলশেভিক বিপ্লব'। 'আন্তর্জাতিক'। রুশবিপ্লবের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি ও 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত]

বহু বৎসর বন্দীশালায় কাটিয়ে সরোজবাবু ১৯৩৮এ যখন মুক্তিলাভ করেন, অভাবনীয় সাংসারিক বিপর্যয়ে তিনি তখন অভিপ্রেত রাজনৈতিক জীবনে আর সম্পূর্ণ ফিরে যেতে পারলেন না। অনেকের অনেক ভার তাঁর মাথার ওপরে পড়ে—আরও অনেক ভার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও তিনি বহন করে যান।

আমাদের সমাজের বিকাশ এখনো যে-স্তরে আবদ্ধ, তাতে সে-সব দায়িত্ব তাঁর পালনীয়; মাথা পেতে তা গ্রহণ করতে হয়। সেই কর্তব্যসঙ্কটে বিবেকবানের পক্ষে অনেক দীর্ঘশ্বাস গোপন করেও যথোচিত কর্তব্য-পালন না করে উপায় থাকে না। ৮০ টাকা (?) মাইনের কেরানিগিরি করা—বসে বসে পরীক্ষার্থী ছাত্রদের নাম এক কাগজ থেকে অন্য কাগজে টুকে টুকে তোলা, ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া আত্মসচেতন যুবকের পক্ষে নিশ্চয়ই এমন কিছু লাভজনক বা লোভজনক কাজ ছিল না। অথচ দিনের পর দিন সরোজবাবু তা করেছেন—সেই সঙ্গে ছাত্র পড়িয়ে সংসারের দুর্যোগ কাটাতে চেষ্টা করেছেন, বেনামা নোট লিখে, জীবিকার এমন আরও কত কত সামান্য কাজ করে! অধ্যাপনায় ও সাংবাদিকতায় ক্রমে যখন তিনি অপেক্ষাকৃত স্বস্তিলাভ করলেন, তখনো তাঁর কর্ম-ভার কর্তব্যভার লাঘব হয়নি। সেই কর্মস্থলেও পরিবেশ সর্বদা অনুকূল ছিল না। কারণ, সরোজ আচার্য তখনো ছিলেন মার্কসবাদী—'মার্কসীয় দর্শন'-এর লেখক, সাংস্কৃতিক বিপ্লবী প্রয়াস ও চেতনার পথিকৃৎ, নানা কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকার সদা-সম্মত লেখক, বহুদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যও, এবং সেই সভ্যপদ থেকে অব্যাহতি নিয়েও অর্থে-সামর্থ্যে, ভাবে-ভাবনায়, সাধনায়-কর্মে, গোপনে-প্রকাশ্যে চিরদিন সেই পার্টির সহায়ক সহযাত্রী। সেই হিসেবেই সে-পার্টির ভ্রান্তিতে-বিপর্যয়ে ব্যথিত, বেদনার্ত, বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাম্প্রতিক বিচ্ছেদ সঙ্কটে শেষ মুহূর্তেও বিচলিত, দেহে মনে আহত। সেই হিসেবেই মার্কসবাদের বিচারে ও আলোচনায় ছিল তাঁর জাগ্রত জিজ্ঞাসা। সে-জিজ্ঞাসায় তাঁর ভ্রান্তি ছিল না, মনে ছিল না গোঁড়ামি, তথ্য সংগ্রহ ছিল ব্যাপক, আর সেই সঙ্গে অভ্রান্ত সামগ্রিক চেতনা। তাঁর স্বীকৃত সাংবাদিক দায়িত্ব পালনে দেশীয় ও বৈদেশিক রাজনীতির অত তথ্যনিষ্ঠ বিচার বা যুক্তিনিষ্ঠ সামাজিক প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড', বা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেরূপ মুক্তবুদ্ধি রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার অনুকূল ক্ষেত্রও নয়। সরোজবাবুর বিদ্যা-বুদ্ধিকে সম্মান করলেও, নিজেদের নির্দিষ্ট খাঁচার মধ্যে খণ্ডিত করেই তাঁরা তার ব্যবহার করতেন। সরোজবাবু মর্মে মর্মেই জানতেন একালের বুদ্ধিজীবীর এই বিধি-লিপি অখণ্ডনীয় নয়। কিন্তু এই রূঢ় দায়িত্ব পালনেও শিথিলতা বা মিথ্যাচার ছিল তাঁর পক্ষে অভাবনীয়। নামাঙ্কিত বা প্রচ্ছন্ননামীয় সাময়িক লেখাতেই তাঁর রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সামাজিক নানা চিন্তা কতকটা মুক্তি পেয়েছিল।

খণ্ডিত না হলেও সে-প্রকাশ ঘটত প্রায়ই খণ্ড প্রবন্ধ ও লঘু রচনায়। সেই প্রকাশের যথার্থ অবকাশ যখন তিনি লাভ করতে যাচ্ছিলেন, আর আমরা অপেক্ষা করছিলাম তাঁর পূর্ণতর দানের জন্য; তখন তিনি বিদায় নিলেন—অকস্মাৎ এবং প্রায় অলক্ষিতে—ঠিক যেমন সাংবাদিক হলেও আজীবন লোকচক্ষুকে এড়িয়ে চলাই ছিল তাঁর জীবন।

আসলে সরোজ আচার্য শুধু সাংবাদিক ছিলেন না। সাংবাদিকতা ঘটনাক্রমে তাঁর জীবিকাবৃত্তি হয়। মূলত তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, সাহিত্য-সৃষ্টির পুরোহিত। তারও বেশি—সচেতন জীবন-জিজ্ঞাসু, নিরভিমান মানব-প্রেমিক। সেই স্বধর্মবশে স্বদেশীর পথে তিনি পদার্পণ করে, মার্কসবাদে গিয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে পূর্বজীবনের এক জাতীয়তাবাদী স্বদেশী বন্ধু বলেন, "মতের মিল না থাক, পৃথিবীতে কেউ তাঁকে শত্রু ভাবতে পারে না।" মনে পড়ে মার্কসের সমাধিকালে এঙ্গেলস-এর শেষ উক্তি—"তাঁর সমালোচক ছিলেন অনেকে, কিন্তু তাঁর শত্রু নেই একজনও।" যথার্থ মার্কসবাদীর মানবিক শ্রীও এমনি স্বতঃসিদ্ধ। সরোজ আচার্যের মৃত্যুতে এ-দেশ ভারতবর্ষে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদী ভাবনার ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে সৃজনমূলক চেতনার একরূপ এক পুরোধাকেই হারাল।

স্বভাবতই অসম্পূর্ণ ও বিতর্কমূলক এই তিনটি নিবন্ধের মূল্যায়ন সম্পর্কে আমরা পাঠকদের সুচিন্তিত মতামত আহ্বান করছি। —সম্পাদক

শারদ-সাহিত্য পরিক্রমা

১

শুধু কোনো এক বছরের শারদীয় পত্রের কবিতা সম্পর্কে আলোচনার অবাস্তবতা ক্ষমার্হ হতে পারে এই কারণে যে, কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা কবিতা-বিশেষ সম্পর্কে দূরত্ব বাঁচিয়ে আপ্তবাক্য উচ্চারণের যে সুযোগ দেয়, তা থেকে এখানে অব্যাহতি মিলতে পারে—অর্থাৎ সত্যিই যেন আমরা কয়েকটি গোটা কবিতার সামনে সরাসরি হাজির হতে পারি এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও তাতে কবিতার অসম্ভব সংখ্যাপ্রাচুর্যই সুবিধে করে দেয় আলোচনাকে কয়েকটি কবিতার নির্বাচনে সীমাবদ্ধ রাখতে এবং ইচ্ছে করলে কোনো অসজ্জ্ব সমালোচকও নেতিবচনকে এড়াতে পারেন নির্বাচনের কারসাজিতে। ইচ্ছে করলে, এ-থেকে কোনো এক বছরের অর্থাৎ কোনো এক সময়ের কবিতার অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্তেও পৌঁছনো যায়—যদিও এই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কবিতার মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে তাতে পৌঁছন কিনা কোনো পাঠক, সন্দেহ, বরং এই ভিড়ে হারিয়ে যায় এমন কোনো কবিতাই পরে অন্যসূত্রে তাৎপর্যে ধরা পড়ে, এরকমও দেখা গেছে। সে দিক থেকে বরং কিছু ভালো কবিতা পড়ার তৃপ্তিকেই নিবেদন করা উচিত—এতদ্দ্বারা বাংলা কবিতার হাল বা তার মূল্যায়নের গভীর চেষ্টায় না গিয়ে। তাছাড়া মূল্যবোধ ও নন্দনতত্ত্বের জটিল দুরূহ সমাধানের সীমান্তে ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন তো আছেই, যারা-কতভির উপদেশে,কেউই নিশ্চয় আমরা উটকে ঘোড়া হবার দাবি জানাব না—

আর শারদীয় সঙ্কলনের আশু প্রতিক্রিয়ায় সেই ব্যক্তিগত পছন্দের কৈফিয়তটা তো আরো বেশি বাস্তব—যদিও তার মানে এই নয়, শিল্পের ধাঁচকে আয়ত্তে আনার লড়াইয়ে যে কবি জীবনের বাস্তবতার শিকড়কে ধরতে না পেরে কুপোকাৎ হন কাব্যক্রপবিলাসের বিচ্ছিন্ন পশ্চাতে, তাঁর বিপত্তিতে আমাদের সমর্থন মিলবে কাব্যপাঠের উদার মানসেও।

অবশ্য বিভিন্ন মুখোশের শিল্পবাদীদের কণ্ঠস্বর যেন এবার ক্ষীণ, প্রায় শোনাই গেল না। কোনো কাগজও বোধহয় তাঁদের বেরোয় নি (কৃত্তিবাস বা অলিন্দ)। বোধহয় অন্ত্যুৎপাত বিস্ফোরণ ইত্যাদি ঘটিয়ে, 'পৃথিবীর শেষ কয়েকটি কবিতা' লেখা শেষ করে তাঁরা বানপ্রস্থ নিয়েছেন, কিংবা অন্যেরা, একই মুদ্রার উল্টো পিঠের কবিরা, কবিতাকে বিশুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম করতে করতে নৈঃশব্দ্যের খোঁজে পৌঁছে গেছেন। এখানে সেখানে হয়তো তাঁদের ক্বচিৎ দেখা মেলে, কিন্তু বড়ই করুণ তাঁদের সেই নিঃসঙ্গ নিঃসহায় অবস্থান। সে অবস্থাতেই চোখে পড়ল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চিরন্তন বিষয়হীনতা ('বৃষ্টি কবিতা' : যুগান্তর, 'ধীরে ধীরে, যে ভাবেই হোক' : এক্ষণ), সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের একঘেয়ে প্রগল্‌ভতা ('পালিয়ে গেলেও' : এক্ষণ) কিংবা প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের অহেতুক গাম্ভীর্য ('জীবন বিষয়ক' : এক্ষণ)। বরং প্রণবেন্দুর মার্কিনি ধাঁচের 'দৃশ্যের কাছে কৃতজ্ঞ' (অনুক্ত)-র হালকা চাল উপভোগ্য; কিন্তু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ঋষিবাক্য ('একটি মৃত্যুর মৃত্যু' : কবিপত্র) বড়ই অবিশ্বাস্য লাগে। (অবশ্য এরকম আয়াসহীন আপ্তবাক্যের চর্চা কনিষ্ঠদেরও নানাভাবে লুব্ধ করে—তারই দৃষ্টান্ত কি একদিকে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ('ইবলিসের আত্মদর্শন' : কাব্যপত্র) কিংবা অন্যদিকে পুষ্কর দাশগুপ্তের ('ঘরে' : গদ্য-কবিতা) রচনায় ?

এঁদের হালকা, পলকা, আত্মসর্বস্ব, সমগ্রতারবোধবর্জিত অভিজ্ঞতার বন্ধ্যাত্ব ক্রমশ যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা খুবই স্বাভাবিক। এর পাশে তবু পরবর্তীদের খোলাচোখকানমন এবং তাঁদের অনুসন্ধানরত কাঁচাপাকা অভিব্যক্তি আমাদের সতেজ ও আগ্রহী করে তোলে। রত্নেশ্বর হাজরার কৌপীন উড়িয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ('মডেল' : সীমান্ত), গণেশ বসুর পাঁজর কাটার গান বা বোধের ভিতর প্রতিশ্রুতির মাদল বাজায় ('বাঘবন্দী' : পরিচয়), চিন্ময় গুহঠাকুরতার স্থির সহজ অনুভূতি ('তিনটি কবিতা' : কালান্তর), রণজিৎ সিংহের ঐতিহ্যসচেতন শিকড়-সন্ধান ('অনুক্ষণ মনে যোর' : সাহিত্যপত্র), গৌরাঙ্গ ভৌমিকের অগ্রজদের স্বদেশচিন্তা ('পনেরোই আগস্টের বাংলা দেশ' :

এবা), শুভাশিস্ গোস্বামীর সহমর্মী সাবধানবাণীই ('বসন্ত সংলাপ' : সাহিত্য-পত্র) বরং এ বছরের শারদীয়া-কবিতা-পাঠকের স্মৃতিতে মূল্যবান সংগ্রহ। ঠিক সমানই কিংবা অল্প কমবেশি স্মরণীয় হয়ে ওঠে তুলসী মুখোপাধ্যায়ের 'ভালোবাসা সমীপেষু' (কালান্তর), অমিয় ধরের 'পদাবলী' (কালান্তর), কবিরুল ইসলামের 'যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে' (নবজাতক), ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'সেরিনেড' (পরিচয়)। অথচ এই তরুণ কবিরা দায়িত্ব-বোধে যে একটুও ম্লান নন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত কবিদের অভ্যাসিকতা ও দ্বিধাগ্রস্ততার কথা মনে রাখলে। শিবশম্ভু পাল ('দুঃখ বিষয়ক স্বরবৃত্ত' : পরিচয়), মোহিত চট্টোপাধ্যায় ('দুরাই চলচ্ছবি' : এবা)-এর মতো কবিরাও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথ ছেড়ে আত্মসন্তুষ্টিতে আবৃত বলে মনে হয়। তাই তো অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের অপরিচ্ছন্নতা ('সাতষট্টির নভেম্বরে রচিত' : চতুষ্কোণ) কিংবা বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের দুঃখ-বিলাস ('আত্মপরিচয়হীন' : পরিচয়) বা সত্য গুহের কৃষ্ণ-কুণাও-প্রভাবিত নৈরাজ্য ('আমাদের কবিতার ব্যাপারে' : কবিপত্র) আমাদের আশাভঙ্গ ঘটায়। ধনঞ্জয় দাশ ('বিচিত্র বাংলা' : চতুষ্কোণ) বা তুষার চট্টোপাধ্যায় ('বেড়া ভেঙে ঘর পালাল' : পরিচয়)-এর রাজনৈতিক ছড়ায় বরং কিছুক্ষণ বিশ্রাম পাওয়া যায়। অমিতাভ দাশগুপ্তের অসামঞ্জস্য এবং মাঝে মাঝেই অপ্রাসঙ্গিক শব্দের ঠোক্করে উন্মার্গগামিতার প্রতি লোভ আমার কাছে অস্বস্তিকর—এবার তবু সাদামাটা কিছু সংযত আবেগের কবিতা, যেমন 'হাত তুলে ধরো' (আন্তর্জাতিক) কিংবা কিছু স্বদেশী কবিতা, যেমন 'পাসপোর্টবিহীন বাংলা দেশ' (কালান্তর, পরিচয়), 'বিশ্বরূপের খুলবে আঁখি' (এবা) মনে লাগল। তরুণ সান্যাল ইদানীং শিথিলবিন্যস্ত, বাঁধাবন্ধহীন ইমাজিস্ট ধরনের কবিতা লিখছেন, যা আমাকে বেশ তৃপ্ত করে। এরকম খোলামেলা কবিতা হয়তো আরো অন্য কেউ কেউ লিখেছেন, এমনকি তরুণবাবুর বিপরীত শিবিরের কেউ কেউ, কিন্তু তাঁদের তুলনায় তিনি অনেক কম দুঃখবাদী, অনেক বেশি আত্মসমালোচক ও সমগ্রতার সন্ধানী—হয়তো এখনও আগ্রহ বা আকুলতা যতখানি, সমাধান ততটা প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু তাঁর কবিতার এই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন অবয়বে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি আঁটে বলে মনে হয়। তাই 'সময় আমার সময়' (কালান্তর)-এর চেয়ে আমার পছন্দ 'কবিতার বুকক্রস্ট' (সীমান্ত) কিংবা 'পরিস্থিতি' (কবিপত্র)। মধ্য

ঘোষ বোধহয় একটিই কবিতা লিখেছেন ('দশমী' : অমৃত)। তাঁর বিদেহী কবিতায় ঔদাসীন্যে বিব্রত পাঠক বরং খুশিই হবেন বৃহৎকাতরতায় ধরাছোঁয়া পাবেন কবির স্মৃতিতাড়িত ঈষৎ ভাবালুতায়—কিন্তু তাঁর ভক্তরা কি মানবেন এই 'স্থূলতা'র ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বর্জনে ?

রাম বসুর আবেগে সাড়া না দেওয়া মুস্কিল। তাঁর আবেগের পেশল সাবধানতা ('কোনো বোধ নেই তার' : সীমান্ত) যে কোনো সৎ কবিরই ঈর্ষাযোগ্য। মিনমিনে ধোঁয়া ধোঁয়া অনুদম সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতায় তাঁর উত্তেজনা বেশ প্রতিষেধকের কাজই করে। কিন্তু সেইসঙ্গে অতিকথন বর্জন না করার গোঁ যেন তিনি কিছুতেই ছাড়তে রাজি নন ('আমি শুনতে চাই' : পরিচয়)। প্রকৃতি এখনও তাঁর কাছে সতর্ক ক্ষিপ্র অর্থবহ এবং সেই সঙ্গে দেশে বারবার শহরে কৃত্রিম শৌখিন আচরণের প্রতি ঠাট্টা ('নেপথ্য সংবাদ' : আন্তর্জাতিক)। এই আপোষহীনতার জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞও হই। কিন্তু অভিজ্ঞতার জটিল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার আবেগই ব্যস্ততায় ও সরলতায় ও পুনরুক্তিতে তাঁর আকাঁড়া উত্তেজনা আমাদের সময় সময় বিপর্যস্ত করে ফেলে। ঠিক তেমনি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নৈরাশ্যও যেন আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণে অক্ষম, এত অধৈর্য তাঁর মধ্যে ('তারপর' : পরিচয়)—অথচ তাঁর কাছ থেকেই তো অন্যত্র পাই অসামান্য সুস্থির কাব্যবোধ ('পরিচয়' : ক্রান্তি)। চিত্ত ঘোষের অকালবার্ধক্য ('হেঁটে যাই' : পরিচয়) কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্রের লক্ষ্যহীন অস্পষ্টতাও আমাদের আশাহত করে। মণীন্দ্র রায় বোধহয় ক্লান্ত, তাই 'পুরনো তালিকা ছিঁড়ে' (সারস্বত)-র মতো অযত্ন ও যান্ত্রিকতা তারই সাজে—তার পাশে বরং 'হাজার কার্পাস কোটে' (পরিচয়)-র তীব্রতা ও আকুতি মর্মে পৌঁছয়। অরুণ মিত্রও কি ক্লান্ত ? তাই ঘৃণার চেহারা বা আশার চেহারা ফোটাতে এখন তাঁর স্বরান্তর ঘটে ('রাত জেগে' : যুগান্তর) ? ফলে গদ্যকবিতার সঠিক মেজাজ পেতে আমাদের কি তবে শরণ নিতে হবে শুধু লোকনাথ ভট্টাচার্যেরই ('চারটি প্রেমের কবিতা' : সাহিত্যপত্র) ? লোকনাথবাবুর কবিতা অবশ্য ক্রমশ সংবেদ্য হয়ে উঠছে অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে ও সমাহারে। এর পাশে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অকিঞ্চিৎকর দার্শনিকত্ব ('দরজায় নারী-মূর্তি' : অমৃত) বড়ই সেন্টিমেন্টাল ঠেকে।

জ্যেষ্ঠতর কবিরাও হতাশ করেন হঠাৎ হঠাৎ দু-একটি কবিতার আকস্মিকতায়। ব্যতিক্রম বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং পরবর্তী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বড় কবিতাকে মনে হয় বড্ড বড় এবং ছোট কবিতাকে মনে হয় নিতান্তই ক্ষীণ—যদিচ তাঁর স্বদেশী আবেগের ঢেউ সকলের মনেই লাগবে ('কৌরব' : এষা)। বিমলচন্দ্র ঘোষ যথারীতি আমাদের অনেককেই খুশি করেন তাঁর মতবাদের নিষ্ঠায়, ফলে গুরুচণ্ডালী বা রসাভাসও তখন উপেক্ষা করা চলে ('বিযুক্ত স্মারক' : পরিচয়)। বুদ্ধদেব বসু আজকাল রিলকে অনুবাদ করছেন ('বৃক্ষ' : এষা), সুতরাং আশা করা যায় তাঁর কবিতায় এখন থেকে রিলকের 'প্রভাব' পড়বে বা পড়ছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা রচনার কর্তব্য-বোধ ('কান্না' : অমৃত) কারো চোখে পড়েছে কি ?

এ সমস্তর পাশে বিষ্ণু দে-র অটল চারিত্র বিস্ময়কর। তাঁর অবিচ্ছিন্ন কাব্যধারা আজও অপ্রতিহত, এই শরতেও। অনিবার্যতায় তিনি আমাদের তৃপ্ত করে রাখেন একই সঙ্গে সমসাময়িকতার দাবি মিটিয়ে এবং আমাদের সঙ্কট ও সমাধানের সঙ্গী ও নির্দেশকরূপে—কখনো অনুবাদে ('লুই জুকোফস্কি' : এষা), কখনো প্রাক্তন রচনার নতুন অভিঘাতে ('বালখিল্য রচনা' ১৯৩২ : অমৃত), কখনো ঈষৎ ভিন্ন চালে, রাবীন্দ্রিক চিত্রধ্যানে ('চারদশকের পুরোনো ছবি' : সাহিত্যপত্র) কিংবা প্রকৃতির অনুকম্পায়ী প্রতীকে ('বৃষ্টি সাবিত্রীর গান করে' : সীমান্ত) এবং কখনো আমাদের বহুমুখ সমগ্রতার উপলব্ধির বিন্যাসে ('এক প্রতিভাসে' : কালান্তর, 'যেন জনৈকা মার্কসীয়া' : পরিচয়)— অথচ কি সেই সহজ অনিবার্য সমাধান, দীর্ঘ জটিল তৃপ্তিহীন পথ-পরিক্রমার শেষে যা আমাদের ব্যাপকতম অভীপ্সাকে পূর্ণ করতে পারে—প্রতিটি শব্দগুচ্ছে, প্রতিটি চিত্রে সেই সমাধান সম্পূর্ণ হয় আমাদের প্রত্যহের সচেতনতায় ও অনুভূতিতে, ভবিষ্যৎ কল্পনায় ও বিশ্বাসে।

"সে উপমা কবে তুমি তুলে নেবে, সর্বব্যাপী মাতৃসমা,
প্রত্যহের আশাভঙ্গে ও আশায় সমুত্তীর্ণ দুই বাহুপাশে
ব্যর্থ ও সার্থকে এক, এক প্রতিভাসে ?" ['এক প্রতিভাসে']

"কি ক'রে মালতী হল যে পিয়ালী-স্বয়ং।
কোন্ শক্তির মৃত্তিকা থেকে লাগডাঁটে ধরে নিজেকে ?
এই উল্লাসে এই মরণে অপরাজেয় কি কেন্দ্রিকে
মার্কসীয়া যেন খুঁজে পেল তার বিশ্বব্যাপ্ত বিচিত্রায় সোহহম্ ?
কিসের মাধ্যাকর্ষণে ?" ['যেন জনৈকা মার্কসীয়া']

যে কবিকে সবশেষে আলোচনা করার জন্য আমি আলাদা করে রেখেছি, সেই সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতাই আমার মতে এবারকার শারদীয় সংখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—অন্তত সেই পাঠকের কাছে, যিনি, পূর্বের উপমার জের ধরে বলা যায়, ষাঁড়ের ছুটো শিঙই চেপে ধরেছেন এমন কবির সন্ধানে উন্মুখ এবং তা থেকে বাঙলা কবিতার সম্ভাবনাকেও বুঝে নিতে চান। সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা দীর্ঘকাল যাঁরা লক্ষ্য রেখেছেন, তাঁরা জানেন প্রসঙ্গ-প্রকরণের অতি সরল অর্থাৎ ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় তাঁর আস্থা ছিল না, এমন কি যখন কবিতায় প্রগতির শিবিরে সেই ধারণাকেই কার্যত প্রশ্রয় দেওয়া হতো, তখনও নয়। অথচ কাব্যচিন্তায় ও অভিপ্রায়ে তিনি প্রগতির প্রথম সারির একজনই ছিলেন। কিন্তু সরল সমীকরণের শান্তিতে তিনি মানবজীবন ও অভিজ্ঞতার আলো-আঁধারকে বর্জন করেন নি, বরং সমগ্রতা-অর্জনের চেষ্টায় তাঁর এতদূর সততা যে, নিজের আত্মকে উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তিনি তাঁর অবশ্যম্ভাবী পিছুটানকে বাদ দিতে পারেন না। ফলত তাঁর কবিতা এক সময়ে হয়ে উঠেছিল অস্তিত্বের দ্বন্দ্বময়তা ও তার যন্ত্রণার কাব্যরূপ—তিনি বুঝেছেন, নিরন্তর দ্বন্দ্বময়তাকে টিকিয়ে রাখাই নৈর্ব্যক্তিক সততার শর্ত। দ্বন্দ্বের লীলাকে নিজের সত্তায় অবিরল অনুভব করেন বলেই ব্যস্ত আবেগ, ক্ষত্র দৌড় বা দ্রুত নির্বাচনে তাঁর প্রবল আপত্তি। তাই কি কবিতার লাইন তাঁর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় অনিশ্চয়তার ধাক্কায়, ক্ষত্র দৌড়কে থামাতে চান উচ্চারণের মন্থরতায়, দ্বিধাকে প্রকাশ করেন অসংখ্য ও আকস্মিক ছেদচিহ্নে, শব্দের ভঙ্গুরতায়? আশ্চর্য তাঁর শব্দবোধ এবং ছন্দের কান। ইদানীং বুঝি কিছুকাল তাঁর কবিতায় এই পিছুটানটাই বড় হয়ে উঠছিল, দ্বন্দ্বের নিরপেক্ষতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সত্তার অন্ধকারটাই যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল, ভয় হচ্ছিল সিদ্ধেশ্বর সেনও বুঝি এবার নিষ্ক্রিয় অন্তর্মুখিনতার নিরাপদ অন্ধকারে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু সেই সঙ্কট-পর্বও যে কতদূর পূর্ণগর্ভ ছিল, তার প্রমাণ, এবার শারদীয় সংখ্যার ৫টি কবিতায় ('যেন হয় মানবিকতায় পুষ্ট রুচি' : কালান্তর, 'খুঁজবে না স্বকীয় আভাস' : পরিচয়, 'এটুকু পথও যেন হয় দীর্ঘতর' : সাহিত্যপত্র, 'তোমার ভাষা' : এবং, 'তোমার প্রতিমা ভেসেছে' : অনুক) তিনি যেন বেরিয়ে এলেন মানবিক অনুভূতির নরক-দর্শনের ক্লান্তি থেকে সুস্থতা ও বিশ্বাসের আত্মপরিচয়ে। বোঝা যায়, এগুলো সবই একই সময়ে লেখা, যেন কোনো অলৌকিক অভিজ্ঞতার চাপে কবির

সাম্প্রতিক ব্যক্তিগত উপলব্ধির অর্থ, নৈর্ব্যক্তিক জিজ্ঞাসার চিরন্তন ক্রিয়া এবং এমন কি প্রাক্তন নৈরাশ্যের অভিজ্ঞতার নির্যাস মিলে মিশে গেছে কোন অখণ্ডতায়। শেষ চারটি কবিতার মধ্যে যেন একটা ক্রমও লক্ষ্যগোচর হয়—যেন দ্বিধাকে কাটিয়ে কাটিয়ে কবি সিদ্ধান্তে পৌঁছুচ্ছেন।

"তুমি কি নিজের দিকে তাকাবে না
কোনোকাল
দেখবে না তোমার উল্লাস, জ্বালায় শতেক দীপ, আলো··· [পরিচয়]

"তোমার মৃত্যুর ভাষা, বোঝার ও-আশা
সে কি ভার ?" [এক্ষণ]

"বারোমাস
ঋতুর যাপনে
কেন আমাকেই, তোমাকেও আনলো ডেকে,
—টানে···
এটুকু পথও যেন হয় দীর্ঘতর···" [সাহিত্যপত্র]

"তোমার প্রতিমা ভেসেছে আমার জোয়ার-ভাঁটার টানে।" [অনুক্ত]

ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাও বটে, কিন্তু সে তো সত্তার নতুন উপলব্ধিও, যার সঙ্গে যোগ আমাদের সকলেরই—বিশেষত শেষ কবিতায় আমাদের পুরাণ ও প্রতিমার সঙ্গে মিশে সেই অভিজ্ঞতা আমাদের আশঙ্কা ও আশ্রয়েরই প্রতীক হয়ে উঠেছে। ভাবতে ইচ্ছে হয়, সিদ্ধেশ্বর যেন সেই কাঙ্ক্ষিত অন্বয়ে পৌঁছুতে চলেছেন, যেখানে তিনি বিষ্ণু দে-র অনুকারী নন, সার্থক উত্তরাধিকারী।

ব্যক্তিগত রুচির কৈফিয়ৎ লেখার সূচনায় ছিল, সেই কথা বলেই এ লেখা শেষ করা উচিত—কারণ অজস্র শারদীয় সংখ্যার মধ্যে যে অধিক সংখ্যকই পড়ে উঠতে পারিনি, তা অ-পাঠ্য এমন বলার দুর্বুদ্ধি যেমন কারো হবে না; তেমনি পঠিত কাব্যগুলোরও সংখ্যাপ্রাচুর্য আমার ব্যক্তিগত পছন্দের অধিকারকেই প্রশ্রয় দিলো—তবে ব্যক্তিগত পছন্দ ব্যাপারটা সত্যিই তো পুরোপুরি ব্যক্তিগত নয়, এই যা বাঁচোয়া।

অরুণ সেন

ব্যবহারে, ব্যবহারে, ব্যবহারে জীর্ণ শব্দগুলি একসময়ে বড়ো পুরনো হয়ে যায়। পুরনো হয়, কিন্তু নাকচ হয় না। সেই বিপুল শব্দসমষ্টি দিয়েই তো প্রতি যুগের ভাষা-নির্মিতি—তবে নতুন প্রয়োগে, নতুন ব্যঞ্জনায়, নতুন প্রতীকে। পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে মানুষ বদলায়, তার ভাষা-কথা-চিন্তা-দর্শন সবকিছু নিয়েই তার বাড়ি-বদল। এই গতিশীল অগ্রসরতাকে প্রতিমুহূর্তের বর্তমান দিয়ে ধরে রাখা সবযুগেরই শিল্পের সমস্যা। একদা শেক্‌স্‌পীয়র পড়ে আমাদের প্রপিতামহদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তাঁদের ঐতিহ্যবোধে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য, দেখতেন যাত্রা, পড়তেন শেক্‌স্‌পীয়র—সেই আমাদের নাট্য-সাহিত্যের নান্দীপাঠ। তারপর শতবর্ষ-অতিক্রান্ত সময়ের স্রোতে সেই ভাবনাধারণাগুলি মলিন হলো, ভক্তিরসে আর দেশাত্মবোধের উন্মাদনায় প্রচুর হাততালি-কুড়নো নাটকের যুগটা নিঃশেষে কখন ফুরিয়ে গেল, যাতে এখন, এমন কি, কলকাতার অফিস-ক্লাব থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত কোথায় যেন 'বিল্বমঙ্গল'-'কর্ণার্জুন' অথবা 'সাজাহান'-'সিরাজদ্দৌলা'য় ক্লান্তিবোধ। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার স্তরগুলি ডিঙিয়ে অবশেষে এমন একটা সময় এলো, যখন জীবন-ঘনিষ্ঠ এবং নৈর্ব্যক্তিক-সচেতন নাটক-উপভোগের জন্য পাঠক-দর্শক-শিল্পী-নাট্যকার এক উপলব্ধির অংশীদার। অবশ্য এর অদ্ভুত পরিণামে আমাদের ঐতিহ্যবহ যাত্রা 'থিয়েটার'-এর (!) পোষাক পরতে চাইছে এবং অন্যদিকে শুভসংবাদ এই যে, বাঙলানাটক আধুনিকতার নতুন আঙ্গিকের, নতুন ভাষার অন্বেষণে মগ্ন। অবশ্য একদিন, সব আধুনিকতার প্রথম আচার্য, নিভৃতে এবং একান্ত নিঃসঙ্গভাবে বাঙলা নাটকের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে গেছেন, সমকালে যা শুধু বড়ো-বাড়ির নাট্যমণ্ডপে কতিপয় বুদ্ধিজীবীর আস্বাদনে সার্থক, বৃহত্তর সমাবেশে ব্যাপক পরিচিতি তার তখনই ঘটল, প্রয়োগকলার নবনিরীক্ষায় বাঙলা নাটক যখন নিজের সাবালকত্ব অর্জনে অস্থির। কর্মের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যা রেখে গেলেন, আর বিষয়-বক্তব্যে 'নবান্ন' 'ছেঁড়া-তার' যে নতুন ধাক্কা দিলো, আধুনিক বাঙলা

নাটকের নাবালকত্ব মোচনের সাধনা সেখান থেকেই শুরু। কিন্তু মূলধনের সবটুকু স্বদেশে জুটল না। তাই বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন অনিবার্য হলো। প্রপিতামহের কাছে যা-ছিল শুধুই শেক্‌স্‌পীয়র, আমাদের কাছে তাই হলো য়ুরোপ-আমেরিকার তাবৎ নাট্য-প্রয়াসের অভিজ্ঞতার সমাহার। সাম্প্রতিক বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের দিকে তাকালে এই পরদেশ-নির্ভরতার প্রাবল্য সহজেই চোখে পড়ে। নবনাট্য আন্দোলনের নাট্য-নির্দেশকরা বাইরে যখন মাতৃভাষায় প্রযোজনা-উপযোগী মৌলিক নাটক খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন, নাট্যদলের আত্যন্তিক প্রয়োজন মেটাতেই তখন বিদেশী কোনো বিখ্যাত নাটকের দেশজকরণ ঘটে। শিল্পের প্রশ্নে এ-জাতীয় নাটক সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা থাকা স্বাভাবিক এবং এ-নাটকের রচনাকার অবশ্যই কখনও পূর্ণ-নাট্যকারের দাবিদার নন, তথাপি এ-জাতীয় নাটকগুলি বর্তমান বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এ-অন্তর্ভুক্তির স্বপক্ষে প্রথম বক্তব্য, স্বদেশ সম্বন্ধে সামগ্রিক চেতনা মৌলিক নাট্য-রচনায় যতটা প্রয়োজনীয়, অনুসৃত-নাটকে তার দাবি কিছুমাত্র কম নয়। দ্বিতীয়ত, নবনাট্য আন্দোলন যদি ব্যবসায়িক-মঞ্চের সঙ্গে সমান্তরাল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত করে তুলতে সক্ষম হয়, তবে আশা করা অন্যায় নয় যে, সেদিন অনেক অনুপ্রাণিত নাট্যকার সমগ্র আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যেই গড়ে উঠবেন। অন্তত ততদিনের অভাবকে ভরে রাখার ক্ষেত্রে এই অনুসৃত-নাটকগুলির গুরুত্ব অনেক। সুতরাং সে-তর্ক আপাতত থাক, অনুসৃতই হোক অথবা মৌলিকই হোক—আধুনিক বাঙলা নাটকে আমাদের অন্বিষ্ট হবে তার রূপগত কারুকলা, যা আমাদের দগদগে বর্তমানকে জড়িয়ে, জাতির অবচেতন থেকে উৎসারিত আবেগকে নিঙড়ে নিঙড়ে যার প্রকাশ।

যথার্থ আধুনিক নাটক হিসেবে বহুজনস্বীকৃত নাটকগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় অভিনয়-মঞ্চে—দর্শনে এবং শ্রবণে। কেন না, অধিকাংশ নাটকই পাণ্ডুলিপি-আশ্রয়ে অভিনীত। পরীক্ষামূলক নাটকাবলীর প্রকাশ (গ্রন্থ বা সাময়িকপত্রে) বিরল। তবু সান্ত্বনা এই যে, নাট্য-সংক্রান্ত কিছু পত্রিকা এখনও প্রকাশিত হয়। আধুনিক বাঙলাদেশের নাট্যপ্রয়াসকে জানার জন্য এই পত্র-পত্রিকাগুলিই বিশ্বস্ত অবলম্বন। এদের এবং অন্যান্য কিছু পত্র-পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাগুলিতে বেশ কিছু নাটক পড়া গেল।

অধুনা বাঙলা নাটক সম্বন্ধে আগ্রহী মানুষের কাছে বাদল সরকারের নাম অশ্রুত নয় এবং এ-বছরের শারদীয় 'বহুরূপী'তে প্রকাশিত তাঁর একাঙ্ক নাটক

'বাঘ'ও পূর্বপরিচিত। রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে নাট্যকারের নির্দেশনায় নাটকটি কয়েক রজনী অভিনীত হয়েছে। কথা, কথা, শুধু কথা; আমরা সবাই এক অদ্ভুত কথার প্রেমে বিভোর। শব্দগুলির কোনো স্পষ্ট অভিধা মনে না রেখেই আমরা শব্দগুলি ভাষায় উচ্চারণ করি, কারণ কথা বলতে ভালোবাসি বলে; অদ্ভুতভাবে গৃহগত মন নিয়ে বিবরনিবাসী হই বেঁচে থাকার স্বভাবে। অথচ জ্ঞানে বা কর্মে কোনো প্রেরণা নেই। নিঃসন্দেহে একটি ভালো নাটক। 'বাঘ' একজন মানুষ, প্রতিবাদী মানুষ; নামটাই শুধু প্রতীকী। দুর্বৃত্তের হত্যায়ই হোক অথবা অসহায়ের দীনতা—নিজের ঘাটতি পূরণে পরস্পর-নির্ভরতা, জ্ঞান আর বুদ্ধির নিরিখে পরস্পর-ঘনিষ্ঠতা, এই হলো জীবনের পরম মুক্তি।

শারদীয় 'বহুরূপী'তে অভিনয়-পরবর্তী আরও একটি নাটকের প্রকাশ—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'যখন একা।' ইংরেজ নাট্যকার আর্নল্ড ওয়েস্কার-এর 'রুটস' নাটকের অনুসরণে রচিত এই নাটকটি 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় দীর্ঘকাল ধরেই অভিনীত হচ্ছে। আমাদের সময়ের একটি জরুরি নাটক 'যখন একা।' প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অর্থহীনতায় অথবা শিক্ষাহীনতায় যে এক অদ্ভুত সামাজিক পরিমণ্ডল আমাদের চারপাশে তৈরি হয়েছে, সেখানে আমরা অভ্যাসে বাঁচি। যদি প্রকৃত শিক্ষার উপনয়ন কারও ঘটে, তখন নিজের বিশ্বাসকে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে ভাবনার আর ভাবনাহীনতার সেতুবন্ধনে যোগাযোগের ভাষা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। জীবনকে সরাসরি ধরার চেষ্টা আছে এ-নাটকে। দেশজকরণে নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নাটকটিকে নির্মম-জীবন্ত করে তুলেছেন। বিচ্ছিন্নতার নাটক হিসেবে অভিযুক্ত হবার প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা (অবশ্য নামকরণ অনেকটা দায়ী) এ-নাটকের আছে। কিন্তু বীথি সংসারের আর সব মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়েই নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে— সে স্বতন্ত্র। তার কণ্ঠধ্বনিতে নতুন ভাষা, সেখানে চিন্ময়ের কণ্ঠস্বর, চিন্ময়ই সাম্যবাদ—এ-উপলব্ধি অন্যায়ভাবে একা হয়ে যাবার, একা হয়ে থাকার নয়। সবাইকে আলিঙ্গনে জড়াতে চেয়েই সে নিজের নির্বাসন আবিষ্কার করেছে।

একটি সম্ভাব্য ভালো নাটকের অসংখ্য উপকরণ নিয়ে লেখা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক—'নিষাদ' (অভিনয়-দর্পণ)। ইতিপূর্বে তাঁর অন্য কয়েকটি মৌলিক নাটক মঞ্চে অভিনীত হয়ে নাট্যকারকে বেশ কিছুটা পরিচিতি দিয়েছে, নাটকের ব্যাকরণে যে-নাটকগুলি 'অ্যাবসার্ড'-ধর্মী।

নিরীক্ষার স্তর পুরোপুরিভাবে অতিক্রান্ত না-হলেও দীর্ঘ অনুশীলনের অভিজ্ঞতায় 'নিষাদ'-এর নির্মাণ-কারুকলা পাতায় পাতায় বৈচিত্র্যময়। এ-যুগেরই অবক্ষয়-মানসের শিকার এক যুবক—দিবাকর। যাদুকরের যাদুদণ্ড তার সব অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা আনে—মোহের যাদুতে সে অবশ। প্রেম চেয়েছিল, অজ্ঞাত-ললনা তাকে ঘিরে লতা হয়ে ওঠে। মেডিকেল ছাত্র ছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিখ্যাত ডাক্তার হয়ে ওঠে, প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় পর্যায়ে পিতা, আত্মদহন, বুক পেতে বংশধরকে রক্ষার প্রয়াস। প্রতিটি স্তরেই একটি করে মৃত্যু—এ-মৃত্যু চরিত্রহননের, বিবেকহত্যার, নৈতিক অবনমনের। প্রভুর বেশে পুঁজিবাদী (অথবা শাসক), জীবন-বিরোধী আচরণে যুবকদের অদ্ভুত ব্যাধি (দৃষ্টিভ্রম, হৃদয়সঙ্কুচন ইত্যাদি), কোরাসের ভূমিকায় সাংবাদিকরা। সংলাপে, ভাষায়, সামগ্রিক অবয়বে এ-নাটক প্রায় কাব্যনাট্য, সিচুয়েশান সৃষ্টিতে কখনও বাস্তবতাকে ছুঁয়ে কাব্য, কখনও সরাসরি রূপকথা। নাট্যকার যে মূলত একজন কবি, এ-নাটক পাঠের অভিজ্ঞতায় তা বারবার মনে হয়। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তিনি কোনো নবতর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান (যা এ-জাতীয় নাটকে অত্যন্ত জরুরি), নাকি কেবল কবিসুলভ আবেগে জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণাগুলিকে নাড়াচাড়া করতেই প্রয়াসী ? নইলে কেন একদিকে বর্তমান জীবনের কঠিন বাস্তবকে দু-হাতে শক্ত করিয়ে ধরতে চাইছেন, এবং ফর্ম হিসেবে এমন কিছুকে আশ্রয় করছেন যাতে কাব্যময়তার আচ্ছাদনে একটা বড়ো কিছু আড়াল পড়ে সমগ্র নাটক শুধু 'সুখপাঠ্য' হয়েই থাকছে ? হয় পুরোপুরি অ্যাবসার্ড-তত্ত্বে অথবা আরও ঘনীভূত জীবনবোধে শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে এগোতে হবে, নাটককে এক-জায়গায় জীবনের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে মেলাতে হবে। কথাগুলি বলতেই হচ্ছে, কেন না, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। বাঙলা নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিযুক্ত একজন তরুণ নাট্যকার—এতো আমাদের অনেকেরই উৎসাহের কারণ।

জীবনের "কঠিন গদ্য" নিয়ে 'অভিনয়-দর্পণ'-এ দুটি একাঙ্ক নাটক লিখেছেন 'কাল-বিহঙ্গ'—মনোজ মিত্র, 'প্রতিধ্বনি'—শেখর চট্টোপাধ্যায়। কারখানায় যখন লাগাতার ধর্মঘট, শ্রমিকদের ঐক্য ভেঙে মালিকপক্ষ যখন পুলিশের সাহায্যে আর শ্রমিকদের ঘরে ঘরে দালাল পাঠিয়ে ধর্মঘট ভাঙতে ব্যস্ত ; ঠিক সেই সময়েই এক ধর্মঘটী শ্রমিকের বাপ পথে পথে পাখির চাতুরি দেখিয়ে লোক ঠকানোর

ব্যবসা চালাচ্ছে। ছেলে লোহার অর্গল দু-হাতে ভাঙতে ব্যাকুল এবং তারই পিতা অন্ধকারের কুসংস্কার আর ভণ্ডামিকে জাপটে ধরে আছে—এই হলো 'কাল-বিহঙ্গ'-র বিষয়বস্তু। 'প্রতিধ্বনি'র নায়ক পবিত্র এক মধ্যবিত্ত যুবক—যাকে ঘিরে বর্তমান সমাজের কুৎসিত নগ্ন ছবিগুলি—চোরাকারবার, মজুতদার, ঘুষ, পকেটমার, পণপ্রথা ইত্যাদি। নিদারুণ বাস্তব এবং সত্যভাষণ, বিশ্বস্ত ফটোগ্রাফ। লেখকদের সততার প্রতি গভীর আস্থা সত্বেও বলতে হয়, শিল্পের আবেদনকে তীক্ষ্ণতর করে তুলতে শুধু এই 'ডকুমেন্টেশান'-ই যথেষ্ট নয়; তার অতিরিক্ত একটা ভাবনা আছে। সংবাদপত্রের পাতায় যা প্রতিদিন দেখি, নাটকের ভাষায় তাকে নতুনভাবে বলতে হয়। ফর্ম আর বক্তব্যের যুগলমিলনেই শিল্পের যথার্থ আধুনিকতা। বিপরীত দিকে একটি শোচনীয় ব্যর্থ-প্রয়াস রতনকুমার ঘোষের একাঙ্ক নাটক 'শেষ বিচার' (অভিনয়-দর্পণ)। দর্শক আর মঞ্চের শিল্পীকে একাকার করে নাট্যকার এ-যুগেরই কিছু জরুরি বক্তব্য নতুনভাবে নবতর আঙ্গিকে উপস্থিত করতে চাইছেন, যা শেষপর্যন্ত কিছু ভাষণমাত্র, কোথাও পৌঁছয় না। শুধু একটা 'ফর্মালিজম'-এর প্রয়াস।

অথচ সেদিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'বহুরূপী'-তে প্রকাশিত লোকনাথ ভট্টাচার্য-র 'শ্রীশ্রীকালীমাতা রেশন ভাণ্ডার'। দিল্লী-প্রবাসী সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি অতীন স্বেচ্ছায় কলকাতার একটি রেশনের দোকানের ভিড়ে লাইন দিয়েছে। 'দুঃস্বপ্নের শহর' কলকাতা, রাজনীতি-সচেতন বিক্ষুব্ধ কলকাতা, নোংরা শহর কলকাতা, মমতাময় কলকাতা। আসলে কলকাতাকে খোঁজার মধ্যে নিজেকেই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে দেখা, দূর-প্রবাস থেকে স্বদেশ বাঙলার প্রতি যে তীব্র আবেগ-অনুভূতি, এ-আত্মানুসন্ধানে তার ক্যাথারসিস। মজুতদার অনিলবাবুর দোকানে বিক্ষুব্ধ জনতা লকলকে আগুন জালল—তার একদিকে "নকশালবাড়ি লাল সেলাম" "মাও-সে-তুং লাল সেলাম", অন্যদিকে "বন্দেমাতরম" "জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ"—মধ্যবর্তী ফাঁকটুকু দিয়ে পুলিশ। বাল্যবন্ধু বলে সনাক্ত করে অতীন যাকে আপন করতে চাইল, দেখা গেল সে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত এক আপাত-উন্মাদ; তারপর ক্রমে ক্রমে মানুষের কাছে গিয়ে আবিষ্কার করল—কি ভয়ঙ্কর এক আত্মিক দীনতা, ভয়াবহ বিশ্বাসহীনতা, সন্দেহ, সংশয়। শেষপর্যন্ত কি-এক গুঢ়তারজনক ঔদাসীন্য, ক্যালাসনেস। চারদিকে যখন এত তোলপাড়, এত হট্টগোল; মানুষ ধুঁকছে, শিশু মরছে, আগুন জ্বলছে; তখনও পকেট থেকে তাসের প্যাকেট বের হয়, আর কিছু না-হোক নিরাপদ

পাশা-পেটাপেটি চলে। হয় তো এ-নাটকও একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়। বিশেষত শুরুর দিকে সুধীরের সঙ্গে সংলাপে অতীনের অকারণ দীর্ঘভাষণ (যার ভাষাও খুব মামুলি) কিছুটা ক্লান্তিকর। কিন্তু সমগ্রভাবে এ-নাটক একটা উপলব্ধির স্তরে ধাক্কা দেয়, সেটা আমাদের দশকের বর্তমান-সংক্রান্ত কিছু সত্য-উন্মোচনের লক্ষণও বটে। তার সঙ্গে এক-দৃশ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে শ্রীভট্টাচার্য এতগুলি কুশীলবকে নানাভাবে ভেঙেচুরে সন্তর্পণে এগিয়েছেন—শুধু আবেগ নয়, বুদ্ধিকে স্বীকৃতি দিয়ে! আবেগকে নাড়া দেওয়া সহজ, কিন্তু পাঠক-দর্শককে বুদ্ধিমান করে তোলাও শিল্পীরই দায়িত্ব।

'এ আমি চাইনি'—'অভিনয়-দর্পণ'-এ প্রকাশিত সুধাংশু দাশগুপ্তের একটি নাটক। তাঁর নাট্যবোধ প্রশংসনীয় এই কারণে যে, কিঞ্চিৎ অসংযমে এ-নাটক একটি গোয়েন্দা-নাটকে পরিণত হয়ে যেতে পারত। তবে বক্তব্যকে তিনি যথেষ্ট জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত করতে পারেন নি, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার জট ছাড়াতে গিয়েই সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির প্রতি তাঁর বক্তব্য শেষপর্যন্ত অস্পষ্ট থেকে গেছে। আন্টন শেকভ-এর 'সোয়ান সঙ'-এর অনুসরণে রচিত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রংয়ের দিন' বাঙলাদেশের নাটক-রসিকদের কাছে ব্যাপক প্রচারিত। নাট্যকারের নির্দেশনায় ও একক অভিনয়ে সমৃদ্ধ এ-নাটক বাঙলা-দেশে বেশ কয়েক বছর ধরে অভিনীত হয়ে আসছে। মুদ্রিত অক্ষরে একাঙ্ক নাটকটি পড়ে বেশ আনন্দ পাওয়া গেল।

এবারের শারদীয়া সংখ্যায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নাটক—মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'বেঁচে থাকার দরকা' (নন্দন), উমানাথ ভট্টাচার্যের 'সত্যকাম' (পরিচয়), 'দিবারাত্রি' (কালান্তর)—তিনটি একাঙ্ক। 'বেঁচে থাকার দরকা' একটি ভালো রচনা। ধর্মঘটী শ্রমিকের সংসারে মধ্যবিত্তসুলভ নীচতা-হীনতার পাশে আশা-আকাঙ্ক্ষার ঘনিষ্ঠ ছবি এ-নাটকে আছে। তবে 'সোনা'র (স্কুলের ছাত্র) মুখে কিছু আদর্শবাদী উক্তি বেমানান। একটি বলিষ্ঠ একাঙ্ক—'সত্যকাম'। অন্যায়ভাবে যুক্তফ্রন্ট-সরকারের পতন ঘটাবার পর যে-গণতান্ত্রিক আন্দোলন সারা বাঙলায় বিক্ষোভের দাবানল জ্বেলেছিল, তার পটভূমিকায় রচিত এ-নাটকে সাম্প্রতিক রাজনীতির বিবিধ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত। একটি বিশেষ সময়ের ঐতিহাসিক দলিল-মূল্য এ-নাটকের গৌরব। অবশ্য উমানাথবাবুর অধিকতর ভালো রচনা 'দিবারাত্রি'। বারো বছর পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে, কারাবাসের পর যে-যুবক ধীরে ধীরে স্ত্রী-প্রেম-সত্তাব্যসন্তান-দিবানিদ্রার মুখে স্বার্থপর হতে

হতে পার্টি থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে, একদিন সে আবিষ্কার করল, সময় আর গতি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারই বৃদ্ধ পিতা, সারাজীবনের চাপোষা মানুষ, সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের গভীর পর্যন্ত সকলের অলক্ষ্যে ধর্মঘটী কারখানার ইউনিয়ন-সংগঠনগুলিকে রক্ষার কাজে নিজেকে বিলিয়ে যাচ্ছেন। জীবন থেকে পলায়ন-উন্মুখ সন্তানের প্রতি কী-এক নিঃশব্দ তীব্র ভর্ৎসনা! উমানাথ ভট্টাচার্যের আরেকটি নাটক 'অন্তরাল' (আন্তর্জাতিক) এক দিক থেকে যথার্থ রাজনৈতিক নাটক। কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বা পার্টি-প্রচার নয়—মধ্যবিত্ত ভীরুতা ও বিবেক-পীড়নে দ্বিধা-দীর্ণ যে মানুষগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রাজনৈতিক উন্মাদনায় করা হয় না; অথবা কাছে টানার বদলে যাদের শুধু নিন্দাপঙ্কে ফেলে আরও দূরে ঠেলে দেওয়া হয়—ধর্মঘট-ভাঙার সেই কতগুলি দালালকে নিয়ে রচিত এ-নাটকটি মহত্ত্বের দাবি না-করলেও, তা সমসাময়িক রাজনীতির সত্য-উন্মোচনে অথবা জনমত সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। আশা করব, কর্মের নিরীক্ষায় আরও মনোযোগী হয়ে শ্রীভট্টাচার্য আরও বলিষ্ঠ নাটকের ভাবনায় অগ্রসর হবেন—যার আবেদন শুধু তাৎক্ষণিক নয় এবং 'ডকুমেন্টেশন'-এই যা নিঃশেষ নয়। এই 'ডকুমেন্টেশন'-এর মূল্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক মদন-গোপাল সেনগুপ্তের 'একেই বলে নেতৃত্ব' (আন্তর্জাতিক)। তথাকথিত আদর্শের নামাবলীর নিচে যাদের দুর্নীতি আর অপরাধের পাপ—এ-নাটকের নায়ক তাদেরই একজন। আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এই একাঙ্কগুলি এক্ষুনি অভিনীত হওয়া প্রয়োজন।

এ-ছাড়া অজিত মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘের গর্জন' নাটকটি (সারস্বত) নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বাঘ শিকারের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের নানা শ্রেণীর মানুষের বিভিন্নমুখী অভিব্যক্তি এবং অবশেষে ঘৃণ্য পরশ্রমজীবী ধনপতির বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ মানবিক আবেগ নাটকটিকে নতুন শ্রী দিয়েছে। রূপকের সহায়তা নিয়ে নাটকটি পাঠকের কাছে এক স্বতঃসিদ্ধ অথচ জটিল জীবন-তৃষ্ণার আবেগ নিয়ে উপস্থিত।

ভিয়েতনাম—আমাদের রাজনৈতিক সচেতনায় সর্বাধিক প্রিয় শব্দ, নিবিড়তম আবেগ। ভিয়েতনামের পটভূমিকায় দুই আমেরিকান যুবককে (বড় ভাই কাঠখোট্টা, ছোট ভাই কবি) কেন্দ্র করে 'অভিনয়-দর্পণ'-এ নাটক লিখেছেন মোহন রক্ষিদার—'খেসারত'। এক দুষ্টে জোতা নিরীহ ভিয়েতনামীদের উপর

নৃশংস উৎপীড়ন করে নিজের জিঘাংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় তৃপ্ত। অন্ত দৃশ্যে হ্যামন্ড বন্দী হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মানবোচিত আচরণে বিস্মিত—সে অনুভব করে তার জন্মভূমি আমেরিকাই হলো কবিতা আর মানবতার শত্রু। জাঁ-পল-সার্ত্র-র 'সম্মানিত পতিতা' আমরা পড়েছি, উৎপল দত্তের 'মানুষের অধিকারে' দেখেছি। তবু সবিনয়ে বলব—ভিয়েতনাম সম্বন্ধে আমাদের একটু স্বতন্ত্রভাবে ভাবা উচিত। ভিয়েতনামীরা নন, শ্রীদস্তিদারের নাটক পড়ব এবং দেখব আমরা, ভারতবাসীরা। ভিয়েতনামের শত্রু ম্যাকনামারা সেদিন কলকাতায় এসেছিলেন, প্রচণ্ড ক্রোধে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল বাঙলার যৌবন। কলকাতার বিক্ষোভ আর ভিয়েতনামের বিক্ষোভকে এক-বিন্দুতে ধরবার চেষ্টা করা হোক। ভারতবর্ষের উপর যে কালো ছায়াটা ঘুরছে, তাকে স্পষ্ট করার জন্যই এমন নাটক লেখা হোক, যেখানে ভিয়েতনাম একটি রাজনৈতিক শিক্ষা, একটি প্রতীক। নইলে শুধু নিজের বিবেকতুষ্টি আর সান্ত্বনার জন্য আবেগতাড়িত কল্পিত ভিয়েতনাম-পটভূমি খুব আবেদনবহ নয়।

অবশ্য নাটকের শেষ-বিচার মঞ্চমূল্যে নির্ধারিত। সাহিত্যের নিরিখে যেখানে সংশয়, সুপ্রযোজনায় হয়তো সেটাই সমাগত দর্শকের অভিনন্দনধন্য। সেটা স্বতন্ত্র শিল্পের এক্তিয়ার। কিন্তু নাট্যসাহিত্যের একটা নিজস্ব এলাকা আছেই, এ-আলোচনা সেখানেই সীমাবদ্ধ। বাঙলা নাটক নানাভাবে, নানা-দিকে পরীক্ষিত হচ্ছে। তারুণ্যের এই অব্যাহত উদ্যম ক্লান্তিহীন। নতুন মূল্যবোধ, দেশজ সংস্কৃতির প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যে আধুনিক জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বুক পেতে নিয়ে বাঙলা নাটক আত্ম-প্রতিষ্ঠ হবে—এ-আশা রইল।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

৩

বাঙলা সৃজনী সাহিত্যের যে কোনো কর্ম—ছোট গল্প, উপন্যাস বা কবিতা—রচনাবাহুল্যে ফেঁপে-ওঠার শরৎকালে পাঠককে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতেই হয়: প্রথমত, ঐ রচনাবলীতে প্রাক্তন থেকে সরে আসার কোনো প্রয়াস আছে কিনা। দ্বিতীয়ত, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যথার্থ অভিনবত্ব কতখানি এসেছে। তৃতীয়ত, সময়—কি দেশজ কি আন্তর্জাতিক—লেখকদের কতখানি আকৃষ্ট করেছে এবং জীবন সম্পর্কে লেখকদের বোধ—কি ইতিবাচক কি নঞর্থক—তাঁদের এ্যাটিচুডকে কতদূর স্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচিত হতে পারে, এমন কয়েকটি গল্প আলোচনাকে সংহত করার জন্য এখানে গ্রহণ করা হচ্ছে। গল্পগুলির লেখক ও নাম—গোপাল হালদার: অঘটন ঘটন (পরিচয়), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: দেবদাস ও তিতির (পরিচয়), বুধন (কালান্তর), অমিয়ভূষণ মজুমদার: ইলেকট্রনিক্‌স্‌ (অমৃত); বনফুল: আভাস (বেতার জগৎ); অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: ধৃতরাষ্ট্র (বেতার জগৎ); দেবেশ রায়: বেঁচে বর্তে থাকা (পরিচয়), বেঁচে বর্তে থাকা (আন্তর্জাতিক), বেঁচে বর্তে থাকা (সাহিত্যপত্র); অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়: বন্দরের গল্প (অগ্রদূত), আগুন জ্বালাবার গল্প (পরিচয়); সংশয় (কালান্তর), অমলেন্দু চক্রবর্তী: ইছামতী বহমান (পরিচয়); সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: মহাপৃথিবী (কলকাতা), কুকুরের ভাষা (গল্প-কবিতা); সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ: ইঁদুর (লেখা ও রেখা), মৌগাঁয়ের পথে ভোর (পরিচয়) এবং অমল দাশগুপ্ত: নেগেটিভ ও মাইনাস (কালান্তর), নিয়তি (পরিচয়)।

'অঘটন ঘটন'-র লেখক গোপাল হালদার গল্প কদাচিৎ লেখেন। গল্পটির বিষয় বিমাতার সংসারে অবাঞ্ছিত একটি বয়ঃসন্ধির কিশোরী ও তার অনুগত একটি নেড়ি কুকুরের বাঁচার জন্য মরীয়াপনা। শিশু রসদষ্টির ক্ষমতা গল্পটিকে

চাপা ত্মাত্তির মতো ঘিরে আছে। গল্পে ঐ কিশোরীটির একটি প্রেমের এপিসোড আছে, যা মামুলিই বলা চলে। কিন্তু কাহিনী-বৈচিত্র্য যেখানে, সেখানে সমান্তরালভাবে একটি সাড়ে-তিন-ঠ্যাঙা কুকুর ও একটি মার-খাওয়া মেয়ে উভয়েই রীতিমতো লড়াকুভঙ্গিতে কষ্ট সময়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে। একজন প্রবীণ লেখকের রচনায় এ-জাতীয় রোখা মেজাজের সন্ধান পাওয়া একান্ত বিস্ময়কর।

গল্পের মধ্যে এবার জীবনের জটিলতা ও সমাজমনস্কতার চমৎকার ছবি এঁকেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বহুক্ষেত্রে সরাসরি না বলে রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন সমাজ আর ব্যক্তি-সত্তাকে। 'দেবদাস ও তিতির' গল্পটিতে লোহার খাঁচার বন্দীত্ব অস্বীকার করে বন্দী একটি তিতির পাখির মৃত্যু বরণ করার মধ্য দিয়ে লেখক মানুষের মুক্তির ইচ্ছাকে চমৎকার রূপ দিয়েছেন। "রক্ত মাখা মৃত পাখিটা তো···একটা প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদটা তখন দেবদাসের সামনে একটা আকাশজোড়া তিতির হয়ে ডানা মেলছিল, তার মাথার রক্তটা আগুন হয়ে জ্বলছিল যেন, তার বাঁকা হলদে ঠোঁটটা তখন একটা বাঁকা তলোয়ারের মত চলে যাচ্ছিল আকাশ ছিঁড়ে।" অথবা 'বুধন' গল্পটির উপসংহার—"তাছাড়া, এতো গোরখপুর নয়, শহর কলকাতা। লাখো কুত্তা এখানে। কে মারে? কাকে মারে?"—এক ধরনের প্রতীক সৃষ্টি করে। অনেকে বলবেন, আজও প্রতীকধর্মের সার্থকতা আছে কি? সে প্রশ্ন অবান্তর হয়ে দাঁড়ায় যখন দেখি, তাঁর অধিকাংশ সমবয়সী লেখকদের রচনার মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলি ফলাফলহীন ও দায়িত্ববিহীন নয়। তাছাড়া, যে কোনো সাময়িক ঘটনার আন্দোলনকে অনুভূতিতে আত্মস্থ করে আনার দুর্লভ ক্ষমতা তো তাঁর আছেই।

অমিয়ভূষণ মজুমদার পূর্বতন রচনাভঙ্গি থেকে সরতে সরতে 'ইলেকট্রনিক্স' গল্পে প্রায় সমাকীর্ণ যেরুতে এসে দাঁড়িয়েছেন। খুব সফিসটিকেটেড, দুরন্ত, স্মার্ট লেখা; পাঠকের কাছ থেকে রীতিমতো অভিনিবেশ ও পরিশ্রম দাবি করে। প্রকরণের দিক থেকে খুবই নতুনত্ব গল্পটিতে, একালের বিজ্ঞান বনাম হৃদয়বৃত্তির সমস্যাটিকে বেশ নতুন ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। অমিয়-ভূষণের চিন্তাপ্রবাহ তীব্রগতি, অথচ তা পাঠকের ভাবনাকে নড়িয়ে দেয়। "কারণ খেলা দেখাটা আনন্দ হতে পারে, কিন্তু উপভোগটাই শেষ কথা নয়, উপভোগটা যথার্থ কিনা, কি হলে তা যথার্থ উপভোগ হয় তা

বুঝে উপভোগ করাটাই মানুষকে অগ্রসর করে," বা "…সেই কালো ভ্যানটা এসে দাঁড়াবে দরজায়। পাড়ার কেউ দেখবে না, কারণ ও ভ্যানটা পাড়ায় ঢুকলে পথের ধারের জানালাগুলোকে বন্ধ করে দেয়" ইত্যাদি পংক্তি নিশ্চয়ই আমার বক্তব্যের সমর্থনে যাবে। তাছাড়া কিছু চলন্ত কবিতা পেয়ে যাই, যা আমাদের কৃতজ্ঞ রাখে—"টেবলে বেশ এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে। কাচের গ্লাসগুলোর ওপরেই তার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ," বা "কারণ নিনা, কারণ তুমি নিজেও কি বুঝে উঠতে পারো নি কি অসম্ভব খাড়াই আর উচ্চতা এই উপত্যকার, তুমি সীমান্তে যেতে পারো কিন্তু সে শুধু শনিবারের প্রথা মতো বেড়াতে, কারণ কোনো পথই নেই প্রকৃতপক্ষে কাইমেলের পথ ছাড়া আর সে ব্যালাস্ট ট্রেনের থামবার জায়গায় পৌঁছনো যায় না, ধ্বসে পথ আটকানো, কিম্বা পথ আর ধ্বস নামা ছুটোছুটি স্বপ্ন। নিনা, তুমি আসছো না কেন…।"

বনফুলের 'আভাস' গল্পটি নিঃসন্দেহে বহু পঠিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, কি ভাব কি ভাষায় একজন নামী লেখক সর্বাংশে কতদূর নিঃস্ব হয়ে যেতে পারেন, গল্পটি তার একটি স্মরণীয় দলিল। তেমনই পাশাপাশি 'ধৃতরাষ্ট্র' গল্পে তরতর করে বয়ে চলেছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কলম। যাকে বলে "খাসা গল্প!"

দেবেশ রায় তিনটি পত্রিকায় 'বেঁচে বর্তে থাকা' এই একই শিরোনামায় তিনটি গল্প লিখেছেন। গল্পগুলি প্রেমের গল্প, তবে বাঙলাদেশে যেভাবে প্রেমের গল্প লেখা হয়, সে ঢঙে নয়। আমার কাছে খুব অস্বস্তির কারণ এটা, কারণ এ-জাতীয় রচনা আমার পাঠের অভ্যাসের বাইরে। রীতিমতো সাবধানে, শির টান করে গল্পগুলি পড়তে হয়। বিবৃতি নয়, ফিস নয়, ছিকে টইটম্বুর লেখা নয়—পাথুরে মাটির অনিচ্ছুক বুক থেকে বৃষ্টি যেভাবে জোর করে উদ্ভিদ আদায় করে, তেমনি এক জবরদস্তির মাঝখানে প্রথমে অসহায় হয়ে উঠি।

সব গল্পেই এক স্থান-কাল-পাত্র—একটি ঘর, সন্ধ্যে থেকে মধ্যরাত, দম্পতি বিজিত ও বপ্পা। সাত বৎসর বিবাহিত জীবন, "তার আগে তিন বছর প্রেমের জীবন," সন্তান নেই, ফলে ঘরে বপ্পা নিঃসঙ্গ। হাল্কা ঠাট্টা-রসিকতায় বিজিতের অফিস-ফেরা সন্ধ্যে, বপ্পার তৈরি নতুন নতুন খাবারের প্রিপারেশন। কর্ণিকা, এ্যাঞ্জেল কেক, গোয়ালিনির হটচিপস, নিখুঁত শাড়ি, সোফা কাম বেড, রান্নার গ্যাস, হট-বক্স, কলকারির দেয়া আদর্শ পরিবেশ…সবই নিরর্থক। কারণ,

"বিজিত ডান হাত দিয়ে ধীরে স্বপ্নাকে বেষ্টন করে বুকের কাছে ধরে রাখলো,—স্বপ্না ফিস্‌ফিস্‌—"ভালো লাগে না, ভালো লাগে না, এর চেয়ে দশ-বারোটা ছেলেমেয়ের মা হওয়ারও একটা মানে—।" বিজিত স্বপ্নার মাথায় হাত দেয়। "নিজের কোনো পরিচয়ই নেই।" বিজিত স্বপ্নার সিঁথিতে আঙুল বোলায়। "এ-সব ফেরত দিয়ে দাও, আমি ঘরদোর মুছবো রান্না বাড়ি করবো, এত খাটনি বাঁচিয়ে লাভ কি "·· মাঝরাতে স্বপ্না নতুন মায়ের ত্রস্ততায় ধড়মড় করে নিজের বালিশে ফিরে কমলা রঙের আলোতে নগ্ন দীর্ঘ হাত মেলে বিজিতকে টেনে তার মাথা আর-এক পুষ্ট বাহুর ওপর এনে বিশদ স্তন দুটির মাঝখানে বিজিতের ঠোঁটদুটিকে গুঁজে দেয়—"বিজিত সোনা, কাঁদে না"।" অবশ্য এই ইচ্ছা-পূরণের জগৎ তৈরি করে বাঁচা যায় না, তাই স্বপ্না কখনো প্রচণ্ড কটু-ভাষিণী, তার খ্যাপামোর আকস্মিক ঝড়ে বিজিতের স্বস্তি তছনছ, বিরক্ত। পরিবার পরিকল্পনার যুগে আধুনিক মডেল-দম্পতির জীবনে একটি যৌন সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে নাজেহাল অবস্থার সম্ভবপর নিপুণ ছবি তুলে ধরার দক্ষতা দেবেশ রায়ের এই গল্পত্রয়ীকে অসামান্য করেছে। তাঁর রচনাদক্ষতা ও আঙ্গিক নির্মিতির ক্ষমতা বর্তমানে প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন। এই শরতে বহুকাল পর তাঁর গল্প প্রান্তরের বিস্তৃতি থেকে ব্যক্তি-সংকটের চৌকাঠে মুখ ফিরিয়েছে।

'সাহিত্যপত্র'-এ প্রকাশিত গল্পটিতে স্বপ্নার তিনবার গর্ভপাতের পর চতুর্থবার গর্ভসঞ্চার। অবস্থা প্রায় দাঁড়িয়েছে "টুকটাক ঘুরেবেড়িয়ে নিচে নেমে ফোন করে, ওষুধ খেয়ে তালুতে মুখ মুছে, 'নষ্ট হয়ে গেছে',কথাটায় যেন দুপুরের রান্নাকরা ডাল বা তরকারি নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা বোঝায়"; বা বিজিতের "একদিনের ছুটি নেওয়াটাও ছুটি নষ্ট করা—এমন স্বাভাবিক আর সহজভাবে স্বপ্নার গর্ভটা নষ্ট হয়ে যায়।" মুখে স্বপ্নার, " 'বাদ দাওনা, সবারই কি ছেলেপুলে হতে হয়' ",অথচ ডাক্তারের কাটাছেঁড়ায় সে সায় দেয়, কারণ,"যেন কেউ এক-জন বলে বসতে পারে তোমার নিজের শরীরের কষ্ট হবে বলে আমার শরীরটা তৈরিই হতে দিলে না। মা।" নষ্টগর্ভা স্বপ্নার সঙ্গে প্রতিটি মৈথুনই বিজিতের মনে বারবার ধর্ষণের অপরাধবোধ নিয়ে আসে। প্রশ্ন করা যাচ্ছে না, গল্প জুড়ে ঠারে ঠোরে বিজিতের ব্যাকুলভাবে বোঝার প্রয়াস– সেদিন, অর্থাৎ চতুর্থবার স্বপ্নার গর্ভপাত হয়েছে কিনা। বিজিতের মানসিক পরিক্রমের সঙ্গে লেখক এক বল্‌গায় বেঁধে যেন পাঠকদের অস্বস্তি, অফিস-ফেরত দরজার কাছে দাঁড়ানো

বিজিতের চিন্তার এক অনবদ্য বর্ণনায়, "হিরণ্যকশিপু যেমন স্তম্ভের সামনে, তেমনি দরজার সামনে বিজিত দাঁড়ায়।"

সন্তানহীনা স্বপ্না স্বামীর শরীরকেই বারবার নতুন মায়ের মতো খুঁটিয়ে দেখে। এই বাস্তব দেখাকে গল্পটির অন্তিমে লেখক স্বপ্নার বাস্তব স্বামী ও কল্প-সন্তানের এক যুগ্ম অস্তিত্বে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এ-সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে কেবল অংশটুকু উদ্ধার করে দেওয়াই শ্রেয় মনে করি। " "বলো তো কি লিখেছি—" বিজিতের পিঠে আঙুল দিয়ে লেখে স্বপ্না—"বিজিত" "হয়েছে, এবার—"…'স্বপ্না' 'হয় নি' 'কি লিখেছ'? 'স্বপন'…'বিজন' 'সুজিত' 'অভিজিত' নাকি অন্ধকারে এই নামলেখা ছাড়া আর কিছুই নেই, তাই নাম নাম একটু একটু করে,…'বিশালাক্ষি' 'সুমন' 'সুজন', স্বপ্না হাততালি দেয় আর নামগুলি হামাগুড়ি দেয় আর দুলে দুলে হাঁটে আর স্তনবৃন্ত ওষ্ঠে নিয়ে ঘুমিয়ে যায়, নামগুলি ঘুমিয়ে যায় 'রঞ্জন' ঘুমোয়, 'চন্দন' ঘুমোয়, 'টগর' ঘুমোয়… বিজিতের পিঠে স্বপ্নার শিলালিপি খোদাই শেষ, বিজিতের নাম পাঠ শেষ, অন্ধকারে দু-পাশে দুটো বুক দুজনের মাঝখানে ধবধবে সাদা একটুখানি নাড়ুগোপাল শূন্যতা আগলে রাখে।"

অশিক্ষিত, সংস্কারগ্রস্ত, যৌনপীড়িত ও ধর্মভীরু জাহাজীদের নিয়ে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সঙ্গে গল্পসৃষ্টির ক্ষমতাকে মিশিয়ে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বেই কিছু সার্থক কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'বন্দরের গল্প' ও 'সংশয়' এই ধারায় দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'আগুন জ্বালাবার গল্প' অন্য চরিত্রের। তবে, এই সক্ষম গল্পকার তাঁর অধিকারের সীমা জানেন। তাই ভবঘুরে, উন্মাদ, উড়নচণ্ডী, হাবাগোবা গাঁয়ের মানুষ; ধর্মান্ধতা, স্বদেশী যুগ, পূব বাঙলা —এই বৃত্তের বাইরে তিনি বড় একটা যান না। ফলে, স্বভাবতই তাঁর রচনায় ব্যাপ্তি অপেক্ষা কেন্দ্রিকতা বেশি। গ্রাম্য প্রবাদ, কিংবদন্তী, লোকভাষা, এমনকি অপ-ভাষাও তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে উপরোক্ত গল্প তিনটিতে ব্যবহার করেছেন। যৌনতা, যৌন বিকার, এই বিকৃতিতে অনুতাপ এবং একে অতিক্রমের আকুল ইচ্ছা বিশেষ করে 'বন্দরের গল্প' বা 'আগুন জ্বালাবার গল্প'-র মূল বিষয়। জাহাজের বদ্ধ পরিবেশে দীর্ঘকাল থাকতে থাকতে প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর প্রতি এক খালাসির অমূলক সন্দেহ কিভাবে অশরীরী অবয়ব পেতে পেতে তার দিন-রাত্রির অস্তিত্বকে দাঁতে ছিঁড়ে দিচ্ছে, তারই কাহিনী 'সংশয়'। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার অত্যন্ত সৎ লেখক বলে মনে হয়,

চরিত্রে একটু বেশি ইনভলভড ও প্যাশনেট। তিনি শক্তিমান বলেই তাঁকে হয়তো বলা প্রয়োজন, শরীর নিয়ে সম্প্রতি তাঁর গল্পে বড় বেশি কাবড়াকাবড়ি দেখা যাচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে তিনি বেশ একটু অবসেসড, তাই গল্পের কোথাও কোনোগতিকে নারীদেহ এসে পড়লে পাঠকের সমস্ত মুডকে ভেস্তে না করা পর্যন্ত তিনি যেন থামতে চান না। শ্লীল-অশ্লীল নয়, অনেকাংশে ইকনমিও যে শিল্পগুণ, তা নিশ্চয় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সমবয়সী লেখকদের তুলনায় অনেক দেরিতে গল্প লেখা শুরু করেছেন। তাঁর গল্পে যে চটুল জর্নালিস্টিক ধরন থাকে, 'মহাপৃথিবী' ও 'কুকুরের ভাগ্য' গল্প দুটিতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। লেখা দুটিতে ভাষার সম্পন্ন গতিবেগ লক্ষ্য করার মতো। 'কুকুরের ভাগ্য' এক কথায় আঙ্গিক-সর্বস্ব, 'মহাপৃথিবী' গল্পে পেঁয়াজ-রসুনের বাড়াবাড়ি থাকলেও গল্পটির বিস্তার চোখে পড়ে। দুটি গল্পই বয়ঃসন্ধির পাঠক-পাঠিকাদের আকৃষ্ট করবে।

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ তাঁর অভিজ্ঞতার গভীরতা ও রচনা-স্বাতন্ত্র্যে আমাকে আলোড়িত করতেন। এবার শরতে তাঁর লেখা গল্পগুলি পড়ে আমি গভীর বেদনা বোধ করেছি। সিরাজের কিছু পূর্বেকার রচনা, বিশেষত তাঁর উজ্জ্বলতম গল্প 'শান্তিঘর', আমার এখনো স্মরণে আছে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অদ্ভুত ধরনের ছন্নছাড়া লেখা লিখছেন, যা প্রায় অভাবনীয়। তাঁর 'মোগাযের পথে ভোর' বা 'ইঁদুর' গল্পের লুম্পেন চরিত্রগুলি আচারে-ব্যবহারে পাঠকের কাছে কোনো সহানুভূতিই দাবি করতে পারে না। খিস্তি-খেউর, মেয়ে নিয়ে হল্লাবাজি, চূড়ান্ত অশালীন শব্দপ্রয়োগ—বাজারি লেখার এই পথটি সিরাজ এত দ্রুত চিনে ফেলেছেন যে বিস্মিত হতে হয়। তিনি আমার প্রিয় লেখক, অন্তত ছিলেন; তাই কথাগুলি আমায় রীতিমতো দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে। সম্প্রতি যে-পথ সিরাজ নিয়েছেন, তা অন্তত তাঁর পথ নয়।

এরই পাশাপাশি অভিনিবেশ, নিষ্ঠা ও মানবিকতার গুণে ক্রমশ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছে অমলেন্দু চক্রবর্তীর গল্প। গত শরতে 'আন্তর্জাতিক'-এর গল্পে তাঁর রচনার এই মানোন্নয়ন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। 'আন্তর্জাতিক'-এ এবারও তিনি একটি চমৎকার ব্যঙ্গ গল্প লিখেছেন। তবে, এক কথায় বলা চলে, এ-বছর 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'ইছামতী বহমান' গল্পে তিনি একটি স্মরণীয় দিগন্ত স্পর্শ করেছেন।

এ সেই পাসপোর্টবিহীন আমাদের আবেগের স্বপ্নের বাঙলাদেশের গল্প,

যেখানে এক দিকে মেঘ হলে অন্যদিকে বৃষ্টিপাত হয়। দেশবিভাগের পর কুড়নো মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে-আসা পালিকা মা ও তাঁর ছেলে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্তের কাছাকাছি এক জায়গায় এতদিনে হদিশ-পাওয়া মেয়েটির আসল মা-বাপের কাছে চলেছেন। নকল মা নকল দাদা দীর্ঘ একুশ বছরে আসল মা-দাদা হয়ে গিয়েছেন, সত্যি মা-বাবাকে মেয়েটি এ-যাবৎ দেখেনি। এমন কি জন্মসূত্রের কথাটিও মেয়ে মৃন্ময়ী অতি সম্প্রতি শুনেছে। সারা গল্প জুড়ে এক আশ্চর্য প্রাণস্পন্দন দপদপিয়ে উঠছে, পড়তে পড়তে কৃত্রিম বিভাগের প্রতিরোধ-কামনায় পাঠকের গলায় জন্মের কান্না দলা পাকিয়ে ওঠে। প্রথম থেকেই খুব উঁচু তারে বাঁধা হয়েছে গল্পটি, যা আগাগোড়া বজায় রাখা কম কৃতিত্ব নয়। এক দুর্যোগময়ী রাতে দু-বাঙলার মাঝখানে খণ্ডিতা বেদনাতুরা দুই সহোদরা দেশের প্রতীক মৃন্ময়ীকে দাঁড় করিয়ে লেখক পরম নৈপুণ্যে তার চেতনাপ্রবাহ উন্মুক্ত করেছেন, "রক্তের প্রবাহে ঝড় ওঠে, শরীরটা অবশ, মৃন্ময়ী চোখ বোজে। তোমরা কারা? কি চাও? আমি চিনি না। এই একুশ বছর ধরে বড়ো একটা আলোর জগতে আমার বড়ো হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতাটা কেড়ে নিতে চাও! তার আগে, তোমাদের অতীতের ভুল আর অন্যায়ের পাওনা আদায় করতে কেন তোমরা এলে? নিমজ্জিত অন্ধকারে বইছে ইছামতী, মৃন্ময়ী যেন তার স্পষ্ট কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। যদি ভেসে যেতে পারতাম সেই স্রোতে, বিপুল অন্ধকারে স্নিগ্ধ জলের ধারা, শীতল বাতাস, ডান-হাতে জল কাটলে সবুজ দিগন্ত, বাঁ-হাতে সেই একই সবুজ, একই মৌসুমী বাতাসে এ'পারে ও'পারে জল।"

লেখক গল্প জুড়ে পা টিপটিপ বিপদবাহক এক রহস্যময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। বর্ডার-চেকপোস্ট, চোরা-চালানদার, মানুষ-পাচারের দালাল এবং তারই মাঝখান দিয়ে অনিদ্র পিতা-মাতার হারানো কন্যা-সন্তান—সব মিলিয়ে এক দম-বন্ধ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মৃন্ময়ীকে মৃদু লণ্ঠনের আলোয় একবার মাত্র দেখে সেই পিতা-মাতা যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন, "শুধু শেষবারের মতো একবার, আলোর শেষ রেখার পিছন থেকে সেই নারীমূর্তিকে আবছা দেখা গেল, তারপরই অন্ধকার, অন্ধকার, আর মনে হলো যেন একটা দূরাগত বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর—পারুলরাণী মালাকার, পিতা শ্রীশম্ভুনাথ মালাকার, সাকিন ভক্তজা, কেরানিগঞ্জ থানা ঢাকা সদর, গোত্র বাৎস্য, রাঢ়ী শ্রেণী।" গল্পটি অবশ্য এখানে সমাপ্ত হলেই ভালো হতো। অন্তে

ইতিহাসের অধ্যাপক দাদার বক্তৃতাটি যে কোনো অর্থে এমন গল্পে অচল ও অতিরিক্ত।

বৈজ্ঞানিক ফ্যান্টাসি, কৌতুক ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সমন্বয়ে বাঙলা গল্পে এক সম্পূর্ণ নিজস্ব পটভূমি গড়ে তুলেছেন অমল দাশগুপ্ত। এক ডায়েরি-লেখকের লেখা পড়তে পড়তে 'নেগেটিভ ও মাইনাস' গল্পে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের শেষে লেখক সিদ্ধান্ত করেন, "ওহে বিপ্লবী, তোমার বয়স সকালে না-বাহাত্তর, কেন-না তখন তুমি বুড়োদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করো. মেক-আপ নেবার সময়ে না-উনচল্লিশ, চাকুরিস্থলে না-একচল্লিশ, বৌয়ের কাছে না-পঁয়তাল্লিশ, পলিটিক্যালি নেগেটিভ, অর্গানাইজেশনালি মাইনাস।"

সমস্ত আবেগ ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাস্তব কাণ্ডজ্ঞানরহিত মধ্যবিত্ত আদর্শবাদের ব্যর্থতার আর-একটি উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ তাঁর 'নিয়তি'। দুটি গল্পেই লেখকের লক্ষ্যভেদী হাত আমাদের পরগাছা-জীবনের ভেতরের ছবিটাকে চোখের সামনে উল্টেপাল্টে একেবারে নগ্ন করে তুলে ধরে। এ-জাতীয় গল্প বাঙলায় খুব পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

উপরোক্ত গল্পগুলি ছাড়া এই শরতে প্রকাশিত যেসব গল্প পাঠকদের আকৃষ্ট করতে পারে, সেগুলির মধ্যে সত্যপ্রিয় ঘোষের 'যাচাই' (লেখা ও রেখা), মিহির সেনের 'মাঙ্গার হত্যার উপাখ্যান' (পরিচয়), চিত্ত ঘোষালের ভিয়েতনামের ওপর গল্প 'শিকার' (লেখা ও রেখা), মতি নন্দীর 'দেখতে আসা' (পথিক), বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কফি হাউস' (অগ্নীক্ষণ) ও প্রলয় সেনের 'ভলিদি বিষয়ক গল্প' (গল্প-কবিতা) উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটি। সত্যপ্রিয় ঘোষ এবং মিহির সেন এবারও তাঁদের রচনায় সমাজচেতনার দৃষ্টিগ্রাহ্য স্বাক্ষর রেখেছেন। তাছাড়া, 'পরিচয়'-এ একটি চমৎকার গল্প—'পক্ষীরাজ'—লিখেছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ। এবারের অন্যতম সেরা গল্প।

বেশ কিছুকাল ভাটায় কাটিয়ে বাঙলা গল্প আবার জোয়ারের মুখে পড়েছে, এর চেয়ে আশাব্যঞ্জক খবর গল্প-পাঠকদের কাছে আর কীই বা হতে পারে?

অমিতাভ দাশগুপ্ত

বন্যার জল নেমে গেলে

চিন্মোহন সেহানবীশ

উত্তর বাঙলায় দু-মাস আগে যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গেল—তার বিভীষিকাজনক ও মর্মান্তিক নানা টুকরো টুকরো খবর এতদিনে বেশ কিছুটা প্রচারিত হয়েছে, বিশেষ করে বাঙলাদেশের পত্রপত্রিকায় (একমাত্র কালিম্পং ও মিরিক পাহাড় অঞ্চলের খবর সংবাদপত্র-পাঠকদের কাছে এখনো তেমন পৌঁছয়নি)। হয়তো তাই এখানে ঐসব ঘটনা পুনরাবৃত্তি করার তেমন প্রয়োজন হতো না। কিন্তু বিপর্যয়ের পর হপ্তাখানেক কাটতে না কাটতেই সরকারী মহল থেকে যেভাবে ঐ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়িয়ে "সর্বত্রই অতি দ্রুত normalcy পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে" বলে থেকে থেকেই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হচ্ছে, তাতে (সেদিনকার সেই বিপর্যয়কালীন অবস্থার কথা না হয় বাদই দিলাম) আরো হালের কয়েকটা ঘটনা গোড়াতেই বলে রাখা দরকার:

জলপাইগুড়ি শহরের দোরগোড়ায়, তিস্তা যেখানে বাঁধ ভেঙে সর্বনাশ ঘটিয়েছে সেই পাহাড়পুর থেকে শুরু করে দোমহনি পর্যন্ত, আমরা ৬ঠা নভেম্বর তারিখেও দেখেছি হাজার হাজার গৃহহারা সর্বস্বান্ত মানুষ কোনোমতে পাট-কাঠির কুঁড়ে বানিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বাঁধের উপরে প্রায় খোলা আকাশের নিচে। রাতের ঘুরঘুটি অন্ধকারে শীতের উত্তরোত্তর কনকনানি ও দাপটবৃদ্ধির মুখে যারা এভাবে রয়েছে, তাদের প্রতি-তিনটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ একটি তেরপল—তাও দেখলাম অনেক পরিবারের কপালেই জোটেনি; আর পরিবার পিছু একটি কম্বল—তা সে-পরিবার দু-জনেরই হোক বা বিশ জনেরই হোক। এবং খাদ্যের বরাদ্দ? সারা দিনে একবার প্রাণধারণের মতো কয়েক হাতা খিচুড়ি। বিকেল চারটে নাগাদ দেখলাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নামলেখা শালুজড়ানো একখানা ট্রাক দেখে শয়ে শয়ে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ থালা হাতে আধ মাইল দূর থেকে ছুটে আসছে—ছুটতে ছুটতে কেউ কেউ পড়ে যাচ্ছে আছাড় খেয়ে, অন্যেরা দৌড়চ্ছে তাকে ফেলে, হয়তো তার উপর দিয়েই। তাদের তখন অন্নচিন্তাই অনন্তচিন্তা, বুঝি বা চব্বিশ ঘণ্টার পর এবার দু-মুঠো মিলবে। অথচ আমরা জানতাম সে ট্রাকে খিচুড়ি নেই!

সরকারী normalcy-র এই এক ছোট্ট নমুনা। এর তারিখটাও মনে রাখা দরকার—৪ঠা নভেম্বর, অর্থাৎ বিপর্যয়ের পুরো একমাস পরে। আমাদের সঙ্গে সেদিন ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি।

তিস্তার ওপারে দোমহনির ব্যাপারটাও মনে পড়ে। দেখা গেল একটা মস্ত দিঘির পাড়ে অনেক লোকের ভিড়—দিঘিতে নাকি শুশুক লাফাচ্ছে। সত্যিই দেখলাম লাফাচ্ছে। কিন্তু শুশুক তো নদীর বাসিন্দে—এখানে এলো কি করে? শুনলাম তিস্তার বানে ভেসে এসে জল সরে যাওয়ার পর নাকি আটকা পড়ে গেছে, আর সেই বানে সেখানকার সাত-আট হাজার মানুষের ঘন বসতি ভেসে গিয়ে তৈরি হয়েছে ঐ বিশাল দিঘি। সে সাত-আট হাজার মানুষ তবে গেল কোথায়? কিছু হয়তো কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ঐ বাঁধের উপরে আশ্রয় নিয়েছে। আর বাকিরা? কেউ তার সঠিক হদিশ জানে না—তবে মনে মনে একটা আঁচ করে নেয়।

মালবাজারের পথে যোগেশচন্দ্র টি এস্টেট-এর কাছে 'ক্রান্তির হাট' নামে পরিচিত যে জায়গাটিতে শুনেছি পূব পাকিস্তান থেকে প্রায় বিশ হাজার মানুষ কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে আস্তানা বেঁধেছিলেন—সেখানে আজ ধূ-ধূ প্রান্তর। বিপর্যয়ের পর দ্বিতীয়বার ছিন্নমূল ঐ দুর্গতদের জন্য যে আশ্রয়প্রার্থী শিবির বসেছে, তাতে অদ্যাবধি সাড়ে ছ-হাজারের মতো শরণার্থী জড়ো হয়েছে। আর বাকি সাড়ে তের হাজার? কিছু নিশ্চয়ই এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। কিন্তু সে আর কত! বাকিরা? সঠিক জবাব কেউ জানে না—শুধু আঁচ করে মনে মনে।

আসলে ঐসব গ্রামাঞ্চলের মুস্কিল হচ্ছে, ওখানে এ-ধরনের দুর্যোগে বাড়ি ঘরদোর একেবারে নিঃশেষে এমনই মুছে যায় যে হঠাৎ দেখলে টের পাওয়া শক্ত। দুর্বিপাক সেখানে জলপাইগুড়ি শহরের মতো ইঁট-কাঠ-টিনের রাশি রাশি ভাঙচুরের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রকট উগ্রভাবে রেখে যায় না। যতক্ষণ না সেখানকার মানুষ বলছে—ঐ যে মস্ত শান্ত দিঘি বা বিশাল ধূ-ধূ প্রান্তর দেখছেন, ঐখানে মাত্র কয়েকদিন আগে আপনার-আমার মতো দশ-বিশ হাজার মানুষ বসবাস করত—ততক্ষণ বাইরে থেকে আসা শহুরে মানুষের চোখে প্রকৃতির হিংস্র তাণ্ডবের মাত্রা ধরাই পড়বে না। তার এই প্রচ্ছন্ন নির্মমতা কিন্তু জলপাইগুড়ি শহরের প্রত্যক্ষ নির্মমতার চাইতে কম নয়—জীবন-হানি বা বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতি কোনো দিক থেকেই না।

ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ানের কথায় মনে পড়ল—২৩শে অক্টোবর জলপাইগুড়ির সেনপাড়া ঘুরে পাহাড়পুরের পথে যেতে ('কম্পাস'-সম্পাদক শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত ও লোকসেবক সঙ্ঘের শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন) দেখলাম, সরকারী কর্মচারীরা বেরিয়েছেন ক্ষয়ক্ষতির তত্ত্বতালাসির উদ্দেশ্যে। দেখলাম তাঁদের হিসেবের তালিকায় ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, গরুবাছুর, টাকা-কড়ি—সব কিছুরই নির্দিষ্ট কোঠা রয়েছে, নেই শুধু মানুষের জীবনহানির মতো তুচ্ছ ব্যাপারটার। কর্মচারীরা জানালেন ওটা নাকি থানা থেকে করা হয়।

কি ভাবে করা হয়, তাও একটু পরখ করে দেখা যেতে পারে। সকলেই জানেন বিপর্যয়ের ফলে কালিম্পং বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। দেশী-বিদেশী ট্যুরিস্টদের সেখান থেকে হেলিকপ্টারযোগে উদ্ধারের রোমাঞ্চকর সব কাহিনীও পড়া গিয়েছিল কাগজে। তবু ৩১শে অক্টোবর যখন আমরা এক ট্রাক রিলিফের মালপত্র নিয়ে সেখানে পৌঁছই, তখন শুনলাম যে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা (আর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত মানিয়েন) সেদিনই নাকি কালিম্পং-এ সর্বপ্রথম বেসরকারী রিলিফ এনেছিলাম। অর্থাৎ বিপর্যয়ের ২৬ দিন পরে প্রথম সত্যকার রিলিফ পৌঁছেছিল সেখানে। কারণ এর আগে অবধি হেলিকপ্টারযোগে যে সরকারী রিলিফ পাঠানো হচ্ছিল, পরিমাণের দিক থেকে তার দৌড় নিশ্চয়ই খুব বেশি ছিল না। তারপর যেসব চাল বা গমের বস্তা ফেলা হচ্ছিল, তার অনেকটাই অপচয় হচ্ছিল খাদের মধ্যে গড়িয়ে বা বস্তা কেটে চাল ছড়িয়ে গিয়ে। তাছাড়া স্থানীয় লোকদের ধারণা—শেষপর্যন্ত যে-মাল ঠিক মতো পৌঁছচ্ছিল, তার একটা মোটা অংশ যাচ্ছিল সৈন্যবাহিনীকে খাওয়ানোর জন্যে।

আর কালিম্পং-এর সঙ্গে শিলিগুড়ির (কিছুটা মাল নেওয়ার মতো) সংযোগ যদি বা ঘটনার ২৬ দিন পরে গরুবাথান-লাভা-আলগাড়ার ৮৪ মাইল ঘুরপথে এখন কিছুটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কালিম্পং শহরের সঙ্গে কালিম্পং মহকুমার অন্যান্য অংশ এমন কি শহরের পনেরো মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত বসতি-গুলির সম্পর্ক কিন্তু এখনো প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই রয়েছে। এ-সব অঞ্চলে যে-ধস নেমেছে, আমাদের মতো সমতলবাসীদের চোখেই যে তা অকল্পনীয় তাই শুধু নয়, পাহাড়ীরাও জানালেন যে তেমন ধসের কথা তাঁরা তাঁদের বাপ-ঠাকুর্দার কাছেও কখনো শোনেন নি। শ্রীযুক্ত সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের মতো

প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিও লিখেছেন : "আমি বহুদিন যাবৎ পাহাড়ের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু এবারে কালিম্পং যাবার সময় গরুবাথানে ঢোকার পর থেকে কালিম্পং পর্যন্ত দু'ধারে পাহাড়ের যে রূপ দেখলাম তা পূর্বে কখনো দেখিনি। সমস্ত পাহাড়ের গা যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে এবং যেখানেই ছোটোখাটো ঝোরা (ঝর্ণা) ছিল সে সমস্ত জায়গায় ধ্বস নেমে ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে" (কালান্তর, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৬৮)।

অথচ "বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার বিস্তৃততর অংশের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন না করেই রাজ্য সরকার মানুষ ও পশুর মৃত্যুসংখ্যা পাকাপাকি স্থির করে কেন্দ্রকে জানিয়ে দিয়েছেন" ('প্রলয়ের পর উত্তর বাংলা'—দেবেশ রায়, যুগান্তর, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৮)। সরকারী পরিসংখ্যানের এমনই মাহাত্ম্য !

আসলে মৃত্যুসংখ্যা বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাসের চেষ্টা বা 'normalcy' পুনঃ-প্রতিষ্ঠার ঘনঘন ঘোষণা সরকারী মহল থেকে যে এত সজোরে প্রচারিত হচ্ছে, তার কারণ—"First phase is over", "এখন থেকে চলবে পুনর্বাসনের কাজ"—এই অজুহাত তুলে তাঁরা এবার রিলিফ দেওয়ার দায়িত্ব ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছেন (ঠিক এইভাবেই তাঁরা উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের খবর প্রচারিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জলপাইগুড়ির নাম করে মেদিনীপুরের রিলিফের কাজ গুটিয়ে নিতে শুরু করেছেন)। অথচ সমস্যাটা মোটেই এখন রিলিফ বনাম 'রিহ্যাবিলিটেশন' বা রিলিফ আগে না পুনর্বাসন আগে—এই রকমের নয়। মানুষকে অনির্দিষ্টকাল 'ডোল' দিয়ে নিশ্চয়ই ভিখিরিতে পরিণত করা চলে না। তেমনি আবার 'নিছক পুনর্বাসন'-এর রব তুলে এই মুহূর্তে জীবিকা-অর্জনে অসমর্থ, একান্ত দুর্গত মানুষের আশু প্রয়োজনকে উপেক্ষা করলে তার ফলও উত্তর বাঙলায় বিশেষ করে বন্যাক্লিষ্ট গ্রামাঞ্চল ও ধ্বস-বিধ্বস্ত পাহাড় এলাকায় মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বহু মানুষকে এখনই জীবিকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, আর সে-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত রিলিফের কাজও তার পাশাপাশি চালাতে হবে। এমন কি, এখানেও শেষ নয়। কারণ দেবেশ রায় তাঁর 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রবন্ধে আমাদের সামনে যে সজীব প্রশ্ন তুলেছেন—"সামনের বর্ষায় তিস্তাকে রুখবে কে ?"—তার খোঁচা নিরন্তর আমাদের অন্তরে বিঁধছে। কাজেই উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের বহু বিলম্বিত ও অবহেলিত কর্মধারায় অবিলম্বে প্রাণসঞ্চার করতে হবে। অর্থাৎ একই সঙ্গে রিলিফ-রিহ্যাবিলিটেশন-রিকনস্ট্রাকশন—তিনটে কাজই চালাতে

হবে—কোনো উপায় নেই এ ছাড়া। গোঁজামিল দিয়ে সহজে কাজ হাসিলের চেষ্টা করলে অনতিবিলম্বে মারাত্মক খেসারত দিতে হবে।

কিন্তু এত দ্রুত একই সঙ্গে এত রকমের কাজ কি করা যাবে? করবেই বা কে? সরকারী তৎপরতা ও কর্মদক্ষতার যা নমুনা, এমন কি সংশ্লিষ্ট সরকারী আমলাদের অনেকেরই কাণ্ডজ্ঞান ও মানবিকতার দৌড়ও যে-রকম—তাতে সে দিক দিয়ে ভরসা রাখা কঠিন। অথচ সরকারকে বাদ দিয়ে তো উত্তর বাঙলার পুনর্গঠন বা পুনর্বাসন সম্ভব নয়, এমন কি রিলিফের ধারাবাহিকতা রক্ষা বা সুবন্দোবস্তও অসম্ভব।

আবার বেসরকারী রিলিফের ব্যাপারেও এবার একটা জটিলতা লক্ষণীয়। ১৯২২ সনের শেষে উত্তরবঙ্গ যখন বন্যায় ভেসে যায়, তখন তার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে যে রিলিফ কমিটি গঠিত হয়—তার কর্মপরিচালক ছিলেন সুভাষচন্দ্র, প্রচারসচিব মেঘনাদ সাহা, সরবরাহ ও মেডিকেল রিলিফ বিভাগের দায়িত্ব ছিল যথাক্রমে সতীশ দাশগুপ্ত ও ডাঃ জে-এম দাশগুপ্তের উপর। ঐ কমিটিই নগদে ও জিনিসপত্রে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা তোলে। সারা বাঙলাদেশে সেবার বেসরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিল ঐ একটিই কমিটি—দেশের শত শত তরুণ ও ছাত্র সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় নাম লিখিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে।

১৯৩১ সনে দামোদরের বন্যার সময়েও দেখেছি বাঙলাদেশে গড়ে উঠেছে একটি মাত্র সঙ্কটত্রাণ সমিতি। এবারেও তার সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। খবরের কাগজে রোজ 'দুর্গতদের দুঃখমোচনের' উদ্দেশ্যে ঐ সমিতির তহবিল ভরে তোলার জন্য বেরোত রবীন্দ্রনাথের আবেদন। আমার মতো শত শত তরুণ ও ছাত্র সেবারেও যোগ দিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে।

তারপর ১৯৫২ সনে মেদিনীপুরের সেই ভয়ঙ্কর প্লাবনের সময় ও বর্মা থেকে যখন হাজার হাজার ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থী আসছিলেন তাঁদের রিলিফের বেলায় দেখেছি কংগ্রেসের তরফ থেকে যে-রিলিফের ব্যবস্থা হয়েছিল তার পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন বা মাড়োয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির মতো বহু প্রতিষ্ঠানও কাজে অগ্রসর হয়েছে। তবে ঐ সমস্ত বেসরকারী উদ্যমের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল বেশ একটা সহযোগিতার ভাব। ১৯৪৩ সনে মন্বন্তরের সময়েও ঠিক তাই—এমন কি মেডিকেল রিলিফের ক্ষেত্রে পিপলস রিলিফ কমিটির মতো বেসব সংস্থা অগ্রণী হয়েছিল, তাদের কাজের সমন্বয়ের জন্য

সেবার ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি। মেডিকেল রিলিফ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল।

এবারেও ছোটো-বড়ো বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান উত্তর বাংলায় রিলিফের কাজে নেমেছে। রাজ্যপালের বা মেয়রের তহবিলে যেসব সঙ্ঘ টাকা দিয়েছে, তারা ছাড়া যারা কিছুটা স্থায়ীভাবে কাজ করে চলেছে তার মধ্যে রয়েছে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে দুটি কমিটি—রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অনেকেই এক্ষেত্রে কিছুটা নিজের উদ্যোগেও কাজ করছে। বাটা ইউনিয়ন প্রভৃতি শ্রমিক ইউনিয়নগুলিও খুব উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। পুরনো সংস্থার মধ্যে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন ও পিপলস রিলিফ কমিটি বেশ ব্যাপকভাবে কাজ করছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন বা মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটির নাম তেমন চোখে পড়ল না। তবে এবার খুবই ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। এমন কি 'আনন্দ মার্গ'-র মতো সংস্থাও দেখলাম কিছুটা কাজে নেমেছে। এ-ছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের সমিতি, মহিলাদের জাতীয় ফেডারেশন, সরোজনলিনী সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। এবারে কিন্তু বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ন্যূনতম সহযোগিতার অভাব প্রকট—বরঞ্চ কিছুটা তীব্র রেষারেষিই রয়েছে আগামী নির্বাচনের তাড়নায়। অথচ গত বিপর্যয় সামাল দিতে ও আগামী বর্ষার সম্ভাব্য বিপর্যয় ঠেকাতে এই মুহূর্তে সব থেকে যা প্রয়োজন তা হলো সামগ্রিক জাতীয় উদ্যম।

তাহলে ভরসার ভাঁড়ার কি একেবারেই শূন্য? এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব, আপাতদৃষ্টিতে যেগুলি সামান্য মনে হলেও আগামী দিনের পক্ষে যাদের তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রথমেই মনে পড়ে দুর্গত জলপাইগুড়ির উদ্দেশে শিলিগুড়িবাসীদের সেই আশ্চর্য অভিযানের কথা—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, ছাত্র-তরুণ, শিক্ষক-অধ্যাপক, ডাক্তার-উকিল, দোকানী-ব্যবসায়ী, বাস-ট্রাক-ট্যাক্সি ড্রাইভার, রিকসাওয়ালা, রাস্তার মানুষ এমন কি এতদিন বখা ছেলে বা পাড়ার মাস্তান বলে যারা পরিচিত ছিল তারাও—সবাই ছুটে গিয়েছিলেন তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন, ঘরের আলো যোগাতে। অথচ এত বড়ো অবিভক্ত একটা সামগ্রিক উদ্যোগের পিছনে সরকারের বা কোনো পার্টির উদ্যোগ বা পরিকল্পনা ছিল না—হঠাৎ কেমন

একটা মানবিকতার প্রবল জোয়ারে সেদিন ভেসে গিয়েছিলেন সারা শিলিগুড়ি শহরের আপামর জনসাধারণ। আর যে-শক্তি সংহত করার মধ্যেই রয়েছে আমাদের প্রধান ভরসা, যে-শক্তির ওপর ভর করে সত্যিই অসাধ্য সাধন সম্ভব—তাকেই ফরমান ঝেড়ে ১২ ঘণ্টার মধ্যে নষ্ট করে দেওয়া হলো বিশৃঙ্খলার অজুহাতে—এমনই সরকারী আমলাদের কল্পনাতীত মূঢ়তা! আসলে এ-সব আমলাদের গোড়া থেকেই শেখানো হয় মানুষকে অবিশ্বাস করতে, জনশক্তির উন্মেষ বা সাধারণ মানুষের উদ্যোগমাত্রকেই ছলে বলে কৌশলে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে। তবু ঐ মানবিক দৈন্যের পাশে আরো যেন উজ্জ্বল মনে হয় শিলিগুড়ির মানুষের তিন দিনের সেই অবিস্মরণীয় অভিযান-পর্ব।

দ্বিতীয়ত, দুর্গত উত্তর বাংলার সাহায্যে এবার আপনা থেকেই এগিয়ে এসেছেন সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষ—শুধু কলকাতা বা বাংলাদেশের নয়, সুদূর দিল্লী থেকেও এসেছে টাকা, জামাকাপড়, কম্বল, ওষুধ, গুঁড়ো দুধের টিন। বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, বহু শ্রমিক বহু কর্মচারী একদিনের মাইনে দিয়েছেন, শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল নিজেরা রিলিফ বিতরণ করেছেন; মহিলা সমিতি, শিক্ষক-অধ্যাপক সঙ্ঘ, ছাত্র-যুব সঙ্ঘের কর্মী ও লেখক-শিল্পীরা পথে নেমেছেন, অনুষ্ঠান করেছেন সাহায্য সংগ্রহের জন্য। বিশেষজ্ঞরা যেমন একদিকে সুপরামর্শ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তেমনি ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তাদের জামা-কাপড় খাতা-পেন্সিল পাঠিয়েছে তাদের ভাই-বোনেদের জন্য। এত ধরনের এতগুলি মানুষের এমন আন্তরিক প্রয়াস কোনোমতেই ব্যর্থ হতে দেওয়া চলে না।

তৃতীয়ত, আমরা যখন দার্জিলিং বা কালিম্পং-এ রিলিফ নিয়ে গেলাম তখন সেখানকার রিলিফ কমিটির নেতারা প্রথমেই আমাদের ধন্যবাদ জানালেন এই জন্যে যে সমতলবাসীদের তরফ থেকে আমরা পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের জন্য সাহায্য নিয়ে গেছি! অথচ আমরা তখন যেহেতু জলপাইগুড়ি, দোমহনি, মালবাজার, আলিপুর দুয়ার—সর্বত্রই রিলিফ নিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ব্যাপারটা আমাদের কাছে মোটেই ঐভাবে প্রতিপন্ন হয়নি। ওঁদের কথা শুনে বুঝলাম না-জেনে আমরা আরো-একটা কাজ করেছি এবং কিছু মানুষের কাছে সে-কাজের আরো-একটা তাৎপর্য রয়েছে। সুতরাং পাহাড়ী ও সমতলবাসীকে এক সূত্রে বাঁধবার জন্য এই দুর্যোগেরও একটা সুযোগ নেওয়া সম্ভব। আর তার থেকে যে-শক্তি উদ্ভূত হতে পারে, তা আদৌ তুচ্ছ নয়।

সর্বশেষে, আমাদের সঙ্গে কয়েকজনের দেখা হলো যাঁরা তিস্তার বানে ভেসে গিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁরা একবাক্যে পাকিস্তানের মানুষ ও সরকারের সুবুদ্ধির তারিফ করলেন। তাঁরা বানভাসি মানুষদের উদ্ধার করেছেন, তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেছেন, খাইয়ে-দাইয়ে রিলিফ ক্যাম্পে রেখে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষে। এইসব খবর শুনে মনে হলো যে উত্তর বাঙলার পুনর্গঠনে—বিশেষ করে সেখানকার নদীশাসন ও বন্যারোধ সত্যি-সত্যিই করতে হলে—যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের সাহায্য অপরিহার্য, তাই পাকিস্তান সরকারের তরফে এ-ধরনের সুবিবেচনা ও সহযোগিতা আগামী দিনের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ।

বন্যারোধের জন্য বিশেষজ্ঞরা যে-পথ দেখাবেন—তা কার্যকর করতে গেলে মনে হয় আমাদের আগামী দিনের কর্মকাণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সরকারী তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে এইসব মানবিক সুলক্ষণগুলির পরিপূর্ণ বিকাশের উপরেই।

পুস্তক-পরিচয়

দূরের আলো (মার্কসবাদের গোড়ার কথা) : অমল রায়। মৈত্র প্রকাশনী। ২৩।২ বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। দ্বিতীয় সংস্করণ—ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮। দাম : ন-টাকা

ছোটদের রাজনীতি : নীহার সরকার। পুঁথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড। ২২, বিধান সরণি কলিকাতা-৬। সংশোধিত নূতন সংস্করণ—জুলাই, ১৯৬৭। দাম : দু-টাকা

ছোটদের অর্থনীতি : নীহার সরকার। পুঁথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড। ২২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। চতুর্থ প্রকাশ—এপ্রিল, ১৯৬৫। দাম : দু-টাকা

কমিউনিজম কি ? : চিন্মোহন সেহানবীশ। কালান্তর প্রকাশনী। ১০, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-২৯। চতুর্থ প্রকাশ ১লা মে, ১৯৬৮। দাম : পঞ্চাশ পয়সা

কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টি : পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। কালান্তর প্রকাশনী। দাম : পঞ্চাশ পয়সা

আজ যখন সব রাষ্ট্রেরই গতি সাম্যবাদের দিকে এবং পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাসও যখন সেই দিকেই এগুচ্ছে, তখন সাম্যবাদের চর্চা আজ আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। সাম্যবাদের ব্যবহারিক দিক বাদ দিয়ে এর চর্চা হয়তো সর্বথা সার্থক নয়, আবার গভীর পঠন ও অনুশীলন ছাড়াও যে সাম্যবাদকে অনুধাবন করা একেবারেই অসম্ভব সে-প্রসঙ্গে তার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা বলে গেছেন, "যেহেতু সমাজতন্ত্রবাদ বর্তমানে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, সুতরাং একে বিজ্ঞান হিসেবেই বুঝবার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ একে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত।" (এঙ্গেলস) গভীর অধ্যয়ন ছাড়া বিজ্ঞান আয়ত্ত করবার চেষ্টা আর কিভাবে সার্থক হতে পারে ?

সুতরাং বাঙলাদেশে বাঙলাভাষায় সাম্যবাদের উপর যত আলোচনা হয়, এর উপরে যত বই-পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ততই ভালো। এই প্রকাশন এবং আলোচনা আজ পর্যন্ত যতটুকু হয়েছে, তাকে পূর্ণ মূল্য দিতেই হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও ফাঁকও যে অনেকখানিই থেকে গেছে, তাও মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি ? সেই জন্যই নতুন পুরনো বই যত বেশি ছাপা বা পুনর্মুদ্রিত হয়, ততই তা আনন্দের।

কিন্তু তবুও সাম্যবাদ বা মার্কসবাদ সম্বন্ধে অনেক লেখাই হাতে পাবার পর অনেক সময় খানিকটা বিব্রত বোধ করতে হয়, এ-কথা স্বীকার করা

উচিত। কোনো কোনো সময়ে শুধু ফর্মুলা বা সূত্রাকারে এই বিজ্ঞানকে উপস্থাপিত করবার চেষ্টার ফলে রচনায় যে খানিকটা দুর্বোধ্যতার সঞ্চার হয়, অতীতে কোনো কোনো বইয়ের ক্ষেত্রে তা আমরা দেখেছি। অধ্যাপক কোশাম্বীর 'An Introduction to the study of Indian History' বা গোপাল হালদার মহাশয়ের 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর মতো সব বইয়ে ভারত-ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত চর্চা আশা করা অনুচিত। কিন্তু প্রাথমিক সাম্যবাদী সাহিত্যের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় গ্রীস রোম আর ইওরোপের ইতি-হাসের উদাহরণের এত ছড়াছড়ি থাকে, আর আমাদের দেশের কথা ঠিক সেই অনুপাতেই থাকে এমন অনুপস্থিত, যে, এর মূল বক্তব্য মেনে নিলেও পুরোপুরি খুশী হওয়া যায় না। চর্বিতচর্বণের প্রয়াস, দুর্বোধ্যতা এবং আমাদের দেশের ইতিহাস-সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত ইতিহাসের কাঠামো তুলে ধরার ফলে মনে হয়, এ-দেশে সাম্যবাদী সাহিত্য যতটা গ্রাহ্য বা আদরণীয় হতে পারত তা হয় নি। উপরোক্ত কারণগুলিই তাতে বাধার সৃষ্টি করেছে।

এখানে মার্কসবাদ সম্পর্কিত পাঁচখানি বই সম্বন্ধে খানিকটা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে আগে শুধু এইটুকু বলে নেওয়া প্রয়োজন যে শ্রীঅনল রায়ের বইখানা এবং অন্য চারখানা বইয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অনলবাবুর বইতে সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদকে বুঝবার-বোঝাবার প্রয়াস আছে, অন্য বইগুলির পরিধির মধ্যে সবকিছু বলার অবকাশ কম। সুতরাং এক মাপকাঠিতে বইগুলিকে মাপার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত হবে না।

নীহার সরকার মহাশয়ের 'ছোটদের অর্থনীতি' ও 'ছোটদের রাজনীতি' সম্বন্ধে এ-কথা খুশী মনে বলা যায়, তিনি তাঁর বইয়ে দুর্বোধ্যতাকে পরিহার করবার চেষ্টায় সফল হয়েছেন। এসব রচনায় খানিকটা দুরূহতা হয়তো বা অপরিহার্য (যদিও মার্কসবাদের মূল প্রবক্তাদের লেখার সহজবোধ্যতায় বহু ক্ষেত্রেই রীতিমতো অবাক হতে হয়), কিন্তু কিশোরদের জন্য লেখা বলেই মনে হয় নীহারবাবু তাঁর রচনাকে যতদূর সম্ভব সহজ করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং বই দুটির যথেষ্ট জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে যে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। এতে অর্থনীতির মূল কথা, পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদের কেন্দ্রীভবন, পুঁজিবাদী শোষণ ও সঙ্কট, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর, সামন্ত-তন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রবাদ, ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

নীহারবাবু যখন বই দুটি প্রথম লিখেছিলেন, সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে, তখন সাম্যবাদী চিন্তাধারা ছাত্রসমাজে সবেমাত্র যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। কিশোরদের ক্রমবর্ধমান পরিণতির মুখে বই দুখানি তখন একদিক দিয়ে প্রায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। আর আজ যখন সাম্যবাদের বিশ্বব্যাপী বিজয়যাত্রা পৃথিবীর সর্বত্র তরুণ-মনে গভীর রেখাপাত করেছে, "নান্য-পন্থা: বিদ্যতে অয়নায়" এই প্রতীতি যখন গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে এবং আমাদের দেশেও যখন সাম্যবাদ প্রবল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে—তখন এই বইয়ের মূল্য আগের থেকেও বেশি বলেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। সুতরাং বোধকরি বহুদিন বাদে বই দুটি পুনর্মুদ্রিত করে গ্রন্থকার ও প্রকাশক একটি প্রশংসার কাজ করেছেন।

তবে, আমাদের দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বই দুটিতে কিছু নতুন বক্তব্য সংযোজিত হলে আরো ভালো হয় বলে আমাদের ধারণা। ভারতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মার্কসবাদী ব্যাখ্যা, এই পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণ এবং বিশেষ করে যুবসমাজে ক্রমবর্ধমান বেকারীর ভয়াবহতা—এ-বিষয়ে আলোকপাত করে পরবর্তী সংস্করণে অর্থনীতির বইটিকে আরো মূল্যবান করা যায় না কি? আর গান্ধীবাদ নেহরুবাদ হিন্দু-রাষ্ট্রবাদ ইত্যাদির পটভূমিতে বুর্জোয়া রাজনীতির দেউলিয়াপনা এবং বিভিন্ন ছলচাতুরির উপরে রাজনীতির বইয়ে একটি 'পলেমিক' অধ্যায় জুড়ে দেওয়া সম্বন্ধে নীহারবাবুর কি অভিমত?

চিন্মোহনবাবুর 'কমিউনিজম কি?' বইটিকে একটি সার্থক রচনা বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। নীহারবাবু ছোটদের জন্য লিখেছিলেন, সুতরাং তাঁর আলোচনায় সাম্যবাদের অনেক কথাই তিনি বাদ দিয়ে গেছেন। চিন্মোহনবাবুর বইও সেই ধরনের একটি বই যাতে এর বহুমুখী আলোচনাকে পরিহার করা হয়েছে। কিন্তু এই রচনার গতি স্বচ্ছ ও সরল। চিন্মোহনবাবু তাঁর বই শুরু করেছেন এই কথাগুলি দিয়ে, "কমিউনিজম, কমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট পার্টি—চারদিকেই আজকাল এ-সব কথার ছড়াছড়ি। পছন্দ করি চাই না-করি আমাদের সবাইকেই এখন এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে অনবিরত। যে-কোন দিন খবরের কাগজ খুললেই দেখা যাবে কেউ হয়ত একে ভালো বলছেন, কেউ বা গাল পাড়ছেন, কিন্তু কারোই যো নেই এ সবের থেকে

একেবারে মুখ ঘুরিয়ে রাখার কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ-ই হচ্ছে এ-যুগের সব চাইতে 'বড় খবর।'

"কমিউনিজম কি? ভালোমন্দ বিচারের কথা পরে—আগে জানা দরকার ব্যাপারটা ঠিক কি।"

ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে সেহানবীশ মহাশয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারাটি প্রথমে সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন এবং শ্রেণীসংগ্রাম যে একটি আমদানীকৃত তত্ত্ব নয়, এটি যে তথ্য এবং সমাজ-সত্যের স্বীকৃতি, তা ব্যাখ্যা করেছেন। এই ক্রমবিকাশের বিশ্বজনীন পথে আমাদের দেশেও সাম্যবাদের আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী, তিনি উপসংহারে তাই দেখিয়েছেন। যে দুই কারণে চিন্মোহনবাবুর বইটি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে, তা হলো—

প্রথমত, তিনি অতি সাবলীল রচনাশৈলীর আশ্রয় নিয়েছেন। যুক্তি-বহুল রচনাও যে সুখপাঠ্য হতে পারে, এই বইটি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, তাঁর আলোচনার মধ্য দিয়ে সাম্যবাদ সম্বন্ধে কতগুলো সাধারণ্যে প্রচলিত সংশয়ের নিরসন করতে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। তাতে বইটির মূল্য বেড়েছে—যেমন, ক্ষুদে মালিকদের সম্পত্তি সম্বন্ধে কমিউনিস্টরা সবস্তরেই ততটাই বিরূপ কিনা যতটা বিরূপ বৃহৎ পুঁজির সম্পত্তি সম্বন্ধে, কমিউনিজম সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই উচ্ছেদ করতে চায়, না শুধু সম্পদসৃষ্টির উপায়গুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানার হাত থেকে উদ্ধার করতে চায়, কমিউনিজম মানে হিংসা, না হিংসার মূলোৎপাটন, স্থুল ভোগবিলাস, না পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধন ইত্যাদি। যদিও ভূমিকায় লেখক বলেছেন "ভালোমন্দ বিচারের কথা পরে," তবুও তাঁর বিভিন্ন আলোচনা এই কথাই প্রতিষ্ঠা করেছে, যে, কমিউনিজম শুধু ইতিহাসের বিধানই নয়, এ মানুষের পক্ষে সব চাইতে ভালো।

চিন্মোহনবাবুর বই সাধারণ পাঠকের জন্য হলেও, মনে হয়, তা খানিকটা পরিমাণে কমিউনিস্ট পার্টি-কর্মীদের পরিচ্ছন্নতার (clarification) জন্যও বটে। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর বই পড়লেই বোঝা যায়, এটি সর্বাংশে পার্টি-কর্মীদের উদ্দেশ্য করেই লেখা। তাই বোধ করি লেখাটির মধ্যে খানিকটা ফর্মুলা-প্রবণতা আছে। নীহারবাবুর ও চিন্মোহনবাবুর বইয়ের মধ্যে অনেকখানি ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা, আর এখানে প্রধানত কতকগুলো বিষয় বলে দেওয়া। আগের দুই লেখক দুটি বিষয়ের আলোচনা একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন, এই বইতে

সে-আলোচনা যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে—একটি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, মার্কসবাদী দর্শন ; অপরটি কমিউনিস্ট পার্টি। প্রকৃতপক্ষে এই আলোচনাই বইয়ের প্রধান আলোচনা। দর্শন-সংক্রান্ত আলোচনায় লেখক 'বিরোধ'-এর উপরে খানিকটা বিস্তৃত বক্তব্য পেশ করেছেন—যেমন, ভিতর ও বাইরের বিরোধ, স-বৈর ও নির্বৈর বিরোধ, প্রধান বিরোধ ইত্যাদি। শ্রেণীসংগ্রামের রণকৌশল ও রণনীতি এবং বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই দুটি অধ্যায়ে ভাদুড়ী মহাশয়ের বক্তব্য শ্রদ্ধা-সহকারে বিবেচিত হবে, কিন্তু সে-বক্তব্য সম্বন্ধে বোধ করি মতভেদেরও অবকাশ রয়েছে।

অনল রায় রচিত 'যুগের আলো' বইটি আগের বইগুলির তুলনায় অনেক ব্যাপক (comprehensive) এবং তার আবেদনও নতুন এক-ধরনের পাঠকের কাছে, যদিও কারুর কাছেই যে এ-বইয়ের আবেদন কম তা মনে করবার হেতু নেই। লেখক মার্কসবাদী চিন্তাধারাকেই এই যুগের আলোক-বর্তিকা বলে চিহ্নিত করেছেন। নীহারবাবু, চিন্মোহনবাবু ও পাঁচুগোপাল-বাবুর লেখা যেখানে মূলত ছাত্র, পার্টি-কর্মী বা পার্টি-দরদী মহলের উদ্দেশেই রচিত ; অনলবাবু সেখানে তাঁর বই লিখেছেন গোটা বুদ্ধিজীবী মহলের জন্য, বিশেষ করে কমিউনিজম-বিরোধী পণ্ডিতম্মন্য সম্প্রদায়কে যুদ্ধে আহ্বান করার ঢঙে। তা করতে গিয়ে লেখক একদিকে যেমন ভূরি ভূরি বচন ও উদাহরণ উদ্ধৃত করে ভারতীয় (এবং বিদেশীও বটে) প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সুতীব্র আক্রমণ পরিচালনা করেছেন, অপরদিকে তেমনি ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রগতিশীল দিককেও স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেন নি। তাঁর লেখায় অন্তত মার্কসবাদের কষ্টিপাথরে ভারতের ইতিহাস-সাহিত্য-দর্শনের নিরীক্ষার সাধু প্রচেষ্টার মনোজ্ঞ পরিচয় মেলে। অপর বইগুলিতে যেখানে মূলত ইতিহাসের বিশ্লেষণে প্রায় শুধু অর্থনীতি ও রাজনীতিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে, অনলবাবু সেখানে ধর্ম-দর্শন-শিল্প-সাহিত্য সব রকমের superstructureকেই যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছেন।

এবং এই বইয়ে মার্কসবাদ গ্রহণে বাধা কোথায় এই প্রশ্ন তুলে সংশয়বাদী বা বিরুদ্ধবাদীদের বহুক্ষেত্রে বুদ্ধির যুদ্ধে আহ্বান করা হয়েছে। হয়তো সেই জন্যই রচনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, "আপন মনের মাধুরী" মেশানর ফলে শাণিত স্বকীয়তায় ভরপুর। বিজ্ঞান-আলোচনায়

ব্যক্তিমানসের আধিক্য অনেক সময়ে বর্জনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু মার্কসবাদ যেহেতু সমাজ-বিজ্ঞান এবং শোষকের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা ও শোষিতের প্রতি তীব্র মমত্ববোধ যেহেতু এই বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেইহেতু সার্থক মার্কসবাদী রচনায় ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন খানিকটা অনিবার্যও বটে। স্বয়ং মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের লেখায় এর অজস্র প্রমাণ মেলে। সেদিক দিয়ে অনলবাবু মহাজন-অনুসৃত পন্থা ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। এই পটভূমিতে ভারতের সনাতনত্বের প্রতি মাঝে মাঝে অনলবাবু যে সুতীক্ষ্ণ অনল-বাণ বর্ষণ করেছেন, তা অতীব কালোপযোগী হয়েছে।

'যুগের আলো'র পরিসর যে কতটা বিস্তৃত এবং তার আলোচনা যে কতটা বহুমুখী, তা এর সতেরটি অধ্যায়ের কয়েকটির নাম-উল্লেখের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হবে। এর মধ্যে রয়েছে: সমাজে ধর্মের স্থান, ভাববাদ ও বস্তুবাদ, জ্ঞানের স্বরূপ; আবার রয়েছে সাম্যবাদী সমাজে নারীর স্থান, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা এবং কর্ম-প্রেরণা। এ ছাড়া অবশ্য আলোচ্য অন্যান্য বিষয় তো আছেই।

বইয়ের শেষাংশে অনলবাবুর একটি আবেগপূর্ণ গভীর জিজ্ঞাসাই বইটির মর্মবস্তুকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে, যেখানে তিনি মার্কসবাদই ভবিষ্যতের দিশারী— এই আলোচনার উপসংহারে বুদ্ধিজীবীদের দরবারে এই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছেন: "পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা কি ধনিকের উচ্ছিষ্টভোজী হয়ে 'মারণাস্ত্রের মিস্ত্রী'র হীন জীবন যাপন করবেন, না, তারা হবেন মানুষের সৃষ্টি-লীলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী? বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক সাহিত্যিকেরা কি আজ অর্থ সম্পদের লোভে ধনিকের স্তুতিগান করবেন, না, সত্যের পথ, রসস্রষ্টার আদর্শ পথ, বেছে নেবেন? মানব-সভ্যতার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা কি আজ রমাঁ্যা রলাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবেন না?"

সাহিত্যরস-আস্বাদনের মধ্য দিয়ে যাঁরা মার্কসবাদের পরিচিতি লাভ করতে চান, 'যুগের আলো' তাঁদের কাছে একান্ত আদরণীয় হবে।

পরিশেষে নীহারবাবুর এবং ভাদুড়ী মহাশয়ের বই সম্বন্ধে সবিনয়ে দু-একটি কথা নিবেদন করতে চাই। নীহারবাবু বহু স্থানে বাঙলা শব্দের পাশে প্রচলিত ইংরাজী শব্দকে স্থান দিয়েছেন। এটা সমীচীনই হয়েছে। কিন্তু ক্যাপিটালিজম ইম্পেরিয়ালিজম প্রভৃতি কতকগুলো শব্দ কি সুপরিচিত বাঙলা পরিভাষা দিয়েই চালানো সম্ভবপর ছিল না? আর পাঁচুগোপালবাবুর বইয়ে পুঁজি

প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ছাপাতে পূর্বাপর বানান ভুল চোখে পীড়ার উদ্রেক করে।

শেষ করার আগে, মনে হয়, আজকের দিনে অমিত সেনের 'ইতিহাসের ধারা', অখিল মুখোপাধ্যায়ের 'সাম্যবাদের ভূমিকা,' রেবতী বর্মনের কোনো কোনো বই হাতের কাছে পাওয়া গেলে বাঙলায় মার্কসবাদী পুঁথির আপেক্ষিক দারিদ্র্য হয়তো আরো খানিকটা মোচন হতো। এই প্রসঙ্গে খুবই আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি গোপাল হালদার মহাশয়ের মূল্যবান রচনা 'সংস্কৃতির রূপান্তর' কিছুকাল আগেই পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

সুবোধ দাশগুপ্ত

কয়েকটি চিত্রপ্রদর্শনী

কলকাতার আর্টগ্যালারিগুলিতে চিত্রামোদীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অবশ্য চিত্রামোদীর ভূমিকা নিয়েছেন শিল্পিরা নিজেই। এর অর্থ স্পষ্ট: পৃষ্ঠকণ্ডূয়ন। ফলত কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সেই মাপকাঠি এখন নিরুদ্দিষ্ট। নিরপেক্ষ চিত্রামোদী হয়তো-বা সংবাদপত্রে কলা-সমালোচনা পড়ে ছবি, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য দেখতে গেলেন। কিন্তু ফিরে এলেন দিশেহারা হয়ে। অর্থাৎ যা পড়ে গেলেন, তার সঙ্গে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার প্রায়ই কোনো মিল ঘটল না। বেশির ভাগ দর্শকই তখন ভাববেন—হয়তো তাঁদের শিল্পবোধ মানানুগ নয়; দু-একবার দেখে যখন এর পৌনঃপুনিকতা দেখা দেয়, তখন তাঁরা প্রদর্শনীতে না যাওয়াই নিরাপদ মনে করেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অন্য-রকম। তথাকথিত "বোদ্ধা কলাসমালোচকরা" অনেকে ছবি দেখে লেখেন না, লেখেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বন্ধুকৃত্যের পরিমাপ অনুযায়ী। বলাবাহুল্য, দু-চারজন আছেন যাঁদের লেখা এর ওপর নির্ভর করে না, অবশ্য তাঁরা বেশি দিন টিঁকতে পারেন না। সুতরাং আমরা নিশ্চয় ধরে নিতে পারি যে, শিল্পমান অবনমনের জন্য দায়িত্বজ্ঞানশূন্য সমালোচনা অনেকটাই দায়ী।

অন্যত্র এই প্রসঙ্গে আলোচনার অবকাশ থাকলেও এখানে নেই। কিন্তু কলাসমালোচনা ও চারুকলার মান যথেচ্ছ নিম্নগামী—এ-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। বরং যে-কয়েকটি প্রদর্শনী আমার কাছে মনোগ্রাহী মনে হয়েছে, সেই কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। গত অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত যে-কয়েকটি প্রদর্শনী হয়েছে, তার মধ্যে লক্ষণ পাই-এর বিশ বছরের শিল্পসাধনার উৎকলিত অংশ এবং রঘুনাথ সিংহের ভাস্কর্যই সব থেকে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশের মধ্যভাগ থেকেই লক্ষণ পাই ভারতীয় চিত্রধারায় একটি উজ্জ্বল নাম। তেল রঙে, গ্রাফিকসএ ও টেম্পেরায় তাঁর সমান অধিকার। অবশ্য মূলত তিনি তেল রঙেরই শিল্পী। টেম্পেরায় প্রথম দিকে তাঁর প্রবণতা দেখা যায়। লক্ষণ পাই-এর বিশিষ্টতা তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্যে অবিচল নিষ্ঠা। প্রতীচ্যে বহুদিন থাকলেও, শিল্পসাধনায় তিনি পরিপূর্ণভাবে ভারতীয়। রেখার দিকে জোর ও টোনালিটির প্রবণতা-বর্জন, ভারতীয় চিন্তাধারাতেই মৌলিক নির্মাণ এবং বিষয়মুখিনতা তার অকাট্য

প্রবাণ। গোয়াতে তিনি মানুষ, তাই গোয়ার অধিবাসী এবং গোয়ার পটভূমিকা তাঁর শিল্পসাধনার প্রথম দিকে প্রবল ছিল। ১৯৫০ সালে প্যাস্টেল-এ আঁকা 'ব্রাইড ও রিলেশনশিপ' এমন এক দৃষ্টান্ত। তারপর ক্রমশ প্রিন্টের দিকে তিনি আকৃষ্ট হন। দুটি লিথোগ্রাফ সিরিজ (প্রত্যেকটি চারটি করে) 'গীত-গোবিন্দ' এবং 'বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত' তার অনুপম দৃষ্টান্ত। গীতগোবিন্দ সাদা-কালোতে আঁকা। কিন্তু 'বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত' ক্রোমোলিথোগ্রাফ। অবশ্য বেশির ভাগই কালো। চারটি ফ্রেম নীল, সবুজ, মেটে হলুদ ও বাসন্তী রঙে সাজানো এবং গভীরতাদ্যোতক। গৌতম বুদ্ধের চারটি স্তরকে এমনভাবে প্রতীক-রূপে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে বড় শিল্পীর লক্ষণ। ধাতুটার প্রিন্ট-এ, প্রধানত অ্যাকুয়াটিন্ট-এ, তাঁর দখল অসামান্য। পঞ্চাশের শেষ দিকে তাঁর রমণীমূর্তির প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। 'বাড এ্যাণ্ড ফ্লাওয়ার', 'ফ্লাওয়ার', 'পুরুষ ও প্রকৃতি' প্রভৃতি প্রত্যেকটি তেলরঙের কাজেই একটি রমণীর প্রতিবিম্ব দেখা যায় এবং সেখানে তাঁর টোনের দিকে দৃষ্টিও লক্ষণীয়। 'রাগভৈরব' ও 'রাগ পুরিয়া ধানেশ্রী'-র ধ্যানমগ্নতা শিল্পচেতনায় উদ্দীপ্ত। এছাড়া 'ইন্টিগ্রিটি'-ও (ইম্প্যাস্টো পদ্ধতিতে) ভালো কাজ। কিন্তু জলরঙের ছবিগুলি না দিলেই তিনি ভালো করতেন। এগুলি যেন কোনো শিক্ষানবীশের আঁকা বলে মনে হয়। তৎসত্ত্বেও লক্ষ্মণ পাই-এর প্রদর্শনী চিত্রামোদীদের বহুদিন মনে থাকবে।

রঘুনাথ সিংহের ভাস্কর্য কলকাতার চিত্রামোদীদের কাছে বহু কারণে আকর্ষণীয়। সিরামিকস-এ এমন কাজ অনেক দিন দেখা যায় নি। তাছাড়া তিনি তাঁর সাধনালব্ধ কলাকৃতিকে ধরে রেখেছেন তাঁর বিভিন্ন কাজে। পোড়াকাঠে ও প্লাস্টার-এ নানারকম ভাবে ভেঙে-চুরে তিনি কয়েকটি নির্বাচিত কাজ দেখিয়েছেন। কনস্ট্রাকটিভিস্ট ভাস্করদের কথা মনে পড়ে, বিশেষ করে রুশ ভাস্কর আর্চিপেঙ্কোর কথা। নভেলের মধ্যে 'সাজেশটিভ হলো' এবং ভাস্কর্যে 'কোলাজ' তাঁরই দান। ইদানীং রুশ ভাস্কর ভেরা মুখিনা এ-ধরনের কিছু কাজ করেছেন। ইনি সিরামিকস-এও সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। শ্রী সিংহের কাজগুলিকে ঠিক 'কিউবিস্ট কোলাজ' বলা চলে না। 'এ্যাবস্ট্রাকশন' যদিও অংশত আছে, তিনি রিয়্যালিস্টিক ভাবধারাকে কখনোই বর্জন করেন নি। বিমূর্ত রীতিকেও অত্যন্ত সতর্কভাবে গ্রহণ করেছেন। সিরামিকস-এর মধ্যে 'ডাইং ওয়ারিয়র' 'দ ফর্ম' 'মুন এ্যাণ্ড স্টারস' 'ফর্ম এ্যাণ্ড কালার' এবং 'ফিশ নং টু' উল্লেখ্য। পোড়াকাঠের ও প্লাস্টার-এর কাজগুলির মধ্যে 'দ কেস' 'ফিগার

ওয়ান-টু-থ্রি' ও 'দ্য বার্ড' ভালো লেগেছে। তিনি সিরামিকস-এর কাজে 'কোলাজ' এবং কাঠের কাজে 'হলো' অথবা 'হোল' ব্যবহার করেছেন। রক্তবর্ণ ব্যবহার খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। মোট কথা, মিডিয়ার ওপর দখল এবং মৌলিকতা—দুইই তাঁর মধ্যে বর্তমান।

অন্যান্যদের মধ্যে কনটেম্পোর‍্যারি আর্টিস্টদের ড্রয়িং ও গ্রাফিকসের প্রদর্শনী, সুনীল সরকারের ন্যুড স্টাডি এবং সীতেশ রায়ের গ্রামীণ জীবনের শিল্পকলা উল্লেখযোগ্য। কনটেমপোর‍্যারি আর্টিস্টদের উল্লেখ করেছি গ্রুপ হিসেবে তাঁদের অস্তিত্বের জন্য। নতুবা তাঁদের কাজ তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্যও হয় নি। যা ভালো একটু কাজ করেছেন গনেশ পাইন ও সুহাস রায়। গনেশ পাইন করেছেন ইংক এ্যাণ্ড ওয়াশ-এ, তার মধ্যে 'ভয়েজ' ছবিটি নয়নশোভন। সুহাস রায়ের মেৎসোটিন্ট বিদেশী বিজ্ঞাপন-পত্রিকা প্রভাবিত হলেও দক্ষতার পরিচয়বাহী। 'দ্য স্টেয়ার' এচিংটি অনেকেরই ভালো লাগবে। আর একটি কাজও চোখে পড়ার মতো নয়। এঁদের মধ্যে দু-একজন কোলাজ-প্রিণ্ট নাম দিয়েও কিছু কাজ প্রদর্শন করেছেন। ওগুলো এমবসড ড্রয়িং ধরনেরই কাজ। কোলাজ ও প্রিণ্ট সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এবং দুটির সহাবস্থান অসম্ভব। এঁরা যে কেন শ্রেণীবিন্যাস করলেন বোঝা গেল না। নাকি দর্শককে স্টাণ্ট দেবার জন্যেই এই কাজ? কিন্তু এই যদি সমসাময়িক শিল্পের নিদর্শন হয়, তবে বাঙলাদেশের শিল্পকলায় গভীর সঙ্কট বিরাজ করছে বলতে হবে।

সুনীল সরকার প্রধানত চারকোল এবং কিছু ক্রেয়নে পেন্সিলে ও কোঁতেতে কাজ করেছেন, চারকোল-এর কাজই তাঁর উপযোগী। তাঁর কাজে বেশ বলিষ্ঠ ড্রয়িং ও অ্যানাটমিক ডিসিপ্লিন পাওয়া যায়। কিন্তু মৌলিকতা যেন দূরবর্তীই রয়ে গেছে। 'লুক' 'ডাগ্রেশন' 'লাইন্স' প্রভৃতি কাজগুলি ভালো লাগার মতো।

সীতেশ রায় অনেকাংশে যামিনী রায়ের উত্তরসাধক। ইনি অবশ্য গ্রাম্য-জীবনের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতিকে শিল্পের মোটিফ করেছেন। যামিনী রায়ের মতো খড়িমাটি, বেলেমাটি, গেরুয়া মাটিই তাঁর রঙ। জ্যামিতিক ফর্মে, বিশেষ করে বক্ররেখায়, তাঁর প্রবণতা। 'দুগ্ধদোহন' 'ধান্যবরণ' প্রভৃতি ছবিগুলি বেশ উন্নত ধরনের। কিন্তু তাঁকে ড্রয়িং-এ এবং রঙ ব্যবহারে অধিকতর মনোযোগী হতে হবে। নতুবা তাঁর কোনো কোনো কাজকে নিরন্নদের ইলাসট্রেশন মনে হতে পারে।

চিত্রাম্বেষী

সেন্সার-নীতি নিয়ে আলোচনাচক্র

হালে ভারতের চলচ্চিত্র-জগতে একটা শব্দ খুবই শোনা যাচ্ছে। শব্দটা অবশ্য ছোটো, ইংরিজিতে মাত্র দুই আর বাঙলায় কুল্যে তিন অক্ষরের। কিন্তু তারই ধাক্কায় বর্তমান তথ্য ও বেতার মন্ত্রী কে. কে. শাহকে সম্প্রতি একটি সেমিনারের আয়োজন করতে হয়েছিল—সাংবাদিক বন্ধুরা যাকে অবহিত করেছেন 'কিসিং সেমিনার' নামে।

কিন্তু সেমিনার-টেমিনার করেও মন্ত্রীমশাই শব্দটিকে কাবু করতে পারলেন না। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। বিদেশী চিত্রে যে-সমস্ত দৃশ্য প্রদর্শন করতে দেওয়া হয়, দেশী চিত্রে তা দেওয়া হয় না বলে দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের দেশের ফিল্মওয়ালাদের মনে ক্ষোভ ছিল। অর্থাৎ তাঁদের দাবি—'কিস', 'ইনটিমেট লাভ সিন' ইত্যাদি দৃশ্য তাঁদেরও প্রদর্শন করতে দিতে হবে। এ-বছরের গোড়ার দিকে তাঁদের ক্ষোভ বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়—বেশ জোরালো ভাবেই। ভারতজুড়ে চলচ্চিত্র-পত্র-পত্রিকাতে বর্তমান সেন্সার-নীতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত লেখা শুরু হলো। মায় লোকসভায় পর্যন্ত এই প্রসঙ্গটি গড়াল। বিব্রত তথ্যমন্ত্রী ব্যাপারটার সমাধানকল্পে 'সেন্সারশিপ এনকোয়্যারি কমিটি' বসালেন। ওই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন পাঞ্জাব হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রী জে. ডি. খোসলা।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলা দরকার। আমাদের দেশের খামখেয়ালী নীতিহীন অদ্ভুত সেন্সার-নীতির জন্য বর্তমান সেন্সার বোর্ডের প্রতি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও বিশেষ প্রসন্ন নন। যেহেতু খোসলা কমিটি প্রচলিত সেন্সার-নীতি সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করবেন, তাই স্বাভাবিকভাবে এই কমিটি সম্পর্কে চলচ্চিত্র-জগতের সকলেই আগ্রহী। ফিল্মওয়ালা, ফিল্ম মেকার, চিত্রামোদী আর 'অ্যাডোলেকচুয়াল' দর্শক—সকলেই অপেক্ষা করছেন কমিটির রায়ের জন্য। অবশ্য পর্বতের মূষিক প্রসব হবে কিনা সে ভবিষ্যৎবাণী এখনই করা উচিত নয়।

অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে খোসলা কমিটি কলকাতায় এসেছিলেন বাঙলা চিত্রজগতের মতামত জানবার জন্য। এই উপলক্ষে 'ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়া'র 'ফিল্ম স্টাডি অ্যাণ্ড ইনফরমেশান গ্রুপ' সেন্সার

নীতির ওপর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে তিনদিন ব্যাপী (১৪ই থেকে ১৬ই অক্টোবর) একটি সেমিনার বা আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন।

আলোচনার প্রারম্ভে 'ফিল্ম স্টাডি অ্যাণ্ড ইনফর্মেশান গ্রুপ'-এর আহ্বায়ক ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সেমিনারের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মসূচি ইত্যাদি সম্পর্কে বলেন। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল চারটি। (১) দু-রকম সেন্সার নীতি আছে কি ? (২) চলচ্চিত্র ও সমাজ (৩) তরুণ-সম্প্রদায় ও চলচ্চিত্র (৪) ভারতীয় চলচ্চিত্রের বর্তমান ধারা।

ভারতের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত ছিলেন 'দু-রকম সেন্সারনীতি আছে কি' শীর্ষক বিষয়ের প্রধান বক্তা। শ্রীদাশগুপ্ত বলেন, দু-রকম নয়, বহুরকম নীতি আছে। এদেশী ও বিদেশী ছবির বেলায় সেন্সার বোর্ডের আলাদা নীতি, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বোর্ডে ভিন্ন বিচার, একই ছবির আভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি কপির ক্ষেত্রে নীতির প্রয়োগে পার্থক্য। আর তাছাড়া, সেন্সার বোর্ডের কর্তাদের ব্যক্তিগত মর্জির ওপরও 'কাটার পরিমাণ' কিছুটা নির্ভর করে। তিনি বলেন, শিল্পসম্মতভাবে উপস্থিত সমস্ত কিছুকেই যদি চলচ্চিত্রে প্রকাশ করতে দেওয়া হয়, তবে চলচ্চিত্র-কাররাই অনেককিছু দেখাবেন না। কারণ তাতে 'পারিবারিক দর্শক' হ্রাস পাবে। পরিশেষে তিনি বলেন, নন্দনতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ যে মানবতাবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গির সূচনা করেন, রাজনীতিতে নেহেরু যে লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি আনেন, সেন্সার-কর্তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করে চলা উচিত।

ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে অধ্যয়নরত কানাডিয়ান অধ্যাপক মিঃ রোবের্জ বলেন, সেন্সার করার সময় চলচ্চিত্রকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা উচিত—যথা আর্ট, এণ্টারটেনমেণ্ট, প্রপাগাণ্ডা, এডুকেশনাল ইত্যাদি।

পরবর্তী বক্তা ও চলচ্চিত্রসমালোচক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিদেশী চিত্রে যা দেখানো হয় দেশী চিত্রে তা নিষিদ্ধ—এই ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত ; কারণ উভয় চিত্রের দর্শকই এক। হলিউড ছবি দেখে তারা যদি উচ্ছন্নে না যায়, তবে দেশী ছবি দেখেই বা গোল্লায় যাবে কেন।

চলচ্চিত্রে চুম্বন প্রদর্শনের তীব্র বিরোধিতা করে অধ্যাপক সুশীল মুখো-পাধ্যায় বলেন, চুম্বন ছাড়াও প্রেমকে কত সুন্দর এবং শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করা যায়, তার নিদর্শন অনেক চিত্রেই দেখা গেছে। তিনি পশুপতিবাবুর যুক্তিকে খণ্ডন করে বলেন, বিদেশী চিত্রের অচেনা চরিত্র, বিজাতীয় রীতি, অপরিচিত

দৃশ্যপট আমাদের এই চিত্র থেকে পৃথক করে রাখে। তাই তার প্রভাব আমাদের সমাজে ততটা ক্ষতিকর নয়। এই বিষয়ে সর্বশেষ বক্তা 'সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা'র জয়সুন্দর গুপ্ত। তিনি বলেন, সেন্সার বোর্ডের কোনো নীতিই নেই। তা না হলে তৃতীয় শ্রেণীর নোঙরা 'নাইট সীরিজ' ছবি অনায়াসে ছাড়পত্র পায়, আর অন্যদিকে অনেক প্রখ্যাত আর্ট ফিল্মকে ভিত্তিহীন অজুহাত দেখিয়ে নাকচ করে দেওয়া হয়—এমন অসম্ভব ব্যাপার ঘটত না।

তারপর আলোচনা শুরু হয় 'চলচ্চিত্র ও সমাজ' নিয়ে। এই বিষয়ে প্রধান বক্তা চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্রীপ্রভাত মুখার্জি বলেন, আজকের সমাজজীবনে জলন্ত সমস্যা নিয়ে ছবি করবার উপায় নেই : শাসনযন্ত্রে দুর্নীতি, পুলিশের গুলি-বর্ষণ, গান্ধীটুপিধারী প্রতারক ইত্যাদি যদি দেখানো হয়—তবে 'বিতর্কমূলক' আখ্যা দিয়ে সেন্সার বোর্ড সেগুলির ছাড়পত্র নাকচ করে দেবেন। অর্থাৎ সমাজভাবনা-রহিত অদ্ভুত অবাস্তব ছবি না করলে সে-ছবির মুক্তির সম্ভাবনা নেই। নট ও নাট্যকার শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বলেন, সেন্সার করবার সময় চলচ্চিত্রের অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে দেখতে হবে। সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না—তারই ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের দৃশ্য বিচার হবে। ভারতের মতো অল্পশিক্ষিত দেশে চলচ্চিত্রের যে শিক্ষামূলক দিক আছে, তার দিকে সেন্সার বোর্ডকে নজর দিতে বলেন লেখক শ্রীঅসিত গুপ্ত। আইনজীবী শীমানিক ভট্টাচার্য আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সেন্সারের নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে আলোচিত হয় 'তরুণ-সম্প্রদায় ও চলচ্চিত্র।' এদিনের বক্তারা সবাই তরুণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত বলেন, আমাদের সেন্সারনীতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গঠিত। সেন্সার বোর্ডের কার্যকলাপ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার যাতে সৎ ও সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীচন্দন ভট্টাচার্য বলেন, চলচ্চিত্রের পর্দায় আমরা জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা দেখতে চাই ; অথচ সেন্সার বোর্ড যে-সমস্ত হিন্দী ছবিকে ছাড়পত্র দিচ্ছেন, তাতে বাস্তবতার নামও নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীভারতী সরকার দ্বিধাহীনভাবে জানালেন, বাস্তব জীবনে 'কিস' 'প্যাসোনেট লাভ'-এর অস্তিত্ব আছে। সুতরাং চলচ্চিত্রেও আমরা সেগুলি দেখতে চাই।

'সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা'র শ্রীঅজয় বোস ঘোষণা করলেন, কতগুলি

ছবিকে বিশেষ করে 'অপ্রাপ্তবয়স্ক'দের জন্ত চিহ্নিত করে রাখা অর্থহীন। শ্রীশ্যামাপদ মজুমদার নামে জনৈক কলেজের ছাত্র বললেন, চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে স্থান দেওয়া একান্তভাবে দরকার। এ-সম্পর্কে সেন্সার বোর্ডকে অনেক বেশি পরিমাণে সৎ হতে হবে।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয়ার্ধে 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের বর্তমান ধারা' নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার স্থত্রপাত করে অধ্যাপক রোবের্জ বলেন, ফিল্ম ইনডাস্ট্রি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভ্রান্ত। 'আর্ট ফিল্ম'-এর সঙ্গে সঙ্গে 'নন আর্ট' ফিল্মের প্রয়োজন আছে। ভালো 'নন-আর্ট ফিল্ম' নির্মাণের জন্ত তিনি সেল্ফ -সেন্সরশিপের প্রস্তাব করেন। অর্থাৎ চলচ্চিত্র-নির্মাতারাই একটি বিধিনিষেধ তৈরি করে সেই অনুসারে চিত্রনির্মাণ করবেন।

'নৈহাটি সিনে ক্লাব'-এর শ্রীশ্যামাপদ ভট্টচার্য বললেন, বর্তমানে যে শস্তা ছবির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, সেন্সার বোর্ডের কর্তব্য তাকে প্রতিহত করা। ওড়িশার চলচ্চিত্র-নির্মাতা শ্রীপাত্র নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সেন্সার-কর্তাদের খামখেয়ালীপনার কয়েকটি নমুনা উপস্থিত করেন। 'ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট'-এর শ্রীনির্মালা বোস বললেন, শিল্পের ক্ষেত্রে কোনো বাধা-নিষেধ থাকা উচিত নয়।

সমাপ্তি দিবসে বিভিন্ন বিষয়ের প্রধান বক্তারা পূর্বে আলোচিত বক্তব্যই সংক্ষেপে উপস্থিত করলেন। 'ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ'-এর নির্বাহী সম্পাদক শ্রীঅরুণ প্রামাণিক বলেন, কোনো দেশের ছবি বা কোনো দৃশ্য অশোভন কি না তা পৃথকভাবে বিচার না করে, ছবির কর্ম ও কনটেক্স্ট দেখে তাকে বিচার করতে হবে। রাজনৈতিক এবং বিতর্কমূলক বিষয়কেও ছাড়পত্র দেবার কথা তিনি বলেন।

সেমিনারের সভাপতি শ্রীবাগীশ্বর ঝা সেন্সার-ব্যবস্থা তুলে দেবার জন্ত দাবি জানান। তারপর শ্রোতাদের মধ্য থেকে কয়েকজন ভাষণ দেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'সাউথ ক্যালকাটা ফিল্ম ক্লাব'-এর শ্রীনিত্যগোপাল চক্রবর্তী। তিনি সমগ্র সেমিনারে 'কিস অ্যাণ্ড সেক্স' প্রাধান্য পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, চলচ্চিত্রকার চলচ্চিত্র-মাধ্যমে কি প্রকাশ করতে চাইছেন সেন্সারের সময় সেটাই দেখা দরকার।

"বাইরে চাকচিক্যের ঘটা ভেতরে শূন্য" কথাটা যে কত সত্য, তা এই

সেমিনারের পূর্বে আমার জানা ছিল না। চারটি বিষয়ে পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা সেমিনারে ছিল। কিন্তু বক্তারা প্রায় সকলেই বলবার সময় বিষয়ের ধার-কাছ দিয়ে না গিয়ে নিজের খেয়ালখুশি মতো বলেছেন। বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি একাধিকবার ঘটেছে। এমন কি, একই বক্তাকে দু-ধরনের বক্তব্য বলতে শোনা গেল। এই সেমিনার শুনে এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে 'সেক্স ও কিস' ছাড়া সেন্সারের অন্য কোনো দিক নেই। কারণ আলোচনা এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রথম দিনের অধিবেশনে শ্রীভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন যে এই সেমিনারের ব্যবস্থাদি করার জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির অধিকাংশ সদস্য হলেন বাঙলাদেশের পেশাদার চিত্রসাংবাদিক। এই ধরনের একটা সেমিনারের জন্য পৃথক কমিটির প্রয়োজন কেন হলো তা বোঝা দুষ্কর। কিন্তু ব্যাপারটা আরো বিসদৃশ (না কি দুদর্শ) লাগল যখন এই কমিটির নব্বই ভাগ সদস্যকে তিনদিনের একদিনেও দেখা গেল না।

উপসংহার : সেমিনার-শুরুতে প্রায় শ-খানেক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন, কমতে কমতে সেমিনারের শেষে তা দশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

পরিমল মুখোপাধ্যায়

সেকালের নাটক—একালের জিজ্ঞাসা : একটি "আলোচনাচক্র"

সম্প্রতি কলকাতার এক অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন। সাম্প্রতিক নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম শরিক এই গোষ্ঠী গত দশ বছর ধরে নিষ্ঠা ও উদ্যমের পরিচয় দিয়ে আসছেন। তাঁদের আহ্বানে বাঙলাদেশের খ্যাতনামা প্রবীণ ও তরুণদের বেশ কয়েকজন (শ্রীমধু বসু, শ্রীজহর গাঙ্গুলি, শ্রীগঙ্গাপদ বসু, শ্রীসবিতাব্রত দত্ত, শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত ('শৌভনিক'), শ্রীবিভাস চক্রবর্তী ('থিয়েটার ওঅর্কশপ'), শ্রীসন্তোষ সিংহ, ইন্দ্রমিত্র ও শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ) এই 'অন্তরঙ্গ' আলোচনাসভায় মিলিত হন। বর্তমান লেখকও যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েই আলোচনা শুনতে যান। কিন্তু প্রথমেই লক্ষ্য করা গেল—বিজ্ঞাপিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে আলোচনার কোনও যোগসূত্র থাকছে না।

আলোচ্য বিষয় ছিল : 'সেকালের নাটক—একালের জিজ্ঞাসা'। এ-বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আজকের সাধারণ মানুষের মনে—বিশেষ করে নাট্যামোদী বা সাহিত্য-অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তো বটেই। আলোচনার শুরুতেই অন্য সুর শোনা গেল। প্রথম বক্তা তাঁর নাট্যজীবনে গুরুদেবের প্রভাব এবং কি করে গুরুদেব তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন, তার ইতিবৃত্ত পাঠ করলেন। সাহিত্য বা কলায় যে কোনও ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে যে কোনও নতুন তথ্য সম্পর্কেই আমরা সশ্রদ্ধ, আগ্রহী। কিন্তু ঘোষিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে উপরোক্ত কথিকার যোগসূত্রটা কোথায় ঠিক বোঝা গেল না। পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবীণ অভিনেতাদের কয়েকজন প্রাচীন ও বর্তমান অভিনয়ে উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্য, অভিনেতার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের গুরুত্ব, স্মৃতি-কথা ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করলেন। যদি কোনও অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের অভিনয়ের মান উন্নত করার অভিপ্রায়ে প্রাচীনদের পরামর্শ গ্রহণে ইচ্ছুক হন—তা নিঃসন্দেহে সুবিবেচনার পরিচায়ক। কিন্তু সে-অনুষ্ঠানকে আলোচনাচক্র আখ্যা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেবার প্রয়োজন কী! অথচ, আশ্চর্য যে, এ-ধরনের অনুষ্ঠানের 'মনোজ্ঞ' আলোচনার ধকপোলকল্পিত বিবরণ বাঙলাদেশের বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই দেখে থাকি।

একালের নট শ্রীসবিতাব্রত দত্ত আলোচনায় একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। বাঙলা নাটকের একালের শুরু কবে থেকে? কি বিচারে আমরা সেকাল ও একালের বিভেদ রেখাটি টানব? অভিনয় কৌশল, নাটকের বিষয়বস্তু, প্রযোজনা, মঞ্চকৌশল ইত্যাদির কোনটি আমাদের বিচারের মাপ-কাঠি হবে? বলাবাহুল্য, এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-আলোচনায় কোনও অভিপ্রায় উদ্যোক্তাদের মধ্যে দেখা গেল না।

শ্রীগঙ্গাপদ বসু তাঁর বক্তব্যে প্রথমেই পরিষ্কারভাবে আমাদের মনের কথাটি বললেন, ঘোষিত বিষয় এক, আর আলোচনা বইছে অন্য খাতে—এমতাবস্থায় তিনি কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন? তবে তাঁর স্বল্প ভাষণে আধুনিক নাটকের একটি বিশেষ দায়িত্বের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সামগ্রিকভাবে সেকাল ও একালের নাট্য-আন্দোলনের গুণগত পার্থক্য প্রসঙ্গে তিনি বললেন—সেকালে বাইরের জগতের ঢেউ কখনও কখনও রঙ্গমঞ্চে এসে আছড়ে পড়ত। ফলে একটি বিশেষ সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে বহু বাদ-বিসম্বাদ বা গণচেতনা সৃষ্টির পরে নাটকে তার কিছু অংশ প্রতিফলিত হতো। একালে ঢেউ উঠছে রঙ্গমঞ্চ থেকে, আর তার প্রতিফলন হচ্ছে গণমানসে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা গণচেতনার দিকনির্দেশনায় প্রয়াস পাচ্ছে। মনে হয়—গঙ্গাপদবাবু একালের নাটকের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। একালের নাটকের বিচারে জনমানসে নাটকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবেই এবং কোনও নাটকের মূল্যায়নে এটি হবে অন্যতম মাপকাঠি। স্বভাবতই কোনও নাট্যকার বা নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে যে কোনও নাটকের প্রতি-ক্রিয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। এই বিচারে পেশাদার অপেশাদার এমনকি 'প্রগতিবাদী' বা 'বিপ্লবী' নাট্যকারদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত অপরাধের অভিযোগ থেকে রেহাই পাবেন না।

পরিশেষে একটি বক্তব্য আছে। অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীগুলির অনেকের মধ্যেই এস্টাব্লিশমেন্ট-এর অনুগ্রহ লাভের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। নাট্য-আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে আপন গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়ই এঁরা সচেতন। আমরা এঁদের প্রতি অনেক আশা রাখি বলেই এ-ঝোঁক সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ আছে। অতীতে আমরা এস্টাব্লিশমেন্ট-এর গোলকধাঁধায় অনেক উজ্জ্বল

সম্ভাবনার অপমৃত্যু দেখেছি। আশা করি, নাট্য-আন্দোলনের সংগ্রামী গোষ্ঠীগুলি এ-বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

আমরা নাটক সম্পর্কে প্রচুর বিশ্লেষণ ও আলোচনার প্রয়োজন উপলব্ধি করছি। 'গ্ল্যামার' বা বিজ্ঞাপনের চটক বাদ দিয়ে নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনার আয়োজন হলে তা সমগ্র নাট্য-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় ও দিকনির্দেশনার পক্ষে যথার্থ সহায়ক হবে। আমরা তেমন আলোচনাচক্রের প্রত্যাশায় রইলাম।

কান্তি সেন

সাঙ্গীতিক দৌত্য : আলি আকবর খাঁ-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ভারতের আত্মাই প্রতিফলিত। অনাদিকাল থেকে ভারতের মর্মবাণী এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়ে এসেছে। ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ-র অনুষ্ঠান শুনে এই উপলব্ধি রসজ্ঞ শ্রোতামাত্রেরই হয়েছে। সম্প্রতি তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে ভারতের মর্মবাণীটি পৌঁছে দেওয়ার দৌত্যকার্যে নিযুক্ত আছেন। বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারের দায়িত্ব তিনি বহুকাল আগেই গ্রহণ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে তিনি এ-উপলক্ষে অনেক আগে থেকেই সফর করে বেড়িয়েছেন।

আলি আকবর খাঁ পদ্মভূষণ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-র পুত্র, পিতার সঙ্গীত-নৈপুণ্য ও শিল্পকুশলতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ তানসেন-এর বংশধর উত্তরাধিকারী রামপুর এস্টেটের ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেবের শিষ্য। পিতা ও পুত্র উভয়েই সেনী ঘরানার ধারক ও বাহক। এই তানসেনী বা সংক্ষেপে সেনী ঘরানার ঐশ্বর্যময় সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশেছে তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী প্রতিভা ও শিল্পকৌশল, যার সমন্বয়ে পিতা-পুত্রের শিল্প সৌকর্যলাভ করেছে।

আলি আকবর খাঁ জন্মেছিলেন ত্রিপুরার শিবপুর গ্রামে ১৯২২ সালে। তাঁর জন্মের পরেই আলাউদ্দিন খাঁ মৈহার রাজ এস্টেটের সভাশিল্পীর চাকরি নিয়ে সপরিবারে সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

সম্প্রতি এক সান্ধ্যবৈঠকে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়ায় আড্ডার সুরটি ছিল কোমল পর্দায় বাঁধা। কথায় কথায় আলি আকবর খাঁ বলতে লাগলেন, "তিনবছর বয়েস থেকে বাবার কাছে আমার ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও তারানায় তালিম শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত বলি যে কণ্ঠে গেয়ে গেয়ে শিক্ষার্থীকে যন্ত্রে সেই রাগ তুলিয়ে দেওয়া বাবার শেখানোর কৌশল। একজন যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীকে প্রথমে কণ্ঠসঙ্গীত শিখতে হয়। আমার তবলায় তাল-জ্ঞান হয়েছিল আমার কাকা কালীসাধক ফকির আফতাবউদ্দিন খাঁ-র কাছে। শুধু তবলাই না, তিনি আমাকে পাখোয়াজেও সুশিক্ষিত করে-ছিলেন। কাকা বাবাকে বলতেন, "তুমি আলি আকবরকে সুর দাও, আর

ওকে ওস্তাদ করার ভার আমি নিলাম।" আট বছর বয়েসের মধ্যেই বাবা আমাকে রবাব, সুরশৃঙ্গার, সেতার ও সরোদে তালিম দিয়েছিলেন। অবশ্য সরোদেই বাবা বেশি জোর দিতেন। তাই আত্মপ্রকাশের জন্য শেষপর্যন্ত আমি সরোদই বেছে নিলাম। আজকালকার সরোদ যন্ত্রের নতুন যা চেহারা, তা বাবার হাতেই রূপ পেয়েছে। এমন কি, রবিশঙ্কর মোটা খরজের তার লাগানো যে-বিশেষ-ধরনের সেতার বাজান—তাও বাবা তৈরি করে দিয়েছিলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি প্রতিদিন আমাকে আঠেরো ঘণ্টা সুর সাধতে হতো। এমনি ছিল বাবার তালিম। ফাঁকি দেওয়ার উপায় থাকত না। পড়া ধরার সময় ভুল করলে বকুনি তো ছিলই, উপরি পাওনাও কিছু কিছু জুটে যেত। পরে রবিশঙ্কর যখন শিখতে এলো, তখন বাবা কিছুদিন তাকে আলাদাভাবে শেখালেন। কিছুদিন পরে সে আমাদের সঙ্গেই এক ক্লাসে শিখত। বাবা আমাদের যা শেখাতেন, অবসর সময়ে রবিশঙ্করের সঙ্গে তা নিয়ে আমি আলোচনা করতাম, ওকে তুলতেও সাহায্য করতাম। গান-বাজনা আমি অল্প আয়াসেই শিখে ফেলতাম বলে ততটা সীরিয়াস ছিলাম না। তাই বাবা যখন আমাদের পরীক্ষা করতেন, তখন আমি অন্যমনস্কতার জন্যে অনেক সময় ভুল করে ফেলতাম। গালাগাল খেতাম। রবিশঙ্কর এক-আধবার লোক-দেখানো ভুল করে পরমুহূর্তেই তা নির্ভুলভাবে পরিবেশন করত। রবিশঙ্কর ছিল ভীষণ চালাক। বাবা ওকে তারিফ করে বলতেন "রবির মাথা ভালো তো হবেই—ও যে ব্রাহ্মণের ছেলে"।"

আলাউদ্দিন খাঁ-র কথা বলার ধরন সম্পর্কে আগেও শুনেছি। কিন্তু সে ভিন্ন গল্প। আলি আকবরের কথাই বলি। একাধারে পিতা এবং গুরু আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ-র তত্ত্বাবধানে কঠোর সাধনার শেষে তিনি আকাশবাণীর লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের 'মিউজিক প্রডিউসার' হন। কিছুকাল পরে যোধপুরের রাজা তাঁকে রাজসভার শিল্পী নিযুক্ত করে সাদরে যোধপুর নিয়ে যান। সেখান থেকেই তিনি ভারতের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত মিউজিক কনফারেন্সগুলিতে যোগ দিতেন। ফলে অচিরেই আলি আকবর খাঁ ভারতবর্ষের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় যন্ত্রশিল্পীর সম্মানে অভিষিক্ত হলেন। উদয়শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন প্রকারের ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ ও প্যাটার্ন নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ তিনি ইতিপূর্বেই পেয়েছিলেন। যোধপুরে থাকাকালীন খাঁ সাহেব ভারতীয় রাগ-রাগিণী ও লোকসঙ্গীতের সুচারু মিশ্রণে কয়েকটি

অর্কেস্ট্রাও রচনা করলেন। মৈহারের অর্কেস্ট্রা রচনা করেছিলেন আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ। ভারতীয় অর্কেস্ট্রার তিনিই পথিকৃৎ। আলি আকবর খাঁ-র মধ্যেও পিতার এই সৃজনী প্রতিভা প্রকাশিত হলো।

১৯৫৫ সালে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারের জন্য তিনি বিদেশযাত্রা শুরু করেন। বিখ্যাত বেহালা-বাদক ইহুদী মেনুহিনের সহযোগিতায় নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, প্যারিস, ব্রাসেলস সফর করে আলি আকবর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নৈপুণ্যে বিদেশীদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন। ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশনের জন্য তিনি টোকিও-তে আমন্ত্রিত হন। ১৯৬৩ সালে 'এডিনবরা মিউজিক ফেস্টিভ্যাল'-এ আমন্ত্রণ করে এই ভারতীয় সরোদশিল্পীকে সম্মানিত করা হয়। বিদেশে যেখানেই তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, সেখানেই প্রায় প্রতিটি স্থানীয় সংবাদপত্র তাঁর সঙ্গীত-পরিবেশনের নৈপুণ্য ও শিল্পমাধুর্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। 'নিউ স্টেটসম্যান' তাঁর সৃজনী প্রতিভার জন্য তাঁকে 'ভারতীয় বাখ্'—এই আখ্যায় ভূষিত করেছে। ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মর্যাদা উপলব্ধি করে বিদেশীরা তাঁর কাছে যন্ত্রসঙ্গীতে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে চাওয়ায় তাঁকে সম্প্রতি বিদেশে যন্ত্রসঙ্গীত-শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকতে হচ্ছে। সেতারী শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোদশিল্পী শরণরানী ও বেহালা-বাদিকা শিশিরকণা তাঁর যোগ্য শিষ্য ও শিষ্যা।

নৈপুণ্যের চরম শিখরে পৌঁছেও আলি আকবর খাঁ রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন রূপ ও প্যাটার্ন নিয়ে এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচটি রাগ—'চন্দ্রনন্দন', 'গৌরীমঞ্জরী', 'লাজবন্তী', 'মিশ্রশিবরঞ্জনী' ও 'হিন্দোলহেম' তিনিই রচনা করে আসরে চালু করেছেন। এভাবেই রাজপুতানার লোকসঙ্গীতের মিশ্রণে সৃষ্ট হয়েছে 'মিশ্রমাণ্ড্'। ১৯৬১ সালে পার্ক সার্কাসে অনুষ্ঠিত 'রবীন্দ্র-শান্তি মেলা'য় রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ একটি রাগিণী-রূপরেখা রচনা করে তা রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে আলি আকবর খাঁ সেই রাগিণীর রূপরেখা পিতার কাছ থেকে পান ও বিভিন্ন তানালঙ্কারে সাজিয়ে সম্পূর্ণ রূপ দিয়ে তার নামকরণ করেন 'মেধাবী'। রবীন্দ্রনাথের নামেই এই রাগিণী উৎসর্গীকৃত। এই রাগিণী 'মলুহা-কেদারা' ও 'কল্যাণ'-এর মিশ্রণে উৎপন্ন হলেও এতে 'বিলাবল' আর 'হাম্বীর'-এর ছায়া এসে পড়েছে। নতুন তাল-সৃষ্টিতেও আলি আকবর খাঁ বিশেষ আগ্রহী। সাত মাত্রার 'রূপক' তাল থেকে তিনি সাড়ে

পাঁচ মাত্রার একটি তাল সৃষ্টি করে তার নাম দিয়েছেন 'দশাক'। দশ মাত্রার 'ঝাঁপতাল' থেকে তিনি সাড়ে আট মাত্রার 'রূপক' তাল রচনা করেছেন। একভাবে চোদ্দ মাত্রার 'ধামার'কে ভেঙে সাড়ে এগারো মাত্রার 'সরস্বতী' তাল সৃষ্টিতেও তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় মেলে।

রাগ-মিশ্রণ

সুষ্ঠু রাগ-মিশ্রণের জন্যে আলি আকবর খাঁ বিখ্যাত। দুটি কি তিনটি রাগকে মিশিয়ে নতুনতর কিছু সৃষ্টি করায় তিনি ইনটেলেকচুয়াল আনন্দ পান। সঙ্গীত-জগতে এ-নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক চালু আছে। তাই তাঁকে প্রশ্ন করলাম, "একাধিক রাগের এই মিশ্রণে তাদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে কি ?" উত্তরে খাঁ সাহেব বিনীত হেসে বললেন, "দুই রাজ্যের মিলন হলে তাদের রাজা-মন্ত্রী-সান্ত্রী কি পালটে যায় ? সঙ্গীত-জগতেও যাঁরা রাগ-রাগিণীর প্রকৃত মিলন ঘটাতে চান, তাঁরাও দেখবেন যাতে রাজা-মন্ত্রী-সান্ত্রী সব ঠিক ঠিক থাকে, অর্থাৎ তাদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য যেন বদলে না যায়। 'চন্দ্রনন্দন'-এ দেখুন 'মালকোষ,' 'চন্দ্রকোষ', 'কৌশী'র কেমন সুন্দর মিলন ঘটেছে। নিজের তৈরি বলে বলছি না, এ-মিলন ঘটেছে ওদের স্বভাবের ঐক্যের জন্যে। 'গৌরীমঞ্জরী' আরেকটি সুন্দর মিলনের নিদর্শন। 'গৌরী' 'ললিতা-গৌরী' 'শ্রীরাগ' 'খাম্বাজ' ও 'নটরাগ'-এর মিশ্রণে 'গৌরীমঞ্জরী' তৈরি হয়েছে।"

সঙ্গীত পরিবেশনের আদর্শ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে খাঁ সাহেব সহাস্যে জানালেন, "দেখুন, আমি যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী। সুতরাং যন্ত্রসঙ্গীতশিল্প পরিবেশনের প্রকৃত মান সম্বন্ধেই আমি আলোচনা করব, এক্তিয়ারের বাইরে যাব না। যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীরা অনেকেই আজকাল প্রকৃতভাবে 'আলাপ' করেন না। আলাপ বা শুরু করেন—তা 'বিলম্বিত জোড়'-এর নামান্তর। 'আলাপ'-এর চারভাগ—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। তাদের পরিবেশনের রীতি ও পদ্ধতিও ভিন্ন। প্রত্যেক রাগ পরিবেশনের ক্ষেত্রেও আলাপের প্রকার বিভিন্ন হওয়া উচিত এবং তা রাগ-রাগিণীর ধর্মের উপরে নির্ভরশীল। রাগের প্রকৃতিবিরুদ্ধ—এমন রীতিতে সঙ্গীত-পরিবেশন বাঞ্ছনীয় নয়। সম্প্রতিকালে এমন যন্ত্রশিল্পী ভাগ্যে মেলে, যিনি এসব নিয়মগুলি যথাযথভাবে পালন করেন।

'দরবারী কানাড়া' পরিবেশন করতে গিয়ে শিল্পীর উচিত এই রাগের আরোহী ও অবরোহীর গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদের উপর সাবধানী নজর রাখা। 'শুদ্ধ কল্যাণ' পরিবেশন করতে গিয়ে তার আরোহী ও অবরোহীর পর্দাগুলিতে প্রকৃত সুর লাগাতে না পারলে তা কল্যাণ-অঙ্গের এক প্রকার হয় বটে, কিন্তু শিল্পী লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। এভাবে 'মুলতানী' বাজাতে গিয়ে প্রকৃত স্বরজ্ঞান না থাকলে সন্ধ্যার রাগিণী সকালের 'তোড়ী'তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একইভাবে 'ললিত' বাজাতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে 'তোড়ী'তে পৌছনোও বিচিত্র নয়। এ-রকম ভুল অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি।"

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মান উন্নয়নের পন্থা সম্বন্ধে হদিশ দেওয়ার জন্যে খাঁ সাহেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানালেন, "শিল্পী হিসেবে গড়ে ওঠার জন্যে আগে যত ঘণ্টা রেওয়াজ করতে হতো, বর্তমানে তার অভাব লক্ষিত হচ্ছে। দৈনিক আঠেরো ঘণ্টা করে রেওয়াজ করেও আমরা গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পারতাম না।" এই সূত্রে তিনি একটি গল্প বললেন। আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ একদিন রাত্রিবেলা 'বেহাগ'-এর একটা মুখ দিয়ে তা রবিশঙ্করকে বাজাতে বলে যান। রবিশঙ্কর কিছুক্ষণ বাজিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সকালে উঠে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বাগানের গোলাপ গাছগুলিকে কুপিয়ে চলেছেন। এই রাগের কারণ অনুসন্ধান করে রবিশঙ্কর জানতে পারলেন যে তিনিই স্বয়ং এর জন্যে দায়ী। গুরু তাঁকে বাজিয়েই যেতে বলেছিলেন, বিশ্রাম করতে তো নির্দেশ দেননি। ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে নতুন জামাইকে তিরস্কার করতে না পারায় গুরু গোলাপ গাছের উপরেই রাগ প্রকাশ করছেন। আলি আকবর খাঁ সাহেব সখেদে জানালেন, "অবশ্য বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় গুরু বা শিষ্য উভয়ের পক্ষেই এই অধ্যবসায় ও তন্ময়তা রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, যত বাধারই সম্মুখীন হতে হোক না কেন— তাকে জয় করতে হবে। ঐকান্তিক সাধনা ছাড়া শিল্পী তার প্রেয় ও শ্রেয়কে লাভ করতে সক্ষম হবেন না। মৃণালের কাঁটায় রক্তাক্ত হাতেই শ্বেতশতদল-বাসিনী সুরলক্ষীর চরণ স্পর্শ করা সম্ভব।"

আলি আকবর খাঁ আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের শিল্পী-সন্তান। তাঁর কথা বলার ধরনও তাই আমাকে মোটেই অপ্রস্তুত করল না।

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

নয়া ঔপনিবেশিকতা ও বৃটেনের সঙ্কট

'আফ্রো-এশিয়ান এ্যাণ্ড ওয়ার্লড এ্যাফেয়ারস' পত্রিকার ১৯৬৮ সালের প্রথম সংখ্যায় রজনী পাম দত্ত একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। নয়া ঔপনিবেশিকতা আজ বৃটেনকে কেমন ঘরে-বাইরে নাজেহাল করে তুলছে, রচনাটিতে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৯ সালে বৃটেনে তখন লেবার দলের সরকার। তাঁরা মনে করলেন পাউণ্ডের বৈদেশিক মূল্যহ্রাসই হচ্ছে বৈদেশিক খাতে দেনা-পাওনা সমস্যার 'বিশল্যকরণী। শ্রীদত্ত তখন 'বৃটেন্‌স ক্রাইসিস অব এম্পায়ার' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের চাপে বৃটেন আর পুরনো সাম্রাজ্যবাদী পরগাছাবৃত্তি অনুসরণ করে চলতে পারবে না। সাম্রাজ্যবাদের কোমর ভেঙে গেছে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোকে জিইয়ে রাখবার প্রচেষ্টাই বৃটেনের বাণিজ্যসঙ্কট ডেকে আনছে। ১৯৫৩ সালে রক্ষণশীল দল বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্কট-সমাধান করেছে বলে লম্ফ-ঝম্প করার সময় শ্রীদত্ত ঐ পুস্তিকাখানি আরও বিস্তৃত করেন, এবং 'দ্য ক্রাইসিস অব বৃটেন এ্যাণ্ড দি বৃটিশ এম্পায়ার' বইটি প্রকাশ করেন। এতেও তিনি বৃটেনের সঙ্কট যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট, সেটি আরও স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেন। ১৯৫৭ সালে ঐ বইটিতে তিনি একটি নতুন অংশ যোগ করেন, বিষয়: পুরনো ও নতুন ঔপনিবেশিকতা। ঐ অংশটিতে শ্রীদত্ত দেখালেন যে সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য বৃটেন এবার নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। বৃটেন অধিকাংশ প্রাক্তন উপনিবেশকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে বটে, কিন্তু বৃটিশ একচেটিয়া মূলধনপতিদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে ও সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে পদানত রাখতে তারা নানা ছলে সচেষ্ট হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের এই নতুন রূপের নাম নয়া ঔপনিবেশিকতা। আর তাই বৃটেনের সঙ্কট এখন নয়া ঔপনিবেশিকতার সঙ্কট।

এক হিসেবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একটি বিশিষ্ট স্মারকচিহ্ন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ সেই সময় থেকে তার প্রত্যক্ষ শাসনের বাইরে চলে যায়। তারপর এই বিশ বছর ধরে অত্যন্ত পাকাপাকিভাবে বৃটেন তার নয়া

ঔপনিবেশিকতার কৌশল গড়ে তুলছে। বৃটেন আগের মতোই ঔপনিবেশিক শাসনও চালিয়েছে, ঔপনিবেশিক লড়াই লড়েছে মালয়ে বা এডেনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটেন অধিকাংশ দেশে এমন কায়দায় রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে, যাতে বৃটিশ মূলধনের বশংবদ, জাতীয় বুর্জোয়াদের একাংশ রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়ে যায়। কিন্তু এতে বৃটেনের লাভ কী হয়েছে ?

আর্থনীতিকভাবে পদানত রাখার জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক, দালাল নিয়োগ ও চোখ রাঙানি—দু-ব্যবস্থাই চালু রাখতে হয়। এজন্য বৃটেনকে কমনওয়েলথের গাঁঠছড়া, ঘাঁটি অনুসন্ধান ও ঘাঁটি বসানো, বিদেশে বৃটেনের সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে তোলা, 'সুয়েজের পূব' রণনীতিতে জোর দেওয়া—ইত্যাকার অনেক কিছুই করতে হয়। এই রাজনৈতিক ও সামরিক—দুটি মহলেই আজ বৃটেনের সঙ্কট বহুদূর ব্যাপ্ত। কিন্তু কেন ?

কি লেবার কি কনজারভেটিভ, যে দলই সরকারে থাকুক না কেন, এদের সবারই লক্ষ্য বিদেশে বৃটিশ মূলধন গড়ে তোলা এবং ঐ মূলধন থেকে পাওনা অব্যাহত রাখা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে বৃটেনের পাউণ্ড স্টারলিঙের ভূমিকা এবং লণ্ডনের কোম্পানিগুলির হেড অফিস বিদেশে বৃটেনের মূলধন-বিস্তারে বেশ সহায়তা করেছে। দেখা গেছে, যে-বছর আন্তর্জাতিক লেন-দেন খাতে বৃটেনের ঋণ রয়েছে, সে-বছরেও বৃটেন বিদেশে মূলধন রপ্তানি করেছে। বিদেশ থেকে পাওনা মুনাফা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ছিল প্রায় বিশ কোটি পাউণ্ড, ১৯৬৫তে তা হয়ে দাঁড়ায় একশো কোটি পাউণ্ড। যুদ্ধের আগে নীট মুনাফা ছিল সতেরো কোটি পাউণ্ড, ১৯৬৫ সালে তার পরিমাণ দাঁড়াল পঁয়তাল্লিশ কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড। বিদেশে বিলিতি কোম্পানিগুলি দেশে-অর্জিত মুনাফার দুই শতমাংশ উপার্জন করে। তাছাড়া কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশ থেকে বাণিজ্যহারের অসাম্যজনিত লাভ ছাড়াও অন্যান্য অনেক রকম লাভ করা যায়। সত্যি কথা বলতে কি প্রতিবছর ঐ দরিদ্র দেশগুলির ভাগ্যে যতখানি 'বিদেশী সহায়তা' জোটে, সুদ-ঋণ পরিশোধ প্রভৃতির জন্য তাদের তার চেয়ে ঢের বেশি ফেরত দিতে হয়। এ-ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সবচেয়ে বেশি সুবিধে জুটেছে। বৃটেনের মূলধনপতিরা বেশি লাভের আশায় খোদ বৃটেনকে বঞ্চিত করে মূলধন পাঠাচ্ছে বাইরে, আর বিদেশে সেই মূলধনকে চৌকি দেবার জন্য সৈন্যবাহিনী পোষা হচ্ছে বৃটিশ করদাতাদের ট্যাকের পয়সায়! তা ছাড়া বিদেশে দানবাকৃতি বৃটিশ কোম্পানিগুলি রাজার

হারে বহাল তবিয়তে দেশ শোষণ করছে, মুনাফা ফেরত পাঠাচ্ছে একচেটিয়া মূলধনপতিদের। আই-সি-আই ১৯৬৬ সালে একশো বাইশ কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে মুনাফা লুটেছে দশ কোটি বিশ লক্ষ পাউণ্ড। আরও মজার ব্যাপার, লণ্ডনে হেড অফিস রাখার কল্যাণে এদের মুনাফা বৃটেনে অর্জিত আয় বলে গণ্য হয়। সম্প্রতি 'লণ্ডন টাইমস' জানিয়েছে তিনশোটি বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধন ছশো ত্রিশ কোটি আশি লক্ষ পাউণ্ড, আর তাদের মুনাফার পরিমাণ উননব্বই কোটি পাউণ্ড। এতে বোঝা যায়, বিদেশ শোষণ করে বৃটেনের মূলধনপতিরা কেমন বহাল তবিয়তে আছে।

কিন্তু পাল্টা চাপ বাড়ছে। বৃটেনের নয়া ঔপনিবেশিকতা টিকিয়ে রাখার রাজনৈতিক সংগঠন কমনওয়েলথ আর আগের মতো নেই। কমনওয়েলথ এখন বৃটেনের শিরঃপীড়া হয়ে উঠেছে। সদস্য রাষ্ট্ররা অনেকেই আজ বৃটেনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশে দ্বিধা করছে না। আর তাছাড়া, একটির পর একটি সামরিক ঘাঁটি থেকে তাকে সরে পড়তে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিদেশে সৈন্য-বাহিনী পুষবার ব্যয়ও প্রচণ্ড। এখন তো আর 'রাজকীয় ভারতীয় বাহিনী' নেই যে বৃটেনের মূলধনের স্বার্থে লড়বে। বৃটিশ টাকা, রক্ত—সবই আজ একচেটিয়া বৃটিশ মূলধনের লুণ্ঠন-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য ঢালতে হবে।

তাই এক কথায় বলা চলে—বৃটেনের দেনাপাওনার সাম্প্রতিক সঙ্কটবৃদ্ধির কারণ : বিদেশে মূলধন পাঠানো ও ক্রমবর্ধমান হারে সামরিক ব্যয় অক্ষুণ্ণ রাখা। বৃটিশ রাষ্ট্রনেতারা বলছেন—দেশে আমদানি বেড়েছে, কিন্তু লোকজনের আয় বেড়ে যাওয়ায় তারা দেশী-বিদেশী জিনিস দুই-ই বেশি কিনছে বলে রপ্তানি বাড়ছে না, সুতরাং ট্যাক্সো দাও! এ যে সমস্তটাই ফাঁকি, একথা বৃটিশ জনগণ ক্রমে বুঝতে পারছেন। অবশ্য বৃটিশ কমিউনিস্টরা বুঝেছিলেন ঢের আগে।

তরুণ সান্যাল

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিপ্লবের একান্ন বছরে

শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে অক্টোবর মহাবিপ্লব একান্ন বছর পূর্ণ করেছে। একদিন ছিল—যেদিন দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের জন্ম, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের জন্ম সংগ্রামরত জাতির কাছে রুশবিপ্লব ছিল অনুপ্রেরণা, ছিল মডেল মাত্র। সমাজতন্ত্রের প্রথম মাতৃভূমিরূপে, সর্বহারা একনায়কতন্ত্রের প্রথম অভিব্যক্তিরূপে দেশে দেশে অক্টোবর মহাবিপ্লব ছিল একদিন নিছকই উদাহরণ। বিপ্লবের ভাবাদর্শের প্রেরণা এবং তার পথ—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বাইরের জগতের কাছে রুশবিপ্লবের তাৎপর্য।

কিন্তু প্রাণবন্ত গতিশীল এক বিপ্লবের তাৎপর্য বস্তুটা ভদ্রলোকের এক-কথার মতো অনড় কোনো স্থির বস্তু নয়। বিপ্লবের অগ্রগতি ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার তাৎপর্যেরও রূপান্তর ঘটে।

যে-দেশ আমাদের কাছে একদা নিছক মানসিক উদ্বোধনের প্রেরণা, নিছকই অনুকরণীয় এক মডেল ছিল; সে আজ আর আমাদের নিছক মডেল নেই। রুশিয়ার নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া। এই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অস্তিত্ব, তার শক্ত দুই বাহুর ভরসা এবং সেই সঙ্গে দেশভেদে জাতীয় বৈশিষ্ট্য আজ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছবার বিভিন্ন পথের সুযোগ খুলে দিয়েছে। সে-পথ রুশবিপ্লবের পথের চেয়ে ভিন্নতর হচ্ছে এবং হতে পারে।

দেশে দেশে বিপ্লব নিজের পথ নিজে নির্বাচন ক'রবে—বিপ্লবের এই স্বয়ংবরা হবার অধিকার যে আজ বহুল পরিমাণে সুনিশ্চিত, তারও অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শারীরিক অস্তিত্ব। সেই দুনিয়ার অন্যতম বিশ্বকর্মা অক্টোবর বিপ্লবের দেশ। ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রুশবিপ্লবের তাৎপর্যও রূপান্তরিত হচ্ছে এইভাবে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাতৃভূমি রুশ দেশ আজ আমাদের কাছে আর শুধুই উত্তরাকাশের তারা নয়। ভিয়েতনাম থেকে কিউবা পর্যন্ত ছোট-বড় সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের এবং এশিয়া-আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার স্বাধীন

ও স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রামরত দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নির্ভরযোগ্য ভরসা সোভিয়েত রুশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া। আজকের যুগের অ-পুঁজিবাদী বিকাশের পথে নতুন-স্বাধীন দেশগুলির বিকাশে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বৈষয়িক সাহায্য নিছকই অনুদান নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের হাত ধরেই এই দেশগুলি এগোচ্ছে তাদের নিজ নিজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে। সে-বিকাশের অনিবার্য লক্ষ্য সমাজতন্ত্র।

রুশবিপ্লবের একান্ন বছরের হিসাবের খাতায়ও একদিন ভুলের জমা ধরা পড়েছিল। চর্তুদিকে পুঁজিবাদী দেশ দিয়ে ঘেরা একলা একটি দেশ নিঃসঙ্গ দ্বীপে রবিনসন ক্রুসোর মতো এক-হাতে সমাজতন্ত্র গড়েছে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার অসম বিকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্বিরোধ বাহ্যিক কারণরূপে তার সেই একক সমাজতন্ত্র-গঠনে আনুকূল্য দান করেছিল সন্দেহ নেই। তথাপি একলা সোভিয়েত ভূমিকে তার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ার সে-গুরুভার কাঁধে নিতে হয়েছিল। নিজেকে নিংড়ে তাকে যে-আত্মত্যাগ করতে হয়েছিল, যে-ঝড়-ঝাপ্টা মাথায় করে চলতে হয়েছিল—সেই অস্বাভাবিক দুর্যোগের ফলেই হয়তো সেখানে একদিন গণতন্ত্র সাময়িকভাবে বিকৃত হয়েছিল এবং বড় হয়ে উঠেছিল একনায়কত্বের স্বৈরাচারীরূপ। নায়কের, ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীবিশেষের হাত এ-বিকৃতিকে আরও ভয়াবহ রূপ দান করেছিল সন্দেহ নেই। পার্সনালিটি কালটের পক্ষে এটা আমার সাফাই নয়। পরন্তু এটা পার্সনালিটি কালটের উৎসসন্ধানের চেষ্টা মাত্র।

কিন্তু ভুলটা গৌণ হয়ে দাঁড়ায় তখন, যখন ভুলের অনুষ্ঠাতারা ভুলকে প্রকাশ্যে সংশোধনের সাহস রাখে। কর্তার ভূতকে ঘাড় থেকে নামাতে অন্য অনেকে আজ পর্যন্ত সাহস না করলেও, রুশ দেশ তা করেছে।

ইতিহাসের বিশেষ এক বিপর্যয়ের যুগে বিপ্লবের জীবনে যে-বিকৃতি ঘটেছিল, আজ তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নেই। কারণ, আজ কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশই একলা নয়, নিঃসঙ্গ নয়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি, তার আন্তর্জাতিক সংহতিই হলো আজকে বিকৃতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।

এই আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সংসার থেকে যে কোনো জোটেই হোক না কেন, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে যে, তার ঘাড়ে কর্তার ভূত অবধারিত-ভাবে চেপে বসবেই। আজকের চীন সমস্ত সুযোগ সত্বেও সেই পুনরাবৃত্তিরই উদাহরণ।

অন্যদিকে বিকৃতির ও বিচ্যুতির পুনরাবৃত্তির ভয়ে ঘরপোড়া গরুর মতো আতঙ্কিত যাঁরা মার্কস-লেনিনের বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের মধ্যেই গণতন্ত্রহীনতা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন—তাঁরাও ভিন্ন পথে হলেও, একই ভুলে গিয়ে পৌঁছবেন।

পারি কমিউনের ব্যর্থতার পরেও নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে প্রচার করত এমন একদল লোক সিদ্ধান্ত করেছিলেন, বিপ্লবের পথটাই খারাপ, ও-পথে মুক্তি-অর্জন সম্ভব নয়। ইতিহাস এঁদের অনেক নাকানি-চোবানি খাইয়েছে। স্তালিনের হাতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নিগ্রহের কথা মনে করে আজ যাঁরা সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র নেই বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, কর্তার ভূতের ভয়ে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক সংহতি ভেঙে সমাজতন্ত্রকে মন্ত্রপূত জাতীয় গণ্ডীর বেড়া দিয়ে বাঁচাবার কথা ভাবছেন—তাঁরাও সম্ভবত সেই ভুলই করছেন।

কর্তার ভূত কর্তার ইচ্ছায় আনাগোনা করে না। ইতিহাসের অবস্থার বিপর্যয়ই তাকে ডেকে আনে। বিশ্বের বিরাট এক অঞ্চল জুড়ে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সবল অস্তিত্ব সেই বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি, স্তালিন আর জন্মাতে পারেন না। তিনি যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে জন্মান মাও সে-তুং রূপে এবং একমাত্র সেই দেশেই, যে-দেশ আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের শিবির থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়। বিচ্ছিন্নতার এই প্রবণতাই হয় ডাইনে না হয় বাঁয়ে সব রকমের বিচ্যুতি ও বিকৃতির জন্ম দেয়।

ভ্রান্তিউত্তীর্ণ, একান্ন বছরের শক্তিমান রুশ বিপ্লব এই তাৎপর্যকেই আজ তার সমস্ত অগ্রগতি দিয়ে প্রমাণ করে চলেছে।

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

রাসেল, সার্ত্র ও বুলগেরিয়ার ছাব্বিশজন বুদ্ধিজীবী

১৯৬২ সালের নভেম্বরে ক্যারিবিয়ান সঙ্কট পৃথিবীকে যখন বিপুল ধ্বংস ও সামগ্রিক যুদ্ধের কিনারায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, বিশ্বের সমস্ত মানুষ যখন নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্তব্ধ আতঙ্কে কালগণনা করছিল, লর্ড রাসেল তখন পীড়িত হচ্ছিলেন তাঁর "শেষ জিজ্ঞাসায়।" পৃথিবীতে কি কাণ্ডজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন এমন রাষ্ট্র একটিও নেই যে যুদ্ধ ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে, শান্তি ও প্রগতির পক্ষে দাঁড়াতে পারে? পৃথিবীকে যাঁরা শাসন করেন, তাঁদের মধ্যে কি একজনও

"প্রকৃতিস্থ" ব্যক্তি নেই ? লর্ড রাসেল তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন সেদিন। স্বস্তি বোধ করেছিলেন। এবং বেদনাও। গভীর বেদনা ও বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তেমন একটি রাষ্ট্র ও তেমনি একজন রাষ্ট্রনায়ক তিনি "মুক্ত দুনিয়াতেই" আশা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে-আশা পূর্ণ হয় নি। অন্য দুনিয়া থেকে এসে হাজির হলেন তাঁরা। কাণ্ডজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানবিশিষ্ট সেই রাষ্ট্রটির নাম রাশিয়া এবং "প্রকৃতিস্থ" সেই রাষ্ট্রনায়কটির নাম খ্রুশ্চভ্।

প্রত্যেকটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া ঘটে। বড় বড় ঘটনার প্রতিক্রিয়াও বড় বড়। বড় বড় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তা হয়তো গভীরতরও। তাই চেকোস্লো-ভাকিয়ার একুশে অগাস্টের ঘটনাও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। আর ঘটনাটা যেহেতু বেশ বড়, প্রতিক্রিয়াও ঘটল বিশ্ব জুড়ে। লর্ড রাসেলের মনেও ঘটল। খুবই স্বাভাবিক। তিনি, সার্ত্র এবং ভিয়েতনাম-যুদ্ধবিরোধী বিচার-ট্রাইবুন্যালের বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই—কেউ বাদ পড়লেন না। এটাও স্বাভাবিক।

কিন্তু…

লর্ড রাসেল ও সার্ত্র তাঁদের প্রতিক্রিয়াকে মনের গণ্ডীতে বেঁধে না রেখে, সংশয় বা জিজ্ঞাসার সীমানা এড়িয়ে একটা খোলাচিঠি লিখে ফেললেন। কাদের প্রতি চিঠিটি ? সোশিয়ালিস্ট ও কমিউনিস্টদের প্রতি। কিন্তু তাঁরা কোথায় পাঠালেন চিঠিটি ? 'প্রাভদা,' 'ইজভেস্তিয়া' কিংবা পশ্চিমের বহুল প্রচারিত ও মর্যাদাসম্পন্ন কোনো কমিউনিস্ট, এমন কি সোশিয়ালিস্ট পত্রিকায় কি ? না। সোজা 'দি টাইমস'-এ। চিঠিটি মুহূর্তে প্রচারের হাতিয়ার হলো এবং সেই সঙ্গে চিঠির লেখকরা ; যা কিছু "নীতিজ্ঞান সম্পন্ন"ও "প্রকৃতিস্থ", তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল, সমাজবাদবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের হাতিয়ার। যে কমিউনিস্ট ও সোশিয়ালিস্টদের "চেতনা" তাঁদের লক্ষ্য, চিঠিটি তার কাছে আবেদনের বদলে কুৎসা হয়ে পৌছল। লর্ড রাসেলরা নিজেদের "উপলব্ধি"কে যে শুধু এদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, তা-ই নয়। বেশ হলফ করেই বললেন, চিঠিটি "অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মার্কিন সংবাদপত্রগুলির" সংবাদের ওপর নির্ভর করে লেখা।

তীব্র ক্ষোভ ও ব্যথা নিয়ে তাঁদের এই চিঠির উত্তরে সেইজন্যে বুলগেরিয়ার ছাব্বিশজন বুদ্ধিজীবী লিখেছেন : "…অবশ্য এইসব দলিলপত্র

সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে আপনাদের দু-তিন ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হতো। মনে হচ্ছে আপনাদের পক্ষে সেই সময় দেওয়ার চাইতে অন্যের রচিত কুৎসা ভরা একটি তৈরি দলিলে স্বাক্ষর দান অনেক সুবিধাজনক।"

আর সেই জন্যেই লর্ড রাসেলদের সিদ্ধান্ত: সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিয়ে আপন আপন এলাকায় তাদের জমিদারি চালিয়ে যাচ্ছে। চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা-স্পৃহাকে তাই দমিত হতে হলো। তাকে অস্ত্রের জোরে "রুশ প্রভাবাধীন এলাকা" হয়ে থাকতে বাধ্য করা হলো। এইসব ঘটনা বলকান অঞ্চলের শান্তিকে বিপন্ন করছে। এবং ইত্যাদি।

বুলগেরিয়াসহ ওয়ারশ চুক্তির দেশগুলিকে আক্রমণ করে তাঁরা তাঁদের চিঠিতে যা লিখেছেন, তার উত্তরে বুলগেরিয়ার বুদ্ধিজীবীরা লর্ড রাসেলকে প্রশ্ন করেছেন:

"এই মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন মার্কিন সমরবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে লড়ছে—ভিয়েতনাম থেকে নিকট প্রাচ্য পর্যন্ত, ইওরোপের কেন্দ্রস্থল থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে—সে যখন দস্যুতার চক্রান্তকে কার্যত প্রতিহত করছে, সেই যুগে, বাস্তববাদী বলে যাঁরা নিজেদের জাহির করেন, তাঁদের পক্ষে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে কুৎসা করা কিভাবে সম্ভব হয়?"

লর্ড রাসেল শান্তি ও প্রগতির পক্ষে একজন দৃঢ় সৈনিক। কিন্তু বাস্তব সর্বদা ভাববাদী আদর্শকে সহ্য করতে পারে না। প্রায়ই গুঁড়িয়ে দেয় রূঢ় আঘাতে। লর্ড রাসেল প্রমুখ ব্যক্তিরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, আণবিক অস্ত্রনিরোধ-সংগ্রামের শরিক। কিন্তু ভাববাদী আদর্শ তাঁদের দৃষ্টিকে অনেক সময়ই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পারমাণবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় পাছে সোভিয়েত এগিয়ে থাকে, তাই তিনি পশ্চিমী শক্তিগুলিকে একদিন সেই অস্ত্র দ্রুত আয়ত্ত করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। অনুতপ্ত লর্ডকে আজ সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে মিছিলের সারিতে দাঁড়িয়ে। তেমনি হয়তো একদিন আসবে, যখন···

বুলগেরিয়ার ছাব্বিশজন বুদ্ধিজীবী তাঁদের চিঠিতে লিখেছেন: "শান্তি ও প্রগতির জন্য সংগ্রামরত জনগণের মধ্যে আপনারা যে প্রভাব অর্জন করেছেন, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, তাকে রক্ষার গুরুত্বও কম নয়।"

একদিন হয়তো লর্ড রাসেল জানবেন—অতীতের বহুবারের মতোই—

প্রচারের বিভ্রান্তি প্রতারিত করেছে তাঁকে। তখন হয়তো তিনি আরো বেশি পিছিয়ে আসবেন। কিন্তু ততদিন বুলগেরিয়ার ছাব্বিশজন বুদ্ধিজীবীর ভাষায় এই অভিযোগ ধ্বনিত হবে: "একটি মিথ্যার ইস্তাহারে স্বাক্ষর করার পরও কিভাবে আপনারা ন্যায়বোধের মর্যাদা দাবি করতে পারেন, তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম।"

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গণবিক্ষোভ

প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাংশ জুড়ে আয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভ চলেছে। পূর্বাংশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা দীর্ঘ দিনের, পশ্চিমাংশে তা সাম্প্রতিক। পশ্চিমাংশে এবার প্রথম বিক্ষোভ শুরু করেন ছাত্রসমাজ—শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত দাবিপত্র নিয়ে। 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র'-র প্রবক্তা আয়ুব খাঁ পুলিশ-মিলিটারির বুটের তলায় তা নিষ্পিষ্ট করতে উদ্যোগী হলেন—কিন্তু ফল দাঁড়াল উলটো। সারা পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল—লাঠি-টিয়ারগ্যাস-গ্রেপ্তারের জবাবে ছাত্ররা মিটিং-মিছিল-হরতাল এবং পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ এমন কি গাড়ি-ঘোড়া-সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসের পথ পর্যন্ত অবলম্বন করল। মিটিং-এ ভাষণরত আয়ুব খান-এর দিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হলো—আততায়ী সন্দেহে ধৃত হলেন পলিটেকনিক কলেজের জনৈক ছাত্র। কারাগারে অন্তরীণ হয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানের বামপন্থী আন্দোলনের নেতা ওয়ালী খান সহ অনেকে। ছাত্রদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন আইনজীবী-অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীরা। আর, এই বিক্ষোভকে সুযোগমতো কাজে লাগাতে এগিয়ে এলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভুট্টোসাহেব ও তাঁর অনুগামীরা; পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান মার্শাল আসগার খাঁ-সাহেবও পেছিয়ে রইলেন না।

ব্যাপারটা মন্দ নয়—বুনিয়াদী গণতন্ত্রের প্রশংসায় একদা-পঞ্চমুখ ভুট্টোসাহেব এখন আয়ুব খান-এর চরমবিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাজনৈতিক বাজিমাতের স্বপ্ন দেখছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আগামী ১৯৭০ সালে। ভুট্টোসাহেব যদি জেল থেকে মুক্তি না পান, তা হলে তো আসগর খাঁসাহেব রয়েছেন—সৈন্যবাহিনী, উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও নেহাৎ কম নয়।

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিক্ষোভকে আপাতদৃষ্টিতে আয়ুব বনাম ভুট্টোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বলেই মনে হবে। নেপথ্য কাহিনী কিন্তু ভিন্ন। তা হলো স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী মানুষের জেহাদ। এই জেহাদের বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট প্রগতিপন্থী নেতা মুজিবর রহমান সাহেবের লেখা—'Friends not Foes' এই ঐতিহাসিক দলিলের মধ্যে। 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র'-র "সোনালী দশবছর" আর ফিল্ডমার্শাল আয়ুব খান-এর 'Friends not Masters'-এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন পাকিস্তানের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। 'কাশ্মীর', 'ইসলাম', 'ভারতের সম্ভাব্য আক্রমণ' ইত্যাদি কোনো টোটকাই আর তেমন ধরছে না। দিন দিন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠছে। এই দাবিকে কাঁটাবারা জুতোর তলায় নিষ্পিষ্ট করতে সচেষ্ট মদমত্ত ডিকটেটর ফিল্ডমার্শাল আয়ুব খাঁ, অপর দিকে 'ইসলাম' 'গণতন্ত্র' 'সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি গালভরা গরম-গরম বুলির তোড়ে আন্দোলনকে বিপথগামী করতে তৎপর ক্ষমতালোভী ভুট্টোসাহেব ও তাঁর অনুগামীরা। আশার কথা, আয়ুব বনাম ভুট্টোর খিস্তি-খেউড় যেমন জমে উঠেছে—তাতে পাকিস্তানের রাজনীতি-সচেতন গণতান্ত্রিক মানুষের বুঝতে অসুবিধে হবে না যে আয়ুব এবং ভুট্টো একই অচল টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এঁরা দু-মুখো মামা-ভাগ্নে সাপ, নিজেরা পরস্পর কামড়া-কামড়ি করলেও, উভয়েই কিন্তু গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রু।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জালিয়াতি আর দমন-পীড়নকে উপেক্ষা করে পূর্ববঙ্গের গণতন্ত্রপ্রিয় সংগ্রামী মানুষ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। ঢাকা শহরে আয়ুব খান-এর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে এই তো সেদিন হাজার হাজার ছাত্র এবং সংগ্রামী মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। মৌলানা ভাসানীর আহ্বানে এগিয়ে চললেন সংগ্রামী মানুষ—লাঠি-টিয়ারগ্যাস-গুলি-গ্রেপ্তার···কোনো কিছুই তাদের প্রতিহত করতে পারে নি। ঢাকা শহরে পুলিশের চণ্ড আক্রমণে প্রাণ হারালেন দু-জন, আহত হলেন অনেকে। পূর্ব বাঙলার মানুষ আবার প্রমাণ করলেন ডিকটেটরশিপের কবর রচনা করে গণতন্ত্রের বিজয়ী পতাকা তুলতে তাঁরা বদ্ধপরিকর; লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের এ-সংগ্রাম থামবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের অগ্রণী ছাত্রসমাজ ও প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবীরা যদি একযোগে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গণতন্ত্রের পতাকা নিয়ে ঠিকপথে এগোতে

পারেন—তা হলেই একমাত্র সমগ্র পাকিস্তান থেকে 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র'-র রাহুমুক্তি ঘটবে।

চার্বাক সেন

সোভিয়েত দেশ নেহরু-পুরস্কার

'সোভিয়েত দেশ নেহরু-পুরস্কার' কমিটি ১৯৬৮ সালের জন্য ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী, শান্তি ও প্রগতির আদর্শে নিবেদিত শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর জন্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেছেন। এ-বছর সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষার তেইশজন বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক ও অনুবাদক এই পুরস্কার-লাভে সম্মানিত হয়েছেন। এ-ছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পাঁচজন কিশোর-কিশোরীসহ মোট ছয়জনকে তাঁদের রচিত চিত্রাবলীর জন্যও এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। আমরা 'নেহরু-পুরস্কার'-বিজয়ী ভারতের এই উনত্রিশজন কৃতী বন্ধুদের সকলের উদ্দেশ্রেই আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা বিশেষভাবে অভিনন্দিত করছি বাঙলার প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, আমাদের পরম সুহৃদ ও 'পরিচয়' পত্রিকার দীর্ঘকালের বন্ধু-লেখক প্রবীণ কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ও নাট্যকার শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কারণ—অক্টোবর বিপ্লব, প্রগতি ও শান্তির উদ্দেশে রচিত 'উত্তরাকাশের তারা' কাব্যগ্রন্থটির জন্য কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষকেই এবার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মৌলিক সাহিত্যকর্মের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। আর, নাট্যকার ও সাংবাদিক শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোর্কির উপন্যাস 'মা'-এর নাট্যরূপ-দানের জন্য সাহিত্যের অতিরিক্ত পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা-কাব্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ। ব্যক্তিগত জীবনে দীর্ঘকাল তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামরত। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে যখন বিমলচন্দ্র তাঁর জীবিকা-নির্বাহের একমাত্র পথ সরকারী চাকরি থেকে পদত্যাগ করে কবিতা-রচনার মাধ্যমেই বেঁচে থাকার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন—তখন অনেক আশাবাদী বন্ধুর মুখেও সংশয়ের ছায়া দেখেছি। কিন্তু সমস্ত সংশয় এবং অবিশ্বাস অতিক্রম করে শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ নিষ্ঠুর দারিদ্র্য ও রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে আজও বেঁচে আছেন এবং বেঁচে আছেন কবিতার মাধ্যমে, তাঁর অজস্র সৃষ্টির মধ্যে। যে-যুগে বহু কবি-সাহিত্যিক সামান্য

প্রলোভনে ভ্রষ্টাচারী হতে দ্বিধা করেন না, সেইযুগে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দাঁড়িয়েও যে-বিরল সংখ্যক স্রষ্টা এখনও আদর্শনিষ্ঠ এবং সমাজতান্ত্রিক জীবন-দর্শনের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত, কবি বিমলচন্দ্র তাঁদেরই একজন। কবি বিমলচন্দ্রের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। ফলে, তাঁর কবিতায় বারংবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে সংগ্রামী সুর, উচ্চকণ্ঠ পৌরুষ এবং কাব্য-শরীরও গঠিত হয়েছে ঋজু-পেশল-বেগবান শব্দের অবিরাম প্রবাহে। বাঙলাদেশের সংগ্রামী মানুষের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা আজও তাই অম্লান।

সোভিয়েত বিপ্লবের অর্ধশতাব্দী পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত কবি বিমলচন্দ্রের 'উত্তরাকাশের তারা' কাব্যগ্রন্থখানি তাঁর পরিণত জীবনে নতুন সম্মান ও স্বীকৃতি এনে দিয়েছে, এ-কথা সত্য। কিন্তু তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'দক্ষিণায়ন' 'দ্বিপ্রহর' এবং 'উদাত্ত ভারত'ও নিঃসন্দেহে আধুনিক বাঙলা-কাব্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদরূপে বিবেচিত হবে। আমরা বিশ্বাস করি, "বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে নতুন মানবেতিহাসের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে ক্রমশঃ" বিমলচন্দ্রের "সজাগ চৈতন্যের মধ্যে…যুগান্তকারী বিপ্লব সম্পর্কে" যে "অপরিমেয় মূল্যবোধ" [উদ্ধৃতাংশ 'উত্তরাকাশের তারা' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা থেকে গৃহীত। প্রকাশক : মনীষা গ্রন্থালয়] জাগরিত হয়েছে, 'সোভিয়েত দেশ নেহরু-পুরস্কার' বিজয়ের পরে সেই জাগ্রত মূল্যবোধের আলোকে তিনি আরও দীর্ঘকাল বাঙলা-কাব্যকে উজ্জ্বলতর মহিমায় উদ্ভাসিত করবেন।

'সোভিয়েত দেশ নেহরু-পুরস্কার'-এর অন্যতম বিজেতা নাট্যকার শ্রীদিগিন্দ্র-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের যেমন প্রবীণ প্রবক্তা, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি কবি বিমলচন্দ্রের মতোই দৈন্যপীড়িত। বাঙলার গণনাট্য-আন্দোলনের প্রথম পর্বে দিগিন্দ্রচন্দ্র ছিলেন এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ সংগঠক। চল্লিশের দশকে তাঁর রচিত 'তরঙ্গ' 'বাস্তভিটা' 'মোকাবিলা' প্রভৃতি নাটকে রূপায়িত হয়েছিল সেই যুগের সংঘাতময় জীবন। সেই সমকার সংগ্রামী মধ্যবিত্ত, কৃষক-মজুর দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাটকের মাধ্যমে তাদের শ্রেণীচেতনাকে যে অনেকখানি শাণিত করতে পেরেছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেশসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথম জীবনে সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। এই আদর্শবোধই সাংবাদিক দিগিন্দ্রচন্দ্রকে

নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্রে রূপান্তরিত করে। চল্লিশের দশকে প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলন যখন এ-দেশের বুদ্ধিজীবীদের মনে নতুন প্রেরণা জাগিয়ে আরও ব্যাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে, সাংবাদিক শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। পরবর্তীকালে এই প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার 'অপরাধ'-এ স্বাধীনতা-উত্তর যুগের একচেটিয়া সংবাদপত্র-মালিকের রোষানলে তাঁর স্থায়ী জীবিকার একমাত্র আশ্রয় সাংবাদিকতার বৃত্তিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। 'গোল টেবিল' নাটক রচনার জন্য ১৯৫৩ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে তাঁর কর্মচ্যুতির ঘটনা এখনও অনেক বন্ধু স্মরণ করতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রকৃতপক্ষে, আঠেরো বছর সাংবাদিকতার পর ১৯৫৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র কোনো স্থায়ী জীবিকার্জনের পথ খুঁজে না পেয়ে কবি বিমলচন্দ্রের মতোই নিদারুণ দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন।

এই মানুষ যখন হতাশায় ভেঙে না-পড়ে নতুন নতুন সৃষ্টির পথে অগ্রসর হন এবং গোর্কির 'মা'-র মতো কালজয়ী উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করেন, তখন অপরিসীম শ্রদ্ধায় বিবেকবান মানুষের মন ভরে যায়। আমরা আশা করি, শ্রমিকশ্রেণীর যে-ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা গোর্কি তাঁর 'মা' উপন্যাসে বিধৃত করেছেন, পুরস্কার-বিজয়ী নাট্যকার শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরবর্তী মৌলিক রচনায় অতঃপর এ-দেশের পটভূমিকায় তাকেই রূপদান করতে সচেষ্ট হবেন।

'সোভিয়েত দেশ নেহরু-পুরস্কার' কমিটি যে যোগ্য ব্যক্তিদের সম্মানিত করেছেন—এ-জন্য তাঁদেরও আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি।

সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কার

এ-বছর বাঙলাদেশের তিনজন কৃতী সন্তান সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। বিখ্যাত পালাকার, যাত্রাভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ (বড় ফণী) যাত্রা-জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে যেমন আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন, তেমনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পীরূপে পুরস্কৃত হয়েছেন শ্রীযুক্ত বাদল সরকার এবং ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ।

সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি কর্তৃক যাত্রাগানকে স্বীকৃতি দেওয়া নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাঙলার যাত্রাজগতের অন্যতম দিকপাল অভিনেতা ও পালাকার শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই পুরস্কার জয় করে বাঙলাদেশের ঐতিহ্যময়, সম্ভাবনাপূর্ণ অথচ অবহেলিত এক শিল্প-মাধ্যমেরই স্বীকৃতি আদায় করলেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ তাঁর পঁচাত্তর বছর বয়সের পরিসীমায় একটানা অর্ধশতাব্দীকাল যাত্রাগানের মাধ্যমে বাঙলার লোক-সংস্কৃতিকে যেভাবে সেবা করেছেন, তার তুলনা বেশি নেই। অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতিকূল পরিবেশে লোকসংস্কৃতির জীবন্ত ধারা যখন শুকিয়ে যেতে থাকে, তখন সাধারণ মানুষের সেই মানস-সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যাঁরা সাধনায় অতন্দ্র থাকেন, তাঁরা সমগ্র জাতিরই নমস্য। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সেই মুষ্টিমেয় নমস্য পুরুষদেরই একজন। আমরা আশা করি, শহর ও গ্রাম-বাঙলার লোকায়ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এই ঐতিহ্যময় যাত্রাগানের মাধ্যমেই ফণিভূষণ আরও দীর্ঘকাল উজ্জীবিত করে রাখবেন।

বাঙলার নাট্যজগতে শ্রীযুক্ত বাদল সরকারকে প্রায় নবাগতই বলা যায়। কিন্তু গত এক দশকের বাঙলা নবনাট্য-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিফহাল, শ্রীযুক্ত সরকার তাঁদের কাছে অপরিচিত নন। বরং একজন প্রতিশ্রুতিময় নাট্যকাররূপেই তাঁর নাম অপরিচয়ের অন্ধকার অতিক্রম করে ধীরে ধীরে প্রায় সামনের সারিতে উঠে আসছিল। তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'সলিউসন এক্স'-এর পর 'বড় পিসিমা' নাটকের মৌলিকতায় মুগ্ধ হয়ে ১৯৬৫ সালে 'নাট্যকার সঙ্ঘ' যখন ঐ নাটকখানিকে শ্রেষ্ঠ বাঙলা নাটক হিসেবে পুরস্কৃত করেন, তখন থেকেই তিনি বাঙলার নাট্যামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। এরপর 'মুক্ত অঙ্গন'-এ 'শৌভনিক' কর্তৃক তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও 'বহুরূপী'-প্রযোজিত 'বাকী ইতিহাস' নাটক দুটির অভিনয় যাঁরা দেখেছেন—তাঁদের পক্ষে শ্রীযুক্ত সরকারের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। অনেকে মনে করেন শ্রীবাদল সরকার একদা যে-প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার সক্রিয় অংশীদার ছিলেন, সেই ভাবাদর্শের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি বর্তমানে জটিল যুগের জটিল মানুষের গ্লানি, হতাশা আর নৈঃসঙ্গ্যচেতনাকে নাটকে তুলে ধরার জন্য নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিরত। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি অনেক, দায়িত্বও কম নয়। এ-প্রয়াসের পরিণত ফসল হয়তো এখনও অনাগত। কিন্তু বাঙলার নবনাট্য-আন্দোলন তাঁর দানে যে লাভবান হয়েছে

এ-কথা অনস্বীকার্য। সুঅভিনেতা এবং বিচক্ষণ নাট্যপরিচালক হিসেবেও তিনি খ্যাত। সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি তাঁর নিরীক্ষামূলক প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়ে অন্তত এবারের মতো যে গতানুগতিক পন্থা বর্জনে বাধ্য হয়েছেন, এটাও কম আনন্দের কথা নয়। আমরা জানি, ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুক্ত সরকার একজন কৃতী কারিগর (ইঞ্জিনিয়ার) ; নাট্যকাররূপে তিনি মানব-মনের আরও সার্থক কারিগরে পরিণত হোন, উন্মোচিত করুন তার জটিল-জিজ্ঞাসা, এই আমাদের কামনা।

শিল্পী মুস্তাক আলি খাঁ প্রথম জীবনে বাঙলার বাইরে কাটালেও, বাঙলা-দেশই তাঁর সাধনার তীর্থভূমি। সুরের আহ্বানে বালক বয়েসে তিনি বেনারস থেকে পালিয়ে কলকাতা চলে আসেন। সুতরাং সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি যখন তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেন, তখন বাঙলাদেশের মানুষ সঙ্গতভাবেই উৎফুল্ল না-হয়ে পারেন না। সেনীয়া ঘরানার ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ শৈশবে তাঁর বাবার কাছে সেতার-বাদনের যে-প্রথম-পাঠ গ্রহণ করেন, আজ তা সর্বভারতীয় স্বীকৃতিলাভে ধন্য হলো।

বিশুদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীতসাধনার ক্ষেত্র যখন ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে, তখন বাঙলাদেশে খাঁ সাহেবের অবস্থান প্রকৃতপক্ষে এক আনন্দ-সংবাদ। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তিনি এক সম্মানিত শিক্ষকও বটেন। ফিল্মি গানের বিকৃত রুচি যখন বাঙলাদেশকে কলুষিত করছে, তখন যে-মুষ্টিমেয় গুণী আমাদের ভরসা - মুস্তাক আলি খাঁ তাঁদেরই একজন। আশা করি পুরস্কারধন্য এই শিল্পী আজীবন দায়িত্ববান থেকে আমাদের প্রত্যাশার মর্যাদা রাখবেন।

ধনঞ্জয় দাশ

আন্তর্জাতিক দর্শন সম্মেলন

সমসাময়িক দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন যে-বিভিন্ন ধারায় চলছে,তা লক্ষ্য করলে দুটো বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। একদিকে, বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যার মূল যে ব্যবহারিক জীবনের তাৎপর্যে নিহিত—এই বোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ; অন্যদিকে, দার্শনিক সমস্যাগুলির তাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ণ করে সেগুলির বিমূর্তবিন্যাসের প্রচেষ্টা। গত সেপ্টেম্বরে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত চতুর্দশ আন্তর্জাতিক দর্শন সম্মেলনের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে এই সত্য স্পষ্টতর হয়। পঁয়ষট্টি দেশ থেকে তিন হাজারেরও বেশি প্রতি-

নিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, নৈতিক প্রশ্ন প্রভৃতি বিষয়ের গভীরতর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ তেরটি বিভিন্ন আলোচনাচক্র এই সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন নিবন্ধগুলির মধ্যে কার্ল পপার-এর 'অন দি থিয়োরি অব দি অবজেকটিভ মাইণ্ড' নিবন্ধটি একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। পপার এই নিবন্ধে তাঁর নিজস্ব পূর্বমতের সমালোচনা করেছেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে হেগেলীয় ভাববাদের মূল বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। অস্তিবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে দু-ধরনের প্রবণতাই সম্মেলনের আলোচনায় উপস্থিত হয়েছে। মানুষের লৌকিক অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারিক জীবনেই দার্শনিক সমস্যাগুলির মূল ওতপ্রোতভাবে নিহিত—এই স্বীকৃতির সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ-সম্পর্কগুলির প্রকৃত চেহারা কি এই বোধ একদল অস্তিবাদীকে স্বভাবতই মার্কসবাদের অনেক কাছে নিয়ে এসেছে। ফরাসী অস্তিবাদী জঁ। হিপোলিৎ-এর নিবন্ধে এই প্রবণতা দেখা যায়। তাঁর নিবন্ধটির বিষয় ছিল কার্ল মার্কস-এর 'ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থ। অন্যদিকে হেইডিগার-শিষ্য হান্স জর্জ গ্যাডামার-এর বক্তব্যে অস্তিবাদী অনুশীলনের অপর প্রবণতা স্পষ্ট। এক ধরনের চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদী শূন্যতাবাদী বক্তব্য এঁর নিবন্ধে উপস্থিত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ সম্পর্কে উদাসীন থাকা আজ আর কোনো বুদ্ধিজীবীর পক্ষেই সম্ভব নয়। সম্মেলনেও এই স্বীকৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। কার্ল মার্কসের জন্মের একশত পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি এবং 'ক্যাপিট্যাল'-এর একশত বৎসর পূর্তি চতুর্দশ দর্শন-সম্মেলনকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। এই উপলক্ষে সম্মেলনে মার্কসবাদ-সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাচক্রে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে সোভিয়েত এ্যাকাডেমিশিয়ান ভি. এ. আমবার্তসুমিয়ান-এর নিবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান-এর ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলসূত্র কিভাবে সমর্থিত হচ্ছে, এই ছিল তাঁর নিবন্ধের আলোচ্যবিষয়।

আলোচনাচক্রের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধি স্রানিস্কি-পঠিত নিবন্ধটি। তাঁর নিবন্ধ বিভিন্ন মার্কসবাদী দার্শনিকের মধ্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। সম্ভবত মার্কসবাদকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু অনেকের কাছেই তাঁর বক্তব্য মার্কসবাদের অপব্যাখ্যারূপে প্রতীত হয়েছে।

গৌতম সান্যাল

ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন

বিগত ১২ই অক্টোবর থেকে ১৪ই অক্টোবর বারাণসীর সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বারাণসীতে অখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের চতুর্বিংশতিতম অধিবেশন হয়ে গেছে। স্থির হয়েছে পঞ্চবিংশতিতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐ সঙ্গে সম্মেলনে পঞ্চাশ বছর পূর্তির জন্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পুণার 'ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট'-এর উদ্যোগে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনকারী পণ্ডিতদের প্রথম সম্মেলন আহূত হয়েছিল। তারপর থেকে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রধান জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলিতে এই সম্মেলনের অধিবেশন বসেছে। সম্মেলনের প্রধান সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন ভারতের প্রায় সকল খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ। বিগত অর্ধশতাব্দীব্যাপী এই সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে কয়েক হাজার গবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত এবং আলোচিত হয়েছে। শত শত প্রবীণ এবং নবীন গবেষক এই সম্মেলনের অধিবেশনগুলির মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন। পরস্পরের কাজের আলোচনা ও সমালোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন। প্রাচ্যবিদ্যার বিভিন্ন শাখা এই সম্মেলনের চেষ্টায় নানাভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে।

বারাণসীতে ২৪তম অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী। অসুস্থতার জন্য তিনি অনুপস্থিত থাকায় সভাপতির কাজ পরিচালনা করেন কোল্হাপুরের শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এ. এন. উপাধ্যায়। ১৭টি শাখায় বিভক্ত হয়ে সম্মেলনের কাজ একটানা তিনদিন চলেছিল। এই শাখাগুলি হলো—১। বৈদিক ২। ইরাণীয় ৩। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ৪। ইসলামী চর্চা ৫। আরবী ও ফার্সী ৬। পালি ও বৌদ্ধশাস্ত্র ৭। প্রাকৃত ও জৈনশাস্ত্র ৮। ইতিহাস ৯। পুরাতত্ত্ব ১০। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ১১। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চর্চা ১২। দর্শন ও ধর্ম ১৩। ফলিত বিজ্ঞান এবং ললিতকলা ১৪। দ্রাবিড়ী চর্চা ১৫। পশ্চিম এশীয় চর্চা ১৬। পণ্ডিত পরিষৎ ১৭। স্থানীয় ইতিহাস। সব শাখা মিলিয়ে উপস্থাপিত প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল ৩২৪টি। তবে বৈদিক (৬৩) ক্লাসিকাল সংস্কৃত (৭৬) এবং দর্শন ও ধর্ম শাখায় (৫৩) যতগুলি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছিল, সেই তুলনায় অন্যান্য শাখায় উপস্থাপিত প্রবন্ধের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম ছিল। পশ্চিম এশীয় চর্চা শাখায় প্রবন্ধ ছিল ১টি, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চর্চা শাখায় ৩টি, ইরাণীয় শাখায় ৬টি এবং ইসলামী চর্চা

শাখার পাঁচ। ব্যাপারটা এমনই শোচনীয় যে সমাপ্তি ভাষণে কার্যকরী সভাপতি ডঃ উপাধ্যায় সম্মেলনের এই একদেশদর্শিতাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব শাখায় পর্যন্ত প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এমন কি, অংশগ্রহণকারী ভাষাবিজ্ঞানীদের সংখ্যাও ছিল হতাশাজনক। গুণগত মানের বিচার না করাই বোধহয় ভালো। আশা করা যায় জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মেলনের পঞ্চবিংশতিতম অধিবেশন আরো ত্রুটিমুক্ত হবে।

অনিমেষ পাল

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ঐতিহাসিক রাজনীতি

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতের ইতিহাস-জগতের অন্যতম দিকপাল বলে খ্যাত। ইতিহাসের বিকৃতি ও ধর্মান্ধ মতবাদের জন্য তিনি বিদ্বজ্জন মহলে বহুবার সমালোচিতও হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ইতিহাসবীক্ষা আমার আলোচ্য নয়। সম্প্রতি তিনি জনসংঘ দলের ইংরাজি মুখপত্র 'অর্গানাইজার'-এর 'দীপালি সংখ্যা'য় এমন কিছু লিখেছেন যা ভারতের জাতীয় সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি কল্যাণকর বিষয়গুলিকেই সমূলে উৎপাদন করার প্রয়াসী। শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি সম্মেলনের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই তাঁর এই রচনা।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী পত্রিকা 'অর্গানাইজার'-এ তিনি পূর্ববঙ্গ নিবাসী আটানব্বই লক্ষ হিন্দুর দুঃখে বিগলিত হয়ে হিন্দুস্থানের স্বর্গরাজ্যে তাদের আশ্রয় দেবার প্রচেষ্টা না করার জন্য দেশবাসীকে 'নির্বিকার' বলে ধিক্কার দিয়েছেন। নেহরু ও গান্ধীজীকেও ছেড়ে কথা বলেন নি। যাঁরা বলেন নির্যাতিত হিন্দুদের আশ্রয় দাও—ডঃ মজুমদারের কাছে তাঁরাও তিরস্কৃত। কেন? আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য স্থান ও সম্পদ কোথায় পাওয়া যাবে—একথা তো তাঁরা বলেন না। রমেশবাবু উপায় বাতলেছেন—ভারতের ন-কোটি মুসলিমকে পাকিস্তানে পাঠালেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনা-বৈঠকে এর ফয়সালা যদি হয় তো ভালো, নইলে অন্য উপায় দেখতে হবে। কি সে উপায়? স্পষ্ট করে না বললেও বোঝা যায়—তা হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নিপীড়ন, পাশবিক ব্যভিচার।

১৯৬৬ সালের গোরক্ষা আন্দোলনকারীদের ত্রিশূলের দাপটে উত্তর ভারত-ব্যাপী প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে অনেক উদারনীতিবাদী শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানসাধকের চোখ খুলে যায়। জনসংঘ এই সাম্প্রদায়িকতাবাদের নোঙরা স্রোতেই ক্ষমতাদখলের লক্ষ্যে পাড়ি জমাতে চায়। আর, আশ্চর্য হয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম ৬৭-৬৮ সাল জুড়ে রাঁচী-সুরসুন্দ-মীরাট-এলাহাবাদ-পুনা-ব্যাঙ্গালোর-নাগপুর-কলকাতা-পুমরী জুড়ে সারা ভারতব্যাপী বিস্তৃত দাঙ্গা বাধাবার ক্রমাগত জঘন্য পরিকল্পনা।

সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ত সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দাঙ্গা বাধাবার চক্রান্ত ও পরিকল্পনা যে অতি গভীর ও নিখুঁত, তা আজ ধরা পড়েছে। গান্ধীহত্যার পর কেবল সাংস্কৃতিক কাজকর্মই চালাবে বলে একদা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ মুচলেখা দিয়েছিল। এই সেদিন তাদের নেতা গোলওয়ালকর দিল্লীর উপকণ্ঠে শ্রীনগরে গৃহীত জাতীয় সংহতি রক্ষার সঙ্কল্পকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এক প্রায়-সামরিক শিবিরে স্বয়ংসেবকদের সম্মুখে ভাষণ দেবার সময় ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতের মুসলিম ও ক্রিশ্চানদের তিনি হিন্দু বনে যেতে উপদেশ দিয়েছেন। তাছাড়া নাকি তাদের ভারতীয় হবার অন্যপথ খোলা নেই। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট-বিরোধিতাও চলে। এই 'সাংস্কৃতিক' নেতার রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ যোগদান ভারতের আকাশে অশুভ সাম্প্রদায়িক মেঘেরই পূর্বাভাস। এই গোলওয়ালকরই আবার জনসংঘের 'গুরুজী'। এই 'সাংস্কৃতিক' সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও তার রাজনীতিক জঙ্গীবাহু জনসংঘের সঙ্গে এবার খোলাখুলিভাবে যোগ দিলেন 'ঐতিহাসিক' ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। সোনায় সোহাগা!

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি এত দরদের কারণ কি 'ঐতিহাসিক', না রাজনৈতিক? প্রভাস লাহিড়ী বা পুলিন দে-র মুখে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলা হয়তো শোভা পায়। রমেশবাবুর মুখে পায় কি? রমেশবাবু বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি আমার শিক্ষকেরও শিক্ষক; এজন্য তাঁকে প্রথামতো ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলতে চাই। ১৯৩৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। সেই বৃটিশ দাপটের যুগে এ-পদ তিনি কি বৃটিশ শাসক ও তাদের তল্পিবাহক প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের সমর্থনে পান নি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে থাকাকালীন তিনি কি বৃটিশ প্রভু ও মুসলিম লীগ নিয়োগ-কর্তার তাঁবেদারি করেন নি? ঢাকা থেকে ১৯৩৮ সালে তিনি

কলকাতা চলে আসেন। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে তাঁর কি কোনও ভূমিকা ছিল? এদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ১৯৪৭ সালে তাঁর সম্মুখে সাফল্যের নতুন পথ খুলে গেল। বাঙলাদেশের শুভ-ডাউসে কমিউনিস্ট-বিরোধী, আধা-সাম্প্রদায়িকতাবাদী, একদা-বিপ্লবীদের অনেকেই আসীন হলেন। বিভক্ত ভারতে তখনও সাম্প্রদায়িকতার দগদগে ক্ষত। এই পটভূমিকাতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস সঙ্কলিত করার জন্য যে-কমিটি দিল্লীতে গঠিত হলো, পশ্চিমবঙ্গের একদল কংগ্রেসী তাঁকে সেই কমিটির সভাপতি করার জন্য জোর তদ্‌বির করলেন। মৌলানা আজাদ তখন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে সভাপতিরূপে গ্রহণ করা হলো। বহু তরুণ ইতিহাস-অধ্যাপক ও গবেষকদের তিনি সহকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন—লক্ষ্য ছিল যাতে তাঁরা তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের পথটি পাকা করে গেঁথে তোলেন। স্বয়ংসেবক সংঘের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি তিনি এই সময়েই আকর্ষণ করলেন। আর, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা অতঃপর তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল।

সরকারী মর্যাদার দাক্ষিণ্যে তাঁর নাম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কমিশনেও প্রস্তাবিত হতে থাকে। 'ইউনেস্কো' কমিশনের ইতিহাস-সঙ্কলনের প্রচেষ্টার সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাবিতও হয়েছিল, পরে তা অগ্রাহ্য হয় এবং কে. এম. পানিক্করের নাম গৃহীত হয়। একদিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, অন্যদিকে হিন্দুসংস্কৃতির প্রাধান্যবাদী বোম্বাই-এর বিখ্যাত ধনাঢ্য মুন্সী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রমেশবাবুকে সম্ভবত আরও উচ্চাভিলাষী করে তোলে। এরপর বিভিন্ন সেমিনারে ও সম্মেলনে ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বীর শহীদদের সর্বজনস্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের বিরুদ্ধে তিনি বিষোদ্গার করতে থাকেন। 'ঐতিহাসিক'-এর মর্যাদা তাঁর এ-কাজে সহায়ক হয়ে ওঠে। রমেশবাবু-কৃত ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের স্বরূপ-আলোচনার নির্গলিতার্থ হলো—[ক] ভারতের সংস্কৃতি—হিন্দু-মুসলিমের সংস্কৃতির সংমিশ্রিত ফল নয়—বরং সংঘাতের ফল [খ] ভারতের মুক্তি-আন্দোলন শুরু হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীতে—মুসলিম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে [গ] ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস মুসলিমদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস।

তাঁর এই প্রতিক্রিয়াশীল অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য একদা পণ্ডিত নেহরু তাঁকে অপসারণের কথা বলেন। অপরিমিত ব্যয় ও কাজের সাফল্য-বিষয়ে

অনিয়মিত রিপোর্টের জন্যই নাকি তাঁকে চাপ দেওয়া হয়। ফলে তিনি পদত্যাগ করেন।

এর পরবর্তী ইতিহাস আরও চমৎকার। সরকার-বিরোধী রাজনীতিতে তিনি জনসংঘের নৌকায় চড়ে বসলেন। তাঁরাও তাঁকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শূন্যস্থানে বসাবার স্বপ্ন দেখলেন। ১৯৫৭ সালে জনসংঘের সমর্থনে 'নির্দলীয়' প্রার্থীরূপে বেহালা কেন্দ্র থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। বাঙলাদেশের মানুষ তাঁকে ঠিকই চিনেছিল! পশ্চিমবঙ্গে জনসংঘের প্রতিপত্তি যখন বাড়ল না, তখন 'স্বাধীন নাগরিক সংঘ' গঠন করে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবের তিনি সুযোগ নিতে চাইলেন। কিন্তু চতুর্দিকের বামপন্থী রাজনীতির জোরালো হাওয়ায় নিরুৎসাহ হলেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রসার দেখা গেল। উত্তর ভারতে জনসংঘের শক্তিবৃদ্ধিও নজরে পড়ল। এই তো সুযোগ! ডঃ মজুমদার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকের রণধ্বনিকে উচ্চে তুলে এবার বোধহয় জনসংঘের 'হিন্দুরাষ্ট্র'-র প্রদীপে ইতিহাসকে আহুতি দেবার সুযোগ পেলেন। আর তাঁর লাইন ধরে এগোচ্ছে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা।

এদিকে মধ্যবর্তী নির্বাচনও সামনে। উত্তর ভারত জুড়ে ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা দখলের জন্য জনসংঘের নর্তন-কুর্দন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। তার আভাস মিলছে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায়। সেখানে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে প্রগতিপন্থীরা জয়ী হওয়ার প্রতিহিংসায় উন্মত্ত জনসংঘ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের চেলা-চামুণ্ডারা তাদের ওপর রুদ্ররোষে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অধ্যাপকেরাও নিস্তার পেলেন না। পুলিশ দিয়ে পেটানো হলো ছাত্র-অধ্যাপকদের। এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতিও শ্রীনগরের জাতীয় সংহতির মূলে কুড়ুল মারতে বাকি রাখে নি। মধ্যবর্তী নির্বাচনের পূর্বেই হিন্দুসংস্কৃতির যে কোনো সশস্ত্র অভিযান ডক্টর মজুমদার ও গোলওয়ালকরের রণধ্বনির সঙ্গে একান্ত সঙ্গতিপূর্ণ। কটকে সম্প্রতি কি তারই 'মৃদু' বর্ষণ? উত্তর ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষও শক্তি সঞ্চয় করছে। দিল্লী-পাঞ্জাব-বারাণসীর সাম্প্রতিক ছাত্র-ঐক্যের গণতান্ত্রিক পদধ্বনি—সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পাঞ্জা লড়তে ইচ্ছুক জনগণের পদধ্বনিরই ইঙ্গিত বহন করছে।

বাঙলাদেশ ডঃ মজুমদারকে কিছুটা চেনে। কিন্তু শ্রীনগরের জাতীয় সংহতির মহিমা ঘোষণা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্কল্প গ্রহণ করার আগে এবং পরে গোলওয়ালকরজী বা রমেশবাবুদের হুঙ্কার কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের কানে পৌঁছয় না। পৌঁছলেও—দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার পক্ষে রয়েছেন যাঁরা, তাঁদের ঘাঁটাতে তাঁরা সাহস পান না। ঐতিহাসিক রমেশবাবুর কি অজ্ঞাত দেশের ইতিহাস খুব অজানা? তিনি কি জানেন না ইতিহাসই তাঁর বিপক্ষে?

শান্তিময় রায়

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের মরশুমে ছাপাখানাগুলি সম্প্রতি খুবই ব্যস্ত। 'পরিচয়'-এর নিজস্ব ছাপাখানা নেই। তাই কার্তিক সংখ্যা 'পরিচয়' আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেও যথাসময়ে প্রকাশ করতে পারিনি। এজন্য বর্ধিত আকারে কার্তিক-অগ্রহায়ণ যুগ্মসংখ্যা প্রকাশ করা হলো।

কর্মাধ্যক্ষ, 'পরিচয়'

বিয়োগপঞ্জী

আপটন সিনক্লেয়ার

সম্প্রতি মার্কিন ঔপন্যাসিক আপটন সিনক্লেয়ারের মৃত্যু ঘটেছে। পৃথিবীর দীর্ঘজীবী কথাশিল্পীদের মধ্যে তিনি অন্যতম, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স নব্বই বৎসর পার হয়ে গিয়েছিল।

১৮৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর বাল্‌টিমোর-এ আপটন সিনক্লেয়ারের জন্ম। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'জঙ্গল' (The Jungle) প্রথম তাঁকে খ্যাতি এবং পরিচিতির জগতে নিয়ে আসে। চিকাগো স্টকইয়ার্ডের কশাই-খানার ওপর ভিত্তি করে এই উপন্যাস রচিত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আহরণের জন্য তিনি দরিদ্র কশাইদের সঙ্গে দিনের পর দিন বাস করেছেন, দেখেছেন তাদের ওপরে নির্মম শোষণ, দেখেছেন দুর্নীতির স্বরূপ। 'জঙ্গল' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্য জাগে, তার বক্তব্য গিয়ে পৌঁছয় কংগ্রেসে—আমেরিকার 'পিয়োর ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাক্ট' ত্বরান্বিত হয়।

ফরাসী ন্যাচারালিজম-এর প্রভাবে আপটন সিনক্লেয়ারের সাহিত্যজীবন আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন, মার্কসীয় চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মার্কিনী রাষ্ট্র-সমাজ-শ্রমিক-সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিকে যে ক্রম-রূপান্তর ঘটছে, তারই বস্তুবাদসম্মত তীক্ষ্ণ রূপায়ণে তৎপর হন তিনি। স্বদেশে তার ফল অনুকূল হয় নি। তাঁর তীব্র-কঠিন সমালোচনা, তাঁর বিশ্লেষণ, তাঁকে 'প্রচারক' বলে চিহ্নিত করেছে—প্রথানুসারী সমালোচকেরা একালে প্রায় তাঁকে পাদটীকায় স্থান দিয়েছেন!

কিন্তু আপটন সিনক্লেয়ার স্বদেশে স্বীকৃত হোন বা না হোন—তাঁর সমাদর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটেছে। মার্কিনী সাংবাদিকতা বিশ্লেষণ করে যিনি 'ব্র্যাস চেক' (The Brass Check) লিখবেন, অথবা 'গুজ-স্টেপ' (The Goose-Step)-এ শিক্ষাপদ্ধতির বিশ্লেষণ করবেন—স্বদেশে তিনি কতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করবেন বলা শক্ত। তবু পৃথিবীর দেশে দেশে অনেক মানুষ অনুপ্রাণিত হবেন তাঁর 'ল্যানী বাড্' উপন্যাসাবলীতে। 'ওয়ার্লডস্ এণ্ড' (World's End—১৯৪০), 'ড্রাগনস্ টীথ' (Dragon's Teeth—১৯৪২)

অথবা 'এ ওয়ার্লড টু উইন' (A World to win—১৯৪৬) জীবনবাদী পাঠকের কাছে বিস্মিত স্বীকৃতি লাভ করবে। বক্তব্যের ভারে তাঁর শিল্পবৃত্তি খণ্ডিত হয়েছে কিনা—সেই বিতর্কে প্রবেশ না করেও সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক এবং প্রায় একক এই সংগ্রামী ঔপন্যাসিককে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি।

বাঙালী পাঠকের কাছে আপটন সিনক্লেয়ার 'জঙ্গল', 'অয়েল' (Oil—১৯২৭) এবং 'ড্রাগনস টীথ'-এর লেখকরূপেই 'সমধিক' পরিচিত। তাঁর 'জঙ্গল' এবং 'অয়েল' বই দুটি বাঙলাতেও অনূদিত হয়েছিল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কানাইলাল গাঙ্গুলী

এক হিসেবে কানাইলাল গাঙ্গুলী মহাশয় পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেছেন। কিন্তু বয়স হলেও তিনি ছিলেন কর্মে উৎসাহী, সাহিত্যচর্চায় নিরলস। একদিনকার তরুণ বিপ্লবী কানাই গাঙ্গুলী, তারপর 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লীগ'-এর সম্পাদক কানাই গাঙ্গুলী, এমন-কি নেহরুর সহকারী নক্ষোর 'ন্যাশনাল হেরল্ড'-এর কর্মাধ্যক্ষ এই সেদিনের কানাই গাঙ্গুলীর কথাও আজ আমাদের অনেকের কাছেই অস্পষ্ট, জনশ্রুতি। 'পরিচয়' এ আমরা তাঁকে দেখেছিলাম বাঙলা সাহিত্যের এক উৎসাহী অনুবাদক হিসেবে। জার্মান ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, আর সেই জ্ঞান তিনি সার্থক করতে পেরেছিলেন গ্যয়টের 'ফাউস্ট'-এর অনুবাদে। আরও অনেক জার্মান কবির কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছিলেন বলে জানি সেগুলি প্রকাশ করার ব্যবস্থাও বাঞ্ছনীয়। 'পরিচয়'-এর পক্ষে তাঁর বিয়োগ সুহৃদবিয়োগ। আমরা সেই বেদনায় তাঁর পরিজনদের আমাদের সমবেদনা জানাই।

গোপাল হালদার

যাত্রা-জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কার-প্রাপ্তি উপলক্ষে 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় আমরা যখন তাঁকে অভিনন্দিত করছিলাম, ঠিক সেই সময়, চৌদ্দই ডিসেম্বর, শনিবার, মধ্যরাতে 'বাঁশের কেল্লা' পালায় অভিনয় করতে করতে তিনি সংজ্ঞা হারান এবং তার অল্পক্ষণ পরেই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভবিষ্যতে ফণিভূষণ সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশের বাসনা জানিয়ে আজ আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ সহকর্মী ও গুণমুগ্ধ বন্ধুদের আমাদের সহানুভূতি জানাচ্ছি।

—সম্পাদক, 'পরিচয়'

পাঠকগোষ্ঠী

সম্পাদক,

পরিচয়

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা — ৭

প্রিয় কমরেড,

আপনাদের মে-জুন-জুলাই সংখ্যায় কমরেড চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর 'বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস' প্রবন্ধে লিখেছেন :

"তারপর ১৮৭৯ সনে প্রকাশিত 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমিউনিজম' ও 'ইণ্টারন্যাশানালের' কথা (স্পষ্টতই 'প্রথম ইণ্টারন্যাশানাল') বললেন আর প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের তিন বিখ্যাত উদ্গাতা—ওয়েন, সেণ্ট সাইমন ও ফুরিয়েরের কথা আর সেই সঙ্গে লুই ব্লাঙ্ক ও কাবেরও নাম—কিন্তু মার্কসের নয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি মূলে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু 'ইণ্টারন্যাশনাল'-এর উল্লেখ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কমরেড সেহানবীশ ঠিকই বলেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই কার্ল মার্কস-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর নেতৃত্বে চালিত 'প্রথম ইণ্টারন্যাশনাল'-এরই উল্লেখ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনষ্টিটিউটের পক্ষে 'প্রগতি প্রকাশনী', মস্কো, কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রথম ইণ্টারন্যাশানালের (১৮৭০-৭১) সাধারণ অধিবেশন'-এর 'বিবরণী'র প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই বই-এর ২৫৮ পৃষ্ঠায় সাধারণ অধিবেশনের ১৫ই আগস্ট ১৮৭১ তারিখের সভার, যেখানে অন্যান্যদের সঙ্গে এঙ্গেলস এবং মার্কস দু-জনেই উপস্থিত ছিলেন (পৃ. ২৫৭ দ্রষ্টব্য), বিবরণীতে আমরা নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পাই :

"আগের সভার বিবরণী পাঠ ও সমর্থনের পর, সম্পাদক ঘোষণা করলেন লিভারপুল এবং লিস্টারশায়ারের লংবরো-তে শাখা স্থাপিত হয়েছে। তিনি কলকাতার একটি চিঠিও পড়লেন, যাতে ভারতে একটি শাখা চালু করার ক্ষমতা দিতে বলা হয়েছে। সম্পাদককে এই নির্দেশ দেওয়া হলো যেন তিনি একটি

শাখা খোলার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লেখেন এবং পত্রলেখককে জানিয়ে দেন যে তা যেন অবশ্যই আত্মনির্ভর হয়। সম্পাদক যেন অ্যাসোসিয়েশনে ঐ দেশবাসীদের (natives) সভ্যপদভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে জোর দেন। (২১৬)

অনুচ্ছেদটির শেষে (২১৬) সংখ্যাটি হলো বই-এর শেষে টীকার উল্লেখ। পৃ. ৫৩০-এ ২১৬নং টীকায় লেখা আছে :

"দি ইস্টার্ন পোস্ট, নং ১৫১, ১৯শে আগস্ট ১৮৭১-এ প্রকাশিত এই অধিবেশনের সভার সংবাদপত্র-রিপোর্টে কলকাতা থেকে প্রাপ্ত চিঠির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে, যাতে লেখা আছে : "জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ এবং বৃটিশ সরকার পুরোপুরি অপছন্দ। করভার অত্যধিক, আর ব্যয়সাধ্য আমলাতন্ত্র বজায় রাখতেই সমস্ত আয় শেষ হয়ে যায়। যেমন অন্যান্য জায়গায় শাসকশ্রেণীর বাড়তি বাজে খরচা আর শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখ অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে বৈপরীত্য প্রকাশ করে, যে-শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমে তৈরি হচ্ছে ঐ বাজে-খরচা-চওয়া সম্পদ। 'ইন্টারন্যাশনাল'-এর নীতিসমূহ ব্যাপক জনগণকে তার সংগঠনের মধ্যে আনতে পাবে, যদি একটি শাখা চালু করা হয়।"

১৮৭১ সালে যে-চিঠি কলকাতা থেকে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল-এ গিয়েছিল, তা বাঙলাদেশের গবেষকদের কাছে—যারা তাঁদের রাজ্যে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত সম্পর্কে অনুসন্ধান করছেন—একটি সমস্যা তুলে ধরে। এমন একটি চিঠির লেখক কে হতে পারেন? একি বঙ্কিমচন্দ্রের গোষ্ঠী থেকেই গিয়েছিল?

কমরেড ধরণী গোস্বামীর সঙ্গে এই ব্যাপারে আমি কথা বলেছিলাম, তিনি বললেন, কিছু সূত্র হয়তো অভয়চরণ দাসের লেখা থেকে মিলতে পারে, যিনি কৃষকদের অবস্থা এবং তাদের সংগ্রাম সম্পর্কে এই সময়টায় বইপত্র লিখেছিলেন। আমি এই লেখকের একটা বই-এর কথাই জানি, "The Indian Ryot', কলকাতা থেকে ১৮৮১ সালে প্রকাশিত, যা থেকে আমি মীরাট-কমরেডদের সাধারণ বিবৃতির 'কৃষিসমস্যা' অধ্যায়ে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম (ঐ অংশটি আমি খসড়া করেছিলাম)। লেখক অবশ্য 'লেবার' বা 'ইন্টারন্যাশনাল' কোনোটাই ঐ বই-এ উল্লেখ করেন নি। বৃটিশ ব্যবস্থায় সৃষ্ট ধনবান জমিদাররা কী ভয়াবহভাবে কৃষককুলকে শোষণ করে, তার গভীর বিশ্লেষণ তিনি দিয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সপ্রশংস।

অভয়চরণ দাস গত শতাব্দীর সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে বাঙলাদেশের বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে :

"...জমিদার ও রায়তের বিবাদ বাঙলাদেশকে দুটি বিরাট শিবিরে বিভক্ত করে দিয়েছে, একে অপরের বিরুদ্ধে ভয়াবহ প্রতিশোধ নেবে। গুরুতর দাঙ্গা ও অশান্তি, রক্তপাত ও খুন, গ্রাম লুঠ করা ও পুড়িয়ে দেওয়া, ধান কেটে নেওয়া—এই জাতীয় অত্যাচার প্রাত্যহিক ঘটনা।" (A. C. Das, The Indian Ryot, 1881, Calcutta)

১৮৭২ সালের ঢাকা বিভাগের সাধারণ প্রশাসনিক রিপোর্টও অভয়চরণ দাস উদ্ধৃত করেছেন, যাতে "রায়তের দল" ও "ধর্মঘট"-এর কথা রয়েছে। এই প্রথম বোধহয় ভারতীয় পরিস্থিতিতে "ধর্মঘট" কথাটির ব্যবহার হয়েছে, যদিও এখানে উল্লেখের বিষয় হলো কৃষক-প্রতিরোধ। (Communists Challenge Imperialism from the Docks. পৃ. ১৫৪, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, মে ১৯৬৭ থেকে উদ্ধৃত)

আমি স্বীকার করি যে এই উদ্ধৃতিগুলি ১৮৭১-এর কলকাতার চিঠির সূত্রে কিছুই প্রমাণ করে না। কিন্তু আমি এই উদ্ধৃতিগুলি দিলাম যাতে এই লেখকের—অভয়চরণ দাস-এর—অন্যান্য বই ও লেখাপড়ার ব্যাপারে গবেষণার একটা গ্রাহ্য কারণ দেওয়া যায়। ১৮৭১ সালের সাধারণ প্রশাসনিক রিপোর্ট অথবা ঐ বিভাগের জন্য তৈরি পাক্ষিক পুলিশ রিপোর্ট—যা রাজ্য মহাফেজখানায় রয়েছে—অনুসন্ধান করলে বোধহয় লাভ হবে। বর্তমান সূত্রের তলদেশ পর্যন্ত যাওয়ার এবং প্রথম ইণ্টারন্যাশনাল-এর উদ্দেশে লেখা পত্রটির লেখককে নিয়ে যে রহস্য তা সমাধান করার পথ বা মাধ্যম সম্পর্কে বাঙলার গবেষণারত কর্মীদের পরামর্শ দেওয়া অবশ্য আমার কথা নয়। অভিনন্দনসহ

ভবদীয়

গঙ্গাধর অধিকারী

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

কেন্দ্রীয় দপ্তর

আসফ আলি রোড, নয়াদিল্লী-১

অনুবাদক : রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

লেখকের কথা

১৮৭১ সনে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর কাছে লেখা ঐ চিঠিটির লেখক যে কে, তার সন্ধান এখনো আমরা পাইনি। তবে 'আন্তর্জাতিক'-এর প্রস্তাবিত কলিকাতা শাখায় 'native'-দের সভাপদভুক্ত করার নির্দেশ থেকে মনে হয় যে পত্রলেখক হয় তো অভারতীয়—সম্ভবত ইংরেজ ছিলেন। অবশ্য এটা আমার অনুমান মাত্র।

প্রসঙ্গত ডঃ অধিকারী উপরে যে 'ইস্টার্ন পোস্ট' পত্রিকার উল্লেখ করেছেন, তাতে ১৮৭১ সনের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে এই বিবরণীটি প্রকাশিত হয়:

"The General Council of the International Working Men's Association held its usual weekly meeting on Tuesday evening last, at the Council-rooms, 256 High Holborn, W. C. Dr. Marx in the chair.

"A mass of correspondence was received from all parts of the world. In a letter from India an account was given of the interest created by the International. It was felt that its introduction into that country would be the commencement of a new era. It would effect a greater revolution than anything which had preceded it. The International was an association exactly in accordance with the aspirations of the working class of India. It would weld the rival races and sects into one homogeneous whole and would help the workers to gain their rights—political and social. Capital, the real juggernaut which crushes down labour, would no longer be allowed to use up human energy like so much fuel, but would be brought under the control of the workers themselves...."

'ইস্টার্ন পোস্ট'-এর দুটি সংখ্যার তারিখ এত কাছাকাছি যে মনে হয় খুব সম্ভবত দুটি বিবরণে একই চিঠির উল্লেখ করা হয়েছে। তবে চিঠি একটি হলেও তাই নিয়ে যে 'আন্তর্জাতিক'-এর দুটি সভা হয়েছিল ও তার দ্বিতীয়টিতে যে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং মার্কস—এ-কথাও এর থেকে প্রমাণ হয়। আর দ্বিতীয় বিবরণীটির ভাষা ও বিশ্লেষণে মার্কসের প্রভাবও যেন কিছুটা রয়েছে মনে হয়।

চিন্মোহন সেহানবীশ
২৫।১১।৬৮

সূচিপত্র

পরিচয়
বর্ষ ৩৮। সংখ্যা ৬
পৌষ। ১৩৭৫

প্রবন্ধ :

এস. ওয়াজেদ আলী এবং ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। গুরুদাস ভট্টাচার্য ৬৪৫ ॥ একচেটিয়া পুঁজি ও ভারতবর্ষ। রণেন নাগ ৬৫১ ॥ শিক্ষা বিপ্লবের দায়। শ্যামল চক্রবর্তী ৬৬৩ ॥

গল্প :

মিটিংয়ের পথে। সুজিত মুখোপাধ্যায় ৬৭৫ ॥ প্রথমভাগ থেকে কয়েকটি গল্প। উলফগাং বোরকার্ট (অনুবাদ : গৌতম চট্টোপাধ্যায়) ৬৮০ ॥

কবিতা :

অসীমকৃষ্ণ দত্ত ৬৮৫। রমেন আচার্য ৬৮৫। শিশির সামন্ত ৬৮৬। বিপ্লব মাজী ৬৮৭। অভিজিৎ সেনগুপ্ত ৬৮৮। তরুণ সেন ৬৯০। অঞ্জন কর ৬৯০। বিশ্বজিৎ সেন ৬৯১। সালভাতোর কোয়াসিমোদো (অনুবাদ : সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) ৬৯২ :

পুস্তক পরিচয় :

সুনীল সেন ৭০৪। চিত্ত ভট্টাচার্য ৭০৫। কপিল ভট্টাচার্য ৭০৮। অমিতাভ দাশগুপ্ত ৭০৯ ॥

পত্রিকা প্রসঙ্গ :

তরুণ সান্যাল ৭১২

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ :

শঙ্কর চক্রবর্তী ৭১৬। দিলীপ বসু ৭২১

চিত্র প্রসঙ্গ :

চিত্রামোদী—৭২৬

নাট্য প্রসঙ্গ :

স্বর্ণেন্দু রায় চৌধুরী ৭৩০। অর্জুন মিত্র-৭৩২

বিবিধ প্রসঙ্গ :

টি, এন, সিদ্ধান্ত ৭৩৪। শুভব্রত রায় ৭৩৬। শান্তিময় রায় ৭৪২। কল্যাণ দত্ত ৭৪৬। তরুণ সান্যাল ৭৫২

বিয়োগ পঞ্জী :

অমল দাশগুপ্ত ৭৫৭

পাঠকগোষ্ঠী :

অমল দাশগুপ্ত ৭৫৯

সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদপট : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

এস. ওয়াজেদ আলী এবং ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

গুরুদাস ভট্টাচার্য

'রাজসিংহ'-র উপসংহারে 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন: "কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের কোনপ্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল-মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে।"

মহাকাব্য 'মহাশ্মশান'-এর ভূমিকায় কবি কায়কোবাদ লিখেছিলেন: "হিন্দু মুসলমান উভয়েই একটি চরম আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত এবং উভয়েই বীর এবং ধর্মপ্রাণ। হিন্দুকে দুর্বল করিয়া অঙ্কিত করিলে শক্তিমান মুসলমানের গৌরবের কোন কারণ হইত না, কেননা, শৃগালের সঙ্গে যুদ্ধে সিংহের কোন গৌরব নাই। তাই উভয়কেই সমশক্তিমান বলিয়া অঙ্কন করিতে হইবে। হিন্দুও বীর, মুসলমানও বীর।"

দুই প্রান্তের দুই সাহিত্যিকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একটা ছবি, একই ছবি ফুটে উঠেছে: হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ—একদিকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান; অন্যদিকে, ব্যবধান পেরিয়ে মিলনের অন্তত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটা আকাঙ্ক্ষা। ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাতে নানা বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ কার্যকারণে এই বিচিত্র সম্বন্ধের সূত্রপাত এবং আজও তা সমবিদ্যমান।

অন্যপক্ষে, উক্তি দুটির মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্যও লক্ষ্যগোচর হয়। বঙ্কিমের আত্ম-নিবেদনের মধ্যে কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে আত্মপক্ষ-সমর্থনের একটা তীব্র চেষ্টা স্পষ্ট। কিন্তু কায়কোবাদের আত্ম-নিবেদনে এ-জাতীয় কোনো কমপ্লেক্স নেই; তাঁর বক্তব্য সহজ স্বচ্ছ ও দ্বিধাহীন। তার কারণ —বাংলা-সাহিত্য-পাঠক মাত্রেই জানেন—হিন্দুর বাহুবল প্রদর্শনের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' লিখেছিলেন, এবং তাঁর পরিণত জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি ছিল: গোঁড়া হিন্দুয়ানী।

বস্তুত, তিনি একা নন। ঊনবিংশ শতকে বাঙালির যে তথাকথিত পুনরুজ্জীবন, তার অন্তঃপ্রেরণাই ছিল 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ'। এই জাতীয়-মানসিকতায় কতটা বিদেশী শাসকের অবদান, কতটা স্বদেশীদের স্বগত, তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে: বিগত শতকের অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবী সচেতন সংস্কারবশত অথবা অচেতন অসতর্কতায় দ্বিজাতিতত্ত্বাত্মিক এই ফাঁদে পা দিয়েছেন এবং তার অনিবার্য ফল ক্রমবিকশিত হয়ে আমাদের সমকালীন পট ও ভূমিকে জটিল করে তুলেছে।

সিদ্ধান্তটি অনেকের কাছে 'রূঢ়' মনে হতে পারে। অতএব, কিছু তথ্য হাজির করা দরকার।

ভারতীয় তথা বাঙালি-সংস্কৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সমবায়িক কর্মতৎপরতায় ও বহুমুখী মানস-ভাবনার মিশ্র ফসল। এই ফসল ফলানোর কাজে সবচেয়ে বড়ো শরিক হিন্দু ও মুসলমান সমাজ। সাহিত্যে উভয়েরই অবদান স্মরণীয়। কিন্তু প্রচলিত বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে তা জানবার বোঝবার কোনো উপায় নেই। 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' নামে একটি উপাধ্যায় বা বড় জোর পুস্তিকা রচনা করেই পণ্ডিত-ঐতিহাসিক কর্তব্য সমাপন করেছেন, ইতিহাসের গভীরে যাবার চেষ্টামাত্রও করেন নি।

ঊনবিংশ শতকে বাঙালির জীবনে ও মানসে যে নব-চেতনার জোয়ার, তার মধ্যে 'হিন্দু জাগরণ'ই প্রধান, সমগ্র দেশ ও দেশবাসীর স্থান সেখানে নেই। নানা কার্যকারণে, তৎকালীন মুসলিম সমাজও নব্যশিক্ষার সমজাতীয় সদ্ব্যবহার করে নি বা করতে পারে নি। কিন্তু যত ছোট আকারে এবং যত বিলম্বেই হোক, আন্দোলনের দোলায় ক্রমশ 'মুসলিম-জাগরণ'ও ঘটেছিল। দুটো স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারা, তবু পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, এবং উভয়ের সামান্য লক্ষণও বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র ও কায়কোবাদের উদ্ধৃত উক্তি দুটির মধ্যেই এই দ্বান্দ্বিক ঐক্যসূত্রটি স্পষ্টত ধরা পড়ে।

এ-ইতিহাস মুসলমান বুদ্ধিজীবী ভোলেন নি। তার প্রমাণ আছে পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাহিত্য-আন্দোলনের মধ্যে, যেখানে প্রাক্-পাকিস্তানী বাঙলা সাহিত্যকেও ঐতিহ্যের সামিল করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ-ইতিহাসের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন হিন্দু বুদ্ধিজীবী; সমসাময়িক তথ্যকেও ছেঁটে বাদ দিতে তাঁদের বিবেকে এতটুকু বাজে নি।

বিভাগপূর্ববঙ্গদেশ ছিল মুসলিম প্রধান। কিন্তু নানামুখী অগ্রগতির জন্যে প্রথমাবধি স্থানীয় সংস্কৃতির কর্ণধার : শিক্ষিত হিন্দু। ফল : আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসূচীতে মুসলমান সাহিত্যিকের রচনাবলী বেহদ্দ অবহেলিত। পরাধীন ভারতে যেটুকুওবা ছিল, স্বাধীনতার পর তাও বিলুপ্ত। মুসলমান ছেলে-মেয়েরা বৈষ্ণব শাক্তপদ পড়ে; কিন্তু হিন্দু ছেলে-মেয়েরা 'নবীবংশ' 'কাসেম বধ কাব্য' বা 'হজরত মোহম্মদ কাব্য' পড়ে না। গৌড়ীয় সংস্কৃতির সমগ্র রূপ কেউই জানতে পারে না — না হিন্দু, না মুসলমান (এবং অন্য সম্প্রদায়ও)। যেসব অভিধানে বা কোষে বাঙলা সাহিত্যের রেফারেনস আছে, সেগুলি পড়ে বোঝবার উপায় নেই যে, এদেশে এক বিপুল 'মুসলিম সাহিত্য'ও দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে, এবং কাজী নজরুল ইসলাম 'আকস্মিকের ফসল' নন।

মাইকেল মধুসূদন ভাট্ সুলতানা রিজিয়াকে নিয়ে নাটক লিখতে চেয়েছেন বারবার; প্রতিবারই তাঁকে দমিয়ে দিয়েছেন বাঙলা নাট্যাভিনয়ের সুখ্যাত হিন্দু প্রযোজকগণ। মধুসূদন উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন মোহররমের করুণ বিষণ্ণতায়। তিনি এর অন্তরে দেখেছিলেন মহাকাব্যের শৈল্পিক সম্ভাবনা। সার্থক মহাকাব্য হয়তো হয় নি; কিন্তু এই অতলান্ত ট্র্যাজেডিকে নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে বাঙলা কাব্যের ঐতিহ্য করে তুলেছেন একাধিক লেখক। মোহাম্মদ খানের 'মকতুল হোসেন', মোহাম্মদ এয়াকুবের 'জঙ্গনামা', মুন্সী জনাব আলীর 'শহীদে কারবালা', সেরবাজের 'সখিনা বিলাপ', শেখ মনসুরের 'আমীর জঙ্গ', হায়াত মামুদের 'মোহররম পর্ব', দুর্গাভিয়া সরকারের 'এমাম যাত্রা নাটক', ছেকেন আলীর 'এমাম বধ নাটক', কায়কোবাদের 'মহরম শরীফ', এবং গোলাম মোস্তাফা, ফররুখ আহমদ প্রভৃতির রচনা প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের জবরদস্ত হিন্দু ঐতিহাসিক এইসব লেখক ও রচনার কথা বলেন না। কেউবা কৃপাবশত নামোল্লেখ করেই পরমুহূর্তে কলম তুলে নেন। ঐতিহাসিক কয়েকটি অনুগ্রহ-পঙক্তি বরাদ্দ করেন 'বিষাদ-সিন্ধু'র স্রষ্টা মীর মশাররফ হোসেনের জন্যে, যাঁর "রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না" বলে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র রায় দিয়েছিলেন; অনেক লেখার ভিড়ে উল্লেখমাত্র করেন এঁর 'জমীদার-দর্পণ'-এর, যে-নাটকে তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের প্রতিলিপি বাস্তব থেকে তুলে-আনা

এবং কলত শাসক-শোষকের নিরন্তর পীড়াদায়ক। ঐতিহাসিক বিদ্বৃত পরিচয় দেন না শক্তিমান কবি কায়কোবাদের, যিনি মধুসূদনীয় আখ্যান-কাব্যধারার শেষ সার্থক প্রতিনিধি ; অগ্রাহ্য করেন 'মোসলেম ভারত'-এর মতো উচ্চচিত্ত পত্রিকার সম্পাদক মোজাম্মেল হককে, লোকসাহিত্য ও পুঁথির একনিষ্ঠ সঙ্কলক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে। খবর রাখেন না, যে, শাহাদৎ হোসেন নামে এক কবি ঘোষণা করেছিলেন : "মাইকেলের দুন্দুভিনাদে প্রতিধ্বনিত বাঙলার মধ্যগগনে তখন রবীন্দ্রনাথ ভাস্বরকিরণে প্রোজ্জ্বল আর তার চারপাশ ঘিরে জ্যোতিষ্মান গ্রহগণের অপূর্বসুন্দর সমাবেশ। কাজেই সে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে কাব্যের অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।"

দৃষ্টান্ত আর বাড়াব না। বাঙলা সাহিত্য একা হিন্দুর নয়, এবং বাঙলা ভাষাও একা হিন্দুর নয়—একথা যে হিন্দু লেখকরা বোঝেন না, তা নয়। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় তাঁরা "লিখিবার সময় অন্যরূপ করিয়া ফেলেন।" ভ্রান্তিটা কেউ কেউ স্মরণও করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বহু লেখকের বধির কানে তা প্রবেশ করে নি। তাই 'ঐতিহাসিক' লিখছেন 'হিন্দু সাহিত্যের ইতিহাস', নাম দিচ্ছেন 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস।' অথচ হিঁদুয়ানীটাই যে বাঙালিয়ানা নয়—এই প্রাথমিক ইতিহাসজ্ঞানও তাঁর নেই। বস্তুবাদী ইতিহাসবিদ বলে যাঁদের খ্যাতি, তাঁরাও, ত্রুটি স্বীকার করেও, নতুন করে মাটি ঘাঁচড়ানোর প্রয়োজন বা উৎসাহ বোধ করেন নি।

ফল : পাশাপাশি থেকেও চির-অপরিচয়, ব্যবধান, অনাত্মীয়তা। একপক্ষে উন্নাসিকতা, অন্যপক্ষে হীনমন্যতা। ফল : পারস্পরিক সন্দেহ-ভ্রান্তি-বিরোধ।

১৮৭৩ সালে লেখা 'বসন্তকুমারী' নাটকের প্রস্তাবনায় এই ছবিটা চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে :

নটী। বসন্তকুমারী ? কার রচিত ?

নট। কুষ্টিয়া-নিবাসী মীর মশাররফ হোসেন রচিত।

নটী। ছি! ছি! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোচ্ছেন ?

নট। কেন ? মুসলমান হলে কি একেবারে অপদস্ত হলো ?

নটী। তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয় ? হাজার হোক মুসলমান !

নষ্ট। এমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্বনেশে কথাতেই
ভারতের সর্বনাশ হচ্ছে।

চুরানব্বুই-বছর আগে যাঁর যশোহরক হোসেন অভ্রান্তভাবে রোগ-নির্ণয় করেছিলেন এবং অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে সত্য কথাটি উচ্চারণ করে শেকড়-শুদ্ধ টান দিয়েছিলেন। আজ, প্রায় একশো বছর পরে, এই সঙ্কীর্ণ মানসকূট থেকে হিন্দু জনসাধারণ তো বটেই, অভিজাত বুদ্ধিজীবীরাও মুক্ত হতে পারেন নি। এবং নাট্যকার যে ভয় করেছিলেন, সেই "সর্বনাশ"কে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি। এই "সর্বনাশ" শুধু দেশ-বিভাগে নয়, তার পরেও নিরন্তর ঘটে চলেছে। পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'সরকারী' ব্যাঘাত ঘটলে এদেশের কণ্ঠে আর্ত গর্জন বেজে ওঠে ; অথচ এদেশেরই ঐতিহাসিক মুসলমান সাহিত্যকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিয়েছেন 'বেসরকারী'ভাবে—তার জন্যে একটা কণ্ঠেও প্রতিবাদ শোনা যায় না। নবজাগ্রত পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের কাছে এবিষয়ে আমাদের অনেক-কিছু শেখার আছে।

এস. ওয়াজেদ আলী প্রসঙ্গে এই ভূমিকাটির প্রয়োজন ছিল। তার প্রথম কারণ: বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙালি সংস্কৃতিতে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। দ্বিতীয় কারণ: বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ওয়াজেদ আলীও সমভাবে অবহেলিত। তৃতীয় কারণ: বঙ্গসংস্কৃতির সদ্য-কথিত আত্মবিচ্ছেদ-সমস্যাটি তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন—যাকে তিনি বলেছেন "শ্মশান-মানসিকতা"—এবং সমাধানের পন্থা নির্দেশের চেষ্টা করেছেন, যে চেষ্টার চিহ্ন 'অগ্রণী প্রগতিশীল বাস্তবসচেতন' হিন্দু সাহিত্যিকদের লেখনীমুখে আজ দুর্লভ-দর্শন। স্মরণীয়: ভারতীয় ট্র্যাডিশনের একটা বড় ধারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এস. ওয়াজেদ আলীর দিব্যদৃষ্টির সামনে: কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-ভিত্তিক সেই সুপরিচিত ও জনপ্রিয় প্রবন্ধে, যার নাম 'ভারতবর্ষ' যার ইংরেজী অনুবাদ তিনি করেছেন 'এ ভিসন অফ ইণ্ডিয়া'।

এস. ওয়াজেদ আলী মুসলমান। ইসলাম ধর্মে ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবিচল আস্থা। স্বসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রশ্নহীন। কিন্তু তবু, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। ক্ষেত্রে

নিষ্ঠাবান হয়েও তাঁর বুদ্ধি দিগন্তপ্রসারী বৃত্তে। এক আশ্চর্য "বৈপরীত্যের সমন্বয়"।

তার কারণ: তাঁর শিক্ষাজীবনের আরম্ভ মক্তবে ও পাঠশালায়, উভয়ত। পরিণতি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে, শেষ ইংলণ্ডে। তাঁর রচনাবলী থেকে যেকোনো পাঠক উপলব্ধি করবেন: ওয়াজেদ আলী মুসলমান, বাঙালি, ভারতবাসী, বিশ্বমানবতার শরিক একই সময়ে, এক সঙ্গে। তাঁর ধ্যানের পৃথিবীতে বিশ্ব-মুসলিম-জাহান ও বিশ্বভ্রাতৃসমাজ, দুই আইডিয়া সহোদর; একটিকে যখন স্মরণ করেন, অন্যটিকে তখন ভোলেন না।

বিরোধ যে ঘটে না, তা নয়। কিন্তু তাঁর সম্ভাবিত রাষ্ট্র ও সমাজ-চিন্তায় সামবায়িক ফেডারেশনের যে আইডিয়া সতত বিদ্যমান ছিল, তার কাঠামোয় সমস্ত বিরোধের অবসান, সকল বিপ্রতীপের বেকসুর সহাবস্থান। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের মানসলোকের যাত্রী তিনি। তাঁর কাছে "রবীন্দ্রনাথ হলেন কবি-দার্শনিক, আর ইকবাল হলেন দার্শনিক-কবি"। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন প্রধানত সৃষ্টি-প্রসঙ্গে। এবং "জাত-দার্শনিক" ইকবালের মধ্যে তিনি দেখেছেন "হিন্দু-মোসলেম সম্মিলিত এক জাতির সৃষ্টির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ"। তাঁর মতে, "মানবপ্রেমই ইকবালকে ধর্মের পথে নিয়ে গিয়েছিল···ইসলামের পথে নিয়ে গিয়েছিল: মোসলেম হ্যায় সারা জাহাঁ হমহম ওতান হমারা—আমরা হচ্ছি মোসলেম, সমস্ত বিশ্ববাসী হচ্ছে আমাদের স্বদেশী" (ইকবালের পয়গাম)। জাতীয়তার মধ্যেও আন্তর্জাতিকতা—এই শিক্ষা তিনি পেয়েছেন (রবীন্দ্রনাথ এবং) ইকবালের কাছে। তবু, ঐসলামিক পুনরুজ্জীবনের যে বিন্দু থেকে পাকিস্তানের জন্ম, ওয়াজেদ আলী সেই বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করেন নি। তাঁর ঝোঁক জাতীয়তা-ভিত্তিক সমবায় রাষ্ট্রের অভিমুখে, ধর্মীয় রাষ্ট্রের অনুগমনে নয়। স্বদেশ বাঙলা এবং স্বগত ব্যক্তিত্বই তাঁর এই স্বতন্ত্র-ভাবনার উৎস। 'পশ্চিম ভারতে' ভ্রমণ করতে করতে ইসলামী শিল্প-ঐশ্বর্য দেখে তিনি গর্বিত হন, হিন্দু স্থাপত্যও সমভাবে উপভোগ করেন, ঠিক যেমন ফারসী সাহিত্যের সঙ্গে উপভোগ করেন ইয়োরোপীয় সাহিত্য। খুশী হয়েই লেখেন: "বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বের আনন্দের স্রোতে, সৌন্দর্যের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াই হল আমার ধর্ম"। এ হলো শিল্পীর মনের কথা। বস্তুবুদ্ধি বলে: "সৌভ্রাত্রি

যে কত বড় পাপ আর ধর্মের নামে কত রকমের যে হয়ে থাকে, এখানে এসে তা বুঝতে পারলুম" (ঐ)।

কেবলমাত্র শিল্প নিদর্শন নয়, ধর্ম-প্রসঙ্গেও ওয়াজেদ আলীর সমবুদ্ধি। বিকানীরে এক বক্তৃতায় বললেন : "আমি মুসলমান, মহানবী মোহম্মদের আদর্শ এবং মতবাদের অনুসরণ করি, আর তাই নিয়েই আমি সন্তুষ্ট। তবে জৈন মতবাদকেও আমি সমান এবং শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। বিশ্বে আমাদের মতবাদের যেমন প্রয়োজন আছে, তাঁদের মতবাদেরও তেমনি প্রয়োজন আছে। আমরা যেমন সত্যের বিশেষ একটি অংশের দিকে মানুষকে আহ্বান করি, তাঁরাও তেমনি সত্যের অন্য একটি অংশের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমাদের মধ্যে বিরোধ তো থাকতেই পারে না, থাকা উচিত ঐক্য এবং বন্ধুত্ব।" অন্যত্র : "ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হবে, ধর্মের ব্যাপারে লোকের পরমতসহিষ্ণুতা বাড়বে, বর্তমানের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের মনে আগ্রহ এবং প্রেরণা আসবে, আর এসবের ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবন মঙ্গলের পথে অগ্রসর হবে" (ঐ)।

বাক্যগুলি ওয়াজেদ আলীর স্বচ্ছ চিন্তা, বাস্তব দৃষ্টি এবং মানবিকতা-বোধের অব্যবহিত নিদর্শন। এবং তাঁর এই ধ্যানের ভারতের রাষ্ট্রগুরু—না, মহম্মদ ইকবাল নন, বাদশা আলমগীরও নন—সম্রাট আকবর : "আমি আকবরকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি।"

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। ব্যক্তিগতভাবে আমি ধর্ম-দেবতা-পূজাসাধনা, এসবে আদৌ বিশ্বাস করি না, এতদ্বারা জগতের কোনো উন্নতি হবে বলেও মনে করি না; আমি জানি মিথ্যা দিয়ে সত্যের সৌধ গড়া যায় না। তবু, তাঁর ধর্ম-বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি উদ্ধৃত করছি, নিরপেক্ষতা বজায় রেখে—প্রসঙ্গত, এ প্রবন্ধ ওয়াজেদ আলীর ভাবনার সমালোচনা নয়, একটা সার্বিক পরিচায়িকা মাত্র—ওয়াজেদ আলীর সমন্বয়ধর্মী মানসিকতার ছবিটা ফুটিয়ে তুলতে। যেমন এই উক্তিটি : মোকরেবার ছাদে উঠে "এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম—মোকরেবার ফাটলের উপর গাঁথা আছে মুসলমানের মিনার, খৃষ্টানের ক্রস আর হিন্দুর মন্দিরচূড়া। ভক্তিগদগদ অন্তরে আমি বাদশার অশরীরী পদপ্রান্ত চুম্বন করলুম আর তাঁর অতুলনীয় উদারতার এবং মহত্ত্বের প্রভাব যাতে আমার অন্তরে, আমার রচনায়, আমার

চাচ্ছে, আমার সাধনায় দেখা দেবে, তার জন্ত তাঁর কাছে আশীর্বাদ এবং সাহায্য ভিক্ষা করলুম।"

আনন্দ, সৌন্দর্যবোধ, তার চেয়েও বেশি—দেশহিত। আকবর-শিষ্য ওয়াজেদ আলী তাই একদিকে লিখেছেন 'আকবরের রাষ্ট্রসাধনা', অন্তদিকে 'ভবিষ্যতের বাঙালী'। এক যুগের কল্যাণব্রতকে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছেন যুগ-যুগান্তরে, সমকালে ও ভবিষ্যতের বাঙলায়।

এই মানসপটেই রূপায়িত হয়েছে তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রবিষয়ক রচনাবলী, হিন্দু-মুসলিম-সম্বন্ধের জাতকপত্র।

রেনান বলেছিলেন: "নেশন বা জাতি হচ্ছে একটা আত্মিক শক্তি। এই আত্মার মধ্যে দুটি জিনিস থাকা দরকার: একটি অতীত সম্পর্কীয় ও আর-একটি বর্তমান সম্পর্কীয়। অতীত গৌরবের সৌধ-স্মৃতি। বর্তমানের যৌথ-সঙ্কল্প—জাতির সৃষ্টির জন্ত অপরিহার্য।"

জাতীয়তাবাদের এই বিশিষ্ট সংজ্ঞায় স্থিত হয়ে জনাব আলী আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যায়ন করেছেন তাঁর ছোট্ট ডায়রী 'আলিগড় মেমারিজ'-এ। তিনি বিশ্বাস করেন, আধুনিক বিশ্বে সম্প্রদায়-চিহ্নিত বিদ্যালয় অবাঞ্ছনীয়। তবু মনে করেন: "বর্তমান বিপর্যস্ত ভারতে, বিশেষত আমাদের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে, এ জাতীয় বিদ্যালয় আশীর্বাদ স্বরূপ।" তার কারণ, তাঁর মতে, স্বজাতিক সংস্কৃতির আবহে ছেলেমেয়েরা স্বভাবে চালিত এবং স্বজাতিপ্রেমিক হয়ে ওঠে, স্বগত সংস্কৃতিকে জানে, চেনে, ভালোবাসে; এবং একমাত্র তখনই পর-সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। বিভিন্ন মতের শিক্ষাধারা যুগোপযোগী নয়, সেখানে ঐক্যবিধানের প্রয়োজন আছে। আবার, যে-দেশ বহু-সংস্কৃতিজীবী, সেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতির স্ব-তন্ত্র ও স্বকীয় শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য। তাই, রবীন্দ্রনাথও, স্বজাতীয়তার মাধ্যমে সর্বজাতীয়তায় উত্তরণের কথা বারংবার উচ্চারণ করেছেন। এবং তাঁর মতো জনাব আলীও নিছক অতীতে মুগ্ধ নন, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অভিমুখীও। তাই, রেনান-সূত্রের আলো ফেলে তিনি দেখেন: "এদেশে অতীত বিষয়ক সামবায়িক স্মৃতিও নাই। আর ভবিষ্যৎ বিষয়ক সামবায়িক সঙ্কল্পও নাই। আমরা তোতাপাখির মতই জাতীয়তার বুলি আউড়ে গেছি মাত্র, এ আদর্শকে

অন্তরে স্থান দিতে শিখি নি ; আর, পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ আদর্শ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।" এই মন্তব্য কতদূর সত্য, অসাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ জাতিকে কোথায় নামিয়ে আনতে পারে, তার কতবিক্ষত প্রমাণ সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনৈতিক আবর্তেই প্রতিনিয়ত বিকশিত হয়ে উঠছে।

ওপরের উদ্ধৃতিটি আলিসাহেব লিখিত 'ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞান' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত।

আজ থেকে ৬৩৬ বছর আগে টিউনিসের এক বিখ্যাত বংশে ইবনে খালদুনের জন্ম। দীর্ঘ গবেষণার পর ৪৫ বছর বয়সে তিনি সমাজবিজ্ঞান গ্রন্থটি শেষ করেন। 'বিজ্ঞান' বলার অর্থ—এটি যাবতীয় অতিশয়োক্তি, অলৌকিকতা, কুসংস্কার বর্জিত (তাঁর ভাষায়), "পরিণত ও সুশৃংখল পদ্ধতিতে ইতিহাসের পর্যালোচনা।" ইবনে খালদুনের সমাজবিচার আধুনিক কালের মতোই তথ্যনিষ্ঠ, বিজ্ঞানসম্মত, নির্মোহ ও নিরপেক্ষ, দার্শনিক বো-এর ভাষায়, "তিনি সমাজের বিবর্তন ও প্রগতিকে কার্যকারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন।" তাঁর অন্যতম মৌলিক সূত্র: "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে অতীতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত।" বস্তুত, ইবনে খালদুনই সম্ভবত আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের প্রথম রূপকার।

ওয়াজেদ আলীর সমাজবিশ্লেষণেও এই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যারীতি আজও লক্ষণীয়। নির্বিচার আবেগ ইতিহাসবুদ্ধি ও সংস্কারবোধকে কিভাবে বিভ্রান্ত করছে, তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেই তিনি ইবনে খালদুনকে বাঙালি পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করাতে চেয়েছেন। এবং তদ্দ্বারা শুধু নিজ বক্তব্যকে নয়, প্রচলিত জাতীয়তার আদর্শকেও চরিত্রবান ও শাণিত করতে চেয়েছেন। দেশ-বিভাগের পর এই আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হয়েছে, যখন তাঁর সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রভাবনাকে প্রচণ্ড আহত করে ভারতীয় জাতীয়তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল—"আর তার অনিবার্য ফলস্বরূপ এদেশে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র এসে দেখা দিল—হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান" ('ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞান')। গ্রন্থটি ১৯৪৭ সাল নাগাদ 'সওগাত'-এ ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত, এবং ৪৯-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'ইসলামের ইতিহাস', বলা বাহুল্য, স্কুলপাঠ্য পুস্তক। তবু উল্লেখযোগ্য। যেহেতু, এখানেও জনাব আলীর স্বচ্ছ মুক্ত মনের পরিচয় বিদ্যমান। যেহেতু,

এ-বই ইতিহাস মাত্র নয়। ইসলাম সম্বন্ধে, শুধু হিন্দু নয়, সাধারণ মুসলমানেরও মনে বেশ কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা আছে; লেখক অতি যত্নে, অতি সাবধানে, এমন কি পাঠক-পাঠিকার অগোচরে সেইসব ভুলের কাঁটা তুলে নেবার চেষ্টা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে সফলতার একমাত্র উপায়—আবেগ বা মোহ বা অহংকার নয়—তথ্যনিষ্ঠা, সংযম, বিজ্ঞানদৃষ্টি। জনাব আনীর লেখনীমুখে এই তিন উপায়ই সহজাত। অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগ পেরিয়ে আরব জাতি ইসলামের আলোয় কেমন করে সভ্য হলো, তার যথাযথ বর্ণনা দিয়ে আরব জাতিকে তিনি স্থাপন করেছেন তার ভৌগোলিক পটভূমিকায়: "আরব দেশ তিনটি মহাদেশের সংগম স্থলে অবস্থিত। প্রকৃতি যেন এই দেশটিকে ভাব এবং চিন্তার মিলনক্ষেত্ররূপেই প্রস্তুত করিয়াছে। কোরাণ শরীফে বারংবার বলা হইয়াছে, **"তোমরা হইতেছ মধ্যমপন্থী, মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছ এবং তোমাদের কাজ হইতেছে সত্যের প্রচার এবং অসত্যের প্রতিরোধ।"** (বড় হরফ ইতিহাস-লেখকের)

এছাড়া, ইসলাম সংস্কৃতির মৌল স্বরূপ প্রদর্শনের জন্যে তিনি খলিফাদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাঁদের কিছু মূল্যবান সংলাপও উদ্ধৃত করেছেন। যথা: "কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। কখনও সৎপথ হইতে বিচলিত হইবে না। কোন শিশুকে অথবা বৃদ্ধলোককে কিংবা স্ত্রীলোককে হত্যা করিবে না। যে বৃক্ষে মানুষ কিংবা পশুর খাদ্য জন্মায়, সেইরূপ বৃক্ষের কোন ক্ষতি করিবে না। পশুর দলকে আহারের জন্য ছাড়া নষ্ট করিবে না। মঠচারী সন্ন্যাসীদের কোনরূপে উৎপীড়িত করিবে না—যদি তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধতা না করে" (খলিফা আবুবকর)। "এই লুণ্ঠিত ধনসম্পদের মধ্যেই আমি আমার জাতির পতনের সূচনা দেখিতে পাইতেছি" (খলিফা ওমর)। "আমি যদি গীর্জার মধ্যে নামাজ পড়ি, পরে হয়তো মুসলমানেরা এখানে জোর করিয়া নামাজ পড়িবে" (ঐ)। এই হযরত ওমরের আদর্শেই গড়ে উঠেছিল মুসলিম সাধারণতন্ত্রের রূপ; এবং তাঁর ঘোষিত নীতি ছিল—আরবের বাইরে রাজ্যবিস্তার না করা। কিন্তু কিভাবে এই আদর্শ অবহেলিত হয়েছে, তার ফল কী হয়েছে, তার দিক্-নির্দেশ করতে লেখক ভোলেন নি।

'সাকী ও কবি' নিবন্ধে তিনি এই অমুজ্জ্বল ছবি তুলে ধরেছেন মমতাহীন সততায়। এবং এই পটভূমিকায় হাফেজ ও ওমর খৈয়ামের কাব্য, শরাব-সাকী-মাশুক-আশিকের তত্ত্ব বিচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন: আরবে

পারস্যে জীবন্ত ধর্মের স্থানে ছিলো কতকগুলো অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান-বিধি-নিষেধ ; ভণ্ড ধর্মযাজকের দল অনুশাসনের নামে জনসাধারণের ওপর নির্মম শাসন-শোষণ চালাতে লাগলো ; মোল্লা-শাস্ত্র-দক্ষিণার চাপে স্বভাবধর্ম লোপ পেতে বসলো ; স্বাধীনতা উধাও ; প্রেম-প্রীতি নিশ্চিহ্ন ; এবং মানুষ "স্বার্থ-সর্বস্ব ভণ্ড ধর্মগুরুদের দাসে পরিণত হয়েছিলো। এই দুর্দিনে মহাকবিদের আবির্ভাব।" জনতার ক্ষোভ-যন্ত্রণা রূপ পেল তাঁদের লেখনী-মাধ্যমে। বেজে উঠল বিদ্রোহের সুর, স্বাধীনতার বাসনা। মধুর রসের আস্তিনযোগে এই বিদ্রোহ, এই স্বাধীনতার বীজ। অন্যদিকে, "বিশ্বপ্রেম, স্বাভাবিক জীবনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, ন্যায় এবং যুক্তির মহিমা"ও নবীন কবিদের রচনাবলীতে ওতঃপ্রোত। ইতিহাসের এই বিচিত্র উত্থানপতনের পটভূমিকাতেই বিচার্য 'আকবরের রাষ্ট্রসাধনা' গ্রন্থের মৌল তাৎপর্য।

আকবরের রাষ্ট্রসাধনায় ওয়াজেদ আলী খুঁজে পেয়েছেন তাঁর মানসিক ভাবনার পূর্বগামিনী ছায়া। তাই তাঁকে স্মরণ করেছেন রাষ্ট্রগুরুরূপে। আকবর ছিলেন সত্যসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসার অন্তে যিনি উপলব্ধি করেছিলেন : "সত্য কোন বিশেষ ধর্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। সব ধর্মেই সত্য আছে। প্রকৃত ধার্মিক মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলান, সত্যের বেদীতে সুন্দর ও কল্যাণকে রূপ দেন। এবং এইদিক থেকে সমস্ত ধর্মের মূলগত আদর্শ এক।" কিন্তু জনসাধারণ এতসব বোঝে না, তারা আঁকড়ে থাকে বাইরের আচার-অনুষ্ঠানকে। আর, সেই অজ্ঞতাকে মূলধন করে ধর্ম-ব্যবসায়ীরা কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বীজ ছড়ায়, ভিন্নধর্মীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে তোলে। সমকালীন ধর্ম-ভণ্ডামিকে চিনতে পেরেছিলেন আকবর ; তাই পরধর্ম-সহিষ্ণুতার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা-নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করেছিলেন, এবং মানবতার আদর্শে সর্বধর্মসমন্বয়ী 'দীনে এলাহী' ধর্মের প্রবর্তনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

আলীসাহেব সম্রাট আকবরকে বলেছেন "দার্শনিক নরপতি"। তাঁরও অনেক আগে পণ্ডিত শেখ মোবারক স্তব করেছেন : "যিনি ধর্মের গ্লানি না করেন, মিথ্যাকে দলিত করেন, সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেন, মানবচিত্তে প্রেরণার সঞ্চার করেন, ভারতের বিভিন্ন জাতির লোককে সত্য সুন্দর ও শ্রেয়ের পথে এগিয়ে দেন···"। লরেন্স বিনীয়ন তাঁকে বলেছেন "মানুষের

রাজা—তাঁর ক্রোধ অন্তর, সহজেই শান্ত, কৌতূহল অসীম, মন সক্রিয়।" চিত্রটি বর্ণনা পড়েই মনে আসে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের রায়চন্দ্র-বর্ণনা।

ওয়াজেদ আলীর অটুট বিশ্বাস ছিল কোরাণ-শরীফে। সেই সঙ্গে, একথাও মানতেন, যে, যুগে যুগে শাস্ত্রবাণীর নবব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, এবং তদ্দ্বারাই ধর্ম জীবন্ত থাকে এ-তথ্য জানা ছিল বলেই, তাঁর মতে, আকবর ধর্মের নতুন ভাষ্যকার ও ভারতভাগ্যবিধাতা ; এবং এ-তথ্য জানা ছিল না বলেই সম্রাট আলমগীর ব্যর্থ হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন না : 'ধর্মীয় রাষ্ট্র' অপেক্ষা 'জাতীয় রাষ্ট্র' উন্নততর ও স্থায়ী। তাই লেখকের সিদ্ধান্ত : "আওরঙ্গজেবের অকৃত্রিম ধর্ম ও শরিয়েত-নিষ্ঠা তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ব্যর্থতা আনয়ন করেছিল। তিনি হিজরীর প্রথম শতাব্দীর জীবনের তাগিদে সৃষ্ট নিয়মাবলীকে হিজরীর একাদশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ ভিন্ন বেষ্টনীর মধ্যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন।" তাই তাঁর ব্যর্থতা ও পতন। অন্যপক্ষে, আকবর চেয়েছিলেন 'জাতীয় রাষ্ট্র' ; ফলে, তাঁর সময়ে হিন্দুরা "মোগল সাম্রাজ্যকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় সাম্রাজ্য বলে মনে করতেন।"

আনুষ্ঠানিক ধর্মের অতি চাপে পিষ্ট-মধ্যযুগে, বিশেষত মধ্যযুগীয় ভারতে, ধর্মনিরপেক্ষতার ও জাতীয়তার চেতনা অসম্ভব প্রস্তাব। ফলত, আলী-সাহেবের শেষ উক্তিটি বিতর্কমূলক। তবু, আলমগীর ও আকবরের রাষ্ট্র-সাধনার তুলনামূলক আলোচনাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়—এই কারণে, যে, লেখক ইতিহাসের পাতায় পাতায় খুঁজেছেন হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলন-বিন্দু ও বিচ্ছেদ-রেখাগুলি, এবং নবভারত-সাংগঠনিকদের তদ্দ্বারা সতর্ক ও সচেতন করতে চেয়েছেন। শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, ব্যাপকতর তৎপরতায়, এবং যথার্থ সত্যসন্ধানের আগ্রহে।

ভারতীয় সাহিত্যকে তিনি তিন দিক থেকে বিচার করতে চেয়েছেন : [ক] বহিরাগত ইসলামী সাহিত্য ভারতীয় জীবন ও সাহিত্যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল ? [খ] মুসলমান শাসনতন্ত্র ভারতীয় সাহিত্যকে কিভাবে উৎসাহিত ও প্রভাবিত করেছিল ? [গ] ভারতীয় সাহিত্যে মুসলমানের দান কী, এবং সে দানের যথার্থ মূল্য কী ? এই ত্রিপ্রশ্নের ভিত্তিতে লেখা 'সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের দান' কিন্তু ফলপ্রাপ্তির দিক থেকে কৌতূহলী পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করেনি।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব বিষয়ে ডঃ আব্বাসাহেবের গবেষণা-গ্রন্থের পরিধি বিরাট, গভীরতা কম, অনেক সিদ্ধান্ত আপ্তবাক্য মাত্র। ওয়াজেদ আলীর গ্রন্থেও নতুনতর তথ্য বা বিস্তৃত পর্যালোচনা অনুপস্থিত। শঙ্করাচার্য, তুকারাম প্রভৃতি ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিংবা "চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম হচ্ছে সুফীবাদের হিন্দু-সংস্করণ" : ইত্যাকার সিদ্ধান্ত হয়তো ভ্রান্তিমূলক নয়—কিন্তু এদের সমর্থনে তথ্য ও তুলনামূলক বিচারের যথোচিত বিস্তার নেই। বস্তুত, বাঙালি তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের অবদান-বিষয়ে আমাদের ধারণা এখনও ধূসর, ইতিহাস এখনও ঝাপসা, গবেষণা সুদূরপরাহত। আলীসাহেবের আলোচনার অসম্পূর্ণতা তাই বেদনাদায়ক।

তবু গ্রন্থটি নানা কারণে উল্লেখ্য। প্রথম : এ-বইয়ে ইসলাম সংস্কৃতির স্বরূপ অত্যন্ত সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা বাঙালি মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য। দ্বিতীয় : ভারতীয়ানায় ইসলামের প্রভাব প্রসঙ্গে যে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে, ভবিষ্যৎ গবেষণার পক্ষে তা মূল্যবান দিগ্দর্শন। তৃতীয় : একটি উজ্জ্বল বাক্যে, অনেক গভীর কথা বলা হয়েছে, যা সম্প্রদায়মাত্রেরই স্মরণীয় ও লক্ষণীয় : (ভারতে) "রাজ্য হারিয়েও মুসলমানেরা দেশ হারায় নি।"

ধর্ম ও রাজনীতিকে তাদের যথাযোগ্য স্থানে রাখার এই মানসিকতা ওয়াজেদ আলীর অন্যান্য রচনার মধ্যেও পরিস্ফুট।

লেসিং-এর 'নাথান দি ওয়াইজ' অবলম্বনে জনাব আলী একটি নাটক লিখেছিলেন : 'সুলতান সালাদীন'। মিশর-সুলতান সালাদীন ক্রুসেডের যুদ্ধে সম্মিলিত খ্রীস্টান বাহিনীকে পরাজিত করে সকলের শ্রদ্ধেয় হয়েছিলেন। সীতা তার বোন, ভাই আসাদ নিরুদ্দেশ। নাথান একজন জ্ঞানী য়িহুদী, রেখা তার পালিতা কন্যা। এ ছাড়াও মুখ্য ভূমিকায় আছেন খ্রীস্টান পাত্রী, ধাত্রী দাজা, এবং দরবেশ আলহাফী, যিনি গঙ্গাতীরবাসীদের প্রশংসায় মুখর। ঘটনার সূত্রপাত : ক্রুসেডের যুদ্ধে বন্দী জনৈক জার্মান টেম্পলার-যোদ্ধা। সালাদীন টেম্পলারকে মুক্তি দেন। টেম্পলার এক অগ্নিদাহ মৃত্যুর হাত থেকে রেখাকে রক্ষা করে, তাকে ভালোবাসে। নাটকের একেবারে শেষে জানা যায় : টেম্পলার-যোদ্ধা আর কেউ নয়, নিরুদ্দিষ্ট আসাদের জার্মান-পত্নীর ছেলে, রেখা তার বোন। সার্বিক মিলন ও যবনিকাপাত।

আঙ্গিকে ও সংলাপে নাটকটি অত্যন্ত কাঁচা। তবু, আত্মঅবহিতি সত্ত্বেও নাটকটি রচনায় তিনি হাত দিয়েছিলেন, বিষয়বস্তুর জন্যে। হিন্দু, ইসলাম,

খ্রীস্টান, য়িহুদী, চার বড় ধর্মের মাঝখানে মানুষ ও মনুষ্যত্বকে রেখে তিনি আপন জীবনাদর্শ যাচাই করতে চেয়েছেন ; হিংসা, সন্দেহ, প্রতিশোধ-সংস্কার এবং দান, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি পরিবেষ্টনীতে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন মানবধর্মের স্থিতিস্থাপকতা। ধর্ম নয়, মনুষ্যত্বই মানুষের একমাত্র পরিচয় ও একমেব বন্ধন—এ-তত্ত্ব যেমন 'গোরা' উপন্যাসে, তেমনি 'সুলতান সালাদীন'-এও, তাই, উভয়েরই কেন্দ্রে একটি করে জন্মরহস্য বিদ্যমান। ভাবনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ও ওয়াজেদ আলী নিকটতর। নিদর্শন হিসেবে কয়েকটি সংলাপ উদ্ধৃত করছি।

(ক) রেখা। ঈশ্বর আবার কারও সম্পত্তি নাকি? যে ঈশ্বর বিশেষ একজন লোকের সম্পত্তি, তিনি কি রকমের ঈশ্বর? আর, যে ঈশ্বরের জন্য তাঁর ভক্তদের মধ্যে লড়াইয়ের প্রয়োজন হয়, তিনিই বা কি রকমের ঈশ্বর।

(খ) নাথান। আমরা কি নিজ নিজ জাতির কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নই? জাতি? এর অর্থ কি? এহুদী এবং খৃষ্টান, তারা মানুষ আগে, না আগে এহুদী, কিম্বা খৃষ্টান? কত সুখী হতুম, যদি আপনাকেও আমি সেই দলের মধ্যে পেতুম যারা সর্বপ্রথম নিজেদের মানুষ বলেই গণ্য করে!

(গ) টেম্প্লার। আমি খোদার নামে শপথ করে বলছি, আমি সেই দলেরই মানুষ! মানবতার বন্ধন—তাই যেন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হয়।

প্রথম সংলাপটি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', বিশেষত অপর্ণার উক্তিরই যেন প্রতিধ্বনি। দ্বিতীয় সংলাপটি স্মরণে আনে 'আত্মপরিচয়'-এর তৃতীয় নিবন্ধের প্রাথমিক পরিচ্ছেদগুলিকে, যেখানে জাতি-ধর্ম-মনুষ্যত্ব প্রসঙ্গে একই কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় সংলাপটি বলাবাহুল্য, যেন গোরার কণ্ঠনিঃসৃত।

তাই, প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে যত ত্রুটিই থাক, একটি রূপদী রচনাকে আধুনিক সমাজচিন্তার উপযোগী করে পুনঃনির্মাণ—ওয়াজেদ আলীর মানবতাবাদী মননশীলতারই অভ্রান্ত দিশারী। এবং এই মননশীলতার উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছেন যাঁর কাছ থেকে, তিনি বিংশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম পুরোধা রবীন্দ্র-অনুগ, কৃষ্ণনাগরিক বীরবল ওরফে, প্রমথ চৌধুরী।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

একচেটিয়া পুঁজি ও ভারতবর্ষ

রণেন নাগ

পুঁজিবাদী অর্থনীতির শেষ পর্যায়ে একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব ঘটে। এর ঐতিহাসিক ধারা সম্পর্কে কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' ও অন্যান্য রচনায় বিজ্ঞানসম্মত আলোকপাত করা হয়েছিল। তারপরে ভি. আই. লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' গ্রন্থে বিকশিত একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কয়েকটি মন্তব্য মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

লেনিনের মতে (১) অত্যন্ত উচ্চ স্তরে উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হবার ফলেই একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব ঘটে, (২) পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় একচেটিয়া পুঁজি ক্রমশ শিল্পোৎপাদনের সমস্ত কাঁচামালের ওপর একাধিপত্য স্থাপন করে থাকে, (৩) একচেটিয়া পুঁজি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় জন্মলাভ করে এবং (৪) মহাজনী পুঁজি কাঁচামালের ওপর একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য বিস্তারে প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। এ কথা বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন, "মহাজনী পুঁজি সমগ্রভাবে অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর, বলতে গেলে এমন এক সর্বগ্রাসী চূড়ান্ত শক্তি, যা কিনা রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকেও তার প্রভাবাধীন করতে সক্ষম এবং কার্যত তা করেও।" ('সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর', পৃঃ ৭৬-৭৭)।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরে একচেটিয়া পুঁজি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ আর. কে. হাজারী তাঁর *The Structure of The Corporate Private Sector—A Study of Concentration, Ownership and Control* নামক গ্রন্থে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে পুঁজি যে কিভাবে কয়েকটি মালিক পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার এক আকর্ষণীয় চিত্র উপস্থিত করেছেন। আমরা জানি, ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল, দশ বৎসরে এই প্রবণতা শুধু বাড়েইনি, একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবৃদ্ধিশীলতা ও তার প্রভাবে সমগ্র অর্থনীতির অবক্ষয় জাতীয়জীবনে তীব্র চাপও সৃষ্টি করেছে।

এ সমস্ত আলোচনার জন্যেই বলে রাখা দরকার যে ভারতের পুঁজিবাদী বিকাশের ধারা সামাজিকভাবে স্বাভাবিক উত্তরণ লাভ করে নি, করতে পারে নি। সামন্তবাদী উৎপাদন নিয়মের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ সংঘাত থেকে বিপ্লবী পথে জন্ম নেবার অবস্থা ভারতীয় পুঁজির ছিল না। ভারতীয় পুঁজি তাই প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শ্রেণীর ভূমিকা গ্রহণ করে অ-বিপ্লবী নিয়মে বিকাশলাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দেশীয় রক্ষীর ভূমিকা থেকে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ভারতের সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে একদা গাঁটছড়া বেঁধে বেড়ে উঠেছিল। অথচ পুঁজিবাদী স্বাভাবিক বিকাশ একমাত্র সামন্ত-শ্রেণীকে উৎখাত করেই সর্বাঙ্গীন হতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী আওতায় সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে যে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে, কালক্রমে পুঁজিবাদী বিকাশের অলঙ্ঘ্য নিয়মে সেই শ্রেণীর একচেটিয়া বিকাশও আজ পরিণতির দিকে চলেছে।

জাতীয় বুর্জোয়াদের বিপুল অংশের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের এজন্য সংঘর্ষও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ভারত স্বাধীন হবার পর দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়। ক্রমাগত একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এই রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে তোলার জন্য আজ ছলে বলে কৌশলে ব্যস্ত।

ডাঃ হাজারী অত্যন্ত যান্ত্রিক কুশলতার সঙ্গে গ্রন্থটিতে ঐ একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের একটা সময়গত চিত্র (১৯৫১-৫৮) তুলে ধরেছেন। ঐ তথ্যগুলি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য আমাদের থেকে আলাদা। কিন্তু যে বিপুল পরিশ্রম করে তিনি ঐ তথ্যগুলি প্রণালীবদ্ধ করেছেন তার জন্যে ভারতীয় অর্থনীতির ছাত্র মাত্রেই তাঁর কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন।

অর্থনীতি সংক্রান্ত সম্পর্কই আসলে সবকিছুর মূলে। রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান মূলত আর্থনীতিক-সামাজিক সম্পর্কের রূপরেখা ধরে বিকশিত হয়। সুতরাং ভারতবর্ষে যে কোনো বিষয়ের চিন্তা অথবা ভাবধারা ভারতীয় অর্থনীতির একচেটিয়া রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সমস্ত রাজনৈতিক দল, মত, সাংস্কৃতিক ধারা ও চিন্তার বিকাশ সহযোগী অথবা বিরোধীরূপে একচেটিয়া পুঁজির প্রভাবাধীন সমাজ ব্যবস্থার অনুসারী হতে বাধ্য। কাজে কাজেই যে-কোন সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের এই আর্থনীতিক সম্পর্কবিকাশের কথাটা মনে রাখতে হবে।

তাহলেই আমরা আমাদের আশেপাশে যা কিছু ঘটছে, যা ঘটতে পারে তার কার্যকারণ সম্পর্ক এবং ব্যাখ্যা খুঁজে পাব। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমরা ভারতে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ, মুষ্টিমেয় পরিবারের হাতে আর্থনীতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত এই আর্থনীতিক-সামাজিক অবস্থার সাবস্ত রাজনৈতিক সঙ্কটাবস্থার উদ্ভবের নিয়মগুলি বুঝতে পারি।

ভারতবর্ষে আর্থনীতিক ক্ষমতা ব্যক্তিগত পুঁজির ক্ষেত্রে প্রধানত জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মধ্যে বিস্তৃত। অবশ্য সরকারী পুঁজির ক্ষেত্রেও এক ধরনের জয়েন্ট স্টক কোম্পানি লক্ষ্য করা যায়।

এই সমস্ত জয়েন্ট স্টক কোম্পানি একত্রে যে মোট আদায়ীকৃত মূলধন নিয়ে কারবার চালায় তার একটা সারণী নিচে দেওয়া হলো।

(কোটি টাকার হিসাবে)

সারণী নং ১

(১) আর্থিক বছর	(২) পাবলিক কোং		(৩) প্রাইভেট কোং		(৪) মোট	
	(ক) সংখ্যা	(খ) আদায়ীকৃত পুঁজি	(ক) সংখ্যা	(খ) আদায়ীকৃত পুঁজি	(ক) সংখ্যা	(খ) আদায়ীকৃত পুঁজি
১৯৫০-৫১	১২৫৫৮	৫৭০	১৫৯৭৪	২১০	২৮৫৩২	৭৮০
১৯৫১-৫২	—	৬০৭	—	২৪৯	—	৮৫৬
১৯৫৫-৫৬	৯৫৭৫	৬৯০	২০২৯৯	৩৩০	২৯৮৭৪	১০২০
১৯৫৮-৫৯	—	৭৮৪	—	৭২৬	—	১৫১০
১৯৬০-৬১	৬৭৪৫	৮৮০	১৯৩৬৩	৮৫০	২৬১০৮	১৭৩০
১৯৬১-৬২	৫৯৯৯	৯৩০	১৮৭৫৮	৯৫০	২৪৭৫৭	১৮৮০
১৯৬২-৬৩	৬০২২	১০১০	১৯৪০৭	১০৬০	২৫৪২৯	২০৭০
১৯৬৩-৬৪	৫৯৫৬	১১৩০	২০০৪৬	১২৬০	২৬০০২	২৩৯০
১৯৬৪-৬৫	৫৯৭৮	১১৮০	২০৬৭৬	১৩৯০	২৬৬৫৪	২৫৭০
১৯৬৫-৬৬	৫৯০২	১৩২০	২১১৭৬	১৪৪০	২৭০৭৮	২৭৬০

[সূত্র : ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইকনমিক স্ট্যাটিসটিকস কম্পেণ্ডিয়াম ১৯৬৭—অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অর্গ্যানাইজেসন ও ডাঃ আর. কে. হাজারী—দি কর্পোরেট প্রাইভেট সেক্টর, কনসেনট্রেশন, ওনারশিপ এণ্ড কন্ট্রোল।]

এই সারণী-১ থেকে লক্ষণীয় যে, পরিকল্পনার বছরগুলিতে পাবলিক কোম্পানিগুলির সংখ্যা অর্ধেকের মতো কমে গিয়েছে। কিন্তু তাদের আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে প্রাইভেট কোম্পানিগুলির সংখ্যা ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত দশ বছরে প্রায় একই থাকা সত্ত্বেও আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সাতগুণ। শেষোক্ত কোম্পানিগুলির মূলধন-এর মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট কোম্পানি রয়েছে এবং অধিকাংশই এই ধরনের ছোট ছোট কোম্পানি। কিন্তু এদের আদায়ীকৃত মূলধন এতটা বাড়েনি। এই বৃদ্ধির কারণ (১) প্রধানত বড়ো বড়ো সরকারি কোম্পানিগুলি প্রাইভেট কোম্পানিরূপেই রেজেস্ট্রি করা হয়েছে, যেমন হিন্দুস্থান স্টীল, ইত্যাদি, (২) আবার ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের কতগুলি অসুবিধাজনক নিয়মের দরুণ অনেক বড় বড় পাবলিক কোম্পানিকে প্রাইভেট কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে টাটা, বিড়লা, সাহু-জৈন, ডালমিয়া এরাই মূলধনের সিংহভাগের মালিক। পাঁচ লক্ষ টাকা বা তার কম মূলধনের ছোট ছোট কোম্পানিগুলি সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও আদায়ীকৃত মোট মূলধনের সামান্য অংশই তাদের।

ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের মাত্র কুড়িটা পরিবার ব্যাঙ্ক শিল্প বাদে অন্যান্য শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত মূলধনের নীট ৩৪·৩৩ শতাংশের মালিক (১৯৫৮ সালের হিসাব)। অর্থাৎ ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকানায় জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলির মোট আদায়ীকৃত মূলধনের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশিরভাগের মালিক মাত্র কুড়িটা পরিবার।

২নং সারণীতে এর একটা নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে :

এই কুড়িটি গোষ্ঠির (১) নিজস্ব কোম্পানিগুলি (যে গুলিতে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সোজাসুজি মালিকানা শেয়ারের মারফতে চালানো যায় কারণ যে কোনো প্রস্তাব পাশ করানোর ক্ষমতা অর্থাৎ ৮০ থেকে ১০০ শতাংশ ভোট মালিক গোষ্ঠির হাতে) ও (২) সাধারণত অন্যান্য গোষ্ঠির সঙ্গে একযোগে পরিচালিত কোম্পানিগুলি (যেগুলিতে কোনো একক গোষ্ঠির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

এবং মোট শেয়ারের অধিকাংশ কোনো একক গোষ্ঠীর হাতে না থাকলেও, ঐ ধরনের কোম্পানিগুলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা গোষ্ঠীগুলির হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে) এদের নিয়ে এই মোট মালিকানার চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে।

সারণী নং ২

গোষ্ঠী কুড়িটি গোষ্ঠীর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে	শেয়ার মূলধন ১৯৫১	শেয়ার মূলধন ১৯৫৮	নীট স্থায়ী সম্পত্তি ১৯৫৮	নীট মূলধন ১৯৫৮	মোট মূলধন ১৯৫৮
(১) কোটি টাকা	২৬৫'৫৭	৪১৪'৪৮	৫৮৪'৩০	৯৪৭'৬০	১২৭৯'৭৪
(২) সমগ্রের শতাংশ	৩২'৭৯%	৩৮'১৭%	৪৩'৬৯%	৪০'৩৪%	৩৯'৯৪%
(৩) বাদ, নিজেদের গোষ্ঠীগত পারস্পরিক লেনদেন মূলধন (কোটি টাকায়)	২৯'৩৮	৬২'২১	৮৩'২৬	১৩৩'৭৪	১৭৯'৬৮
(৪) নীট গোষ্ঠীর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে	২৩৬'১৯	৩৫২'২৭	৫০১'০৪	৮১৩'৮৬	১১০২'০৬
(৫) সমগ্রের শতকরা হিসাবে	(২৯'১৬)	(৩২'৪৪)	(৩৭'০৩)	(৩৪'৬৫)	(৩৪'৩৩)
(৬) এর মধ্যে বৃহত্তম তেরটা গোষ্ঠীর হাতে মোট ও শতকরা হিসাবে রয়েছে (নীট)	২২৫'৮৯ (২৭'৮৯%)	৩৩১'৯৫ (৩০'৫৭)	৪৭৬'৫৩ (৩৫'২২)	৭৫৭'২৪ (৩২'২৪)	১০২৩'৪৫ (৩১'৯৪)

[সূত্র : ডঃ আর. কে. হাজারী, স্ট্রাকচার অব কর্পোরেট প্রাইভেট সেক্টর পৃঃ ৪০, সংক্ষিপ্ত টেবল নং ২৩]

এখন এই কুড়িটি গোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এবং এই গোষ্ঠীগুলি প্রত্যেকে আলাদাভাবে ২নং সারণীর মোট সম্পদের কতটার মালিক তা দেখা যেতে পারে।

সারণী নং ৩

বে-সরকারী কোম্পানিগুলির পুঁজি ও সম্পদে ঐ কুড়িটি গোষ্ঠীর অংশ

গোষ্ঠীর নাম	শেয়ার মূলধন ১৯৫১ কোটি ও %	শেয়ার মূলধন ১৯৫৮ কোটি ও %	নীট স্থায়ী সম্পত্তি ১৯৫৮ কোটি ও %	নীট মূলধন ১৯৫৮ কোটি ও %	মোট মূলধন ১৯৫৮ কোটি ও %
এণ্ড্রু ইউল	১৪·৬৪ (১·৮১%)	১২·৩৭ (১·১৪%)	১১·২২ (০·৪৩%)	১৮·৫৭ (০·৭৯%)	৩১·৬৭ (০·৯৯%)
বাঙুর	৮·৬৭ (১·০৭%)	১৯·৬৯ (১·৮১%)	২০·৫০ (১·৫২%)	৩৬·১৩ (১·৫৪%)	৫৩·১৩ (১·৬৬%)
বার্ড হেইলজার্স	১২·২৩ (১·৫১%)	১২·৯৬ (১·১৯%)	১৪·২৫ (১·০৫%)	২৩·৫০ (১·০০%)	৩৮·৩৮ (১·২০%)
বিড়লা	৪০·১০ (৪·৯৫%)	৬·৮৫৩ (৬·৩১%)	৬৬·৪১ (৪·৯১%)	১১৮·৪৯ (৫·০৫%)	১৫৭·৬৩ (৪·৯২%)
ডালমিয়া-সাহু-জৈন	২৫·২৯ (৩·১২%)	২৮·৫১ (২·৬৩%)	৩৯·৮১ (২·৯৪%)	৫৭·৪৮ (২·৪৫%)	৭৫·৬৭ (২·৩৬%)
ইন্দ্রসিং	১·৯৪ (০·২৪%)	১·৯৭ (০·১৮%)	২·৫৪ (০·১৯%)	৪·৭০ (০·২০%)	৮·১৬ (০·২৫%)
জে. কে.	৯·১৩ (১·১৩%)	১১·৮০ (১·০৯%)	১০·৯০ (০·৮১%)	২১·৩২ (০·৯১%)	৩০·৭১ (০·৯৬%)
কস্তুরভাই	২·৮০ (০·৩৫%)	৭·০৩ (০·৬৫%)	৯·০৫ (০·৬৭%)	১৪·৯৮ (০·৬৪%)	২১·৯১ (০·৬৮%)
থাটাউ	১৬·৫০ (২·০৪%)	২৬·১০ (২·৪০%)	২৮·২০ (২·০৮%)	৫৭·৫৯ (২·৪৬%)	৭৬·৪৫ (২·৩৯%)
কির্লোস্কার	০·৮৫ (০·১০%)	১·৬৭ (০·১৫%)	১·৬৭ (০·১২%)	৬·৫৬ (০·২৮)	৮·১১ (০·২৫%)
মফতলাল	৬·৫৫ (০·৮১%)	২১·৫৪ (১·৯৮%)	৩৪·৯০ (২·৫৮%)	৪৬·২৩ (১·৯৭%)	৬৬·৩৮ (২·০৭%)

মাহীন্দ্র	০·৮০	৩·১৭	২·২০	৭·৭২	৮·৪৩
	(০·১০%)	(০·২৯%)	(০·১৮%)	(০·৩৩%)	(০·২৬%)
মার্টিন বার্ন	১৪·৬৮	২০·০৫	৪৮·৮১	৭৪·৩৮	৯১·৮৭
	(১·৮৪%)	(১·৮৫%)	(৩·৩১%)	(৩·১৭%)	২·৮৭%)
বাঙ্গুর	১·২০	২·১৮	৬·০০	৯·১৩	১০·৭৪
	(০·১৫%)	(০·২০%)	(০·৪৪%)	(০·৩৯%)	(০·৩৪%)
শেষাদ্রী	২·৪৯	২·৬৭	২·৬৭	৪·২৫	৬·৬৩
	(০·৩১%)	(০·২৫%)	(০·২০%)	(০·১৮%)	(০·২১%)
শাপুরজি	১৩·৬০	২৭·৬০	৩২·৪৭	৬২·১৯	৮৩·০৬
	(১·৬৮%)	(২·৫৪%)	(২·৪০%)	(২·৬৫%)	(২·৫৯%)
শ্রীরাম	৪·৬৮	৬·৪৫	৮·৭৬	২০·৪৯	২৯·৬৯
	(০·৫৮%)	(০·৫৯%)	(০·৬৫%)	(০·৮৭%)	(০·৯৩%)
টাটা	৬৬·৮৩	১০৮·২৩	২০১·১৩	২৯২·৯৩	৩৮৮·৭২
	(৮·২৫%)	(৯·৯৭%)	(১৪·৮৭%)	(১২·৪৭%)	(১২·১৩%)
থাপার	৬·৬৩	১২·০৮	১১·৬৭	২২·৩৭	৩০·৭৪
	(০·৮২%)	(১·১১%)	(০·৮৬%)	(০·৯৫%)	(০·৯৬%)
ওয়ালচাঁদ	১৫·৭৬	১৯·৮৮	৩১·১৪	৪৬·৩৯	৬১·৬৬
	(১·৯৫%)	(১·৮৩%)	(২·৩০%)	(২·০৬%)	(১·৯০%)

ঐ সময়ে সমস্ত বেসরকারী কোম্পানিগুলির অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

	শেয়ার মূলধন		নীট স্থায়ী সম্পত্তি	নীট মূলধন	মোট মূলধন
	১৯৫১	১৯৫৮	১৯৫৮	১৯৫৮	১৯৫৮
কোটি টাকা	৮১০·০০	১০৮৬·০০	১৩৫৩·০০	২৩৪৯·০০	৩২০৪·০০
শতকরা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে ভারতবর্ষের ঐ কুড়িটি একচেটিয়া মালিক-গোষ্ঠী একত্রে কোম্পানিগুলির নীট মূলধনের ৩৪·৬৫ শতাংশ, কোম্পানি-গুলির মোট মূলধনের ৩৪·৩৩ শতাংশ এবং নীট স্থায়ী সম্পত্তির ৩৭·০৩ শতাংশ করায়ত্ত করে নিয়েছে। এরমধ্যে আবার বড়োবড়ো তেরোটি কোম্পানির ভাগে গিয়েছে যথাক্রমে ৩২·২৪ শতাংশ, ৩১·৯৪ শতাংশ এবং ৩৫·২২ শতাংশ।

পুঁজিবাদী বিকাশের নিয়মে দেশের সমস্ত সুযোগসুবিধা একচেটিয়া পুঁজির মালিকগোষ্ঠীর করায়ত্ত। সরকারী মূলধনের সিংহভাগ এদেরই মুখাপেক্ষী। এদের পরিচালনাধীন ব্যবসায় সোজাসুজি ও লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন মাধ্যমে সরকারী লগ্নীর পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে টাটা, বিড়লা, মার্টিন বার্ন ও ডালমিয়া-সাহু-জৈন, এই চারটি সবচেয়ে বড় একচেটিয়া গোষ্ঠীর শেয়ারে লগ্নীর পরিমাণ লক্ষণীয়। লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন (১১·৮১ কোটি) ও সোজাসুজি সরকারী লগ্নী (৬·৯৪ কোটি) মোট ১৮·৭৫ কোটি টাকা ১৯৫৮ সালে এই চারটি গোষ্ঠীর শেয়ারে নিয়োজিত ছিল। সরকারী লগ্নী সংস্থাগুলি, যেমন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-ডেভেলেপমেন্ট, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্ট-মেন্ট কর্পোরেশন, রাজ্যগুলির স্টেট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলেপমেন্ট কর্পোরেশনগুলি একত্রে ১৯৬৪-৬৫ সালে বেসরকারী শিল্প-গুলিতে ৯২ কোটি টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৬৩ কোটি টাকা লগ্নী করেছে [ইউ, এন, আই, রিপোর্ট ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৬]।

সরকারী নির্দেশেই এই বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রধানত একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের স্ফীতকায় করেছে। পাবলিক সেকটরের লগ্নী সংস্থাগুলি এই ভাবেই বেসরকারী শিল্পব্যবসায়কে আরো বেশি প্রসারিত ও শক্তিশালী করার কাজে নিযুক্ত হয়েছে। এছাড়া ১৯৬৬-৬৭ সালে বেসরকারী শিল্প-গুলিকে আরো বেশি সাহায্য করার জন্য ভারত সরকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলেপমেন্ট কর্পোরেশনের হাতে আরো ৫২ কোটি টাকা তুলে দিয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত আরেকটি সরকারী সংস্থা ইউনিট-ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া ঐ সময়ে মোট বেসরকারী লগ্নীর প্রায় ২৬ কোটি টাকার মধ্যে মোট ১০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা কোম্পানিগুলির সাধারণ শেয়ারে লগ্নী করেছে। এই টাকা ঐ সময়ে লগ্নী করা মোট বিনিয়োগের ৪১·৩১ শতাংশ। ১৯৬৫-৬৬ সালে L. I. C. বেসরকারী শিল্পে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বাবদ অতিরিক্ত মোট ২০ কোটি টাকা লগ্নী করেছে [সূত্র : শিল্পগুলির বার্ষিক সমীক্ষা ASI রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া]।

আমাদের দেশে পুঁজিবাদী সামাজিক উৎপাদনের সংগঠনগুলি, এই ভাবে 'সমাজতান্ত্রিক' সরকারী নীতির কার্যকরী প্রয়োগের ফলে দ্রুত একচেটিয়া পুঁজির সংগঠনে রূপান্তরিত হচ্ছে। বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে

ভারতীয় একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর গাটছড়া এবং এই অশুভ সহা-বস্থানের প্রধান সহযোগী দেশীয় আমলারা এই একচেটিয়া প্রবণতাকে আরো বেশি দ্রুত করে তুলেছে। তথাকথিত সরকারী সংগঠনগুলি (পাবলিক সেকটর) এইভাবে বেসরকারী পুঁজিগঠনের এবং ঐ দ্রুতহারে সঞ্চিত পুঁজি একচেটিয়া মালিকদের কবলে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে। ভারত সরকারের শিল্পনীতির পরিবর্তন (১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬), বিনিয়োগনীতি, আমদানি রপ্তানি, কন্ট্রোল তুলে দেওয়া, এসমস্তই ভারত সরকারের দীর্ঘকালের নীতি রূপায়নের ফল।

এই একচেটিয়া পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধির ফলে চিরাচরিত শিল্পোৎপাদনে এবং নতুন শিল্পে দাম বাড়ানোর ঝোঁক বেড়েছে। ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলি ক্রমশ একচেটিয়া পুঁজির আওতায় এসে পড়ে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজি একটা অবক্ষয়ী অবস্থা সৃষ্টি করেছে। সরকারী নীতি এতদিন এই একচেটিয়া পুঁজি বিকাশের সমস্ত দাবি মেনে নিয়ে হোঁচট খেয়ে খেয়ে এগোচ্ছিল এবং এখন তা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শুধু সরকারী অর্থানুকূল্যে নয়, সরকারী আর্থিকনীতি, বেসরকারী ব্যাঙ্ক-গুলির বিনিয়োগ নীতিও এই একচেটিয়া আর্থিক ক্ষমতা প্রসারের পথে প্রচণ্ড সাহায্য করছে। গত কয়েক বছরে বড়ো বড়ো পাঁচটা ব্যাঙ্ক—সেন্ট্রাল, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল, পাঞ্জাব নেশনেল, ব্যাঙ্ক অব বরোদা—প্রধানত টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া-সাহু-জৈন, ওয়ালচাঁদ, কস্তুরভাই, মফতলাল, মার্টিন বার্ন প্রভৃতি একচেটিয়া পুঁজির মালিকেরা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে শিল্পস্থাপনে লাইসেন্স দেবার পদ্ধতি নিয়ে ডাঃ হাজারী যে তদন্ত চালিয়েছিলেন তার রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে নতুন শিল্প স্থাপনে বর্তমান শিল্প প্রসার করার জন্তে যে অর্থ-বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে টাটা, বিড়লা, মার্টিন বার্ন এবং ডালমিয়া-সাহু-জৈন এই চারটি গোষ্ঠীকে সমগ্র বিনিয়োগের এক-পঞ্চমাংশ তুলে দেওয়া হয়। এর মধ্যে আবার বিড়লা-গোষ্ঠী একা অপর তিনটি গোষ্ঠীর প্রায় দ্বিগুণ বিনিয়োগের অনুমতি লাভ করে। বিড়লাগোষ্ঠী ১৯৬৭ সালে মোট ৬০০টি কোম্পানি পরিচালনা করে।

এই সব কোম্পানি অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে বিড়লাগোষ্ঠী মনোনীত অন্যান্য উপ-গোষ্ঠীর (Sub-Group) নামে পরিচালিত হয়—যেমন কানোরিয়া, পোদ্দারি, খৈতান, কেজরিওয়াল, কোঠারি প্রভৃতি উপগোষ্ঠী।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে বিড়লা গোষ্ঠী (১) নতুন পণ্য তৈরি করার জন্যে ২২৮টি (২) বর্তমান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির বড়োরকমের প্রসারণের জন্য ২৬৭টি এবং নতুন কোম্পানি স্থাপনের জন্যে ৪৪৩টি, সর্ব মোট ৯৩৮টি লাইসেন্সের জন্যে আবেদন করে। এই কায়দায় বহু আবেদন করার পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য থাকে যাতে নতুন শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে, অথবা উৎপাদন শিল্পের প্রসারে নতুন নতুন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হাত বাড়াতে না পারে। ঐ আবেদনগুলির মধ্যে বিড়লাগোষ্ঠী যথাক্রমে ১০২টি নতুন পণ্যোৎপাদনের জন্য, ১৪৯টি বর্তমান শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বড়োরকমের প্রসারের জন্য এবং ১২৪টি নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যে অনুমতি পায়। এই ৩৭৫টি অনুমোদিত লাইসেন্সের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৮৪ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে দুর্লভ বিদেশী মুদ্রার অনুমোদিত পরিমাণ ছিল ২৪৮ কোটি টাকা। [সূত্র: ৭ই এপ্রিল, ১৯৬৭ সালে পার্লামেন্টে পেশ করা ডা: আর. কে. হাজারীর রিপোর্ট] লক্ষণীয় যে টাটাগোষ্ঠী এই সময়ে বিড়লাগোষ্ঠীর পেছনে—বেশ পেছনে ছিল। কিন্তু টাটাগোষ্ঠী অপেক্ষায় ছিল মাত্র। তারা ১৯৬৮ সালে একটি মাত্র সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের জন্যে ১০০ কোটি টাকা মূলধনের অনুমোদন চেয়েছে। যদিও প্রার্থিত বিদেশী মুদ্রায় কাঁচামাল আমদানির (এমোনিয়া) প্রশ্নটি জড়িত আছে বলে প্ল্যানিং কমিশন থেকে টাটার সার কারখানার আবেদন পত্রটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিশেষ কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন একথা ভাবার কারণ নেই যে টাটাগোষ্ঠীর এই অনুমোদন পেতে বিশেষ দেরি হবে।

১৯৫৮ সালে ভারতবর্ষে একচেটিয়া পুঁজির মালিক কুড়িটি পরিবারের একক ও সম্মিলিত নিয়ন্ত্রণে সমগ্র কোম্পানি মূলধনের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি ন্যস্ত ছিল। ১৯৬০ সাল থেকে আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা ও পুঁজির একচেটিয়া রূপগ্রহণ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। ফলে ১৯৫৮ সালের পরে এই কুড়িটি পরিবারের আর্থিক ক্ষমতাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সালে কোন গোষ্ঠির স্থান কোথায় ছিল নিচের সারণীতে তা দেওয়া হল।

সারণী নং ৪

গোষ্ঠী	১ শেয়ার মূলধন	২ নীট স্থায়ী সম্পত্তি	৩ নীট মূলধন	৪ মোট মূলধন
	১৯৫৮	১৯৫৮	১৯৫৮	১৯৫৮
টাটা	১ নং	১ নং	১ নং	১ নং
বিড়লা	২ নং	২ নং	২ নং	২ নং
মার্টিন বার্ন	৪ নং	৩ নং	৩ নং	৩ নং
ডালমিয়া-শাহু জৈন	৩ নং	৪ নং	৪ নং	৪ নং
বার্ড হেইলজার্স	৬ নং	৬ নং	৬ নং	৫ নং
বাঙ্গুর	৫ নং	৫ নং	৫ নং	৬ নং
এণ্ড্রু ইউল	৭ নং	৭ নং	৯ নং	৭ নং
শ্রীরাম	১০ নং	৯ নং	৭ নং	৮ নং
থাপার	৯ নং	৮ নং	৮ নং	৯ নং
কে, কে,	৮ নং	১০ নং	১০ নং	১০ নং
কস্তুর ভাই	১১ নং	১১ নং	১১ নং	১১ নং
মফতলাল	১৩ নং	১৩ নং	১৩ নং	১২ নং
ওয়ালচাঁদ	১২ নং	১৪ নং	১২ নং	১৩ নং
রামকৃষ্ণ	১৭ নং	১২ নং	১৪ নং	১৪ নং
ইন্দু সিং	১৮ নং	১৬ নং	১৬ নং	১৫ নং
মাহীন্দ্র	১৪ নং	১৭ নং	১৫ নং	১৬ নং
শেষাদ্রী	১৫ নং	১৫ নং	১৭ নং	১৭ নং
শাপুরজী	১৬ নং	১৯ নং	১৯ নং	১৮ নং
কির্লোস্কার	১৯ নং	১৮ নং	১৮ নং	১৯ নং
থাচাউ	২০ নং	২০ নং	২০ নং	২০ নং

[সূত্র : আর, কে, হাজারী—স্ট্রাকচার অব কর্পোরেট সেক্টর, পৃঃ ১৭]

দেশের কুড়িটি গোষ্ঠী তাদের বিপুল আর্থিক সম্পত্তি নিয়ে অন্যান্য ছোটো-খাটো শিল্পসংগঠকের শিল্পোদ্যোগে প্রবেশ প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। এই গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব এক্তিয়ারাধীন ব্যাঙ্ক, জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং এবং অন্যান্য ধনে লগ্নীকারী ট্রাস্ট ও কোম্পানি রয়েছে।

ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স, শিল্পোত্তোগ, ব্যবসা ও বাণিজ্য কোম্পানিগুলিতে এই গোষ্ঠীগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বা ভোট নিয়ন্ত্রণদ্বারা পরিচালন ক্ষমতা পঞ্চাশ শতাংশের বেশি। শুধু মাত্র ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলির হিসাব ধরলেও ১৯৫৮ সালে এই গোষ্ঠীগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ৩৭ শতাংশের মতো ছিল। নিচের সারণী দ্রষ্টব্য।

সারণী নং ৫

ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে গোষ্ঠীগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

	১৯৫১ সালে			১৯৫৮ সালে		
	মোট	সাধারণ শেয়ার (১)	প্রেফারেন্স শেয়ার (২)	মোট	সাধারণ শেয়ার (১)	প্রেফারেন্স শেয়ার (২)
কোম্পানির সংখ্যা	২২	—	—	২১	—	—
[লক্ষ টাকায়]						
১। মোট শেয়ার মূলধন	৯৬২	৮৯১	৭১	৮৪৩	৮৩৫	৪৮
২। নিয়ন্ত্রণাধিকারে	৩৭১	৩৬০	১১	৩১৪	৩০৯	৫
৩। ১ নং ও ২ নং-এর শতকরা হিসাবে	(৩৮·৬)	(৪০·৪)	(১৫·৫)	(৩৭·২)	(৩৭·০)	(৬২·৫

সূত্র: [ডাঃ আর. কে. হাজারী, ঐ পৃঃ ৩৫৩]

মনে রাখতে হবে যে কোম্পানিগুলির বার্ষিক অথবা অন্যান্য সাধারণ সভায় নানা অসুবিধার জন্যে অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডার উপস্থিত হতে পারেন না। যাঁরা উপস্থিত হন, তাঁরাও নিয়ন্ত্রণকারী জোটের ক্ষমতার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অনিচ্ছুক থাকেন। কারণ সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে অধিকাংশই মোটামুটি লভ্যাংশ পেলেই সন্তুষ্ট থাকেন। এই অবস্থায় মোট ভোটদান ক্ষমতার কুড়ি শতাংশ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কোম্পানিগুলি পরিচালনার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। তাছাড়া কোনো কোনো গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির আর্টিকেলে (Articles of Asson.) এমনভাবে গুছিয়ে রাখে যে অনেক বেশি টাকার শেয়ার থাকলেও ভোটদান ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম থাকে। উদাহরণ স্বরূপ জে.কে. ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন মুয়র মিলস্-এ (Muir Mills) বাঙ্গলাগ্রুপ অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডারকে নিয়ন্ত্রণ করত। যদিও জে. কে. গ্রুপ অধিকাংশ শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করত। কোম্পানির আর্টিকেল অনুযায়ী প্রত্যেকজন

শেয়ার-হোল্ডারের একটা করে ভোট ছিল, প্রত্যেকটা শেয়ার বাবদ নয়। অর্থাৎ একজন শেয়ারহোল্ডারের ১টা শেয়ার থাকলেও তার একটাই ভোট থাকবে। আর একজন শেয়ার হোল্ডারের একশোটি শেয়ার থাকলেও তারও একটিই ভোট থাকবে। এভাবে শতকরা ১০ থেকে ৪৯ ভাগ মাইনরিটি শেয়ারের মালিক হয়েও জয়েন্টস্টক কোম্পানিতে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সহজেই বজায় রাখা যায়।

কতকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৫৮ সালে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ৩১ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা ডালমিয়া-জৈন গ্রুপের হাতে ছিল। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ২০ শতাংশ বিড়লাগ্রুপের মালিকানায়, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ৫৬ শতাংশ শেয়ারের মালিক ছিল জে. কে, গোষ্ঠী আর ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্সের ৯০ শতাংশের মালিক ছিল করমচাঁদ থাপার গোষ্ঠী।

ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলির মধ্যে কনকর্ড অব ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্সের ৩১ শতাংশের মালিক ছিল এণ্ড্রু ইউল গ্রুপ, এশিয়াটিক ইন্সিওরেন্সে ২০ শতাংশ ও রুবি জেনারেলে ৪৫ শতাংশের মালিক ছিল বিড়লা গোষ্ঠী। ভারত ফায়ার এণ্ড জেনারেলে ডালমিয়া সাহু-জৈন গোষ্ঠী মোট সাধারণ শেয়ারের ৬৩ শতাংশ ও প্রেফারেন্স শেয়ারের ৬৬ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্সের ৮০ শতাংশ শেয়ারের মালিক ছিল জে. কে. গোষ্ঠী, ইণ্ডিয়ান ট্রেড এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্সে করমচাঁদ থাপার গোষ্ঠীর শেয়ার ৪৮ শতাংশ এবং নিউ ইণ্ডিয়াতে টাটা গ্রুপের শেয়ার মাত্র ৮ শতাংশ ছিল।

কিন্তু অন্যান্য লগ্নীকারক কোম্পানিতে (finance company) এই গোষ্ঠী-গুলি মোট শেয়ারের ৮৬ শতাংশ (১৯৫১ সালে) ও ৭৯ শতাংশ (১৯৫৮ সালে) নিজেদের প্রত্যক্ষ মালিকানায় রেখেছিল। সেবামূলক কোম্পানি-গুলিতে (যেমন বাণিজ্য, পাইকারী ও খুচরো চৌহন পরিবহন ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণক্ষমতার ৭৩ শতাংশ (১৯৫৮ সালে) এই গোষ্ঠীগুলি অধিকারী ছিল।

দেশের শিল্পবাণিজ্যে এই গোষ্ঠীগুলি প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য পণ্যোৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সিংহভাগ দখল করে আছে। বস্ত্র, পাটশিল্প, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইঞ্জিনিয়ারিং, খনি, যানবাহন, প্লাস্টিক, কেমিক্যাল, বনস্পতি, সাবান, ডিটার্জেন্ট, কসমেটিক, ঔষধপত্র, রেয়ন, উলজাত

দ্রব্য, লৌহের ধাতু, চিনি, কাগজ, পাব্লিশিং ও সংবাদপত্র, জমি ও গৃহ নির্মাণ, সিমেন্ট, পরিবহন, হোটেল, ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স, লগ্নী ও ম্যানেজিং এজেন্সি সহ অন্যান্য শিল্পে এদের একচেটিয়া আধিপত্য বর্তমান।

টাটা প্রধানত লৌহ ও ইস্পাত, হাইড্রো ইলেকট্রিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, মোটর গাড়ি, ট্রাক, সিমেন্ট (A.C.C.), বৃহত্তম বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (ভলটাস) বস্ত্র শিল্প, কেমিকেল, হোটেল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে নিযুক্ত।

বিড়লার বস্ত্র ও রেয়ন শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, কাগজ, চিনি, পাট, চা, কয়লা, কেমিক্যাল, গৃহনির্মাণ, কাঁচ ও প্লাস্টিক, বনস্পতি, উদ্ভিজ্জ তৈল, এ্যাসবেসটস, প্লাইউড, বিদ্যুত, মোটর গাড়ি, অগ্নি-বাতি, পরিবহন, খাদ্য প্রভৃতি শিল্পে প্রধান স্বার্থ বর্তমান। বিড়লা বার বার চেষ্টা করেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সুবিধা করে উঠতে পারে নি। কিন্তু ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্সে বিড়লা অন্যতম প্রধান ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠী।

মার্টিন বার্নের প্রধান স্বার্থ রয়েছে মূল লৌহ ও ইস্পাতে, কয়লা, সিমাটাইট, লাইট রেলওয়ে, বিদ্যুত ও পরিবহন শিল্পে। ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্সে মার্টিন বার্নের কোনো উল্লেখযোগ্য স্বার্থ নেই।

ডালমিয়া-সাহু-জৈন গোষ্ঠী প্রধানত ব্যাঙ্ক ইন্সিওরেন্স, পাব্লিশিং, সংবাদপত্র, চিনি, বস্ত্র, পাট, বনস্পতি, সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে নিযুক্ত।

দুটি বৃটিশ কোম্পানি এই কুড়িটি গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান পেয়েছে। তারা আবার নানা পারস্পরিক কোম্পানি-মালিকানা সম্পর্কে আবদ্ধ। এণ্ড্রু ইউলের মালিকানা বৃটিশ ও মার্কিন স্বার্থের অধীন। বার্ড হেইলজার গ্রুপের ৭ শতাংশ শেয়ার ক্যাপিটালে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন লগ্নী করেছে। বার্ড হেইলজারের মালিক প্রধানত বৃটিশ, বেনথল পরিবার, তার সঙ্গে অবশ্য তাদের আত্মীয় আয়রনসাইড ও কিল্লিসন পরিবারও এই গ্রুপে অর্থ লগ্নী করেছে। অনেকেরই মনে আছে যে কিছুদিন আগে অসাধু রপ্তানি ব্যবসা ও কম দাম দেখিয়ে রপ্তানি পণ্যের ইনভয়েস তৈরি করার জন্য বার্ড কোম্পানির বহু লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে। এণ্ড্রু ইউল-এর স্বার্থ প্রধানত কয়লা, পাট, চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, লগ্নী, ইন্সিওরেন্স, এবং জমিদারী ও গৃহসম্পত্তি, মহাজন প্রভৃতিতে নিযুক্ত। বার্ড হেইলজার প্রধানত কয়লা, পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্পে স্বার্থবান। তাছাড়া 'ক্যাপিটাল' সাপ্তাহিক পত্রিকার মালিক ডব্লু, এইচ, টারনেট কোম্পানির মারফতে বার্ড হেইলজার

'ক্যাপিটাল'-এরও পরোক্ষ মালিক। বার্ডের কতগুলি কোম্পানিতে বর্তমানে জালান (আসাম স মিল) বিড়লা ও আগরওয়াল (জুলনবাড়ি চা বাগান) ভগত (নৈহাটি জুট) এবং টাটা ও কর্পানী অধিকাংশ বা উল্লেখযোগ্য শেয়ার অধিকার করেছে।

বাঙুর প্রধানত জমি-বাড়ি, নদী ও বর্ড. কাগজ (বেঙ্গল পেপার) কয়লা ও পাট শিল্পে স্বার্থ সম্পন্ন। এদের অবশ্য কাপড়ের কল (শ্রী নিবাস) এবং সিমেন্টের কারখানাও আছে (শ্রী দিগ্বিজয়)। এ ছাড়া বাঙুর-এরা ইউল, ম্যাকনিল এণ্ড ব্যারি ও বামার লরীর অধীন কিছু কোম্পানি কিনে নিয়েছে।

থাপার-এরা প্রধানত কয়লা, কাগজ, চিনি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বস্ত্রশিল্প, লাক্ষা, ঘরবাড়ি নির্মাণ ও জমিদারী, ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স ব্যবসায়ে স্বার্থ সম্পন্ন। এদের প্রধান আর্থিক অংশীদার ছিলেন হায়দরাবাদের নিজাম। নিজামের অর্থানুকূল্যে থাপার গ্রীভস্ কটন নামে সুবিখ্যাত বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানিটা কিনে নেয়। তারপর, সরকারী মালিকানাধীন বল্লভপুর পেপার কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ কোম্পানির শেয়ার হস্তগত করে।

জে, কে (যুগীলাল কমলাপত সিংহানিয়া) গ্রুপের স্বার্থ রয়েছে ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, কাপড় ও পশমবস্ত্র, রং, এলুমিনিয়াম, ঘরবাড়ি, পাট, প্ল্যাস্টিক, কয়লা খনি প্রভৃতিতে।

শ্রীরাম গ্রুপ-এর মূল কোম্পানি ডি. সি. এম. ভারতবর্ষের বৃহত্তম বহুমুখী উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান। এই গ্রুপের স্বার্থ কাপড়, পশমবস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিকেল, ইলেকট্রিক ফ্যান, সেলাইকল, এয়ার কণ্ডিশনার, চিনি, বনস্পতি, রেয়ন প্রভৃতি বহু শিল্পে সন্নিবিষ্ট। এছাড়া অন্যান্য দশটা গোষ্ঠীও কমবেশি উপরোক্ত গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ সম্পন্ন ব্যবসায়ে জড়িত।

এরা উৎপাদন উপকরণ-এর মালিক, অথচ উৎপাদন হয় সামাজিকভাবে। অন্য ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিরা এদের আগ্রাসী প্রভাবের প্রতাপে প্রায় বিলুপ্ত হবার অবস্থায় সঙ্গে সংগ্রাম করে টিঁকে থাকে। ছোট ছোট শিল্প পরোক্ষভাবে বাজার ও দাম নির্ধারণে এই একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির উপর নির্ভরশীল। অসংখ্য ক্রেতাসাধারণ এদের পণ্য দাম ও বিতরণ কৌশলের অসহায় শিকার। সরকারী যন্ত্রে এদের প্রভাব অপরিসীম। সরকারী যন্ত্র

এদের ইঙ্গিতেই চলে। ডাঃ হাজারীর ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসের রিপোর্টে তা দেখানো হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা এভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতার রূপও পরিবর্তিত হচ্ছে। সরকার, পার্লামেন্ট ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির অপ্রতিহত প্রভাবের ফলে জনসাধারণের আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লুপ্ত হতে চলেছে। আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে এদের লোকজন ক্ষমতার আসন দখল করে আছে এবং এরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্ট-এর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশকে অর্থহীন, অকার্যকরী করে তুলতে পারে।

যারা একচেটিয়া পুঁজি, সামন্ত ও বিদেশী পুঁজির স্বার্থরক্ষা করতে সর্বদা প্রস্তুত তাদের নির্বাচন তহবিলে প্রচুর অর্থ যোগান দিয়ে পার্লামেন্টে ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে জনস্বার্থের বিরোধী এইসব দলের অধিকাংশ প্রতিনিধি যাতে নির্বাচিত হয় নিজেদের কোম্পানিগুলির মারফতে এরা তার সমস্ত ব্যবস্থা করে। এদের নিজস্ব মালিকানার সংবাদপত্রগুলি গণতন্ত্ররক্ষীর ভূমিকা নিয়ে সরল জনসাধারণকে প্রতারিত করে যাতে তারা নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিকে ভোট দেয়। সম্প্রতি লোকসভায় প্রকাশিত কোম্পানি তহবিল থেকে যেসব দল বিপুল অর্থ চাঁদা পেয়েচে তাদের তালিকা ও চাঁদার পরিমাণ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়।

ভারতবর্ষে আজ যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, যে অবর্ণনীয় অনিশ্চয়তা সমগ্র জাতির জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে—তার জন্যে সমগ্রভাবে দায়ী একচেটিয়া পুঁজির মালিক ও তাদের বশংবদদের জোট এবং কংগ্রেস-স্বতন্ত্র-জনসংঘ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল। এই জোটের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট—কমিটি ফর কালচারাল ফ্রীডম, কোয়েস্ট, থেকে স্টেটসম্যান, দেশ, অমৃত, আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার প্রভৃতি।

জাতির জীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলশ্রুতি হিসাবে এইসব রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অপচ্ছায়া সংগ্রামী প্রতিরোধশক্তিকে পঙ্গু করে দিতে চায়। একচেটিয়া দেশী বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে বৃহত্তম রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গঠন করে জন-মানসে এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই প্রতিটি দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীর অবশ্য কর্তব্য।

মিটিংয়ের পথে

সুজিত মুখোপাধ্যায়

টপ টপ···টপ টপ···টপ টপ···

কে যেন করাত চিরে রক্ত ঝরায়। হায় হায় আকাশ দুভাগ, চুঁইয়ে পড়ে রক্তের ফোঁটারা। বাতাসে আগুন ওড়ে, ঝড়। রক্ত বাতাস পাক খায়, পাক খায়, পাক খেয়ে ওড়ে—আর আগুন। আগুনে বিশ্ব পোড়ে, চরাচর, ঝড় ওঠে উত্তরে দক্ষিণে ঈশান নৈঋতে...আগুনে দেশ পোড়ে গাছপাছালি শস্যক্ষেত, পোড়ে ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কিউবা, বাঙলাদেশ। রক্তের মত আগুনে ছিটে জলে কুড়ে যেন টম্পাতের কলা নাপাম, পোড়া মানুষের গন্ধ, চামড়া মেদ মজ্জা···মানুষ জ্বলতে জ্বলতে আগুন ছড়ায় উত্তরে দক্ষিণে বাঙলাদেশে।

আর, মানুষ এক হয়, ভিয়েতনামে, কোরিয়া, কিউবা, বাঙলায়।

নেতাই শিস্ দিয়ে ডাকে, 'হুই···ই···অ···ব···লা···আ আ আ··· ।' তার বলদটা মাঠে চরছে, দূর দিগন্তে, তার মুখ নামান, নেতাই শিস্ দিয়ে ডাকে। ডাকলে বলদটা তাকায়। তার ডাগর কালো চোখের পাশে ঘায়ের কোঁচা। অতো দূরে নেতাই, হয়ত দেখতে পায় না, শুধু তার ডাক··· গলকম্বলের নিচে হাত বুলিয়ে ডাকটা ঘুরে ঘুরে ফেরে রোদ্রে বাতাসে। অবলার চোখে জল। খড় কুটো ছড়ান মাঠ। খড় ওড়ে ধুলো ওড়ে, রোদ্দুর···নেতাই হাঁটু অবধি কাপড়ে ঢেকে শীর্ণ পা দাপে মাঠের ধুলোয়। এখন শীতের শেষ বসন্তের আমেজ নেই—গ্রাম তার পাঁজরায়, সেই গ্রীষ্মের খোঁচা, রোদ্দুর পোড়ায়। নেতাইয়ের কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ, একটা টুকরোর মত হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে গলার ভেতরে, কে বুঝি হাত ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করে কোন গুপ্তধন কণ্ঠের গভীরে—নেতাই ওয়াক পাড়ল, একবার দুবার, পরে বসে পড়ে গল গল করে খানিক,...হর্ষে বমি করল নেতাই,

টপ টপ···টপ টপ···টপটপ···

সূর্য চোঁয়াচ্ছে আকাশ চিরে, আকাশ পোড়া কাঠ। নেতাইয়ের লাল জিভ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে সূর্য, ভূঁইয়ে, পোড়া ভূঁইয়ে ধুলো খড় হু হু হুতাশন। অনেকক্ষণ হাঁটু ভেঙে ঐ সূর্যের মত রক্তে পড়ে গলন্ত সূর্যলোকে পড়ল নেতাই। এক সময়ে, তখন সূর্য ম্লান হচ্ছে, লাল পশ্চিমের কবরে এক পা দিয়ে হাসছে, নেতাই বোধ করতে পারছে তার বলদটার ছায়া পড়েছে গায়ে, কেমন শির শির লোমকূপের গোড়ায়, নেতাই হাত বাড়াল।

হাতে ঠেকল লোম। নরম। নেতাইয়ের মনে হল একরাশ সবুজ ধানের গাছ তাকে জড়িয়ে ধরে হাসছে খলখল। তাদের মাথায় হাওয়ার ঢেউ, সর সর আওয়াজ···যেন খোল বাজিয়ে নাচে হারান চাড়াল· ঐ খোল···'ওবৌ ভাত দে জলদি, ওপাড়ায় কেত্তন শুনবার যাই; ওবৌ তোর রাঙা হাতের চুড়ি আনবার যাই, ওগাঁয়ে মেলা বসে; ওবৌ যাবি নি? নেতাই এখন বিড় বিড় করে। আর দেহে, অবলা তার খস খসে জিভ দিয়ে শরীর চাটে···শুরশুরি···, নেতাই আবছা চৈতন্যে তার ঘাড়ে গলা বাড়িয়ে দেয়। কোথায় ঘুঘু ডাকে পড়ন্ত বিকেলে। 'ওবৌ, তুই এমন করে আদর করিস আমার দিক পানে, আমার দিবার যে কিছু নাইরে···তোর কপালে সিন্দুর নাই, ওবৌ, সিন্দুর না লাগালি কেমন পর পর লাগে, তোর সিন্দুরের কৌটো ফাঁকা ক্যান বৌ?' অবলার নিশ্বাস লাগে নেতাইয়ের মুখে, কুচি কুচি জলের ছিটে। নেতাই ক্রমে ভেসে ওঠে··· সরোবর, পদ্ম ফোটে, শালুক, নেতাই একবার ডোবে একবার ভাসে, ডুবতে ডুবতে কালা পাঁক, কতকালের পুরোন দীঘি কতযুগের পচা পাঁক···এখন বসন্ত সা-র বৈঠকখানায় সেই পচা পাঁকের বাসে গা জ্বলো নেতাইয়ের। 'এবারের মত আমারে ভাগে জান বড় বাবু, আপনি মা বাপ। অখন যাই কই কন্। ও জমি কত সন চষবার লাগছি, ভাববেন, আপনার লোকসান হবো নি। বৌ মাইয়া লইয়া যাই কই কবার পারেন, আপনেরা না দেখলি।' হু হু করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবলা, তার পাঁজর সমেত শরীর ওঠে নামে, দোলা লাগে নেতাইয়ের শরীরে, নেতাই ডোবে ভাসে, কানে কথাগুলো, 'অমন কইরে যারতি আপনি মারবেন বড়বাবু, আপনারগোও মনত শরীল, দয়া মায়া··· বাবু, আমার অবস্থা তো বাকি নাই আপনের।···ঐ দশবিঘার চাষ দিয়া চাইরজন পরাণ

হু হু করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কে। কে অমন গভীর গলায় মা বলে ডাকে। নেতাইয়ের বুকের ভেতরটা পাক খায়, 'না রে অবলা, তরে বেচি নাই, তরে বেচি নাই···।' তার চোখের সামনে কশাইয়ের ছুরি ঝিলিক মারে, 'এই তো ত্যাণ্ড মারা শরীল, কতটুকু গোস্ত তার হইব চাচা।' না না, হবে না, এক ফোঁটাও গোস্ত হবে না অবলার। ওর শরীরে বেচ বলা কিছু নাই, শুধু এক মায়ের কান্না ফোঁটা ফোঁটা হয়ে জমে আছে ওর পাঁজরের নিচে, 'আমার অবলা···অবলা রে···' নেতাই অর্ধ-চৈতন্যে গলকম্বলে সুরসুরি দেয়, 'তরে আমি বেচি নাই, বেচি নাই কশাইগো কাছে।'

তখন নেতাইয়ের জ্ঞান ফিরে আসছিল। সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। মাঠে ঢালা কলস কলস রক্ত। অনেকদিন আগে কেটে দেওয়া ধানের মাথায় সে রক্ত জ্বলছে যেন দাবাগ্নি। সে দেখল, তিনটে মানুষ দূরের আল বেয়ে যায়। তাদের মাথায় গামছার ফেটি, কোমরে ডেনা। তাদের ছায়া লম্বা হয়ে সারা মাঠময় ছড়ান। নেতাই বিড় বিড় করল, তার হলুদ চোখে ক্ষীণ দৃষ্টি, 'ওরা কারা যায়রে অবলা, কোন গাঁয়ের মনিষ্যি?' অবলা জানে না, দুঃখে মাথা নাড়ে আর হাম্বা ডাকে। তার ডাকের সঙ্গে পাশে একটা নেতিয়ে পড়া মানুষ ঠাওর করে লম্বা ছায়াওয়ালা মানুষেরা নেতাইয়ের দিকে ছুটে আসে ত্রস্তে। 'ওমা, মনিষ্যিডা যে রক্তে ভাসে, দেখনি জলিল চাচা।' তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠটি ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে বসে নেতাইয়ের গা ছুঁয়ে, 'গায়ে য্যান গ্যাকা নাগে, অনেক তাপ পিত্যায় যায়, দেখ নি।' একে একে তিনটে হাত একটা কপাল ছুঁয়ে যায়, সে কপাল নেতাইয়ের। 'তুমরা কোন গাঁয়ের মনিষ্যি, যাও কনে?' গলাটায় বিচিত্র চাপ, কেমন ধ্যাস ধ্যাসে ভাঙা, কষ্টে উচ্চারণ করে নেতাই। তার বুকের ভেতরটা এখন ফাঁকা যেন ফুটবল খেলার মাঠ, হৃদপিণ্ডটা দাপাদাপি করে সেখানে। একটু দূরে অবলা, কালো গভীর চোখ নেতাইয়ের শরীরে বুলায়। 'আমার গো গিরাম। ওই ছুরি, ঐ তিন কোশ হবার পারে, বদরিপুর, চেন নি? মিছিল্ শুনতি যাই শহরে, যাবা নি!' বুড়ো লোকটি নেতাইয়ের মুখে সাদা দাড়ির ঝালর ঝুলিয়ে বললে, যুবকটিও সঙ্গে যোগ করে, 'এট্টা নতুইনে নেতা এয়েছে, তারে দেখতি যাই, যাবা নি আমার গো সঙ্গে, ঝ্যাত্তিরেই ফিরব।' 'তোমায় গিরামতক্ আগাইয়া দিবার পারি, যাও তো ওঠ।' তৃতীয় লোকটি এবার

এগিয়ে এসে টেনে তোলে নেতাইকে বগলের নিচে হাত দিয়ে। নেতাইকে শরীরে বল নেই, সমস্ত শক্তি এই দশ বিঘা জমির ওপরে এখন রাঙা হয়ে হুতাশ। দীর্ঘশ্বাস টেনে বিড় বিড় করে, 'কোথায় ফিরাইবার চাও ভাই-জান, কার কাছে ফিরাইবা, আছে নি কেও। কেও নাই, সব শূন্য। কিন্তুক তোমরা করে যাও এই ভয় বিহানে? নড়ুইরে ঘোড়া সে আবার কি দরকা।' কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এখন ধ্বনি বড় কম, কেবল ফ্যাস ফ্যাস করে ফাঁকা বন্দুকের মত, ভিন্‌গাঁয়ের সাথীরা শুধু বুঝতে পারে 'নড়ুইরে ঘোড়া।' যুবকটি ওর মুখের কাছে মুখ আনে, 'হগো, নড়ুইরে ঘোড়া। অনেক দূরের মনিষ্যি, একযুগ শুধু নড়াই আর নড়াই, ভিৎনাম না কি নাম য্যান্‌, ঠিক ঠাওর পড়ে না, সে অনেক দূরি, যাবা নি দেখতি, চলো।' তারা এখন শলা করছে, কেমন করে নিয়ে যাওয়া যায় নেতাইকে। ঐ দুঃখী মানুষটাকে। অতো বড় মিটিং নেতাই দেখবে না এটা ভালো লাগে না তাদের। যুবকটিই এগিয়ে আসে সবার আগে, 'আমি একলাই নেবার পারি, এটটুন তো শরীল, কান্ধের ওপর চাপে যাও, গড় গড় কইরে চলতি নাগব।' কিন্তু অত দুজন একেবারে হাঁত গুটিয়ে থাকতে নারাজ, তারাও চায় নেতাইকে বয়ে নিতে, অন্তত খানিকটা।

নেতাই লাল সূর্যটাকে এখন দূরের গ্রাম পেরিয়ে ডুবে যেতে দেখছে, তার শরীরে কষ্ট হচ্ছে আবার। আকাশময় এত রক্ত কেন? টক টকে লাল, যেন রক্ত বমি করছে সারা পৃথিবী। সবাই কি তবে এমন নিঃস্ব! বুকের ভেতরটা কি সবার ঝাঁঝরা হয়ে গেছে নেতাইয়ের মতোই? 'তোমার গো নড়ুইরে ঘোড়ারও কি কারবার আছে কি? তার ভাগ জমিও কি বড়বাবু ছিনে নে গেছে? তার ছাওল, বৌ…অবলা…?' ঠোঁট কাঁপে নেতাইয়ের। বুকের ভেতরে কথা আটকে যায় জমান রক্তে, মাঝে মাঝে হিক্কা ওঠে নাভির গোড়া থেকে। সরু কণ্ঠনালিটা বুঝি দমকে ফেটে পড়বে। 'হ বাপজান, তার বড়বাবু বড় ডাকসাইটে জোয়ান, সারা জাপটাই আপুন বাগাব বাসনাথান চায়। কিন্তুক ঐ নড়ুইরে ঘোড়া।…তার নামেই তো নড়াই চলে এক যুগ, একবার এ আঙিনায় তো ও পিছায় আবার।'…যুবকটির কণ্ঠে বুঝি সুর খেলে ওঠে, যেন সড়কি নিয়ে নাচে গাজনের মেলায়, 'আপুনে দেখ যেতে কেমন! নড়ুরে ঘোড়ারে হামাগুড় মারবে কি কও চাচা!'

অবশেষে যুবকটিই জয়ী হয়। নেতাইকে অত দুবল যত্নে তুলে কাঁধে চাপিয়ে দেয় তার, 'হুঁশিয়ার কেরফানউল্লা, কেলাস নি ব্যান, যইয়া যাইব কইলাম।' কেরফান টগবগ করে ওঠে, তার কাঁধে পেশী ফুলে উঠেছে, বুক বরাবর ছিলার মত টান টান নাড়ি, বুঝি টংকার দিলে এখনি বেজে উঠবে। নেতাইয়ের থুতনি ঝুলে পড়েছিল কেরফানের চুলের ওপর, চোখে লাল ছিটে, হঠাৎ কেমন আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'ভাইজান, এইটুস খায় নি, হুই যে অবলা…' তার গলাটা বুঝি চিরে যাবে এখনি, কম্পিত আঙুল তুলে সে দিগন্ত দেখায়, 'উর পাঁজরে কশাইয়ের ছাপ, মুছবার নি পার জলিল ভাই, বড় দুঃখী মুনিষ্যি উটা।' তার কণ্ঠ এতক্ষণে নিখাদ কান্নায় বুজে আসে, নোনা স্বচ্ছ জল নামে রক্তাক্ত দু চোখ কাটিয়ে, 'উরেও মুক্তি দে যাও কেরফান, বড় দুঃখী উটা বড় নক্ষী।'

তিনটি ভিন্গাঁয়ের মানুষ অবাক হয়ে দেখে অবলা দূরের মাঠে হেঁটে যায়, সূর্যটা এক্ষুনি যেখানে অস্ত যাবে, সেদিকে ফেরান তার মস্ত ছাপওয়ালা পেটটা।

প্রথম ভাগ থেকে কয়েকটি গল্প

উলফ্‌গাং বোরকার্ট

১

প্রত্যেকেরই তো একটা করে সেলাইএর কল, রেডিও এবং রেফ্রিজারেটার আছে। টেলিফোনও আছে। তাহলে এখন আমরা কি তৈরী করব? কারখানার মালিকের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

আবিষ্কারক উত্তর দিলেন: বোমা!

সেনাপতি জবাব দিলেন: যুদ্ধ!

কারখানার মালিক বললেন: তাছাড়া যদি আর উপায় না থাকে, তবে তাই হোক।

২

সাদা জামা পরা লোকটি একটা কাগজের টুকরোতে অনেকগুলো সংখ্যা লিখছিল।

তাদের সঙ্গে মিলিয়ে সে অনেকগুলি ছোট ছোট অক্ষরও লিখল।

তারপর নিজের সাদা জামাটা খুলে ফেলে সে এক ঘণ্টা ধরে জানালার ধারের ফুলগুলির পরিচর্যা করল। যখন সে দেখল যে একটি ফুল মরে গিয়েছে, তখন সে মনের দুঃখে অঝোরে কাঁদল।

এদিকে কাগজটার উপর সংখ্যাগুলো জলজল করতে লাগল। তাতে প্রমাণ করা ছিল যে ঐ ফরমুলার তৈরী সামগ্রীর এক ছটাক দিয়ে দু ঘণ্টার মধ্যে এক হাজার লোককে মেরে ফেলা যায়।

ফুলগুলোর উপর ঝলমলে রোদ এসে পড়ল—কাগজটার উপরেও।

৩

দুজন লোক কথা বলছিল।

তোমার হিসেব?

টালি দিয়ে ?

নিশ্চয়, সবুজ রংএর টালি দিয়ে।

চল্লিশ হাজার।

চল্লিশ হাজার ? ঠিক আছে। বুঝলে দাদা, যদি আমি সময়মত চকোলেটের ব্যবসার পাট তুলে দিয়ে বিস্ফোরক তৈরীর ব্যবসায়ে না নামতুম, তাহলে তোমায় এই চল্লিশ হাজার দিতে পারতুম না।

আমিও তাহলে তোমায় বাথরুম করে দিতে পারতাম না।

সবুজ টালি দিয়ে ?

হ্যাঁ, সবুজ টালি দিয়ে।

লোক দুজন দুদিকে চলে গেল।

একজন কারখানার মালিক, অন্যজন বাড়ি তৈরীর কন্ট্রাক্টর।

তখন যুদ্ধ চলছে !

৪

কানাগলি। দুজন লোক কথা বলছে।

কি খবর মাষ্টারমশাই, কালো পোষাক কেন ? শোক করছেন ?

মোটেই না। একটা অনুষ্ঠান ছিল স্কুলের একদল ছেলে যুদ্ধ করতে চলে গেল। ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিলাম। স্পার্টার কথা মনে করিয়ে দিলাম। ক্লজেউইৎস্ থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। ওদের কিছু ধ্যানধারণাও দিলাম, যেমন সম্মান, পিতৃভূমি। হোল্ডারলিন থেকে খানিকটা পাঠ করা হল। লাঙেমার্কের কথাও বলেছি। মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠান, বেশ জমেছিল। ছেলেগুলো গাইল : ভগবানই ইস্পাত তৈরী করেছেন। তাদের চোখ জলছিল—একেবারে জমজমাট ব্যাপার।

দোহাই আপনার, মাষ্টারমশাই, থামুন ! বীভৎস, কী বীভৎস !

ইস্কুলের মাষ্টার মশাইটি হতভম্ব হয়ে অন্য লোকটির দিকে তাকালেন। কথা বলবার সময় তিনি একটা কাগজের উপর ক্রশ আঁকছিলেন, অনেকগুলো ক্রশ। এবার সোজা হয়ে, তিনি হেসে উঠলেন। তারপর একটা কাঠের টুকরো নিয়ে গলির ভিতরে ছুঁড়ে দিলেন। একটা থড়াম করে শব্দ হল। গলির শেষের দিকে রাখা বোতলগুলো হুড়মুড় করে পড়ে গেছে।

সেগুলোকে ঠিক মানুষের মত দেখাচ্ছে।

৫

দুজন লোক কথা বলছিল।
কেমন চলছে?
বেশ খারাপ।
তোমার আর কজন বাকী আছে?
সব ভাল্য ভাল্য হলে, চার হাজার।
আমায় তুমি কত দিতে পারবে?
খুব বেশি হলে আট শ।
এর বেশি আর হবে না?
আচ্ছা, বড় জোর এক হাজার।
ধন্যবাদ।
লোক দুজন দুদিকে চলে গেল।
ওরা মানুষের সম্বন্ধে কথা বলছিল।
ওরা দুজনেই সেনাপতি।
তখন যুদ্ধ চলছে।

৬

দুজন লোক কথা বলছিল।
স্বেচ্ছাসেবক?
আলবৎ!
কত বয়স?
আঠারো। তোমার কত?
একই।
লোক দুজন দুদিকে চলে গেল।
ওরা দুজনেই সৈনিক।
তারপর একজন পড়ে গেল। মারা গেছে।
তখন যুদ্ধ চলছে।

৭

যুদ্ধ শেষ হলে সৈন্যটি বাড়ী ফিরে এল। কিন্তু তার খাবার রুটি ছিল না।
সে একজন লোককে দেখতে পেল, যার হাতে রুটি।
সে লোকটাকে মেরে ফেললে।

বিচারক বললেন : তোমার জানা উচিত যে তুমি লোককে খুন করতে পার না।
সৈন্যটি জিজ্ঞেস করল : কেন পারব না?

৮

শান্তির সম্মেলন শেষ হয়ে গেলে মন্ত্রীরা সহরে বেড়াতে বেরলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা বন্দুক-ছোড়ার খেলার জায়গায় এলেন। টুকটুকে লালঠোঁট মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল : "ও মশাইরা, গুলি ছুঁড়বেন নাকি?"
তখন সব কজন মন্ত্রীই রাইফেল নিয়ে ছোট ছোট কাগজের মানুষগুলিকে গুলি করলেন। এর মাঝখানে এক বুড়ী এসে তাঁদের রাইফেলগুলো কেড়ে নিল। একজন মন্ত্রী তার রাইফেলটা ফেরৎ চাইলে, বুড়ী তাঁর কান খোকস করে মলে দিল।
বুড়ীটি একজন মা।

৯

কোন এক যুগে দুটি মানুষ বসবাস করতেন। যখন তাদের ছবছর বয়স হল, তাঁরা পরস্পরকে চড় মারলেন।
বার বছর বয়সে তাঁরা পরস্পরকে লাঠি পেটা করলেন, ঢিল ছুঁড়লেন।

বাইশ বছর বয়সে তাঁরা পরস্পরের দিকে রাইফেল থেকে গুলি মারলেন।

বেয়াল্লিশ বছর বয়সে তাঁরা পরস্পরকে বোমা ছুড়ে মারলেন।

বাষট্টি বছর বয়সে তাঁরা ব্যবহার করলেন মহামারীর জীবাণু।

বিরাশি বছর বয়সে তাঁরা একই সঙ্গে মারা গেলেন। তাঁদের পাশাপাশি কবর দেওয়া হল। আরও একশ বছর পরে একটা কেঁচো মাটি খুঁড়ে তাঁদের দুজনের কবরেই ঢুকে পড়ল—তার চোখেও পড়ল না যে একদিন এখানে দুজন ভিন্ন ধরণের লোক কবরস্থ ছিলেন। তার কাছে সব মাটিই সমান, সব মাটিই সমান।

১০

৫.... শ্রীটাবে একটা ছুঁচো গর্ত থেকে উঁকি মেরে
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখল :
গাছগুলো তখনও গাছই রয়েছে।
কাকেরা তখনও কা কা কা করছে।
কুকুরেরা তখনও পা তুলতে পারে।
মাছ এবং নক্ষত্র, ঘাওলা এবং সমুদ্র—
সবই, যেমনটি ছিল তেমনই আছে।
আর, মাঝে মাঝে—
এক আধজন মানুষও দেখা যাচ্ছে।

অনুবাদ : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

[উলফ্‌গাং বোরকার্ট একজন জার্মান লেখক। তাঁর জন্ম ১৯২১-এ জার্মানীর হামবুর্গ সহরে। ১৯৪১-এ ২০ বছর বয়সে হিটলারশাহীর ফৌজের একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে তিনি রুশ রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে যান। ১৯৪২-এ আহত হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন কিন্তু পারিবারিক চিঠিতে নাৎসী শাসনের তীব্র সমালোচনা করায়, তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে তাঁর তারুণ্যের দিকে তাকিয়ে মৃত্যুদণ্ড রদ করে দেওয়া হয়। ১৯৪৪এ তাঁকে আবার রুশ রণাঙ্গণে লড়তে পাঠান হল কিন্তু তাঁর মতবাদের জন্ত তিনি আবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৫-এ হিটলারশাহীর পতনের পরই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন এবং তাঁর তীব্র যুদ্ধবিরোধী লেখা তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গিয়েছিল এবং মাত্র ২৬ বছর বয়সে সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর যুদ্ধবিরোধী নাটক— "দি ম্যান আউটসাইড" বিশ্বসাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় রচনা। তাঁর মৃত্যুর পর যে কটি ছোট গল্প ও নক্‌শা বেরিয়েছিল, তারই একটি—"ডোরিভ্‌ ক্রম এ প্রাইমার"। —অনুবাদক।]

একটা ঘরের জন্য

অসীমকৃষ্ণ দত্ত

একটা ঘরের জন্য দীর্ঘদিন সমস্ত কলকাতা
হন্তে হয়ে ঘুরে বেড়ালাম ;
একটা ছোট ঘর—বরং সম্পূর্ণ
জানলা খুলে দিলে রোদ
দরজা খুলে দিলে মুক্তি
ফালি বারান্দায় বসলে পরে
চলমান মানুষের মুখ দেখে
আমার বাঙলাকে বেন খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

এত ঘর কলকাতায়—ইন্দ্রসভা
ছড়ানো ছিটোনো, বিশ্বকর্মা নিয়ত চঞ্চল,
তবে কেন ঘরগুলোতে জানলা নেই
দরজাগুলো বন্ধ করা কেন
বারান্দাগুলোতে শুধু চকচকে চোখের বেসাতি।

আমি সারাদিন ঘুরে ঘুরে
ঘুরে ঘুরে
ক্লান্ত বড়ো, ঘরের কাঙাল,
আমি দীর্ঘদিন সারাবেলা
সমস্ত কলকাতা বাঙলাদেশ
সমগ্র বসতি হন্তে হয়ে ঘুরে বেড়ালাম।
একটা ঘরের জন্য
আমি সারাদিন দীর্ঘবেলা
পথে পথে—একা।

দরিদ্র ও অগ্নিকাণ্ড

রমেন আচার্য

বড় বিরক্ত লাগে। থু থু করে ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে বিস্বাদ সময়।
মুখ পাল্টানোর জন্য সুপুরীর যত মুখে দিয়েছি যাকে
অনেকক্ষণ ধরে উত্তপ্ত মুখের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ক্লান্ত করে শেষে

জিব দিয়ে পিষেছি, শক্ত দাঁতের ধাক্কায় মুঠো চেপে ধরে
অন্যমনস্কভাবে অনেকক্ষণ কষ্ট দিয়েছি, তারপর মুখ থেকে বের করে
থু থু করে নর্দমায় ছিটিয়ে দিলাম সেই বিবর্ণ জীবন।

বড় বিরক্ত লাগে বলে ট্রামের ছোট্ট টিকিটটার ফর্সা চামড়া
তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিই। শেষ হয়ে গেলে
বুকে হাহাকার বাজে, নিঃসঙ্গ মনে হয়।
তখন এই নরঘাতক আত্মাকে নরম শরীরের পাশে শোয়ানো যাবে না বলে
মাঠে মাঠে অনেকক্ষণ ঘুরতে হয়। তীক্ষ্ণ উদ্ধত নখগুলি
শান্ত হয়ে থাবার খাপে ঢুকে গেলে ফণা গুটিয়ে, মাথা নিচু করে সরু গলি
ও অনুচ্চ দরজা
পার হয়ে এক সময় ঘরে আসি।

পা ধুলে আগুন নেভে না। মধ্যরাত্রে মাথার মধ্যে অজস্র রাজপথে জটিল
অলিতে গলিতে
কাদা ছিটিয়ে, ঘন্টা বাজিয়ে, হেড লাইট জেলে হাজার দমকল ছোটাছুটি
করে।
হল্লা চিৎকার, আর্তনাদ। বুকের মধ্যে পোড়া গন্ধ।

জন্মের সময় সোনালী সূর্যালোক হাতে গুঁজে দিয়েছিল যে দলিল
গুপ্তধনের সাংকেতিক মহামূল্যবান সেই নক্সাটি
এখন বুকের মধ্যে ভিতরে ভিতরে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

নবজাতক

শিশির সামন্ত

আমারই রক্ত, নভোনিখিলের এই প্রভাতে
যে নবজাতক,
শুভ্র জলধিরেখা ওষ্ঠাধরে অমল হাসির,
অস্ফুটোক্তি ভাষে
গাঢ় হৃদয়ের কথা আসে।

আমার আত্মার রক্তে জবাকুসুমের মতো ভোর,
জীবনের তার মরা নদী
কে জানতো এ নাব্যতায় নিহত বুকের স্রোত যায়।

নভোনিখিলের এই পদ্মনাভে বহু তারকার
বিস্ফোরণে ছাই হয়ে,
পেটে যাবো তুমিও মানসী হবো
অক্ষয় পুরস্কার আজ।

যে মহাশূন্যের পথে নাক্ষত্রিক রক্তে
কোন পরমাণু খোঁজে আর এক জন্মের লগ্ন
অনুকম্পা সামান্য অণুকে!
গতিবিধে অনুরূপ ;
অক্ষয় নিয়তি নিয়ে এতোকাল ক্লান্ত প্রতিপাতে

এখন আত্মার ঘর নভোনিখিলের পদ্মনাভে।

যুদ্ধ নয়, ভালোবাসা

বিপ্লব মাজী

আমি চাই না সেই অস্পষ্ট সূর্য
ও আকাশ
যা শুধু যোগাবেন
রামধনু রঙের ফোয়ারা।
আমি চাই না সেই বাতাস
ও ঝড়
যা মাত্রাহীন স্তব্ধ বা
সীমাহীন উল্লাসে উত্তাল।
আমি চাই না সেই পরিকল্পিত
শহর
যা কেবল মোজায়েক পাথর ও
অ্যালুমিনিয়ামে উদ্ভাসিত
যা কেবল
পেট্রোলের ঝাঁঝালো
গন্ধ আনে নাকে।
আমরা প্রত্যেকেই খুঁজি,
উদ্দাম ফেনিল স্রোতস্বিনী, ঝর্ণা, উপবন

এবং গ্রামের কিষানী ও তার
যুবতী মেয়ের সাথে
মধুর সংলাপ
আমরা প্রত্যেকেই খুঁজি,
ঈগল বাজপাখির মত গান
অথবা মৌলিক বিস্ময়,
যাকে জেনেও
জানার আগ্রহ থেকে যায়
আমরা প্রত্যেকেই খুঁজি,
বিপদসংকুল সাহারা, প্রণালী-পথ অথবা
[illegible] মেরুর উপর দিয়ে
হেঁটে যেতে
অথবা
তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামে
সন্ধান মেলে যদি কোন নবাগত অণু
আকাশ-যুদ্ধ থামিয়ে দিতে
আমরা প্রত্যেকেই খুঁজি,
যুদ্ধ নয়, ভালোবাসা,
মানুষের পৃথিবীতে।

সময়

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

বাইরে অন্ধকার ভিতরে আমরা ;
রাত কালো কাঁচের মত হিম।
চুল্লীর গনগনে চোখের আলো আমাদের মুখের উপর।
পরস্পরের মুখ আমরা তন্ন তন্ন পড়ে নিচ্ছি—সেই আলোয়।

বাইরে
এখনো ওৎ পেতে আছে অন্ধকার
বরফের মত ঠাণ্ডা আর কঠিন ;
ভিতরে মুখোমুখি আমরা।

শেষবারের মত রাত না ফুরতেই
এসে জড়ো হয়েছি চায়ের টেবিলের পাশে।

কেটলির জল মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠে
হিস্ হিস্ শব্দে ছোবল মারছে নিস্তব্ধতাকে
আগুনের চোখ থেকে থেকে জেলে দিচ্ছে—হাওয়া।

অন্ধকার স্থির।

দেয়াল ঘড়ির হাত
টক্‌টক্ শব্দে টোকা দিয়ে যাচ্ছে
ঘুমিয়ে পড়া সময়ের দরজায়।
চোখের-পলকে-জেগে-ওঠা
অতীত এবং মৃত সমস্ত মুহূর্তগুলি
একে একে জড়ো হচ্ছে চুল্লীর পাশে
সেখানে
আমাদের জন্য ফুটছে উষ্ণ পানীয়
আর নিঃশব্দ প্রতীক্ষা।

খণ্ড খণ্ড সময়গুলি একত্রে
অখণ্ড একটি সময়ের হৃৎপিণ্ডের মত
দপ্‌ দপ্‌ করছে আগুনের গর্ভে।
এখন একটিই মাত্র সময়।
বাইরে অন্ধকার
ভিতরে আমরা।

মুহূর্ত আর কয়েক মুহূর্ত—
শেষ পেয়ালায় চুমুক দিয়ে
যে-যার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার ঠিক আগেই
ওই একটাই হৃৎপিণ্ডকে আমরা
তুলে নেব
যার যার হৃৎপিণ্ডের
ঠিক
পাশে

চিঠি

তরুণ সেন

কথা ছিল পৌঁছে দেব। সময় নিষ্ঠুর এক সিপাহসালার
নির্মম মনিব। যেতে হবে—নোনা জল ঘেরা পরিখার
ভগ্ন সেতু। শীর্ণ জানু কাঁপে যেতে এপার ওপার
ডাকঘরের ছুটি ছিল। চিঠি ফিরে আসে ঠিকানায়।

হলুদ সকালে কিছু শুভ্রমুখ কিশোরীকে ডেকে
প্রশ্ন করি—দেখেছিলে? যুবতীরা হাসে উত্যক্ত
প্রৌঢ়ের দরবারে বৃথা কৌতূহল। ব্যস্ত রমণীরা,
সন্তান সম্ভবা কোনও নব্যবধূ। ত্রস্তে যায় হেঁটে।

তারপর রাজপথে। পৃষ্ঠে ছুটে আসে হাওয়ার চাবুক
হেঁটে যাই—ক্রীতদাস। পূর্বপুরুষের কিছু ঋণ
বাকী আছে। রক্তে ঘামে জ্বলে ওঠে বুক
চৌমাথায় দীর্ঘ ছায়া। ক্লান্ত আসে বলে, 'কই দিন?'

'চিঠিটা' সন্দিগ্ধমতি বহু দিন। বিশেষতঃ হিসেবী প্রখর,
বলি—'তুমি! বল দেখি কোন্ চিঠি, কি আছে খবর?
আতস কাচের খাঁজে ইদানীং জমেছে প্রচুর
নোনা জল। চোখে ছায়া—তাছাড়া দেখিনা বহুদিন—'
'এই যে—নিশ্চয় চিহ্ন'। দেখি শীর্ণ কাগজের ভাঁজে
পদ্মদীঘি রক্তলাল—সূর্য তার বুকে শুয়ে আছে!

ভারতবর্ষ

অজন কর

ভারতবর্ষের আকাশ ক্রমশ হরিদ্রাবর্ণ হয়ে আসে, পূর্ব
ও দক্ষিণে রক্তমেঘ, বারুদের গভীর টার্গেট
ছুঁয়ে হেসে উঠবে ব্যথিত রক্তিমা—তাই দূরে
শিতাভ আলেনী চড়ে জয় জয় শব্দ, ধ্বনি—

মতোন ছন্দে ঘন হয়ে বসা—চলাফেরা
　　বুকের কোথায় যেন টান, বালি ওড়াউড়ি
হঠাৎ বলতেই বুড়ি ছুঁয়ে ফেলা—
　　　　সমানে গভীর হলে একদম পছন্দ করিনা

সমুদ্রের পাড়েই যেন যত শব্দ—ঢেউ, কলোচ্ছ্বাস
তোমার সমস্ত শরীর হয়ে গেছে, রেগে ওঠা রক্তের
কার্তুজ ও টর্চ তোমার হাতে হাতে ঘুরছে,
　　　　　　　　　　　　　　　　এখন সময়
হলেই তুমি তোমার সশস্ত্র নিষ্ঠার কাছে যাবে,
　　ভারতবর্ষ
　　　　তোমার পূর্ব ও দক্ষিণে রক্তমেঘ, প্রার্থনা
অনিবার্য কোথায় ফেলেছো সার্চলাইট !

একটি নেতার জন্ম

বিশ্বজিৎ সেন

কোনো সন্ধ্যায় নাকী একজন লোক—
রাস্তায়—মানুষের ভিড়ে সংগ্রহ করেছিলো একটি চতুর নির্মোক।
তারপর—আরো কিছু খুঁজে পেতে—সেই ব্যক্তি পরিণত হলো
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　মানুষরে—

মানুষরা—আরো কিছু আনুষঙ্গিক—জনতার সোজাস খবরে।
আমি কিন্তু চুপি চুপি তাকে বলেছিলাম পূর্বাহ্নেই—
"আপনার মুখের ছাঁচটা কিন্তু রয়ে গেলো ফেলে আসা রাস্তার
　　　　　　　　　　　　　　　　　　মোড়ে।"

দুটি কবিতা

সালভাতোর কোয়াসিমোদো

শীতের রাত্রি

আবার শীতের রাত্রি
অন্ধকার টুপটাপ ঝরে গ্রামে জনহীন গির্জার শিখরে
কুয়াশায় ছায় নদী। অবরুদ্ধ হয়ে যায় কাঁটাতারগুলি। ও কমরেড
তোমার হৃদয় কোথা চলে যায়। আর সমতলে
আমাদের ঠাঁই নেই। তুমি এই স্তব্ধ অন্ধকারে
ফুঁপিয়ে স্মরণ করছো জন্মভূমি, আর
রঞ্জিত রুমাল ছিঁড়ছো কুটি কুটি নেকড়ের আগ্রাসে।
জাগিয়োনা ছেলেটিকে, ঘুম যাচ্ছে ও তোমারই পাশে
পোষাকের ছেঁড়া ভাঁজে জড়ানো রয়েছে নগ্ন দুটি পা, তাহলে
কেউ যেন না মনে করায় ওকে জননীর মুখ
কেউ যেন মনে না করায়
ওকে স্বদেশের নাম বলে।

তুষার

সন্ধ্যা হল
চলে যাবে তোমরা সবাই এই আমাদের ফেলে
পৃথিবীর এইসব রূপশালী দৃশ্যপট : গাছ, পশু
সৈনিকের লম্বাকোটে আপাদমস্তক মোড়া গরিব মানুষ
অশ্রু ও জঠর শুষ্ক যত হতভাগিনী জননী
বিস্তীর্ণ প্রান্তর হতে জ্যোৎস্নাপ্রায় যেনবা ধবল জ্যোতিচ্ছুরিত উদ্ভাসে
আমরা সবাই। আ মৃতরা সব। তবে করাঘাত করো
হা কপালে, আঘাতে জর্জর হোক হৃৎপিণ্ড তোমার
—এই কবরস্থ শাদা দিগদিগন্ত থেকে
একজনো চিৎকার করো—
নির্জন মুহূর্তে এই, অন্তত একজনো।

অনুবাদ : শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা বিপ্লবের দায়

শ্যামল চক্রবর্তী

যে কোন সমাজ-ব্যবস্থাই যে তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রয়োজনমত নিজের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গড়ে তোলে, তা একটি সুপরিচিত সমাজ-তাত্ত্বিক তত্ত্ব। প্রাক্‌বৃটিশ যুগে ভারতবর্ষেও শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিলো পাঠশালা ও টোলে, মণ্ডপে এবং মাদ্রাসায়, অথবা নালন্দা, তক্ষশীলা, বল্লভী, কাশী, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী ও নদীয়ার মত হিন্দু বা বৌদ্ধ, কিংবা লাহোর, দিল্লী, রামপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, জৌনপুর, আজমীর বা বিদরের মত মুস্লিম উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে। এই সব উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে ছাত্ররা শুধু ব্যাকরণ ও ন্যায়, দর্শন ও ধর্ম চর্চাই করতো না, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র, ভেষজচিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসা, কৃষিবিজ্ঞান ও পশুতত্ত্ববিদ্যা, যোদ্ধৃবিদ্যা ও ব্যবহারশাস্ত্রও শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের জন্য জমির মাপ ও কেনাবেচার হিসাব থেকে আরম্ভ করে, পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ, এবং যোদ্ধা ও শাসক পর্যন্ত সকলের জন্যই প্রয়োজনমত শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়েছিলো। তখনকার দিনের সামাজিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত শিক্ষাব্যবস্থা সেই সমাজকে ধরে রাখবার কাজ করে যেতো। কিন্তু এটা এক দিক মাত্র। কারণ মানুষকে চিন্তা করতে শেখালে সে যে নির্দিষ্ট রেখা ধরেই চিন্তা করবে এমন কোন কথা কোনকালেই ছিলো না। তাই সে যুগেও চিন্তার জগতে সংঘাত এসেছে। সমাজ-জীবনে অন্যায়, অবিচার, ও অত্যাচারের প্রতিবাদ হয়ে, পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলস্বরূপ বিদ্রোহী চিন্তা আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু সে সংঘাত চিন্তাজগতে অনেকাংশেই রূপ নিয়েছে ধর্মের ক্ষেত্রে বিদ্রোহে, দর্শনে নূতন পন্থা নির্ণয়ে। সমাজের যেমন মৌল পরিবর্তন ঘটেনি, নতুন কোন শ্রেণী অর্থনীতিতে ও রাজনীতিতে ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয় নি, শিক্ষাব্যবস্থাও তার প্রাচীন রূপ পরিবর্তন করে নি।

শিক্ষাব্যবস্থার মৌল পরিবর্তন এলো কিন্তু অনেক পরে, বৃটিশ আমলে। প্রবর্তন হলো ইংরাজি শিক্ষার; তার পেছনে এলো আধুনিক বিজ্ঞান। ইংরেজদের মধ্যে যাঁরা নতুন শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষ নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকের

হয়তো সত্যই "অসভ্যকে সভ্য" করার সদুদ্দেশ্য ছিলো ; অনেকের হয়তো ইচ্ছা ছিলো এই সুযোগে খ্রীষ্টান ধর্মে ভারতবাসীকে ধর্মান্তরিত করা ; কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে বৃটিশ শাসকশ্রেণী বুঝেছিলেন যে এতো বড়ো দেশকে শাসন ও শোষণ করতে গেলে প্রয়োজন নতুন এক শ্রেণী, যারা নতুন অর্থনীতি ও রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থার যুক্তিটি সঠিকভাবে ধরতে পারবে, তার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল থাকবে এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশাধীনে সমগ্র শাসনব্যবস্থা চালু রাখবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তার উদ্দেশ্যে প্রভূত পরিমাণে সফল হয়েছিলো। নিজেদের শোষণের সুযোগের বিনিময়ে, দেশী সামন্ততন্ত্র ও জমিদার শ্রেণী বিস্তৃত কৃষকসমাজকে সামলে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলো, দেশী ধনিক-বণিক শ্রেণী দিয়েছিলো ব্যবসায়ে সহযোগিতা আর ইংরাজীশিক্ষিত মধ্যবিত্ত কেরানী, কর্মচারী, অফিসারকুল ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে ধরে রেখেছিলো।

স্বভাবতঃই এর ভিতর থেকে সংঘাতও গড়ে উঠেছিলো। নিষ্পেষিত কৃষক মজুর অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত আঘাত হানছিলো, ধনিক-বণিক শ্রেণী তার সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত আন্দোলন সুরু করেছিলো ; শিক্ষিত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত বেকার এই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলো। এক কথায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিভিন্ন ধারা এসে জাতীয়-স্বাধীনতার আন্দোলনকে বিস্তৃত ও বিশাল করে তুলছিলো।

এর অনিবার্য প্রতিফলন দেখা গিয়েছিলো চিন্তা ও আদর্শের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাব্যবস্থায়। প্রথম যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন ইংরাজি ও বিজ্ঞানশিক্ষাকে স্বাগত জানাতে, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মত, তাঁরা বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতের মৌল পরিবর্তনের রাস্তাও তৈরি করছিলেন। পরবর্তীকালে বেশি বেশি অংশ যেমন এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তেমনি এই ব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হয়েছিলো শিক্ষিত ভারতবাসী। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বারবার ঘোষিত হয়েছিলো। এই ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই সৃষ্টি হয়েছিলো এর বিরোধী শক্তি। মেকলের ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছিলো। "...having become instructed in European knowledge, they may in some future age, demand European institutions."—বলেছিলেন মেকলে। ভারতবাসী ইউরোপীয়দের

সত্তোই জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবি করেছিলো, সংগ্রামে নেমেছিলো। —অবশ্য পরে ঠিক তারই পাশে পাশে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দাবিও উঠেছিলো। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আদর্শ স্থাপন করেছিলেন; ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর তত্ত্বাবধানের বাইরে স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার চেষ্টায় রত ছিলেন; গান্ধীজী এককালে Devilish institutions"-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করার কথা বললেও, পরে শাসকশ্রেণী প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি বুনিয়াদী শিক্ষার নতুন রাস্তা দেখাবার চেষ্টা করেন। এরকম আরও বহু উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে বৃটিশ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত করে তার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অন্য কোন ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় নি, যা হয়েছিলো তা তৎকালীন ব্যবস্থার প্রতিবাদ, সমালোচনা, উন্নতির প্রস্তাব ও তদনুযায়ী কিছু কিছু প্রয়াস এবং সামগ্রিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত, যার প্রকাশ খানিকটা দেখা যায় কংগ্রেস-সৃষ্ট প্ল্যানিং কমিশনের শিক্ষাসম্পর্কীয় পরিকল্পনায়।

তারপর স্বাধীনতা এলো। ভারতের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো নতুন শ্রেণী। পুরানো আমলের শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে পেলে পরেও, নতুন চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তুইটি ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন হলো। ১৯৪৯ সালে ভারতের সংবিধান প্রণীত হলো; ঐ সালেই বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টও উপস্থাপিত হলো ভারত সরকারের কাছে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণের সভাপতিত্বে এই কমিশন ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে ভারতসরকার গঠন করেন।

সম্ভ-স্বাধীন দেশের উৎসাহ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা-কমিশন ঘোষণা করলেন: ভবিষ্যতের স্রষ্টা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পুরোনো আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেনা (The Universities as the makers of the future cannot persist in the old patterns,...)। সংবিধানের মুখবন্ধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিক্ষার পুনর্গঠনের আদর্শ হিসাবে হাজির করা হলো গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। জাতির মূল সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতালাভ করা, সাধারণ সমৃদ্ধির বিস্তার, জাতি, ধর্ম, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ঘুচিয়ে গণতন্ত্রকে কার্যকরী করে তোলা এবং সংস্কৃতির মানোন্নয়ন। ঘোষণা করা হলো যে উপরোক্ত উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করতে

শিক্ষা এক মহাশক্তিশালী অস্ত্র। কিন্তু গোড়াতেই বলে রাখা হলো যে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাই হলো আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত দুর্বল ক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষাসংস্কারের যে কোন প্রস্তাবই বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি না বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করা যায়।

তিন বছর পরে ১৯৫২-র সেপ্টেম্বর মাসে মাধ্যমিক-শিক্ষা-কমিশন নিয়োজিত হলো। মাধ্যমিক-শিক্ষা-কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন ১৯৫৩ সালের জুন মাসে। মোটামুটি বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা-কমিশন যে শিক্ষার আদর্শকে উপস্থিত করেছিলেন তাকেই আরও কিছুটা পরিবর্ধিত করে হাজির করা হলো এখানে। শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা বড়ো পরিবর্তন কিন্তু এখানে উপস্থিত করা হলো। বলা হলো : ১০ বছরের স্কুল-পাঠক্রম বদলে ১১ বছরের করো ; একমুখী শিক্ষার পরিবর্তে বহুমুখী, অন্তত বর্তমানে, পঞ্চমুখী ব্যবস্থা প্রবর্তন করো, কলেজের ইন্টারমিডিয়েট কোর্স তুলে দাও।

একটা বড়ো পরিবর্তনের সূচনা হতে লাগলো শিক্ষাজগতে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লো ; উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান-গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো ; নতুন বহু বিষয়ের চর্চা সুরু হয়ে গেলো, প্রচুর নতুন কলেজ খোলা হলো। স্কুল ও ছাত্রসংখ্যাও প্রচুর বাড়লো। বেশ কিছু হাই স্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারি করা হলো ; অনেক রাজ্যে ইন্টারমিডিয়েট পাঠক্রম উঠে গেলো। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেই 'ডিগ্রি' ক্লাসে ভর্তি হতে লাগলো ছাত্ররা ; নিতান্ত যারা দশ ক্লাসের 'স্কুল ফাইন্যাল' পাশ করে এসেছে তাদের জন্য তৈরি হলো নতুন 'প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়' নামক এক বছরের পাঠক্রম। অবশ্য কতকগুলি রাজ্য শেষোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যাই হোক অগ্রগতির লক্ষণ নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানে পাওয়া যাবে ;

	১৯৫০-৫১	১৯৬৫-৬৬ (আনুমানিক)
৬ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের হিসাবে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র	৪২·৬%	৭৪·৩৩%
১১ „ ১৪ „ „ „ ৬ষ্ঠ „ ৮ম „ „	১২·৭%	৩০·১৫%
১৪ „ ১৭ „ „ „ ৯ম „ ১০ম „ „	৫·৮%	১১·৮%
১৭ „ ২৩ „ „ „ কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের „	০·৭%	১·৯%

(All India Educational Survey, 1967 ও India 1967)

কেউ-কেউ-হয়তো বলবেন,—বাঃ এই-তো বেশ বেড়েছে ! কিন্তু ঘটকা থেকে গেলো এতো সত্বেও।

একটা অশান্তি মনের মধ্যে পাক খেতেই থাকে : কোথায় যেন চোরাবালিতে সব কিছুই ডুবতে বসেছে। তৃতীয়র পর চতুর্থ পরিকল্পনা সুরু হতে পারলো না ঠিকমত। সমগ্র অর্থনীতি টলমল করছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে ; উৎপাদন বাড়ছে না ; ব্যবসায়ে মন্দা, দেশের অর্থনীতির ওপর একচেটিয়া ধনপতিদের কব্জা বাড়ছে ; বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে, রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা ব্যাপক ; উপদলীয় কলহ সবত্র, ছাত্রবিক্ষোভ বাড়ছে, তার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার অংশ ক্রমেই প্রাধান্য অর্জন করছে ; শিক্ষাকর্তৃপক্ষের মধ্যে উপদলীয় কলহ, পরস্পরবিরোধী চক্রান্ত, শিক্ষার মানের অবনমন এবং চাকুরী ও অর্থসংক্রান্ত নানাবিধ দুর্নীতির উদাহরণ বেশি বেশি জনসমক্ষে হাজির হচ্ছে ; এবং সর্বোপরি উপরে যে সংখ্যাতত্ত্ব হাজির করা হয়েছে তাকে উল্টে দেখলেই সমস্ত শিক্ষা-ব্যাপারে অক্ষমতা, অভাব ও পশ্চাৎপদতা প্রকট হয়ে ওঠে।

অর্থাৎ, দেশ স্বাধীন হবার এতো দিন পরেও ভারতের শতকরা ৭৬ জন নিরক্ষর। সংবিধানে বলা হয়েছিলো যে সংবিধান চালু হবার পর ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছরের সমস্ত ছেলেমেয়েদের সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দেখাই যাচ্ছে যে এখনও ৬ থেকে ১১ বছরের ছেলে-মেয়েদের কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ ও ১১ থেকে ১৪ বছরের শতকরা ৭০ ভাগের বেশি স্কুলে পড়ে না। যারা সেকেণ্ডারি পর্যায়ে উঠতে পারে না সেই বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৮২ জন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ২জনও ঠাঁই পায় না।

অর্থাৎ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উচ্চশ্রেণীর সন্তানদের জন্য উচ্চশিক্ষা রইলো এবং নিম্নতম শিক্ষা থেকেও বিশাল জনসমষ্টি বঞ্চিত। ফলে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নেতৃত্বের চাবিকাঠি প্রিভিলেজ্‌ড্‌ ক্লাসের হাতে নিরঙ্কুশভাবে বর্তমান। বহুকথিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ছবি ভ্রমকারী মরীচিকায় পর্যবসিত।

এই পটভূমিকায় ১৯৬৪ সালের ১৪ই জুলাই ডক্টর কোঠারির সভাপতিত্বে 'শিক্ষা কমিশন' গঠিত হয় ও শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন ১৯৬৬ সালের ২৯শে জুন। শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্র বিচার হিসাবে ভারত

সরকার এঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কমিশনও সাধ্যমত সে দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করেছেন।

শিক্ষা কমিশন দুটি বিষয়ের প্রতি গোড়াতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ হলো আসলে 'যৌবনের দেশ,'—a land of youth! দেশের জনসংখ্যা এখন প্রায় ৫০ কোটি! এর অর্ধেকের বয়স ১৮ বছরের কম। দ্বিতীয়তঃ বহুশতাব্দীর নিপীড়নে পিষ্ট ভারতবর্ষের জনতা আজ জেগেছে ও দাবি করছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনধারণের উন্নততর মান ও উন্নততর নাগরিক জীবনের সুযোগ। ঘটেছে একটা আশা আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ,—explosion of expectations! ভারতের শাসকবর্গকে এই যৌবনের দাবি, এই আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণের মোকাবিলা করতে হবে; আর সেই সঙ্গে অর্থ নৈতিক কর্মিকুতার চোরাবালি থেকে উদ্ধার পেতে হবে। (পৃঃ ১-৩)

শিক্ষা কমিশন সোজাসুজি বলেছেন যে মানবশক্তির উন্নয়ন ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন যে দেশ কখনও খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারবেনা যদি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র কৃষক সমাজকে যুগযুগান্তের রক্ষণশীলতার গ্রাস থেকে মুক্ত করা না যায়, তাকে নতুন পরীক্ষায় আগ্রহী করে তোলা না যায়, যদি উৎপাদন বাড়াবার নতুন কৌশলে ব্যবহার করতে তাকে প্রস্তুত করে তোলা না যায়। (পৃঃ ৪)

শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বাহন এবং সামন্ততন্ত্র ও প্রাচীন সমাজের দ্বারা সীমিত।—বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এই চৌহদ্দির মধ্যেই আটক রয়েছে। একে মূলতঃ পাল্টাতে হবে; পাল্টাতে হবে লক্ষ্যে, বিষয়বস্তুতে, শিক্ষণপদ্ধতিতে ও কার্যক্রমে, ছাত্রসংখ্যায় ও তার প্রকৃতিতে, শিক্ষক নির্বাচনে ও তাদের প্রস্তুতিতে, এবং সমগ্র সংগঠনে। বস্তুতঃ, প্রয়োজন শিক্ষাবিপ্লবের, যা নিয়ে আসবে বহু আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব। (পৃঃ ৫)

কমিশনের মতে শিক্ষা হবে: (১) উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত; (২) সামাজিক ও জাতীয় সংহতি এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বাহন; (৩) আধুনিকীকরণের পথ-প্রদর্শক; (৪) সামাজিক, নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে যুব-চরিত্রের স্থপতি। বিশেষ করে প্রথম লক্ষ্যটিকে সার্থক করে তুলতে গেলে বিজ্ঞানকে সমগ্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক মৌলিক উপাদানে পরিণত করতে হবে। উৎপাদন-কার্যে অভিজ্ঞতা, ক্ষেতে খামারে বা ফ্যাক্টরির কাজের অভিজ্ঞতাকে,—

সাধারণ শিক্ষায় এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রচনা করতে হবে। শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে, বৃত্তিমূলক ভাবে গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন করতে হবে। (পৃ: ৬)

শিক্ষা কমিশন আজ দুবছর হলো সরকারের কাছে তাঁদের রিপোর্ট হাজির করেছিলেন। দুবছর পরে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট 'জাতীয় শিক্ষানীতি' সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এ প্রস্তাব শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত হলেও, কোথাও কিছু কিছু পরিবর্তন ও কোথাও-বা সুবিধামত নিশ্চুপতার সাহায্যে এতে মূল নীতিগুলি থেকে অনেকখানি পশ্চাদপসরণ করা হয়েছে। তাছাড়াও অন্যান্য সমালোচনার বিষয়ও রয়েছে যা এখানে না তোলাই বাঞ্ছনীয়।

আসলে শিক্ষা-কমিশনের প্রস্তাবের মূল চ্যালেঞ্জ এসেছে বাস্তব জীবন থেকে। গত ৩১শে মে, ১৯৬৮ তারিখে কলকাতার ষ্টেট্সম্যান কাগজে বেরিয়েছে—এমপ্লয়মেন্ট-এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ১৯৬৬ সালে ছিল ৯,১৭,৪৮৭, কর্মসংস্থান হয়েছিল ১,৭১,৩২৬-জনের; ১৯৬৭ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো, যথাক্রমে ১০,৮৭,৩৭১ এবং ১,৫১,৪৪২। শ্রম-মন্ত্রীর মতে অনুরূপ কর্মপ্রার্থী এঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে ছিল যথাক্রমে ২৬,৩৮৯ ও ২৭,৯৪৫; কর্মসংস্থান ঘটেছিল যথাক্রমে ১১,১১৫ এবং ৭৬৮২ জনের। আর কে না জানে অল্পসংখ্যক বেকারই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখায়।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার অভিযান চালালেন,—এঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কমাও। তাঁরা অনেকাংশে সফলও হয়েছেন।

এ সমস্যার আসল চাবিকাঠি কিন্তু রয়েছে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে। শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্টে ছাত্রভর্তি ও জনশক্তি (Enrolment and Manpower) সংক্রান্ত পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থনৈতিক বিকাশ ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় এঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি-বিদ্যা বিকাশের যে পরিকল্পনা হাজির করেছেন, বাস্তবে তা কার্যকরী হচ্ছে না। ঘটবে যে না এরকম সন্দেহ অনেকেই প্রকাশ করেছিলেন; এই সূত্রে সেই সময়ে ষ্টেটস্ম্যানে প্রকাশিত শ্রীঅমর্ত্য সেনের প্রবন্ধ আমাদের মনে পড়ে। যাই হোক, যদি অর্থনৈতিক বিকাশ না

ঘটে, যদি এঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিভায় শিক্ষিত যৌবনশক্তি উৎপাদন বাড়াবার কাজে না লাগে, তাহলেও উচ্চ শিক্ষার তাগিদ তো চেপে রাখা যাবে না। তাহলে বেশি বেশি ছেলেমেয়ে শুধুই কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য পাঠক্রমে এসে ভর্তি হবে। অর্থাৎ, বেকার সংখ্যা বাড়বে—শুধু প্রকাশিত পরিসংখ্যানে বিভিন্ন খাত অনুযায়ী সংখ্যার হেরফের হবে মাত্র।

অথবা, যদি অন্তত সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রভর্তি কমিয়ে দেন, তাহলেও কি সমস্যার সমাধান হলো? এতে উচ্চশিক্ষিত বেকারের জায়গায়, অল্পশিক্ষিত বেকার, এবং অল্পশিক্ষিত বেকারের জায়গায় অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়বে মাত্র শুধু। পরিসংখ্যানের সূচীতে শতক সংখ্যার হেরফের হবে—জীবনের কি এতে কোন পরিবর্তন ঘটবে?

এই কি যৌবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা, যৌবনের অভিষেক?

তবে কি এ কথা তাঁরা বলবেন যে অর্থনৈতিক দুর্যোগটা স্বল্পকালস্থায়ী? দুঃস্বপ্ন কেটে গেলেই আবার পুরোদমে বৃদ্ধির কাজ চলতে থাকবে।

তাও যদি সত্যি হয়, তাহলে শিক্ষাকমিশনের উন্নয়ন পরিকল্পনার দিকে তাকিয়ে দেখা যাক :

শিক্ষাস্তরানুযায়ী বয়ঃক্রমের জনসংখ্যার, শতক হিসাবে ছাত্রছাত্রী

শিক্ষাস্তর	সাল ১৯৬০-৬১	সাল ১৯৭৫-৭৬	সাল ১৯৮৫-৮৬
প্রাথমিক—			
১ম – ৪র্থ শ্রেণী	৫৪·৮	৮৯·৭	১১০·০
৫ম—৭ম „	২৪·৩	৬৯·২	৯০·০
মাধ্যমিক—			
৮ম—১০ম শ্রেণী (সাধারণ)	১২·৮	২৭·৩	৩৯·৮
৮ম—১০ম „ (বৃত্তিমূলক)	০·৪	১·৯	৯·২
১১শ—১২শ „ (সাধারণ)	২·৮	৫·৯	১০·২
১১শ—১২শ „ (বৃত্তিমূলক)	২·১	৫·১	১০·২
বিশ্ববিদ্যালয়—			
আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট (সাধারণ)	১·৮	৩·৬	৪·৫
„ (বৃত্তিমূলক)	০·৬	১·৪	২·২
পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট	০·৩	১·০	২·১

(রিপোর্ট—পৃঃ ১০০)

এই হিসাবে দেখা যায় কি হারে বৃদ্ধি হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু এই কি "শিক্ষাবিপ্লব" ? স্বাধীনতা-উত্তর ৪০ বছর পরেও তো ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সবাইকে দিয়ে ওঠা যাবে না! পরপর অন্যান্য স্তরগুলিও লক্ষণীয়! রিপোর্টের দুই পৃষ্ঠা পরেই তো বলা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের মতো অগ্রসর দেশ ইতিপূর্বেই শিক্ষার যে অগ্রগতিতে পৌঁছেছে শিক্ষা-কমিশন তাঁদের লক্ষ্য তার থেকেও নিম্নস্তরে রেখেছেন। (পৃঃ ১০২)

আরও লক্ষণীয়, শিক্ষা-কমিশনের নির্ধারিত লক্ষ্যও রাখা যাচ্ছে না; রিপোর্ট প্রকাশের দুই বছরের মধ্যেই তা বানচাল হতে বসেছে।

শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টে এতো ভালো কথা থাকা সত্ত্বেও,—বিশেষ করে, মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনের দিকে এতো সুনিশ্চিত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও,—যে 'শিক্ষা-বিপ্লব' এ দেশের পক্ষে কাম্য ও অপরিহার্য তার 'ব্লু-প্রিণ্ট' বা নক্সা এতে হাজির করা হয় নি। এ দেশের শাসকশ্রেণীর সীমাবদ্ধতার ছাপ এর সর্বাঙ্গে। একদিকে রয়েছে উচ্চ-আকাঙ্ক্ষার সাধু উদ্দেশ্যের ঘোষণা; আর তার পাশেই রয়েছে অক্ষমতার অনিবার্য সঙ্কেত, আত্মার অভাবের ছাপ, পরিকল্পনার দুর্বলতা। শাসক শ্রেণীর কল্পনা আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে প্রতিফলিত করছে এই রিপোর্ট।

কমিশনের রিপোর্টের অন্তর্নিহিত দুর্বলতায় এবং শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় জনমানসে হতাশা যখন ক্রমবর্ধমান, সেই সময়ে বেশ কিছু গণ্যমান্য পণ্ডিত ব্যক্তি বলতে আরম্ভ করেছেন,—পুরোনো দিনের শিক্ষাব্যবস্থাই তো ছিলো ভালো; বন্ধ করো, সংস্কারের নামে ভ্রান্ত ওলট-পালটের খেলা!

সরকারের ব্যর্থতা যেমন সত্য, তেমনি এঁরা যে ঠিক বলছেননা সেটাও অনুরূপ সত্য। পুরোনো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার কথা আজ একেবারেই অবাস্তব! ১০ বছরের হাইস্কুল আর মাধ্যমিক স্তর থেকে বাধ্যতামূলক ইংরাজি শিক্ষা, আজকের প্রয়োজন কিছুতেই মিটাতে পারে না। মাধ্যমিক শিক্ষা শুধুই কলেজ শিক্ষার প্রস্তুতি নয়; এই স্তরের শেষে একটা বিশাল অংশ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ত্যাগ করে জীবিকার্জনে লাগবে। তাদের শিক্ষার চাপে তাদের ক্লিষ্ট না করে তাদের জীবনের প্রয়োজনের জন্য তৈরি করে দিতে হবে। যে সামাজিক ও আর্থনীতিক কাঠামোকে বৃটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা ধরে রাখতো, আজকের চাহিদার সঙ্গে তা কোনোমতেই মেলে

না। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনিবার্য। সভাই যে চাই "শিক্ষাবিপ্লব," সমাজবিপ্লবকে গড়ে তুলতে সেই সমাজবিপ্লবের অংশ হিসাবে। শিক্ষা-কমিশন সঠিকভাবেই "শিক্ষাবিপ্লবে"র প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন; কিন্তু তাকে আনার ক্ষমতা বর্তমান শাসকশ্রেণীর নেই।

ভবিষ্যতে আসবে সেই শক্তি, সেই শ্রেণী-সমাবেশ, যার দ্বারা এই "শিক্ষা-বিপ্লব" সম্ভব হবে। সেই পরিবেশ সৃষ্টি হবার আগে সেই "শিক্ষাবিপ্লবের" ব্লু-প্রিন্ট আজকেই পাওয়া যাবে, এমন আশা করা হয়তো অসঙ্গত। কিন্তু বিকল্প পথ-নির্দেশ চাওয়া কি অন্যায়? বৃটিশ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিলো, এবং পরীক্ষা শুরু হয়েছিলো শান্তিনিকেতনে, ওয়ার্ধায়, যাদবপুরে। একথা ঠিক যে আজকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিজের ঠাঁই যাতে করে নিতে পারে এমন শিক্ষাই সব পিতামাতা তাঁদের সন্তানের জন্য চাইবেন। কিন্তু নতুন যুগের শিক্ষা-পরিকল্পনা ছাত্রকে আজকের যুগের সমস্যার সম্মুখীন হতে অপারগ করে দেবে,—এ কথাই বা বললো কে?

যদি এ কথা ওঠে যে বর্তমান শাসকশ্রেণীর বিকল্পশক্তি তো নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে পারছে বা চলেছে; তাহলে তো সরকার মারফতও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। এ যুক্তি সঠিক নয়। যুক্তফ্রণ্টের কার্যসূচী পড়লেই বোঝা যায় যে ভারতব্যাপী শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য পরিবর্তিত না হলে, শিক্ষা-কমিশনের 'ডাইলেমা'র হাত এড়ানো দুষ্কর।

অধিকন্তু বিপ্লবটা তো সরকার করে না; বিপ্লব করে মানুষে; আর সেই বিপ্লবও শুরু হয় মানুষের মনে। বর্তমান শাসকশ্রেণী তাঁদের সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন শিক্ষা-কমিশন ঘোষিত লক্ষ্যগুলির মারফৎ, কিন্তু বলছেন,— প্রয়োজনীয় "সম্পদের" অভাবে, এই লক্ষ্য অচিরে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। শাসকশ্রেণীর নির্দিষ্ট চৌহদ্দিকে মেনে নিলে অবশ্য এ অভাব ঘুচবে না। কিন্তু এঁদের হিসাবের বাইরে একটা বিরাট শক্তি আছে, তার নাম 'জনশক্তি' আর এই শক্তিই তো মালিক-নয়-যারা-সেই-বঞ্চিত-মানুষের ভরসাস্থল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সোবিয়েত সব মানুষকে শিক্ষার ব্যাপারে মাতিয়ে তুলেছিলো, যার যা শক্তি তাকেই লাগিয়েছিলো উৎপাদনের কাজে আর শিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার দায়িত্বে। ওরা বিপ্লব করেছে, আমরা করি নি। কিন্তু এটা পরিষ্কার,—বাঁচতে হলে, "শিক্ষাবিপ্লব" ঘটাতে হবেই।

শিক্ষার ব্যাপারে সব মানুষকে মাতিয়ে তোলা যায়। এ কাজ সরকারের

নয়, সমাজের; 'ব্যুরোক্র্যাসী'র নয়, রাজনৈতিক পার্টির; আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের নয়, সমস্ত জনশক্তির, তথা যুবশক্তির। এ কাজ সমস্ত ছাত্র, সমস্ত শিক্ষক, সকল শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রয়াস—দেশের সব মানুষের সঙ্গে মিলে। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের জনজীবনের যোগ সাধনের যে সংগ্রাম তাতে শিক্ষাবিশেষজ্ঞর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে রাজনৈতিক কর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকসভার সংগঠক, ছাত্র, যুবক, মহিলা সংগঠনের সদস্যদের। ভবিষ্যতে একটা বিশাল যজ্ঞ আসছে; এর সমিধ সংগ্রহের ভার সকলেরই।

দায়িত্ব অবশ্য বিশেষ করে শিক্ষা-জগতের সঙ্গে যাঁরা জড়িয়ে রয়েছেন, তাঁদেরই, অর্থাৎ, শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজের। এটা ঠিক, মৌলিক রাষ্ট্রবিপ্লব ছাড়া শিক্ষাবিপ্লব ঘটবে না। কিন্তু শিক্ষাজগতের আলোড়ন, শিক্ষাবিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষাজীবনের পরিবর্তনের প্রয়াস, শিক্ষা ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই আবর্তনকে ত্বরান্বিত করবে। শিক্ষক ও ছাত্র,—উভয়কেই ভাবতে হবে নতুন করে। বর্তমান ব্যবস্থায় আত্মসন্তুষ্টি যেমন অশ্রদ্ধেয়, অনুরূপ নিতান্ত অসন্তুষ্ট 'নেতি নেতি' মনোভাবও অপ্রতুল ও বিভ্রান্তির সম্ভাবনায় পূর্ণ। বর্তমান ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করছি এবং ক্রমাগতই এর নিন্দা করে যাচ্ছি,—শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের কাছেই এ ব্যবহার সুবিধাবাদের নামান্তর মাত্র। বিকল্প পন্থা সকলেই পরিষ্কার দেখতে পাবেন—এ দাবি ভ্রান্ত। কিন্তু সেই বিকল্প পন্থা অনুসন্ধানে আন্তরিকতার অভাব অসঙ্গত। কার্যে, বাক্যে ও চিন্তায় সঙ্গতিই পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক, যা অর্জন বিপ্লববাদের অন্যতম লক্ষ্য। যার মধ্যে বঞ্চিত জনতা নতুন দিনের ইঙ্গিত দেখতে পায়—নিজেকে ও পরিবেশকে পরিবর্তনের সেই কাজ এখন থেকেই শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজকে গ্রহণ করতে হবে।

পুস্তক পরিচয়

Iswarchandra Vidyasagar : Hiranmay Banerjee : সাহিত্য একাডেমি। মূল্য ২'৫০

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁদের অক্ষয় মনুষ্যত্ব।" শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের "অক্ষয় মনুষ্যত্ব" ফুটিয়ে তুলেছেন। দরদ ছাড়া জীবনী লেখা কঠিন। শুধু তথ্য সাজিয়ে জীবনী লেখার প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মনে হয়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সার্থক প্রধানত এই কারণে যে তিনি দরদ ও দক্ষতার সঙ্গে তথ্য উপস্থিত করেছেন। ঘরোয়া ভাবে একটা সমগ্র যুগের আলোচনায় যে পদ্ধতি তিনি ইতিপূর্বে 'ঠাকুরবাড়ীর কথায়' অনুসরণ করেছেন, এই বইতে সেই একই পদ্ধতি প্রকাশিত। স্বভাবতই তিনি শ্রীবিনয় ঘোষের বিখ্যাত বই-এর সাহায্য নিয়েছেন। শ্রী ঘোষের বই বাঙালি পাঠক সমাজে পরিচিত। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত অবাঙালি পাঠকের সামনে বিদ্যাসাগরের মহান চরিত্র হাজির করেছেন। যতদূর জানি এই ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। সাহিত্য একাডেমির বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রশংসা দাবি করে।

উনিশ শতকের নবজাগরণ এই বই-এর পটভূমি। পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার ধাক্কায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে যে আলোড়ন এসেছিল শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় তা বড় স্থান পেয়েছে। এই আলোড়নের মধ্যে বিদ্যাসাগরের জন্ম। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিকাশ, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সরকারী নীতি, বিভিন্ন জেলায় "জিলা স্কুলের" প্রতিষ্ঠা দেশে এক নতুন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল; নিঃসন্দেহে এই নতুন অবস্থা বিদ্যাসাগরের প্রতিভার স্ফুরণের সহায়ক ছিল। এইভূমিতে লেখক বিদ্যাসাগরকে বুঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও নবজাগরণের বর্ণনা সুখপাঠ্য। মনে হয় যে নবজাগরণের আলোচনায় নাগরিকতার মন্থর গতি এবং মধ্যবিত্তের বিকাশ স্থান পেলে ভালো হত।

বিদ্যাসাগরের জীবনকে লেখক চারটি ভাগে ভাগ করেছেন: নারীদের অধিকারের জন্য তাঁর সংগ্রাম, শিক্ষাব্রতী হিসাবে তাঁর ভূমিকা, বাংলা গদ্যের

স্রষ্টা বিদ্যাসাগর, এবং তাঁর মানবতাবাদী চিন্তা। সুন্দর গঠন সজ্জা। তথ্যের ব্যবহার এবং বলার ভঙ্গি আকর্ষণীয়। বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব, চরিত্রের দৃঢ়তা, সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা, তাঁর অসাধারণ উদ্যম এবং ধৈর্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চারিদিকে যখন ভয় ভীতির ছড়াছড়ি তখন এই মহান চরিত-কাহিনী পড়ে মনে সাহস ও ভরসা জাগে। উনিশ শতকের নবজাগরণের এই মহান প্রতিনিধিকে সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত করবার এই প্রয়াসকে স্বাগত জানাই।

বাঙলা সাহিত্যের বিকাশে বিদ্যাসাগরের অবদান লেখকের কাছে সঙ্গত ভাবেই গুরুত্ব পেয়েছে। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-এ (১৮০৮) রাম রাম বসুর বাঙলা ভাষা, কিংবা রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থ'-র ভাষার পাশাপাশি লেখক 'সীতার বনবাস' থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করেছেন : "রজনী অবসন্ন হইল। মহর্ষি বাল্মীকি স্নান, আহ্নিক সমাপিত করিয়া, সীতা, কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন।" রচনার বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। বাঙলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম শিল্পী বিদ্যাসাগর।

পরিশিষ্টে লেখক বিদ্যাসাগরের রচনাবলী এবং তাঁর সম্পাদিত বইগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দিয়েছেন। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর।

সুনীল সেন

শতচিত্র দুঃস্বপ্ন : দেবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায়, মানস প্রকাশনী : দু'টাকা

একদিন চিরদিন : মনীষী মোহন রায়, সপ্তর্ষি, দু'টাকা

আলো আঁধার : অজয় মাইতি। মিত্রানী। দু'টাকা

বৃত্ত কোলাহলে : সুনীল মজুমদার। প্রতিবিম্ব : দু'টাকা

তাৎক্ষণিক অনুভূতিগুলি : নীহার গুহ। অধুনা। এক টাকা

কিছু নাম পরিচিত, কিছু অপরিচিত—মিলিয়ে মিশিয়ে পাঁচ জন কবির ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের বিভিন্ন আঙ্গিকে রচিত কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে বর্তমানে বাঙলা কবিতা চর্চায় অনেকটা দিক উন্মোচিত হয়েছে। একথা ঠিক নিছক চটক, যুগ-যন্ত্রণার নামে ব্যক্তিগত যৌন যন্ত্রণার বিকৃত বিবরণ, নতুন আঙ্গিকের নামে অন্বয়হীনতার যুগ দ্রুত শেষ হয়ে আসছে।

বৈচিত্র্য অবশ্যই প্রয়োজন। যুগজীর্ণ আঙ্গিক সংস্কৃত হোক, বক্তব্যের পরিধি

জীবনের সকল স্থান স্পর্শ করুক—কবিতা পাঠক মাত্রেরই এটা কাম্য। অধুনা বাঙলা দেশে কবি যশঃপ্রার্থীর সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর, তার মানে এই নয় যে কবির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে কবিদের কাব্যগ্রন্থ কদাচিৎ প্রকাশিত হলেও কবিযশঃপ্রার্থীদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যম অন্তহীন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থগুলির বেশ কয়েকটি সেই উদ্যমেরই নিদর্শনবাহী।

সাতাশটি কবিতা নিয়ে গ্রথিত 'স্বরচিত দৃষ্টান্তর' রেবন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নতুন কাব্যগ্রন্থ। নির্জনতার বিপক্ষে এই কবি বলেন 'ফিরে আসি আমি যেখানে আমায়/চেনা-চেনা মুখ, মুখের প্রতিমা/দেখব বলেই আনন্দ অভিলাষী' অথবা 'আজো আমি সেই ঘরে বসে আছি দু'বাহু বাড়িয়ে/যুগ্ম আনন্দের খোঁজে দুঃখ-শোক-বেদনা ছাড়িয়ে।

তাঁর কবিতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিণত মানসিকতার ছাপ বর্তমান। পরিবেশ, সমাজ ও জীবনগত উপলব্ধির উপস্থাপনে রেবন্তকুমার অস্ত্রর জীবন বোধে বিশ্বাসী। আকাঙ্ক্ষিত প্রহরের প্রত্যাশায় প্রেমিকের দৃপ্ত ভঙ্গিমায় তিনি দেখেন 'সীমান্ত অবধি দীর্ঘ প্রসন্নতা'। 'একদিন সময় হ'লে' (পৃঃ ১২) 'সকলি স্বপ্নের মতো' (পৃঃ ১৬) 'চতুর্দশপদী' (পৃঃ ৩১) প্রভৃতি কবিতায় তাঁর বিক্ষত চিত্তের উচ্চারণ সুপরিস্ফুট। তাঁর কোন কোন কবিতায় ('স্বভাবে আমার' পৃঃ ১৭) মাত্রা যথাযথ নয়। প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ সুন্দর।

মনীষীমোহন রায়-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একদিন চিরদিন' এর কবিতাগুলি প্রধানত প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ বিষয়ক। প্রকৃতির অফুরন্ত লীলা নিকেতনে—যেখানে 'কৃষ্ণচূড়া—চিরায়ু কিশোরী/অভিসার অভিলাসে উত্তরীয় শীর্ষে নিয়ে জাগে' অথবা 'চিত্রিত পলাশ বনে তালঝিরি মতিঝিরি/বনরাজী নীলে—অন্ধকার জ্যোৎস্নায় নিয়ে আসে অমল জোয়ার' সেইখানে কবি বিমল এক আনন্দ উপভোগের প্রয়াসে যেতে চান।

অনতি বিস্তৃত একটি পরিধির মধ্যে কবি তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ-সুখ-ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিচ্ছবিগুলিকে প্রতিবিম্বিত করতে চেয়েছেন। বক্তব্য পরিস্ফুটনে কবি আন্তরিক। সুমুদ্রিত এই কাব্যগ্রন্থখানির অনেকগুলি কবিতাই সুখ-পাঠ্য।

'মেঘের শিবিরে'র কবি অজয় মাইতির নতুন কাব্যগ্রন্থ 'আলো আমার।'

চেতনার দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় কবি রোমান্টিক। বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে তিনি যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন তাতে বর্তমান যুগের যন্ত্রণাকে এড়িয়ে তিনি বলেন—'তোমাকে সাজাবো, দেবী, পুঞ্জ পুঞ্জ রক্তের অঞ্জলি/পান্নাময় হবে তুমি পান করে সবুজের হাট/সমুদ্রের শাবকেরা নির্জনতা ভাঙে, শোনো বলি/বিপুল সৌন্দর্যে আমি চিরদিন অটুট সম্রাট।' (পৃঃ ২৮)

কবিতাগুলি পড়ার পর কোন রসানুভূতি মস্তিষ্কের কোষে দীর্ঘক্ষণ সঞ্চরণ করতে সক্ষম হয়না। নিছক বাক্য-বিলাস বলে মনে হয়। শংকর মিত্র বিরচিত 'কথামুখ' থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রতিটি কবিতার মধ্যে বানানের প্রতি নির্মম ঔদাসীন্যের স্বাক্ষর রয়ে গেছে।

সুন্দর কাগজে চমৎকার ছাপা সুনীথ মজুমদারের কাব্যগ্রন্থ 'মৃত্যু কোকোনদে।' তাঁর বাচনভঙ্গি সম্পূর্ণ আধুনিক। সাংকেতিকতা ও প্রতীকের আশ্রয়ে তাঁর কথা বলার কৌশল দৃষ্টি আকর্ষণ যোগ্য। তাঁর অনেকগুলি কবিতাই ক্ষুদ্র পরিসরে রচিত হলেও ব্যঞ্জনায় হৃদয় সংবেদ্য। 'অভিসার' কবিতাটি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।

'খুব দূরে হারিয়ে যাবার অনুমতি দিলে, কাছে এসে বলো : না,/ভোরের প্রথম শ্বেতপদ্ম-আলো/মুখটিপে যেই অবগুণ্ঠিত হতে গেলো/তখনই উন্মনা/যেন শেষ সীমার রহস্য বারতার স্বর/কানে আসে, বোঝা যায়, নশ্বর/মুহূর্ত চিরকাল চেনা।/

নীহার গুহের সূচিপত্রহীন কবিতার বইটির নাম 'তাৎক্ষণিক অনুভূতিগুলি।' অনুভূতি নিশ্চয়ই তাৎক্ষণিক, কিন্তু সেইগুলিকে কবিতা পদবাচ্য করতে হলে যে সমস্ত আনুষঙ্গিক উপাদানের প্রয়োজন হয়, তার কোন বালাই নেই পরিবেশিত তেইশটি অনুভূতির মধ্যে। অর্থাৎ যেমনভাবে অনুভূতিগুলি এসেছে তিনি সেইভাবে বসিয়েছেন মাত্র। ফলে প্রচেষ্টাটি এক ধরণের নিরক্ত স্পন্দনহীন শব্দের শোকযাত্রায় পরিণত হয়েছে। প্রচ্ছদপটের ওপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অক্ষরনিচয় কোন তুমুল গাঢ় সমাচার পেশ করেছে নাকি? ধ্বং=ধ্বংস, দুঃ=দুঃখ, হিং=হিংসা নয়ত? তান্ত্রিক যোগীদের ষটচক্র ভেদের মতোই সাধারণের পক্ষে তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য।

চিত্ত ভট্টাচার্য

হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ : শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস। প্রকাশক - এম, সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা—১২। দাম : পাঁচ টাকা।

বাঙলা ভাষায় আজকাল কিছুকিছু ভ্রমণকাহিনী লেখা হচ্ছে ; অধিকাংশই সহজগম্য পথে যাত্রার কাহিনী। রেলে, মোটরে, বাসে অথবা এরোপ্লেনে। বর্ণনার লালিত্যে তারা সুখপাঠ্যও বটে। বাঙালি আজ আর ঘরকুনো নয়, সুযোগ সুবিধা পেলেই কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বাঙালি যাত্রীর ভিড়। যাঁরা সুযোগ পান না, তাঁরা ভ্রমণকাহিনী পড়ে ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করেন।

আবার কিছু কিছু দেশভ্রমণের কথা প্রকাশিত হয়েছে, (যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত বলিষ্ঠ লেখনীতে) যাতে দেশের মানুষ এবং তাদের কর্মজীবন ও আশা আকাঙ্ক্ষার কথা অত্যন্ত সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে।

শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাসের "হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ" একটি অত্যন্ত কঠিন পথে ভ্রমণের কাহিনী। দশ বারো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে উঠ্‌তে যে কোন সরল মানুষ সহজেই পারেন, লেখিকার পথের এক অংশ উনিশ হাজার ফুট উঁচু হিমবাহের উপরে ছিল। সেখানে বায়ুর চাপ কম। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। মাথা ঘোরে, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। হিমবাহে পদস্খলন হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার বদরী—বাঙালি ভ্রমণকাহিনী পাঠক-পাঠিকার কাছে খুবই পরিচিত নাম। গঙ্গোত্রী থেকে বদরী যেতে সাধারণ তীর্থযাত্রী প্রায় ২২২ মাইল পথ অতিক্রম করেন, কেদার ও তুঙ্গনাথের সহজ পথ দিয়ে ঘুরে যেতে। অবশ্য বৎসরে ছয় মাস যখন তুষারপাত হয় না, তখনই তীর্থযাত্রীরা এ-অঞ্চলে যান। কিন্তু হিমবাহ পথে গঙ্গোত্রী থেকে বদরীর দূরত্ব মাত্র ৫০ মাইল হলেও সাধারণ যাত্রীর কাছে সেপথ দুর্গম। লেখিকা এই পথেই গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার তিনি চিত্রগ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন, এই পুস্তকে।

দুখানি মানচিত্রে ও কয়েকটি ফটোচিত্রে বইখানি সমৃদ্ধ। এর ফলে ভ্রমণকাহিনী বেশ সহজবোধ্য হয়েছে। কিন্তু বইখানির বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার 'উপক্রমণিকায়' যেখানে হিমালয় ও হিমবাহের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। কুমায়ুনের পর্বতশৃঙ্গ ও নদীগুলির সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিবরণও অনুবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। ফলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক

অন্য বই না খুঁজেও বহু তথ্য জানতে পারবেন। যদিও যাঁরা হাল্‌কা কাহিনী ভালোবাসেন, তাঁরা হয়তো এ পরিচ্ছেদগুলির পাতা উল্‌টিয়ে যাবেন।

ভ্রমণকাহিনীটির বর্ণনাশৈলী পাঠককে মুগ্ধ করবেই। লেখিকার স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, কৌতুক ও আনন্দোচ্ছ্বাসের আস্বাদ গ্রহণ করে পাঠক পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবেন। পড়তে পড়তে মনে হবে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামীজী ও প্রসিদ্ধ গাইড দিলীপ সিং তার দুই বিশ্বস্ত সহচর যেন আমাদেরই সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র, বর্তমানে মুসৌরীতে বাঙালি মাত্রেরই অকৃত্রিম মিত্র, শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গ যেন যাত্রাপথে উত্তাপ ও আশার আলো বিকীরণ করছে। পুণা থেকে আগত যুবক যাত্রী পট্টবর্দ্ধনের এই দুরূহ পথে হিমালয় ভ্রমণ অনেক নিঃসম্বল বাঙালি তরুণকে নতুন পথ দেখাবে: অ্যাডভেঞ্চারের নতুন ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

বইটিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিবেশনে কিছু কিছু ভ্রান্তি নজরে পড়লো। যেমন হিমালয়ের জন্ম বৃত্তান্তে লেখিকা লিখেছেন, "ক্রমে ক্রমে তরলাংশ শুকিয়ে জমে কঠিন হয়ে পর্বতের আকার ধারণ করে।" সমুদ্রতলেই তো কঠিন প্রস্তরের সৃষ্টি হয়েছিল, গণ্ডোয়ানার চাপে ঊর্ধ্বে উঠে হিমালয় পর্বত হয়েছে! তা ছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠকে "সমুদ্রতল" এবং, সিপাহী বিদ্রোহের নানাসাহেবকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভিন্ন ব্যক্তি "নানা ফান বিস" বলা হয়েছে "পুল,"। "সেতু" শব্দগুলি বাংলা ভাষায় সুপ্রচলিত হওয়া সত্বেও ইংরেজী "ব্রীজ" শব্দটির ব্যবহার কেন? উপলখণ্ড, শিলা, নুড়ি প্রভৃতি বাংলা শব্দের প্রাচুর্য সত্ত্বেও লেখিকা অনর্থক "boulder" প্রভৃতি ইংরেজি শব্দের পদাশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী সংস্করণে, আশা করি, বইটি ত্রুটিমুক্ত হবে।

কপিল ভট্টাচার্য

ভিসা অফিসের সামনে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উচ্চারণ। ২ টাকা।

আলেকজান্দার পুশকিনের কবিতা। অসিত সরকার। কবিতা পাক্ষিক পরিষদ। তিন টাকা।

নিছক কবিতা বা কিছু ভালো কবিতা লিখে কেবার হকদ শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে টানেন নি। এই টানের অপর প্রান্ত বাঁধা রয়েছে মানুষ এবং মনুষ্যত্বের সঙ্গে, যার সত্যমূল্য সময় বা আত্মার দৈন্যে শেষ পর্যন্ত খাটো হয় না। খুব সার্থকভাবে তাই কবি কাব্যগ্রন্থটির মুখবন্ধে বলেছেন,'...আমাদের ভালোবাসাকে, মনুষ্যত্বকে হত্যা করা পৃথিবীর এই দেশের এবং ঐ দেশের কয়েকজন

দাঙ্গাবাজ, যুদ্ধোন্মাদ অমানুষের পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হবে না। সমস্ত হত্যাকাণ্ড, মাৎলামো, অসম্মানকে অতিক্রম ক'রে আমরা দুই বাঙলার এবং বৃহত্তর অর্থে সমস্ত পৃথিবীর নিরপরাধ মানুষ আজো বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবো, মানুষের মতোই বেঁচে থাকবো।'

খণ্ডিত বাঙলা নয়, আবহমানের অচ্ছেদ্য বাঙলার পূর্বপ্রান্তে আকাঙ্ক্ষায় ভর করে পাশপোর্টবিহীন-কবি চলে যেতে চান পূর্বসীমান্তের দিকে। সে দেশের মানুষ শুধু তাঁর চৈতন্যের নয়, রক্তেরও সহোদর। কঠিন বাস্তবের চৌহদ্দির ভিতর ভিসা অফিসের সামনে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় দুজনের, যারা 'দুটি কঠিন পাথরের মুখ/খোদাই করা নিষ্প্রাণ দুই জোরা ঘোলাটে চোখ/অদৃশ্য রক্তের তোলপাড়ে একই অধিকারে মৃত পিতাকে স্মরণ করেছিলো।' বিচ্ছিন্নতার দু পারে দাঁড়িয়ে দুজনে আপ্রাণ অনুভব করে, 'স্পর্শ করলে পুণর্জন্ম হতে পারে/কিন্তু মাঝখানে/বাতাসের শূন্যতা, চোখের জল ঝরে,/যেন শীতের হলুদ পাতা'। এই একই নিশ্বাসে কবি তাসখন্দ চুক্তির ওপর, সীমান্ত গান্ধীর ওপর, দাঙ্গার প্রতিরোধে নিহত আমীর হোসেন চৌধুরীর স্মরণে কবিতা লেখেন। নজরুল-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'নজরুল, তুমি দেখতে পাওনি জন্ম-ভূমির, এই যন্ত্রণা। দেখলে আবার উন্মাদ হ'তে…/বরং আঁধার অনেক ভালো।' মার খাওয়া মানুষের বৃহত্তর পরিধি একই সঙ্গে তাঁকে টানে। তাই পাশাপাশি লেখা হয় দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার ঃড-এর মোড়লদের অমানুষিকতার বিরুদ্ধে ঘৃণার বারুদে ঠাসা কবিতা, সমগ্র এশিয়ার লাঞ্ছিত বিবেকের বন্দনা।

লক্ষণীয়, 'ভিসা অফিসের সামনে' কাব্য কি ভাবে ঘৃণা ও ক্রোধের কাঠিন্যে অবলীলায় মিশে গেছে ব্যক্তি মানুষের জন্য মায়ামমতা প্রেমে; প্রীতি-তন্ময়তার নিবিড়বিষাদে জেগে উঠেছে ফলহীন বৃক্ষের হাহাকারের শব্দ। শুদ্ধতম আবেগে কবি যখন উচ্চারণ করেন, 'কবে খুনী বলেছিল বেশ্যার রোদন শুনে / 'তুই পাপী যদি,/তোর পায়ে মাথা রাখলে সেরে যাবে আমার অসুখ,' বা 'যে বেশ্যা ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখে অন্ন তুলে দিতে/নিজের কান্নার স্রোতে রোজ দেয় সতীত্ব ভাসায়ে' অথবা 'তার ঘর পুড়ে গেছে/অকাল অনলে; / তার মন জেগে গেছে/প্রলয়ের জলে। /তবু সে এখনো মুখ দেখে চমকায়,/এখনো সে মাটি পেলে/প্রতিমা বানায়'—তখন সঙ্কট ও বিশ্বাসের করমর্দনের কেন্দ্রভূমির উপর দাঁড়ানো কবির আবেগ তাড়িত কণ্ঠ আমাদের মূল্যবোধবিহীন অস্তিত্বের কাছে অস্তি-র নতুন অর্থ বহন করে আনে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে কার-

কর্বের খুব বাহাদুরি নেই, শুদ্ধ কবিতার সাধকেরা অনেকাংশেই তথাকথিত 'কবিতা না খুঁজে পেয়ে নাক উঁচু করবেন, কবির অনুভূতির অস্থির কম্পনে ছন্দের জমি মাঝে মাঝেই বেশ টালমাটাল। রঞ্জিত মিথ্যে, পুষ্পিত ইমেজ, স্পষ্ট চিত্রকল্প নেই। তবু এ কাব্যগ্রন্থের আবেদন আমার কাছে আশাতীত, কারণ কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আমি যেন আর একটু ভালো, সৎ হয়ে উঠি এবং কবির এ প্রতীতিতে আস্থা রাখতে শিখি, 'যদিও উজীর, কাজী, শহর কোটাল/ছড়ায় বিষাক্ত ধুলো, ঘোলা জল/তথাপি মানুষ আজো শিশুকে দেখলে/নম্র হয় জননীর কোলে মাথা রাখে,/উপসেও রমণীকে বুকে টানে, কারও/সাধ্য নেই/একেবারে নষ্ট করে তাকে।'

যে আলেকজান্দর পুশকিনের কবিতা যুগের মধ্যে উচ্চারণ করছেন শক্তি, সেই প্রেম, যৌবন ও বৈপ্লবিক রোমান্টিসিজমের অগ্রজ কবির কিছু কবিতা এবং দুটি কাব্যনাট্য অনুবাদ করেছেন শ্রীঅমিত সরকার। যাঁরা পুশকিনকে মূল রুশ ভাষায় পড়েছেন তাঁদের সৌভাগ্যের অন্ত নেই। ইংরেজিতে অনূদিত পুশকিনের কবিতায় ভাষান্তর সত্ত্বেও যে স্বাদ পাওয়া যায়, দুঃখের কথা, শ্রীসরকারের অনুবাদে তার রঙ আরও বেশ কয়েক স্তর ধুয়ে গেছে। মহৎ কবিতাকে রূপান্তরিত করার জন্য নিশ্চয়ই যথেষ্ট শ্রম ও কিছু পরিমাণে কাব্যপ্রাক্তনের প্রয়োজন থেকে যায়। অনূদিত কাব্যগ্রন্থটির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেও অবশ্য একথা বলা উচিত, শ্রীসরকার পুশকিনের কবিতাকে এ দেশের পাঠকদের সামনে তুলে ধরার যেটুকু চেষ্টা করেছেন, সেটুকুও আর কেউ করেছেন কি?

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পত্রিকা প্রসঙ্গ

বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে মার্কসের মতামত

১৮৪৩ সালে টমাস কার্লাইলের 'পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট' নামে একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। অর্থনীতিতত্ত্বকে ঐ রচনাবলীতে তিনি দুঃখের বিজ্ঞান বা ডিসম্যাল সায়েন্স বলে অভিহিত করেন। রাস্কিন তো ইতিমধ্যেই বলছিলেন যে, "পণ্য অর্থনীতি ব্যবস্থায় মানুষের কাজকর্ম সুনীতিনিয়ন্ত্রিত না হয়ে বরং 'মূষিক বা শূকরপালে'র মত টিকে থাকার লালসা লালিত এক প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে"। কার্লাইল তাঁর 'গসপেল অব ম্যামনে' তো সমস্ত সমাজব্যবস্থাকেই আক্রমণ করে লিখলেন "ম্যামনের সুসমাচারকে অনুসরণ করে আমরা কিছু আজব সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছি। .আমরা একে সমাজ নাম দিয়েছি; আর আমরা পরিপূর্ণ নিসম্পর্কিত থাকার কথা প্রচার করে চলেছি, প্রচার করছি বিচ্ছিন্নতা। আমাদের জীবন আর পারস্পরিক সহায়তাবিধৃত নয়, বরং চলেছে যুদ্ধের যথাযোগ্য নিয়মের ঘেরাটোপে ঢাকা 'প্রতিযোগিতা' ...যা কিনা পারস্পরিক শত্রুতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা ভুলে গেছি যে 'নগদ দামই' মানুষের একমাত্র মূল্য নয়; আমরা ভাবছি সন্দেহাতীত-ভাবে নগদ দামই মানুষের মধ্যে দেনা পাওনার পরম মোক্ষ আর প্রতিদান। সত্যি বলতে কি এই হল ম্যামন উপাসনার বিষাদিত ধর্ম।'

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এ সময় তাঁর পৈত্রিক ব্যবসা সংগঠন আরমেন এ্যাণ্ড এঙ্গেলস-এর কাজকর্ম দেখছিলেন। এঙ্গেলস কার্লাইলের এই উত্তেজনা সাগ্রহে লক্ষ্য করেন। ১৮৪৩-এর শেষ দিকে তিনি ডয়েট্‌স-ফ্রাঙ্কোসিস জারবুচার পত্রিকায় 'পাষ্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্টে'র একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা প্রকাশ করেন। এঙ্গেলস কার্লাইলকে ইংলণ্ডের একমাত্র সংস্কৃতিবান ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেও লিখলেন যে কার্লাইল সমাজের নৈতিক পতনের কারণ দেখেছেন যে প্রতি-যোগিতায় আসলে সেই প্রতিযোগিতা সমাজের রোগলক্ষণমাত্র। ব্যাধির বীজ রয়েছে আরও গভীরে। আর সে ব্যাধির বীজ হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব। এঙ্গেলস এর পরেই ঐ পত্রিকায় 'স্কেচ ফর এ ক্রিটিক অব পোলটিক্যাল ইকনমি' (১৮৪৪) নামে এক সন্দর্ভ প্রকাশ করেন। মূলধনতন্ত্রের বিষয়ে এ রচনাটিই বলা যেতে পারে মার্কসবাদ উদ্ভবের পূর্বে প্রথম 'মার্কসবাদী' রচনা।

মনে রাখা দরকার ১৮৪৩ সালে 'তরুণ' মার্কস জেনি ফন ওয়েস্টফ্যালিয়াকে বিবাহ করেন এবং আরনল্ড রোজ-এর সঙ্গে একযোগে 'ডয়েচস-ফ্রাঙ্কোসিস

জারবুচার' পত্রিকাটি সম্পাদনা করার জন্য প্যারিসে আসেন। সমাজতন্ত্রের প্রায় অ আ ক খ-ও তখন তাঁর অজানা। ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবার লক্ষ্য করা গেল। এঙ্গেলসও তাঁকে মূলধনতন্ত্রের বৈপরীত্যগুলি অনেকখানি বুঝিয়ে দিতে পারলেন। ১৮৪৭ সালে মার্কস লিখতে শুরু করলেন সেই নিবন্ধাবলী, আজ সারা বিশ্বে 'ইকনমিক এ্যাণ্ড ফিলজফিক্যাল ম্যানুস-ক্রিপ্‌ট্‌স্' বা 'প্যারিস ম্যানুসক্রিপ্‌ট্‌স' নামে যা পরিচিত। ঐ পাণ্ডুলিপির প্রথমদিকে তিনি বললেন "পলিটিক্যাল ইকনমি শ্রমিককে মাত্র এক কার্যকরী জীব বলে দেখতে অভ্যস্ত, কেবলমাত্র অতি শরীরসর্বস্ব-প্রয়োজনবিধৃত এক জন্তু হিসাবে তাকে পরিগণিত করা হয়ে থাকে।" ১৮৪৭ সালে প্রুধোঁর 'ফিলজফি অব পভার্টি'র প্রত্যুত্তরে লিখলেন, 'পভার্টি অব ফিলজফি'। আর ব্রাসেলসে মজুরী—শ্রম—মূলধন বিষয়ে এক শ্রমজীবি সমাবেশে বক্তৃতায় তিনি লেবার থিয়োরি অব ভ্যালুর জট খুলে ফেললেন। মার্কস তখনই বুঝলেন মূলধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মানুষের শ্রম পণ্যে পরিণত হয়েছে। মানুষের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সত্যটি এখন থেকে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল। মার্কস—মার্কস হয়ে উঠলেন।

অনন্বয় বা বিচ্যুতি বা বিচ্ছিন্নতা যাই বলা হোক না কেন, অধুনা অতি আলোচিত অ্যালিয়েনেশন বিষয়ে মার্কসের পূর্বসূরীদেরও নানা তত্ত্ব ছিল। হেগেলের কথাই প্রথমে ধরা যাক। হেগেল বলেছেন—মানুষ বস্তুগত জগত অর্জন করতে গিয়ে যেমন বহু কিছু অর্জন করেছে, তেমনি সে অনেক কিছু হারিয়েছেও। কেননা যে বস্তু মানুষ উৎপাদন করেছে, মানুষের সেই শ্রমওমনীষাবিধৃত উৎপাদিত সামগ্রীই মানুষের পয়লা নম্বর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়েছে। যে পৃথিবী সে রচনা করেছে, ভাগ্যের পরিহাসে সেই দুনিয়াই তার বিরুদ্ধে অরাতিরূপে উদ্যত। হেগেলের মতে মানুষের সৃজনশীল শ্রমপদ্ধতি আসলে পরম বা এ্যাবসলিউটের আপনাকে ক্রমাগত ব্যক্ত করে দেওয়া—নিজেকে নিক্ষিপ্ত করে পরম আপনাকে প্রকৃতির মধ্যে বিমূর্ত করেছেন। মানুষের কর্মের মধ্যে দিয়ে যে ক্রমযোজন ঘটে, সভ্যতা গঠনের ভেতর দিয়ে মানুষ যে নিজের জগৎ ও আপনাকে রচনা করছে তার স্বরূপই বা কি? হেগেলের মতে তা কেবল উৎসের দিকে এক ধরণের ফিরে যাওয়া, কেননা এগুলির মধ্য দিয়েই পূর্ণ আত্মসচেতনতা, পরমের সঙ্গে একাত্মতা এবং সম্পূর্ণতা অর্জন করা যায়—আর এভাবেই পরম প্রাক্‌স্বরূপে যেমনটি ছিলেন সেই অবস্থার উত্তরণ ঘটে। হেগেলও তরুণ বয়সে বিমূর্ত

শ্রমের নিকটে ব্যক্তির অধীনতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনিও বিনিময় প্রথা-নির্ভর আর্থনীতিক নৈরাজ্য অনুভব করে লিখেছিলেন—এই অন্ধ, নৈরাজ্যময় উৎপাদন ও বিনিময়ের মূলধনতন্ত্র "এক বিপুল সম্প্রদায়ভিত্তিক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ব্যবস্থা, মৃতের এক চলমান জীবনধারা। এমন এক ব্যবস্থা এখানে ওখানে যা অন্ধ জানোয়ারের মত ভ্রাম্যমান।"

মার্কস অবশ্য হেগেলের ভাববাদী অত্যুক্তির মধ্যথেকে সারাৎসারটি গ্রহণ করেছিলেন। একথা ঠিক যে শ্রেণী-বৈপরীত্য ভিত্তিক সমাজে মানুষ নিজেরই উৎপাদিত যন্ত্র ও পণ্যে নিজের শত্রু গড়ে তুলেছে, 'সে নিজেই বিচ্যুত হয়েছে, হয়ে দাঁড়িয়েছে দিশাহারা, শোষিত।' মার্কসের অন্যতম অব্যবহিত পূর্বসূরী ফয়ারবাখ বিচ্যুতিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। ফয়ারবাখের মতে পরম আপনাকে সীমায়িত করে মানুষকে বিচ্যুত করেননি। মানুষই তার নিজস্ব সত্তাকে 'ঈশ্বর, পরম' ইত্যাদিতে প্রক্ষেপ ও সেগুলির উপরে আপনার মনুষ্যত্ব, গূঢ় মূল্যবোধ প্রভৃতি আরোপ করে আপনাকে এ্যালিয়েনেটেড করে ফেলেছে। সুতরাং আপনার সত্তায় অভিষিক্ত হতে হলে তাকে ধর্মগত মিথ্যার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। "ঈশ্বর আসলে মানুষের আপন স্বভাব বা প্রকৃতি, নিজের কাছ থেকে বিযুক্ত করে নিয়ে তাকে স্বর্গে অর্থাৎ, দর্শনের ভাষায় বলতে গেলে ঈশ্বরে প্রক্ষেপ ঘটানো হয়েছে"।

এই বিচ্যুতি থেকে উত্তীর্ণ হবার পথ কোথায়? হেগেল বলেছেন, আত্ম-চেতনা দিয়ে পরমের সঙ্গে একাত্মতাই একমাত্র নিস্তার নৌকা। ফয়ারবাখ বলেন, যুক্তিবাদী শিক্ষাই মানুষকে সত্তার বহির্পাতনের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে। আর মার্কসের মতে কমিউনিজমই একমাত্র বিচ্যুতি থেকে মুক্তি পাবার পথ। "যখন তার নিজের শ্রমজাত দ্রব্য তার সম্মুখীন হয় শত্রুরূপে, তার মানবস্বরূপ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়—নিজে সে হয়ে ওঠে বস্তুমাত্র।...সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানাবিধৃত মূলধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে এই অ্যালিয়েনেশন বাঁধা পড়ে আছে।" মার্কস টাকা—শ্রম—টাকা: এই সূত্র দিয়ে দেখালেন শ্রম পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলধনবাদী সমাজে মানুষ যে পণ্য উৎপাদন করে, যে পণ্যের মধ্যে তার নিজের কিছুটা অংশ মিশে থাকে—সেই নিজস্ব অংশটাই তার বিরুদ্ধে শত্রু হয়ে ওঠে। সেই পণ্য তার নিজের নিয়ন্ত্রিত না হয়ে বরং তাকেই দাসত্বে বেঁধে ফেলেছে। কর্মে নিযুক্ত শ্রমিক অন্যবিধ উৎপাদনের যন্ত্রপাতির মত একবিশেষ ধরনের

যন্ত্র হয়ে ওঠে মাত্র। ব্যক্তিগত মুনাফাবিধৃত উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক দ্রব্যবিশেষ হয়ে পড়ে। তার ফলে সে যখন উৎপাদনের শিকলে বাঁধা পড়ে যায় তার নিজের স্বার্থেও ব্যক্তিত্বের আর স্বকীয় অস্তিত্ব থাকেনা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মানবিক ব্যক্তিসম্পর্ক বিচ্যুত হয়ে নৈর্ব্যক্তিক বাজারের সম্পর্কে মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর একমাত্র মানবিক বন্ধন হল বাজারের বিনিময় মূল্য। এর ফলে শ্রমিক 'তার শ্রমকে তার জীবনের অংশ বলে ধরে না, বরং তার কাছে শ্রম জীবনের বলীদান মাত্র।' 'মূলধনবাদী পণ্য উৎপাদনের নিয়মের সঙ্গে একবার যুক্ত হয়ে গেলে শ্রম সর্বহারা ও উপেক্ষিত হয়ে পড়ে।' আর এই মানুষের খণ্ডীকরণ, ক্রমাগত মানসিক ও কায়িক শ্রমের তফাৎ, ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের বৈপরীত্যে ক্রমশ প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। এমন এক সর্বগ্রাসী আর্থ-নীতিক নিয়ম দেখা দেয়, যার স্বরূপধারণ না বুঝতে পেরে ব্যক্তিমানুষ আত্মসমর্পন করে দিশাহারা হয়ে যায়। ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীন উৎপাদনকারী সত্তা বিচ্যুত শ্রমে রূপান্তর পায়। 'যে চাকাগুলি পোলিটিক্যাল ইকনমির রথটিকে গতি এনে দেয়, সেগুলি লোভ এবং লোভীদের মধ্যে লড়াই—যার অন্য নামে প্রতিযোগিতা।' এই 'সম্পূর্ণ' মানববিরোধী শক্তির 'বিজাতীয় ক্ষমতা' মানবিক অস্তিত্বই বিড়ম্বিত করে দেয়।

মুক্তির রাস্তা কি? সমস্যা থেকে সমাধানের পথ হল 'দৃশ্যমান জগতকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে মানুষ সেই ব্যবস্থায় যথার্থ মানবতামূলক অভিজ্ঞতা পেতে পারে, মানুষ হিসাবে নিজে সে অভিজ্ঞতায় যাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, নিজের যথার্থ ব্যক্তিত্ব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে পারে।' এ সব করতে কি প্রয়োজন? উৎপাদন যন্ত্রের সামাজিক মালিকানা।

•

'মার্কসইজম টু-ডে' পত্রিকায় কিছু কাল আগে জন লুইস 'মার্কস'স থিয়ো অব অ্যালিনেশন' নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। উপরোক্ত আলোচনাটি তারই সারসংক্ষেপ।

তরুণ সান্যাল

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

অ্যাপোলোর চন্দ্র-পরিক্রমা

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উপহার দেন। মহাজাগতিক যুগের শুরু সেদিন থেকে হয়েছিল বলা যায়। তারপর এল ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল। পৃথিবীর প্রথম মহাকাশযাত্রী ইউরি গাগারিন পৃথিবীকে একবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে আবার নিরাপদে সোভিয়েতভূমিতে ফিরে এলেন। মহাকাশ অভিযানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অ্যামেরিকার বিজ্ঞানীরা এরপর বহু বরমাল্য অর্জন করেছেন।

মহাকাশ অভিযানের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটল এই সেদিন—গতবছর ডিসেম্বর মাসের একুশ তারিখ থেকে সাতাশ তারিখের মধ্যে। পৃথিবীর মানুষ এক গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে ঐ কটি দিন যাপন করেছিলেন। তিনজন অ্যামেরিকান মহাকাশযাত্রী বোরমান, লভেল এবং অ্যাণ্ডার্স একুশে ডিসেম্বর অ্যাপোলো-আট মহাকাশযানে পৃথিবী থেকে রওনা হলেন চাঁদের দিকে। চাঁদের কাছে পৌঁছে, চাঁদকে দশবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে, সাতাশে ডিসেম্বর তাঁরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। এই দুঃসাহসিক অভিযান সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে অবাকবিস্ময়ে স্তম্ভিত করেছে।

চাঁদের দেশে বৈজ্ঞানিক অভিযান অবশ্য এই প্রথম নয়। ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম চাঁদের জমির ওপর এক মহাজাগতিক রকেট ছুঁড়ে মারেন। পৃথিবী ও চাঁদ দুই-ই গতিশীল বস্তু, তাই ঐ সাফল্যের মধ্য দিয়ে সেদিন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা গতি-বিজ্ঞানের এক জটিল সমস্যা সমাধান করেছিলেন। তারপর ঐ বছরই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম চাঁদের উলটো পিঠে (যে পিঠটাকে আমরা কখনোই দেখতে পাই না) এক স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশনকে পাঠিয়ে সে পিঠের টেলিভিশন ছবি তুলে আনলেন।

গত কয়েক বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অ্যামেরিকার বিজ্ঞানীরা যেমন কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক ষ্টেশনকে চাঁদের জমিতে নামিয়েছেন, তেমনি চাঁদের চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহকেও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই কয়েকমাস আগে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা জোন্দ্-পাঁচ ও জোন্দ্-ছয় নামে দুটি মহাকাশযানকে চাঁদকে পরিক্রমা করিয়ে আবার নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন। এই স্বয়ংক্রিয়

বৈজ্ঞানিক ষ্টেশনগুলি চাঁদ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য এবং চাঁদের জমির অজস্র ফোটোগ্রাফ বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু অ্যাপোলোর চন্দ্র পরিক্রমার মধ্য দিয়ে এই সর্বপ্রথম চাঁদের বিচিত্র প্রকৃতির ছবি অত্যন্ত কাছে থেকে মানুষের চোখে ধরা দিল। তেমনি পৃথিবীর প্রথম তিনটি মানুষের চোখে মহাকাশের পটভূমিতে সমগ্র পৃথিবীর রূপও এই সর্বপ্রথম ধরা পড়ল। অ্যাপোলোর চন্দ্র অভিযানের এগুলোই বোধহয় সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক সাফল্য।

চাঁদের দেশে যাত্রী

১৯৬৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর, ভারতীয় সময় সন্ধ্যে ৬টা বেজে ২১ মিনিটে, অ্যামেরিকার কেপ কেনেডি মহাকাশবন্দর থেকে মহাকাশযাত্রী ফ্র্যাংক বোরম্যান, জেমস লভেল এবং উইলিয়াম অ্যাণ্ডার্স অ্যাপোলো-আট মহাকাশযানে পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করলেন। অ্যাপোলোর বাহক-রকেট স্যাটার্ন-পাঁচ ছিল এক বিপুল শক্তির অধিকারী। মহাকাশযানের সঙ্গে এর মিলিত ওজন ছিল ৩০০০ টনের মত এবং মোট উচ্চতা ছিল ৩৬৩ ফুট।

অ্যাপোলো প্রথমে পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে দুবার পৃথিবীকে পরিক্রমা করল, তারপর ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইলের বেগ নিয়ে সোজা ছুটে চলল চাঁদের দিকে। পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চাঁদ বা অন্য কোন গ্রহের দিকে যাত্রা শুরু করতে হলে এই পরিমাণ বেগ তৈরি করতেই হবে। অ্যাপোলোকে পাড়ি জমাতে হবে ২,৪০,০০০ মাইলের মত পথ। তাকে ছুটতেও হবে এক অভ্রান্ত লক্ষ্যপথে, যাতে প্রায় ৬৪ ঘণ্টা বাদে সে যখন চাঁদের পৃথিবী পরিক্রমা-পথের কাছে গিয়ে হাজির হবে, তখন চাঁদের সঙ্গে দেখা হতে তার যেন ভুল না হয়।

ওজন নেই

পৃথিবী থেকে বা পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে যাত্রা শুরুর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে বাহক-রকেটের কাজ যেই শেষ হয়ে আসে, অমনি অ্যাপোলোর মহাকাশযাত্রীরা এক সম্পূর্ণ ওজনবিহীন অবস্থার মধ্যে এসে পড়েন। পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের কাছ থেকে কিন্তু অ্যাপোলোর এক মুহূর্তের জন্তেও নিষ্কৃতি নেই। এই বলের বিরুদ্ধে ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইলের বেগ নিয়ে ছুটতে গিয়ে সে যেন অবাধে মহাকাশের মধ্য দিয়ে পড়ে চলেছে। অবাধে পতনশীল বস্তুর কোন ওজনের অনুভূতি থাকে না।

ওজনবিহীন অবস্থার সঙ্গে মহাকাশযাত্রীদের ইতিপূর্বে নানাভাবেই পরিচয় ঘটেছে। মহাকাশযাত্রী বোরম্যান এবং লভেল বেশ কিছুদিন আগে মহাকাশ-যান জেমিনি-সাতের যাত্রীরূপে পুরো চোদ্দদিন সম্পূর্ণ ওজনবিহীন অবস্থায় পৃথিবীকে পরিক্রমা করে এসেছেন।

অ্যাপোলোর অভ্যন্তরে

মহাকাশে মহাজাগতিক রশ্মি, সূর্যদেহজাত অতিবেগুনী রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি এবং সৌরকণিকাস্রোতের যে তীব্রতা, মানবদেহের পক্ষে তার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বিশেষ করে পৃথিবী থেকে বিভিন্ন দূরত্বে যে তিনটি বিকিরণ বলয় পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে তাদের তেজস্ক্রিয় কণিকারা যাতে অ্যাপোলোর যাত্রীদের ওপর কোন ক্ষতিকারক প্রভাব তৈরি করতে না পারে, বিজ্ঞানীরা সে সম্পর্কে সমস্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা আগেই করেছিলেন। যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি অ্যাপোলোর যাত্রীরা গ্রহণ করেছেন, তার একটা হিসেব অ্যাপোলোর আভ্যন্তরীন তেজস্ক্রিয়তা পরিগণক যন্ত্রের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। পরপর তিনটি এক্স-রে ছবি তোলার পর যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তাকে আমরা গ্রহণ করি, তার তুলনায় এই পরিমাণ বেশি নয়। এটুকু তেজস্ক্রিয়তা আমাদের শরীরের কোন ক্ষতিসাধন করে না।

বায়ুহীন মহাকাশে অ্যাপোলোর যে পিঠ ছিল সূর্যের দিকে ফেরানো, সেদিক যেমন প্রচণ্ড তাপে তপ্ত হয়ে উঠছিল, তেমনি উলটো বা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটা ছিল শূন্যডিগ্রীরও নিচে এক পরম শীতলতায় আচ্ছন্ন। তাপের এই অসম অবস্থার ফলে মহাকাশযান যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তারজন্য অ্যাপোলোর দেহসংলগ্ন রকেটের ছোট গ্যাসজেটের সাহায্যে মহাকাশযানটিকে প্রতি এক-ঘণ্টায় একবার সম্পূর্ণ আবর্তিত করে তাপের সমবণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মহাকাশ থেকে অ্যাপোলোর যাত্রীরা পৃথিবী ও চাঁদের কিছু আশ্চর্য সুন্দর টেলিভিশন ছবি পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিয়েছেন।

চন্দ্র পরিক্রমা

২৩শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত প্রায় দুটো নাগাদ অ্যাপোলো এসে পৌছোল পৃথিবী থেকে প্রায় দু লাখ তিন হাজার মাইল দূরে। এবারে অ্যাপোলো যে অঞ্চলে প্রবেশ করছে, সেখানে পৃথিবীর অভিকর্ষের চেয়ে চাঁদের অভিকর্ষের জোর বেশি।

পৃথিবীর অভিকর্ষের বিরুদ্ধে ছুটতে গিয়ে অ্যাপোলোর বেগ দাঁড়িয়েছে এখন ঘণ্টায় ২২০০ মাইল, অর্থাৎ মাঝরাস্তায় তার ঘণ্টায় ২৩,০০০ মাইলের মত বেগ খোয়া গেছে। চাঁদের অভিকর্ষের টানে অ্যাপোলোর বেগ আবার বেড়ে চলে। চাঁদের অভিকর্ষ সাম্রাজ্যে ৪০,০০০ মাইল পথ পেরিয়ে অ্যাপোলো যখন চাঁদের কাছে এসে পৌঁছোল, তখন তার বেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ৫৮০০ মাইল। সুদীর্ঘ স্তব্ধতার পর অ্যাপোলোর রকেটের এঞ্জিনকে আবার চালু করে এই বেগকে দাঁড় করানো হল ঘণ্টায় ৩৭০০ মাইলে, যার সাহায্যে অ্যাপোলো চাঁদের চারপাশে প্রথমে এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে এবং পরে এক বৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রমার কাজে নেমে পড়ে। চাঁদের জমি থেকে এই বৃত্তাকার কক্ষপথের দূরত্ব ছিল মাত্র ৭০ মাইল।

চাঁদের কোলের কাছে

চাঁদের কোলের কাছে এই সর্বপ্রথম চাঁদের বায়ুহীন, জলহীন, প্রাণহীন প্রকৃতির ছবি অত্যন্ত কাছে থেকে পৃথিবীর মানুষের চোখে ধরা দিল। অ্যাপোলোর যাত্রীদের কাছে চাঁদের জমির গঠনটা মনে হচ্ছিল যেন পিটুমিস স্টোন বা ঝামার মত, প্লাষ্টার অফ প্যারিস বা সাগরের উপকূলে ধূসরবর্ণ বালুরাশির মত। চাঁদে ধূসরবর্ণ ছাড়া আর কোন রঙের বালাই নেই বললেই বলে। চাঁদের জমির যেদিকেই অ্যাপোলোর যাত্রীরা তাকিয়েছেন, সেদিকেই মাইলের পর মাইল জুড়ে মনে হয়েছে যেন এক প্রাণহীন মরুর রাজত্ব। মাঝে মাঝে ছোট-বড় মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলো, খোঁচা খোঁচা চেহারার বিরাট পাহাড়গুলো এবং চাঁদের মেরিয়া বা জমাটবাঁধা লাভার বিরাট সমুদ্র-গুলোও তাঁদের চোখে পড়েছে। দু একটি আগ্নেয়গিরির পাশে তারা চাঁদের রহস্যময় রশ্মিরও সন্ধান পেয়েছেন। অ্যাপোলোর যাত্রীদের কাছে এটাই বিশেষভাবে মনে হয়েছে যে, পৃথিবীর রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, বর্ণের মত মানুষের মনকে আকর্ষণ করার কোন উপকরণই চাঁদের নেই।

যেমন পৃথিবী থেকে চাঁদের দেশে যাবার সময়, তেমনি চাঁদের দেশ পরিক্রমাকালে মহাকাশযাত্রীদের, পৃথিবীর কথা বার বার মনে হয়েছে। প্রায় দু লাখ ত্রিশ হাজার মাইল দূরে ফেলে আসা পৃথিবীর দিকে যখন তাঁরা ফিরে তাকিয়েছেন, তখন অসীম মহাকাশের বুকে পৃথিবীকে দেখাচ্ছিল অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি উজ্জ্বল বস্তুর মত—পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে আমরা যত বড় দেখি, তার

চেয়ে প্রায় চারগুণ বড় একটি গোল বলের মত। পৃথিবীর অর্ধাংশ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। সূর্যের আলো প্রতিফলিত করার জন্যে পৃথিবীর বাকি অংশের যে জ্যোৎস্না, তা ছিল চাঁদের জ্যোৎস্নার চেয়ে প্রায় আটগুণ বেশি উজ্জ্বল। মহাকাশযাত্রী লভেল জানিয়েছেন, মহাসাগরের জলের নীল রঙ ও মহাদেশের জমির সবুজ রঙে ভরা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে পৃথিবীতে আদৌ প্রাণীজগত রয়েছে কিনা, তা এতদূর থেকে তাকিয়ে কেউ বুঝে উঠতে পারবে না।

নিকষ কালো মহাকাশের পটভূমিতে সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্র জগতের মধ্যে জননী বসুন্ধরাকে একনজরে দেখার মধ্য দিয়ে অ্যাপোলোর যাত্রীদের মনে যে বিচিত্র আবেগ ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার গভীরতা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

ঘরে ফেরার পালা

চাঁদকে একবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে অ্যাপোলোর সময় লাগছিল দু' ঘণ্টা এবং সে মোট দশবার চাঁদকে পরিক্রমা করে।

২৫শে ডিসেম্বর বুধবার ভারতীয় সময় সকাল ১১টা বেজে ৪০ মিনিটে অ্যাপোলোর পৃথিবীতে ফেরার পালা শুরু হল। এই মুহূর্তটিই ছিল সবচেয়ে উৎকণ্ঠাজনক। অ্যাপোলোর রকেটের এঞ্জিন যদি আদৌ চালু না হত, তাহলে চাঁদের অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে ছুটে বেরোনোর জন্যে প্রয়োজনীয় ঘণ্টায় ছ হাজার মাইলের বেগ তৈরি হয়ে উঠত না। মহাকাশযাত্রীরা বরাবরের মত চাঁদের কক্ষপথে বন্দী হয়ে পড়তেন এবং কিছুদিন বাদে অক্সিজেনের অভাবে তাঁদের মৃত্যু ঘটত। কিন্তু অ্যাপোলোর রকেটের নিখুঁত যান্ত্রিক ব্যবস্থা তাকে সঠিক পথে এগিয়ে দিল।

অ্যাপোলো যত পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, ততই পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রভাবে তার বেগ বেড়ে চলে। প্রায় আটান্ন ঘণ্টা বাদে অ্যাপোলো তার যাত্রীদের নিয়ে যখন পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পৌছোল, তখনও আর একটি গভীর সঙ্কট তার জন্যে মাঝরাস্তায় অপেক্ষা করছে। এটি হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণজনিত প্রচণ্ড তাপের সমস্যা।

সাতাশে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত নটা বেজে সাত মিনিটে ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে অ্যাপোলো যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল, তখন তার মহাকাশ কক্ষের চারপাশে তাপ আবরণীটির তাপমাত্রা দাঁড়ায় ছ' হাজার ডিগ্রী

ফারেনহিট। যে পথে এগিয়ে এসে অ্যাপোলোর বায়ুমণ্ডলকে ঢোকার কথা, যদি তার চেয়ে বেশি খাড়াভাবে অ্যাপোলো নেমে আসত, তাহলে ঘর্ষণজনিত তাপের পরিমাণ দাঁড়াত দশ হাজার ডিগ্রী ফারেনহিট, যে তাপে অ্যাপোলোর জ্বলে যাবার সম্ভাবনা ছিল। আবার অ্যাপোলো যদি একটু বেশি তেরছাভাবে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করত, তাহলে ঢিল একইভাবে জলে পড়ে যেমন অনেক সময় আবার খানিকটা লাফিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে অ্যাপোলো বায়ুমণ্ডল থেকে লাফিয়ে উঠত মহাকাশে এবং ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর অভিকর্ষের বিরুদ্ধে ছুটে সে সোজা চলে যেত সূর্যলোকের দিকে।

কাজেই, এ যেন মহাকাশের ভেতর দিয়ে একটিমাত্র সরু পথ অ্যাপোলোর জন্যে খোলা রয়েছে, সেটি ছাড়া আর কোন পথ দিয়েই তার বায়ুমণ্ডলে ঢোকার ছাড়পত্র নেই। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর ঘর্ষণের ফলে অ্যাপোলোর বেগ যখন বেশ কমে আসে, তখন কয়েকটি প্যারাশুট খুলে দেয়া হয়। এরা অ্যাপোলোর বেগ আরো কমিয়ে আনে এবং অবশেষে ঘণ্টায় বাইশ মাইল বেগে তিনজন মহাকাশযাত্রীকে নিয়ে অ্যাপোলো ভারতীয় সময় রাত নটা বেজে একুশ মিনিটে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরে নিরাপদে অবতরণ করে।

পৃথিবীতে ফিরে আসার পর মহাকাশযাত্রীদের নানাধরণের জীববৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এরফলে বেশকিছু বিচিত্র তথ্যের সন্ধানও পাওয়া গেছে।

মহাকাশের এই তিন কলম্বাস বোরম্যান, লভেল এবং অ্যাণ্ডার্স চাঁদের দেশে অভিযানের সকল পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে যে অসাধারণ সাহস, বীরত্ব এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে, যেমন আমরা কোনদিনই ভুলতে পারব না পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গাগারিনের পৃথিবী পরিক্রমার অনন্যসাধারণ কৃতিত্বকে।

শঙ্কর চক্রবর্তী

চাঁদে কেন যাব?

ত্রয়ী বীর আমেরিকান মহাকাশচারী, বোরম্যান, লভেল ও অ্যানডারস ২১-২৭ ডিসেম্বর তাঁদের অ্যাপোলো-আট ব্যোমযানে পৃথিবী থেকে যাত্রা করে চন্দ্র-

পরিক্রমা করে আবার নিরাপদে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছেন। তাঁদের ও ঐ ব্যোমযানের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রনকারী বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্ম আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। মানুষ আজ নিশ্চিতই চাঁদের পথে পা বাড়িয়েছে এবং জোর করেই বলা যেতে পারে, এই দশক শেষ হবার পূর্বেই মানুষ চাঁদে পদার্পন করবে এবং হয়তো এই শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই বৈজ্ঞানিকদের বাসোপযোগী স্থায়ী ছোটো কলোনিও চাঁদে স্থাপিত হবে।

বলা বাহুল্য, চাঁদে তথা মহাকাশে অভিযান নিশ্চয়ই ব্যয়সাপেক্ষ। এক অ্যাপোলো-৮-এর চন্দ্রপরিক্রমাতেই কয়েক শ' কোটি ডলার খরচ হয়েছে। ওদিকে সোভিয়েত দেশেও সমানে মহাকাশে অভিযান চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সম্প্রতি তাঁরা শুক্রগ্রহে দুটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ ষ্টেশন পাঠিয়েছেন, যেগুলি ওখানে পৌছবে আগামী মে মাসে। তাছাড়া সম্আরোহী দুটি পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী ব্যোমযানও সয়ুজ-চার ও সয়ুজ-পাঁচ, তাঁরা ১৪ই ও ১৫ই জানুয়ারী মহাশূন্যে পাঠিয়েছেন। এক ব্যোমযান থেকে অন্ত ব্যোমযানে যাত্রীরা যান বদল করেছেন, পরে দুটি ব্যোমযানই পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। সর্বসাকুল্যে সোভিয়েত ও আমেরিকা শ'নয়েক পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম উপগ্রহ, গোটা বিশেক সূর্যের কৃত্রিম গ্রহ, খান দশেক গ্রহান্তরে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ ষ্টেশন পাঠিয়েছেন; তাছাড়া চাঁদে খান কুড়ি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানকে হয় আছাড় খাওয়ানো হয়েছে, নয় নিরাপদে নামানো হয়েছে এবং তাদের মধ্যে গুটি পাঁচেক উপস্থিত চাঁদের কৃত্রিম উপগ্রহ রূপে চাঁদের চতুর্দিকে চক্কোর খাচ্ছে। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাফল্যের ভিত্তিতেই নিশ্চয় মানুষবাহী অ্যাপোলো-আট ব্যোমযানের চন্দ্রপরিক্রমা সম্ভব হয়েছে।

তথাপি স্বভাবতঃ প্রশ্নই উঠেছে, আজকের পৃথিবীতেই যখন আমাদের এতো কিছু করা বাকি রয়েছে, তখন মহাকাশ অভিযান, চন্দ্রপরিক্রমা বা ভবিষ্যতে চাঁদে মানুষের অবতরণ বা বৈজ্ঞানিক কলোনি স্থাপন কি বহুল ব্যয়সাপেক্ষ বিলাসিতা নয়? আর প্রশ্নটা কেবল কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। একদিকে যেমন আচার্য চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনও অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন তেমনি বেশ কয়েক বছর পূর্বে প্রাভ্দাতেও একজন সোভিয়েত শ্রমিকের মহাকাশ অভিযানের বিরোধিতামূলক চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। ইয়োরোপের অভিবাম মহলে এবং চীনে বিশেষ করে

মহাকাশ অভিযানের প্রকাণ্ড বিরুদ্ধাচরণই করা হয়ে থাকে। কাজেই এ প্রশ্নের জবাব দেবার সময় এসেছে।

মহাকাশে পৃথিবী

পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুমণ্ডল, যেন আট হাজার মাইল ব্যাস-যুক্ত মস্ত একটি কমলালেবুর চারধারে প্রায় তিনশো মাইল পুরু খোসা। ত্রিমাত্রিকরূপে ভাবলে আমাদের মাথার উপরে তিনশো মাইল গভীর বায়ুসমুদ্র, যার একেবারে তলদেশে আমরা বিচরণ করি। অবশ্য এই তিনশো মাইলের অধিক উচ্চেও বায়ুর ছিটেফোঁটা পাওয়া যাবে।

এই বায়ুমণ্ডল বা আমাদের আকাশ ভেদ করে মহাকাশের নানারকমের প্রাণঘাতী রশ্মি ও তেজবিকীরণ (মহাজাগতিক রশ্মি, সূর্যনিঃসৃত অতি-বেগুনী রশ্মি ও উচ্চ তড়িতাবিষ্ট কণিকাস্রোত,যার নাম দেওয়া হয়েছে সূর্যবায়ু প্রভৃতি) আমাদের জীবদেহকে আঘাত করতে পারে না বলেই আমাদের প্রাণধারণ সম্ভব হয়েছে। অবস্থাটা যেন ঘরের দেওয়াল, মেঝে, ছাদ, এককথায় চার দেওয়াল দিয়ে ঘরকে ঘিরে বাইরের ঝড়ঝাপটার আক্রমণ থেকে যেমন ঘরের ভেতরের মানুষকে নিশ্চিন্ত আরামে রাখা হয়, সেইরকম আর কি। আর তাহলে এটাও ঠিক যে, ঘরের মানুষ যেমন ঘর থেকে বাইরে না বেরোলে, না-ঘর না-বাহির কোনটা সম্পর্কে সম্যক ধারণা হয় না, যেন কূপমণ্ডুকের অবস্থা,—তেমনি মহাকাশে প্রথম পা দিয়েই, সেখান থেকে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ করেই মানুষ নিজের ঘর পৃথিবী সম্পর্কে দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে পেরেছে। সত্যই আকাশ থেকে মহাকাশে উত্তরণ যেন তার কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্তি।

অবশ্যই জ্ঞানবিজ্ঞানের যে নবদিগন্ত আজ উন্মোচিত হয়েছে তার ব্যবহারিক বা বৈষয়িক দিক হয়তো উপস্থিত কম বা প্রায় কিছুই নয় বলা যেতে পারে। যদিও দেশান্তরে রেডিও বার্তার আদান প্রদানের, বিশেষ করে সারা-পৃথিবী জুড়ে টেলিভিশনের ব্যবস্থা একমাত্র মহাকাশ থেকেই সম্ভব, তেমনি সম্ভব আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ। তবে এটাও তো ঠিক যে, মানুষের ইতিহাসে আজকে যেটা নিছক বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, আগামীকাল তা থেকেই আবার মানুষের সভ্যতার বৈষয়িক উন্নতি ও সভ্যতার উপকরণের পথও প্রশস্ততর হয়েছে, আর তা নাহলে প্রগতির রথ কি থেমে যেতো না?

শৈশবের পৃথিবী

চাঁদে বিশেষ করে আমরা পৌঁছতে চাই, কারণ চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর শৈশব। আসলে পৃথিবী আর চাঁদের জন্ম একই লগ্নে, তাদের গ্রহ উপগ্রহ না বলে যুগ্ম গ্রহই বলা উচিত। সাড়ে চারশ কোটি বছর অতীতে তাদের জন্ম, কিন্তু প্রধানত বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে আজকের পৃথিবীতে তার জন্মলক্ষণের প্রায় কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া শক্ত। পৃথিবীর, তথা গ্রহাদির ও সমগ্র সৌরজগতের উৎপত্তি কি করে হোলো তা সম্যক জানতে হলে আমাদের যেতে হবে ঐ চাঁদে, যেখানে কোনো বায়ুমণ্ডল না থাকাতে (চাঁদ আকারে ছোট, তার ভর পৃথিবীর একাশি ভাগের একভাগ মাত্র, কাজেই মহাকর্ষ কম হওয়াতে তার জন্মলগ্ন সমস্ত বায়ুমণ্ডল বা গ্যাসই অল্প দিনের মধ্যে তাকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেছে,) তার শৈশবের সকল অবস্থাই প্রায় বর্তমান।

কাজেই যেমন মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে, তেমনি চাঁদে পৌঁছে আমাদের আসল কাজ হবে আমাদের পৃথিবীকেই আরো ভালো করে জানা।

তাছাড়া অবশ্য চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল না থাকাতে অন্য গ্রহাদি,বা সূর্য-নক্ষত্রলোককে নিরীক্ষণ করার অভূতপূর্ব সুবিধা। পৃথিবীতে বসে আমাদের টেলিস্কোপের বা যন্ত্রের দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করতে হয় আমাদের মাথার উপরের ঘন বায়ুমণ্ডলকে। সেজন্যেই অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দিরদের (অবজার ভেটরিদের) স্থাপন করা হয় ধূলিধূসর সহরের বাইরে উঁচু পর্বতের শীর্ষদেশে। তা সত্বেও দারুণ শক্তিশালী টেলিস্কোপেও (যেমন মাউন্ট প্যালোমারের ২০০-ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত) গ্রহাদির ছবি ঝাপসা হতে বাধ্য। তাদের দৃষ্টি বহুদূর অবধি (২০০ কোটি আলো বছর বা আরো অধিক) ভেদ করতে পারলেও আমরা মাত্র চার কোটি মাইল (আড়াই আলো-মিনিট দূরত্বে) মঙ্গলগ্রহে খাল আছে কি নেই, থাকলে তাদের আসল চরিত্র কি কিছুই সঠিক বলতে পারি না। একমাত্র বায়ু বিহীন চাঁদে বসেই অপেক্ষাকৃত অনেক কম শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যেও আমরা মঙ্গলগ্রহে খালের বা 'বৃহস্পতিতে' লাল দাগের বা ঐ ধরণের বহু প্রশ্নের সঠিক জবাব পাবো।

অধিকন্তু বায়ুশূন্য, কম মহাকর্ষের (পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ) চাঁদে পৌঁছে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু বিভাগেই যে নানারকমের অভূতপূর্ব নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ চালানো সম্ভব হবে, এমন কি জীববিজ্ঞানেরও কি নতুন

দিগন্ত উন্মোচিত হবে, তার সম্যক ধারণা ও সম্ভাবনা আমরা হয় তো আজ পুরো উপলব্ধি করতে পারি না।

অবশ্যই প্রকৃতির বিরুদ্ধে চিরন্তন যুদ্ধে সমগ্র মানবজাতি একজোটে নিযুক্ত হলেই মানুষের আসল ইতিহাসের কাজ সুরু হবে। তার পূর্বে, এঙ্গেলসের ভাষায়, মানুষের প্রাক্-ইতিহাস।

বিশ্বশান্তি সুস্থির ও নিশ্চিত করে বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ হবে নিশ্চয়ই দুনিয়া জুড়ে শোষণহীন সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু তার কাজ কি ইতি-মধ্যেই সুরু হয় নি, শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও? ১৯৫৭-৫৮ সালের স্নায়ু যুদ্ধের (কোল্ড ওয়ার) মধ্যেও কি পৃথিবীর ছেষট্টিটি দেশের প্রায় দশ হাজার বৈজ্ঞানিক একজোটে জল-স্থল অন্তরীক্ষ জুড়ে পৃথিবীকে আরো ভালো করে জানবার প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষে (International Geophysical Year) একযোগে মিলিত হন নি? আজকের মহাকাশ অভিযানেও এ পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশের বৈজ্ঞানিক, বিশেষ করে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউ-নিয়নে, শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্র কি বিস্তৃত হয় নি? মহাকাশে স্নায়ুযুদ্ধ নিয়ে গেলে সমগ্র মানবজাতির সমূহ বিপদ একথা উপলব্ধি করেই ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ইউনাইটেড নেশনসের একবিংশতিতম সাধারণ অধিবেশনে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর উদ্যোগে মহাকাশ আইনের খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। মহাকাশ অভিযান যে একমাত্র মানুষের কল্যাণের কাজেই ব্যবহৃত হবে, সেটা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই মেনে নিয়েছেন।

মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের মহত্তম অধ্যায় রচিত হচ্ছে ও হবে ত্রিমাত্রিক চতুর্মাত্রিক মহাকাশের আদিগন্ত মহাপ্রাঙ্গনে। আর সেই বোধ ও চেতনা নিশ্চয়ই আমাদের আরো উদ্বুদ্ধ করবে শোষণহীন বিশ্বসমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের মহাযজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডে। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের অগ্রগতি হার মানাবে আজকের মানুষের কল্পনাকে।

দিলীপ বসু

চিত্রপ্রসঙ্গ

শীতকালীন চারুকলা

শীতকালই প্রদর্শনীর মরশুম। আর্ট গ্যালারীগুলো খালি পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, কিন্তু ১৩৬৮ সালের সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে, এবারে কলকাতায় শেষের দিকে কয়েকটি বেশ উন্নতধরণের প্রদর্শনী হয়ে গেছে। অবশ্য বেশির ভাগই সম্মিলিত প্রদর্শনী। একক প্রদর্শনীর মধ্যে সুনীল দাশ, অনিলবরণ সাহা ও অনীতা রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য, এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠার দিকে চলেছেন, বিশেষ করে প্রথমোক্ত শিল্পীর কথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এই আলোচনা প্রধানতঃ সম্মেলন প্রদর্শনীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে অনিবার্য কারণে। যে তিনটি প্রদর্শনী নিয়ে আলোচনা করব, সেগুলি যথাক্রমে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস, গভর্ণমেন্ট কলেজ অফ আর্ট এণ্ড ক্র্যাফট্ এবং ইণ্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট এণ্ড ড্রাফটম্যানসিপ-এর বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনী।

এ্যাকাডেমীর ৩১-তম বার্ষিক প্রদর্শনী

গত বছরের তুলনায় এবছরের প্রদর্শনী যথেষ্ট উন্নত এবং আশাব্যঞ্জক। এবারের আর একটি বৈশিষ্ট্য, নির্বাচক মণ্ডলীর বিমূর্ত শিল্পের দিকে স্নেনদৃষ্টি। ফলত বিষয়বিমুক্ত একজিবিট এবারে ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া আঙ্গিক এবং ক্রাফট্সম্যানশিপের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে নির্বাচনের বেলায়। প্রদর্শনীর অর্ধেকই তেল রঙের ছবি। শিল্পীদের একপ্রেশনিজমের দিকে ঝোঁক দেখা গেছে। এবারের প্রদর্শনীর আর একটি বড়ো আকর্ষণ হোলেনের যোগদান। অনবদ্য টোনে ও সীমিতরেখায় অঙ্কিত 'ঐরাবত' তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তেলরঙের ছবি অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ বাদ দেওয়া যেতো। প্রথমেই যাঁদের কথা মনে আসে তাঁরা হলেন সুনীলমাধব সেন, আশিন মোদী, জিরান প্যাটেল, এম. এল. নাগর ও সরিৎ নন্দী এঁরা মিডিয়া এবং বিষয় দুই নিয়েই নিরীক্ষারত। ক্যানভাস বা বোর্ডের তল নিয়ে এঁরা রীতিমতো পরিশ্রম করেন। কন্‌ক্রিট, সিমেন্ট, মোম প্রভৃতি দ্বারা অ্যারেঞ্জেড সারফেসে (যাকে কোলাজ না বলে রিলিফ ইন পেনটিং বলা যেতে) এঁরা ভারতীয় শিল্পধারাকে প্রাচীন ও আধুনিক মাত্রিতে উজ্জীবিত করেন। সুনীলমাধব সেনের 'সিয়েস্টা' এবং আশিন মোদীর 'তবলো বা

জ্যোতির্ময়' ধ্যানমগ্ন সৃষ্টি। নাগর-এর 'সিটি'-ও আধুনিক জীবনচেতনাকে তীক্ষ্ণতর প্রতীকে বিধৃত করেছে। সুসময় মিত্রের জুট ও কটন ফাইবারে কোলাজ 'এভার মুভিং স্পিরিট অব ইণ্ডিয়ান সয়েল' গভীর ভাবদ্যোতনায় মূর্ত। মনে পড়ে যায় 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটির অন্তবিহীনতা। রথীন্দ্র মৈত্রের 'ড্রিম অফ ফ্রিডম'ও বলিষ্ঠ রেখা ও অফিস্ট কালার দিয়ে বিষয়কে তীব্রতায় উপস্থাপিত করেছে। মহম্মদ সৈয়দ বিনের 'ষ্টিললাইফ' (এবারের রাজ্যপাল-পদক প্রাপ্ত) প্রে 'ইমপ্রিম্যাচুরা'-তে সফল। অন্যান্যদের মধ্যে দয়ানন্দ 'এক্সপ্রেসিভ গড'(অ্যান্ড টিনাইজড),চেলাম্মার 'কম্পোজিস্যান'(ক্যালিগ্রাফিক), ধীরাজ চৌধুরীর 'মুরাল' (টোন), অক্ষয় দাসের 'বিশ্বরূপ' (এমবস্‌ড্), জি. কে. পণ্ডিতের 'হর্সেস ইন মো' (পোষ্ট ইম্প্রেশনিষ্টিক), শেষগিরি রাও-এর 'ডেড কাউ' (ম্যাট সারফেসে টোন) পরিতোষ ব্যানার্জির 'বস্তু' (ম্যাট), সুনীত বসু রায়ের 'অলনাইটি' (প্যাষ্টেল ও অয়েল), ও এন. এন. রায়ের 'সারা আলম পোস বার আওয়াজ হ্যায়' (টোন ও ইমপ্যাসটো) উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান পেন্টিং-এ রঙ্গনাথ রাউলের 'ম্যারেজ প্রোসেশান' ব্যতীত উচ্চাঙ্গের কাজই নেই। রাধাচরণ বাগচীর সিল্ক পেন্টিং 'মেঘদূতম', অজয় কুমার ঘোষের 'বসন্ত', নীলিমা দত্তের 'সংঘমিত্রা' ও আশিস সেনের 'জ্ঞান পরশে' মোটামুটিভাবে প্রশংসনীয়। জলরঙে ইন্দ্র দুগারের স্বাতন্ত্র্য আজও অম্লান। তাঁর 'মর্নিং মিস্ট্ অ্যারাউণ্ড কাঞ্চনজঙ্ঘা' তারই সাক্ষ্য। শিখা ব্যানার্জির 'গ্লিম্প্‌স্ অফ দ্য আন্‌নোন'-এ রৈখিক শৃঙ্খলা, গোপাল ঘোষের ল্যাণ্ডস্কেপ, গণেশ হালোই-এর পেন-ইংক ওয়াশ-এ 'পেনিট্রেশন্' প্রভৃতিও আকৃষ্ট করে। প্রনব মজুমদারের 'নিউবর্ন' (অতুল বোস-পুরস্কার প্রাপ্ত) অ্যাকশন্ পেন্টিং-এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে পেন্ এণ্ড ইংকে-র সূক্ষ্ম কাজও লক্ষণীয়।

গ্রাফিক্স বিভাগটিও গতবারের তুলনায় উন্নত। এই বিভাগে সোমনাথ হোড়ের অংশগ্রহণ বিভাগটিকে উন্নত হতে সাহায্য করেছে, এস.কে. রাও-এর ক্রোমোলিনো 'ব্যালে অ্যাট অপেরা' কলরং-এর গুণসম্পন্ন, বিরাময় রায়ের অ্যাকুয়াটিন্ট 'কম্পোজিশন. এন.কুতুব'মেৎসোটিন্ট' ও বাণী মিত্রের প্যারাটোনে 'এচিং' উচ্চমানসম্পন্ন, হরেন দাস সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। ভাস্কর্য বিভাগটি উন্নত হলেও বৈচিত্র্যবর্জিত। লোরা, ব্রি, অ্যাডকিন, লিপবিটস্, আর্চিপেংকো প্রভৃতি কিউবিস্ট ভাস্করদের প্রভাব দেখা যায় এঁদের কাজে, সেলিম মুন্সীর 'ভেজিল্যুস্ ফিউচার' (কনক্রিট), সুখেন ঘোষের 'আপলিফটমেন্ট-থ্রি', এস্. গোপালের

রিজিক 'হেডস টু', থারিওয়ালের 'অ্যাগনি এণ্ড এক্সটাসি' ও সি. পাণ্ডেয়ার ম্যাটিসিজমধর্মী কোলাজ 'ওভয়েভ' উল্লেখযোগ্য ! ভাটনগরের 'অ্যাঞ্জেল অব পিস' ম্যাটিসিজমের মৌলিক সৃষ্টি ভারতীয় শিল্পধারার বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। তবে এবারে কাঠ খোদাইয়ের কাজ বড়োবেশি।

গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট এণ্ড ক্রাফট

আর্ট কলেজের প্রদর্শনীর আকর্ষণ অন্তবিধ। প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায় এই প্রদর্শনীতে। এবছরেও তার ব্যতিক্রম দেখিনি, এদের প্রায় অর্ধেক শিল্পীই বিস্ময়কর পরিণতিপ্রবণতা লাভ করেছেন। এবছরে যাদের বিশেষভাবে চোখে পড়ল, তাঁরা হলেন অখিলেন্দু ভৌমিক ও কালিদাস কর্মকার (তেলরং ও গ্রাফিক্স), নিখিলবরণ সেনগুপ্ত (জলরং ও তেলরং), হিতেন্দ্রনাথ রায় ও গৌরীশঙ্কর মিত্র (বিজ্ঞাপনচিত্র). ফনিভূষণ জানা এবং শমিতা কুণ্ডু (ভাস্কর্য) , এছাড়াও অনেকের কাজ বেশ উচ্চমানের। জলরং, বাটিক-চামড়া ও বিজ্ঞাপনশিল্প বিভাগের কাজ হতাশাব্যঞ্জক। জলরং বিভাগে নারায়ণ দত্তের 'স্টীল লাইফ', অমল বেরার 'উড হাউস' (ওয়াশ), পার্থসারথি ঘোষের 'হাউস অন দ জেটি' ও বিনোদ দাসের 'ক্রেনস্ অ্যাট রেস্ট' আকৃষ্ট করে। তেলরং বিভাগে বিশ্বপতি মাইতির 'ক্যাথিড্রাল' (টোন ও ডিটেল), কাঞ্চন দাশগুপ্তের 'গার্ডেন' (মিডিয়া), অখিলেন্দু ভৌমিকের 'সানলাইট' (টোনাল সেন্স), ও কালিদাস কর্মকারের 'কম্পোজিশন ওয়ান' (এক্সপ্রেশনিজ্ম) উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগটির মান গ্রহণযোগ্য। গ্রাফিক্স বিভাগটি বোধহয় সবচেয়ে পরিণত। কলকাতায় সচরাচর এত প্রিন্ট দেখা যায়না, অচনা দত্ত চৌধুরীর 'লিথো' পিকাসোর 'গার্ল উইথ ম্যাণ্ডোলিন' এর দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুচিত মিত্রের এচিং, ব্রতেন্দ্র মিশ্রের উডকাট, কাঞ্চন দাশগুপ্তের অ্যাকুয়াণ্ট, আশিস দত্তের লিনোকাট, অখিলেন্দু ভৌমিকের কোমোলিনোগ্রাফ ও বাণী ঘোষের মনোলিথো অতি নিপুন শিল্পকর্ম। তরুণ মিত্র, নিখিলবরণ সেনগুপ্ত ও সেলিম আব্বাসের স্কেচ-এর ড্রয়িং বলিষ্ঠভাবাহী, কাঞ্চন দাশগুপ্তর ইণ্ডিয়ান মোটিফে 'ম্যুরাল' প্রশংসনীয়, ভাস্কর্য বিভাগে সুনির্মল ব্যানার্জির বাউল, ফণিভূষণ জানার টেরাকোটা (লিপসিৎস-প্রভাবিত), সোমেন চক্রবর্তীর প্লাস্টিক উডকাট, ও শমিতা কুণ্ডুর 'স্কুইরেল' (গুভোলো) চোখে পড়ে। অন্যান্য বিভাগ আদৌ চোখে পড়েনা।

ইণ্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট এণ্ড ড্রাফটস্‌ম্যানশিপ

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের প্রদর্শনী তেমন উচ্চমানের হয়নি, বরং সাধারণ শ্রেণীর জলরং বিভাগে সাফল্য দেখা গেলেও ওয়াস্ টেকনিকের আধিক্য পীড়াদায়ক। পরিতোষ দাসের 'ফিশিং', সরল ঘোষের 'রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং', গোবিন্দ পালের 'লোকোমোটিভ টু' ও দিলীপ পালের 'নৌকাগুলি' উল্লেখযোগ্য। ডিটেলের দিকে এঁদের দৃষ্টি প্রশংসনীয়। তেলরঙের বিভাগটি মোটামুটি উত্তীর্ণ বলা যায়। সরল ঘোষের 'আফটার দ্য ওয়ার' (মিশ্র আঙ্গিক) এবছরের একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। পূরবী বসুর 'পেন্টিং-টু' (ইমপ্যাসটো), জগৎ সিং ছাব্রের 'ষ্টিল লাইফ' (টার), জহরলাল সাহা পোদ্দারের ফিগারেটিভ স্টাডি 'তিন বিক্রেতা' (প্যালেট নাইফে) চোখে পড়ে। রথীন মিস্ত্রার পেন-ইংকে স্কেচটি প্রশংসনীয়। গ্রাফিক্স বিভাগ সবই মনোলিথো ও মনোলাইনো ধরণের কাজ। বিমল দাসের 'ওরা কাজ করে'ও বিশেষ যুগচৈতন্যে গভীর। স্বর্ণা খানের 'এচিং' উল্লেখ্য। ভাস্কর্য বিভাগে ভবতোষ শীলের কাজই চোখে পড়ে। তাঁর 'ফুটবল প্লে'র টেনশন্ ও রিদিমের ভারসাম্য মুগ্ধকর। প্ল্যাস্টিক সেন্স না থাকলে এ ধরনের কাজে সফল হওয়া যায়না। মুরের প্রথম দিককার কাজ এঁকে প্রভাবিত করেছে। বিজ্ঞাপন শিল্পবিভাগে পরিমল চক্রবর্ত্তী, রূপেন্দু চৌধুরী ও তৃপ্তি নন্দীর কাজ ভালো লেগেছে। নির্বাচনে এঁদের আরো সংযমী হওয়া উচিত।

চিত্রামোদী

'মানুষের অধিকারে' প্রসঙ্গে

'মানুষের অধিকারে' নিঃসন্দেহে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। সবচেয়ে সুখী হতাম যদি অবিমিশ্র সাধুবাদ জানাতে পারতাম এই নাটকের প্রযোজক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা সম্ভব নয়।

'মানুষের অধিকারে'র মূল কাহিনী হিউ প্যাটারসনের 'স্কটস্‌বরো বয়' নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এই শতকের তিন-এর দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে আলাবামা রাজ্যে এক আঠার বছরের নিগ্রো তরুণকে (উল্লিখিত বইটির লেখক) জনৈক শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। বলা বাহুল্য নিগ্রো নিপীড়ন ও বর্ণ বিদ্বেষই ছিল আসল কারণ। আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত এক আন্তর্জাতিক কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে এই মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থন করেন বিশ্ব-বিখ্যাত আইনবিদ লিবোভিট্‌জ। এই ঐতিহাসিক মামলা সারা বিশ্বে সাড়া জাগায়, কিন্তু বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের ধিক্কার ও ঘৃণাকে উপেক্ষা করে আলাবামার আদালত এই তরুণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। পরে অবশ্য ফেডারেল কোর্টের বিচারে মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়। কিন্তু সে অংশ এই নাটকের কাহিনীর অন্তর্গত নয়।

এই মূল আখ্যানটিকে কেন্দ্র করেই নাটকের বিন্যাস এবং এই বিন্যাসকে যদি এই কাঠামোর মধ্যেই সীমিত রাখা হত, তা হলে 'মানুষের অধিকারে'-কে একটি অসাধারণ পরিপূর্ণ শিল্পসৃষ্টি বলে অভিহিত করা যেতে পারত। কিন্তু তা হবার নয়। নাট্যকার উৎপল দত্ত এই মূল কাহিনীর সঙ্গে নান্দীমুখ ও ভরতবাক্যের কায়দায় দুটি মলাট জুড়লেন যার মূল বক্তব্য: (১) রাইফেল ছাড়া কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্তি সম্ভব নয় ও (২) শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাস মোকাবিলা করার জন্য কৃষ্ণাঙ্গ শক্তির সকীর্ণ সন্ত্রাসমূলক সংগঠন (লক্ষণীয় যে ব্ল্যাক পাওয়ার কথাটিকে সর্বজন দৃষ্টিগ্রাহ্য করার জন্য দেওয়ালে পোস্টার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে)। রাইফেল বা অস্ত্র দ্বারা সব শোষণ ও নিপীড়নের অবসান ঘটানো আজকাল বেশ কিছু লোকের প্রিয় তত্ত্ব—অন্তত: যতক্ষণ শুধু তা তত্ত্ব থাকছে ততক্ষণই। কখন কোন অবস্থায় এই তত্ত্বের প্রয়োগ জনগণের স্বার্থে যায় সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও এইটুকু বলা চলে, নিপীড়িত জনগণ একমাত্র শেষ অবস্থাতেই অস্ত্র

হাতে তুলে নেয়, দান করে নেয় না এবং পাশাপাশি এটাও সত্য যে প্রয়োজনের দিনে যারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয় না ইতিহাস তাদেরও ক্ষমা করে না।

যাই হোক, দ্বিতীয় বক্তব্য সম্পর্কেই আমার মূল আপত্তি। একথা সর্বজনবিদিত যে নিগ্রোদের উপর অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত রাখার জন্যই এত সামাজিক নিপীড়ন ও অসাম্য। তুলনামূলক ভাবে কম হলেও আজ আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ জনতার এক বিরাট অংশও এই অর্থনৈতিক নিপীড়নের শিকার। কাজেই বর্ণবিদ্বেষবিরোধী আন্দোলনকে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে মেহনতী মানুষের লড়াইএর সঙ্গে যুক্ত করাই নিগ্রো-স্বাধিকার আন্দোলনের সাফল্যের পথ। এর কোন বিকল্প নেই। শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসকে রুখতে গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ সন্ত্রাসকে ডেকে আনার অর্থ হলো বর্ণবিদ্বেষের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তারই শিকার হয়ে পড়া। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের মিলিত মোর্চাই আমেরিকার বুক থেকে চিরদিনের জন্য অর্থনৈতিক শোষণ আর সামাজিক অসাম্য দূর করতে পারে। আর সেই পথে যদি প্রয়োজন বোধে তারা রাইফেল হাতে তুলে নেয় তবে বোধহয় কারও কোনও আপত্তি হবে না। প্রস্তাবনা এবং উপসংহারের এই ব্যাপারটুকু বাদ দিলে যা বাকী থাকে তাই হলো মূল নাটক—দুটি দৃশ্যে বিভক্ত—আলাবামার একটি-রেল স্টেশনে নিগ্রো নিপীড়ন ও তারপরে আদালতঘরে এই মামলার শুনানি—একটি অসাধারণ নাট্যকর্ম। আঙ্গিকের জগতে বাড়াবাড়ি ঘটে বলে লিটল থিয়েটারের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ছিল, অন্ততঃ এই নাটক দেখে সে অভিযোগ আর করা চলে না। মঞ্চ, সঙ্গীত ও আলো সবই অদ্ভুত সংযত ভাবে ব্যবহৃত। স্টেশনের দৃশ্যের কথা তো ভোলা যায় না। অথচ কি নিরাড়ম্বর মঞ্চস্থাপত্য এবং আলোক প্রয়োগ। অভিনয়ের ব্যাপারে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের মাঝের দু একটি প্রযোজনায় যে শৈথিল্য চোখে পড়েছিল, এ নাটকে তার চিহ্নমাত্র নেই। বিশ্ববিখ্যাত এক আইনজ্ঞের চরিত্রের যথোচিত ব্যক্তিত্ব ও সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের শিশুসুলভ সারল্য অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন উৎপলবাবু। সরকার পক্ষের উকীলের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ সপ্রতিভ এক ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন যদিও উৎপলবাবুর পাশে তাঁকে মাঝে মাঝে বড় ম্রিয়মাণ লাগে। সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারক সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন লিবোভিট্‌জ-এর সহকারী ও হিউ প্যাটারসনের ভূমিকায় শিল্পীরা। শান্তনু ঘোষ এবার একটু একপাশে

পড়ে গেছেন। তুলনামূলক বিচারে মহিলারা কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ। শোভা সেন অভিনীত চরিত্রটি তো অলঙ্করণ মাত্র।

সবশেষে আবার বলি মলাট ত্রুটি বাদ দিলে 'মানুষের অধিকারে' নাট্যকর্মের জগতে একটি মূল্যবান সংযোজন। নিপীড়িত নিগ্রো মানবাত্মার পক্ষে একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। আমার বিশ্বাস, সুধী দর্শক নীর বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করবেন।

স্বর্ণেন্দু রায়চৌধুরী—

'গন্ধর্ব'-র 'একা নয়'

বাঙলা দেশের সাম্প্রতিক নাট্য-ডামাডোলের পাশে দাঁড়িয়েও যে-কটি অঙ্গুলিমেয় নাট্যগোষ্ঠী তাদের দায়িত্ব পালনের আন্তরিকতায় ব্রতী তাদেরই সতীর্থ হিসেবে 'গন্ধর্ব'-গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা চলে।

'গন্ধর্ব'-র নতুন নাটক 'একা নয়' ম্যাক্সিম গর্কির একই ভাবনাশ্রয়ী দুটি গল্পের নাট্যায়ণ। এ নাটকের বক্তব্য সম্পর্কে 'গন্ধর্ব' তাঁদের একটি প্রচার-পত্রে বলেছেন : 'একা নয় নাটকের প্রথমাংশে একক স্বাধীনতার দায়িত্বহীনতা ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের পরিণামের কথা প্রকাশ করা হয়েছে, পরবর্তী অংশে যৌথজীবনের বিজয়যাত্রার মধ্যে অনেকের শুভকামনায় একজনের আত্মত্যাগের আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। যৌথ চেতনার বাণীমুখর এই নাটকের মূল কথাই হল—একা নয়, বাঁচার পথ মানেই যুথবদ্ধতার পথ...'। তথাকথিত 'এলিয়েনেশন' বা একাবাদের শিকার হয়ে ওঠা যখন একটা সঙ্কটের চেহারা নিচ্ছে ঠিক সেই সময় এই নাটকের প্রযোজনা একটা মূর্ত প্রতিবাদ হিসেবেই গণ্য হবে।

প্রযোজনার ব্যাপারে 'গন্ধর্ব' বরাবরই নিরীক্ষামূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এ নাটকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নাটকের কাহিনীকে স্থান-কালের উর্ধ্বে একটি রূপকথার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়েছে, ফলে নাটকটি একটি অন্য 'ডাইমেনশন' পেয়েছে (এ ব্যাপারে নাট্যকার শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য)। এ ছাড়াও মঞ্চস্থাপত্যের প্রতীকী বিন্যাসে, 'ট্যাবলো,' 'ফ্রিজ এফেক্ট' ইত্যাদির সাহায্যে 'স্টাইলাইজড' অভিনয় পদ্ধতিতে ধ্বনি-প্রয়োগের নৈপুণ্যে, লোকগীতি ও লোকনৃত্যের ব্যবহারে আগাগোড়াই আধুনিক মনোভঙ্গির পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটি কম্পোজিশন (যেমন রুমকীর

মৃত্যুদৃশ্য অথবা বিটলার অপরাধজর্জর চিত্তে ছটফট করা কিংবা সুনন্দকে ছুরিকাহত করার উদ্যোগ) নির্দেশকের চিন্তামনস্কতার পরিচায়ক। নাটকের তুঙ্গমুহূর্ত (যেখানে ভীষণ ঝড়ের রাত্রে সবাই দিশেহারা, সুনন্দর ওপর কারুর আস্থা নেই) পরিবেশ রচনায় এবং অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকের মনেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দর্শকও কিছুক্ষণের জন্য দিশেহারা। এ-নাটকের প্রযোজনায় টিম-ওয়ার্কের প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। প্রতিটি অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন সে ব্যাপারে নাট্যনির্দেশক শ্রীদেবকুমার ভট্টাচার্যের দৃষ্টি সজাগ ছিল। অভিনয়াংশে প্রত্যেকেই আশ্চর্য সুমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। দেবকুমার ভট্টাচার্যের অভিনয় কোথাও কোথাও সোচ্চার হলেও বিটলার যন্ত্রণায় কাতরোক্তি, সুনন্দর আত্মহত্যা—এসবই আমাদের কাছে মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

এ-নাটকের কিছু কিছু নেপথ্যকাহিনী ভাষ্যপাঠের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও প্রত্যক্ষ কাহিনীর অবতারণা করা চলত বোধহয়। কেননা নাট্যগ্রন্থনায় বেশ বড় বড় লাফ (gallop) আছে। তাতে দর্শকের কাহিনীর পরম্পরা অনুধাবনে একটু অসুবিধে হয়। আমার মনে হয়েছে নাট্যরূপটির আর একটু মাজাঘষা প্রয়োজন। ঘনঘন কেটে এগোবার সময় 'হেইয়ো' শব্দের পুনরুক্তি আরও কম হওয়া প্রয়োজন—নচেৎ একঘেয়ে লাগে। নাটকের শুরু ও শেষে 'দেশলাই'-এর প্রতীক ব্যবহার একটু সিনেমেটিক—তবে শিল্পের খাতিরে তা উৎরে যায়। এ-সবই ছোটখাটো ত্রুটি এবং পরবর্তী প্রযোজনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্যেই এর উল্লেখ মাত্র। এবং এ-নাটকের বহুল প্রচার যে কোন নাট্যামোদী দর্শকেরই কাম্য।

মূল রচনাকার ব্যারিস গকি। রূপান্তর অরুণ মুখোপাধ্যায়। মঞ্চস্থাপত্য সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায়। দীপচিত্রণ শান্তনু দাস। সঙ্গীত প্রণব ঘোষ। নির্দেশনায় দেবকুমার ভট্টাচার্য। কুশীলব: অরুণা চট্টোপাধ্যায়, ভাস্বতী ভট্টাচার্য, কল্প বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীষা চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দাস, জগন্নাথ হালদার, শিবাজী সেন, সলিল বিশ্বাস, শান্তনু দাস, সুধাংশু মৈত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন রায়, বিশু চৌধুরী, বেবু ঘোষ, দেবকুমার ভট্টাচার্য, অমিতাভ দাশগুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, নীলাদ্রি বসু।

অর্জুন মিত্র

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আশু সমস্যা

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে দিল্লীতে দশটি পুঁজিবাদী দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই সরকারের তরফে পুঁজিপতিদের যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তার বিবরণ দেওয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক আশ্বাস দেশীবিদেশী পুঁজিপতিদের দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ভারতে কোন কোন সময় আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রভৃতি দেখা দিলেও সেসব দমন করার শক্তি ভারত সরকারের আছে অর্থাৎ বিদেশী পুঁজিবাদীদের ভারতে অর্থলগ্নী করতে কোন বিপদ নাই। ব্যাঙ্কের কাজ কারবার যাতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় চলতে পারে সেইজন্যই ব্যাঙ্ক সংশোধনী বিলে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে মোরারজী দেশাই উল্লেখ করেন ; সেই বিলে ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নামে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিয়ন্ত্রণের আইনগত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মোরারজী দেশাই এই সম্মেলনে ভাষণ দিতে যাওয়ার আগেই ইনডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স বিল পাশ হয়েছে এবং অত্যাবশ্যকীয় কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের ধর্মঘট বে-আইনী করার সম্পর্কে বিলও লোকসভায় তখন পাশ হওয়ার পথে। তার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মাত্র একদিনের প্রতীক ধর্মঘট দমন করার জন্য অর্ডিনান্স জারী করা, হাজার হাজার কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা এবং অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঢালাওভাবে নেওয়া হয়েছে। একদিনের প্রতীক ধর্মঘট দমনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এই সবের পর মোরারজী দেশাই দেশী-বিদেশী একচেটিয়া ধনিকগোষ্ঠীদের কাছে খুব জোরের সঙ্গেই সুপারিশ করেছেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, সকল দিক থেকেই ভারতবর্ষ বিদেশী পুঁজির অবাধ অর্থলগ্নীর এক উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। মুনাফা প্রভৃতি রপ্তানীতে কোন বাধা নাই, কর ও শুল্কের সুবিধা ক্রমে বাড়ানো হচ্ছে। পরিকল্পনা বর্জন করা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে শিল্পস্থাপনের অগ্রাধিকার ক্রমে বাতিল করা হচ্ছে। লাইসেন্স ব্যবস্থা প্রভৃতিতে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তা' ক্রমে শিথিল করা হচ্ছে। মোটের উপর দেশীবিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অতি মুনাফা অর্জনের পথে সকল রকম প্রতিবন্ধকতার অপসারণই কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান

নীতি। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দাবির কাছে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমে নতি-স্বীকার করে চলেছে। গত কয়েক বছরের তীব্রতর সঙ্কটের সময় শিল্প-মালিকদের সঙ্কটের সমস্ত বোঝা শ্রমিক শ্রেণীর উপরে চাপানোর চেষ্টা করেছে। লেঅফ, ছাঁটাই, লক-আউট, কারখানা বন্ধ করার হিড়িক দেখা দেয়। বর্তমানে সঙ্কটের তীব্রতা কিছু স্তিমিত হলেও, শ্রমিকশ্রেণীর উপর আক্রমণ স্তিমিত হয়নি। মালিকরা একদিকে যখন উৎপাদিত পণ্য বর্ধিত দামে বিক্রয়ের সুযোগলাভের জন্য নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার দাবি উঠিয়েছে, অন্যদিকে উৎপাদন খরচ কমানোর অভিযান শুরু হয়েছে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হল মজুরী-বাবদ খরচ কমানো—লোক ছাঁটাই করে, র‍্যাশনালাইজেশান বা অটোমেশন চালু করে। মজুরীবৃদ্ধি বন্ধ করাও মালিকদের অন্যতম প্রধান দাবি—তা প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরী দিতে অস্বীকার করেই হোক, বা মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা রদ করার দাবি করেই হোক। সেই কারণেই বেশ কিছুদিন থেকে সমস্ত বেতন বোর্ডগুলিতে নিম্নতম বেতন নির্ধারণে মালিকদের বাধাদান এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে বেতনবোর্ডের গৃহীত সুপারিশও কার্যকরী করা হচ্ছে না। অধিকাংশ কয়লাখনিতে বেতনবোর্ডের রায় কার্যকরী করা হয়নি। সংবাদপত্র শিল্পের বেতনবোর্ডের রায় কার্যকরী করার ব্যাপারও শিল্প আদালতের কাছে বিচারাধীন। বেতনবোর্ডে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এখন প্রায় সুদূর পরাহত। কেন্দ্রীয় সরকারও সেই একই নীতি অবলম্বন করেছে। প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার তার গুরুত্বকে লঘু করার এবং সে সম্পর্কে তাদের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করার চেষ্টা করে আসছে। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সালিশীতে পাঠানোর দাবিও অগ্রাহ্য করে। অন্যদিকে সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকারকে সঙ্কুচিত করার জন্য আইনী ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র পুরাপুরি প্রয়োগ সাম্প্রতিক সময়ের বৈশিষ্ট্য। সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি শ্রমিকবিরোধী বিল কয়েক মাসের মধ্যে পাশ করানো, জীবনবীমা কর্মচারী ইউনিয়নের স্বীকৃতি জোর করে বাতিল করা প্রভৃতি আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমে ক্রমে দেশীবিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থের কাছে নতি স্বীকার করছে এবং সেই সঙ্গে বেপরোয়াভাবে শ্রমিকবিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ করছে, শ্রমিকদের

ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ ক্রমে বাড়ছে। শ্রম সম্পর্কের ক্ষেত্রে ত্রিদলীয় যে কাঠামো গড়ে উঠেছিলো, তাকেও ভারত সরকার অকেজো করে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং মালিকশ্রেণীর এই যৌথ আক্রমণের মুখে কীভাবে শ্রমিক-কর্মচারীরা সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে সেইটাই বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামনে আশু সমস্যা। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সাম্প্রতিক প্রতীক ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতির চাপে শ্রমিক কর্মচারীদের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাকে এক মঞ্চে এনে হাজির করেছে। সরকারী ও বে-সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের মধ্যেকার এতদিনের কৃত্রিম ব্যবধান অনেকাংশে অপসারিত হয়েছে। শ্রমিক সাধারণের মধ্যে এই উপলব্ধি প্রবলতর হচ্ছে যে বিচ্ছিন্নভাবে, এককভাবে প্রতিরোধ লড়াইকে সফল করা দুরূহ, প্রায় অসম্ভব। সুতরাং শিল্প, কারখানা নির্বিশেষে ব্যাপকতম ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই এই আক্রমণ প্রতিরোধ করে সরকার ও মালিককে পিছু হটাতে পারে। এই উপলব্ধি আজ সমস্ত সংগঠনেই কম বেশি এসেছে। যার ফলেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ব্যাপক ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য গঠনের প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। ঐক্য গঠনে বাস্তব প্রয়োজন এবং বাস্তব সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হওয়া সত্ত্বেও, এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা সহজ হয়। রাজনৈতিক মত পার্থক্য, কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, সঙ্কীর্ণ মনোভাব ও কর্মপদ্ধতি এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধা। কিন্তু সুস্থ সচেতন প্রচেষ্টার দ্বারা এই ঐক্য গঠন সম্ভব, তার প্রধান কারণ বাস্তব পরিস্থিতির চাপ এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও মালিকশ্রেণীর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি।

টি. এন. সিদ্ধান্ত

ফরাসী দেশের মুদ্রা সঙ্কট

ফরাসী দেশে শ্রমিক ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক সঙ্কটের জের মিটতে না মিটতেই, দুনিয়া জুড়ে রব পড়েছে ফ্রান্সের মুদ্রা ব্যবস্থার নাকি নাভিশ্বাস উঠেছে। আবার বোধ হয় গেল-গেল অবস্থায় পড়েছে ফ্রান্স। কিছুদিন ধরেই ধনতান্ত্রিক তা-বড় তা-বড় দেশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেনে মুদ্রাসঙ্কটের শনি দৃষ্টি দিচ্ছিল। শক্ত রাষ্ট্রপতি ও দলের সুবিবেচনার ফলে আর ফরাসী দেশে নাকি এমন কিছুই ঘটতে পারে না—এমন কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছিল। আসলে

সঙ্কটের মূলে রয়েছে একচেটিয়া মূলধনতন্ত্র একথাটি অনেকের মনে ধরেও ধরতে চায়না। দ্য গলের শাসনে একধরনের বারফাট্টাই সব সময়েই দেখা গেছে, এখন দেখছি ফরাসী অর্থনীতির দ্রুত ধাবন্ত ঘোড়া খোঁড়াচ্ছে, এই বুঝি সওয়ার শুদ্ধ হুড়মুড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু ফ্রান্সের মুদ্রাসঙ্কট বলতে আমরা কি বুঝবো?

একেক দেশে টাকার একেক নাম। ফ্রান্সের টাকার নাম ফ্রাঁ। প্রতিটি দেশের টাকার একক সোনার ওজনে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আজকের দিনে কাগজে টাকার যুগে এক দেশের টাকা তো আর অন্যদেশে চলে না। তাই এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের দেনা-পাওনার হিসাব মেটাতে হলে, এক দেশের টাকার বিনিময়ে অন্য দেশের কত টাকায় তা শোধ করা সম্ভব সেটা দেখতে হয়। উভয় টাকার বিনিময় সোনার সরকারী দামের সাহায্যে সরকারী ভাবে নিরূপিত হয়। কিন্তু কোনদেশে যদি জিনিসপত্তরের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে, সোনার দরও বাড়বে। কিন্তু দেশের টাকাপয়সা যদি পুরনো সোনার দামেই বাঁধা থাকে, অন্য দেশ এই টাকার সরকারি দামে গাঁইগুঁই করতে পারে। দেনাপাওনা মিটিয়ে দিতে সোনার জন্য চাপ দিতে পারে। তা-ছাড়া কোন দেশ থেকে টাকা অন্য দেশে লগ্নি হতে বেরিয়ে গেলেও বিদেশের টাকার চাহিদা বাড়ে, ফলে তার দামও বাড়ে, দেশের টাকার দাম কমে যায়। আমদানী রপ্তানীর চেয়ে বাড়লেও, বিদেশী টাকার চাহিদা বাড়ে, দেশের টাকার দাম কমবার মত ঝোঁক দেখা যায়। যে দেশ প্রচুর আমদানীর উদ্বৃত্ত বছরের পর বছর চালিয়ে যাচ্ছে, দেশের মূলধন বিদেশের টাকায় বিনিময় হয়ে বিদেশী ব্যাঙ্কে-কারখানায় লগ্নি হচ্ছে, দেশের মধ্যে জিনিসপত্তরের দর ঊর্ধমুখী, তেমন দেশ সরকারী হিসাবে আগের মতই সোনার যে দাম বেঁধে দিয়েছে, সেই হারে দেশী টাকাপয়সার বিদেশের সঙ্গে হিসেব নিকেশ করতে গেলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা তা শুনবে কেন? তারা বলবে, সোনার দাম বাড়িয়ে দাও। তারা বলবে আমাদের এক একক মুদ্রার বদলে তাহলে তোমাদের আগের চেয়ে বেশি-একক মুদ্রা চাই। এর নাম ডিভ্যালুয়েশন। কিন্তু পাওনাদাররা ডিভ্যালুয়েশন করতে বললেই দেনাদারেরা সব সময় তা করে না। এতো আর ভারতবর্ষ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববাণিজ্যে বাণিজ্য-ঘাটতি চলেছে। সে দেশে জিনিষপত্তরের দাম বাড়ছে হু হু, কিন্তু ভারত থেকে কমদামে জিনিস কিনতে, বেশি দামে যন্ত্রপাতি বিক্রী করতে, আর ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে চাপ দিলো ডিভ্যালুয়েশন করো। যো হুকুম। রাতারাতি টাকার বৈদেশিক মুদ্রামূল্যের ঘাড়ে তরোয়ালের কোপ পড়লো। কিন্তু যে সব দেশ জাতীয় স্বার্থ বা স্বাধীনতার মর্যাদা বোঝে, তারা অমনভাবে যার তার কথায় যখনতখন ডি ভ্যালুয়েশন করে না। করার আগে দেখে আমদানী-রপ্তানীর পণ্যের চাহিদার-স্বরূপটি কেমন। ডি ভ্যালুয়েশন করলে, দেশী জিনিসের বিদেশী টাকায় দাম কমে যায়; ফলে বিদেশে জিনিসের চাহিদা বাড়ে। যদি এজন্য ডি-ভ্যালুয়েশনকারী দেশ আগের চেয়ে বেশি টাকার বিদেশে বিক্রি করে পায়, আমরা সে চাহিদাকে বলি স্থিতিস্থাপক চাহিদা। আর দাম কমলো, কিন্তু চাহিদা সামান্য বাড়লেও রপ্তানী করে আয় কমে গেল, তেমন ডি-ভ্যালুয়েশনে কাজ কি? আবার ডি ভ্যালুয়েশনে বিদেশী জিনিসের দাম বাড়ে। আর দাম বাড়ায় যদি আমদানীকৃত দ্রব্যের জন্য বিদেশী টাকায় ব্যয় কমে যায় তাহলে ভাল। কিন্তু দাম. বাড়লো, জিনিসপত্তর সামান্য কম আমদানী করলেও ব্যয় বেড়েই গেল, এমন ডি ভ্যালুয়েশন কি ভালো? তাই ডি-ভ্যালুয়েশন করার আগে দেশের সরকার লাভক্ষতির ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে।

কিন্তু বড় বড় মূলধনপতিদেশ অন্যদেশের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে চায়। লাভের জন্য প্রতিযোগিতাই যখন মূলধনতন্ত্রের অন্যতম ধর্ম, তখন এ-ব্যাপারতো ঘটবেই। ফ্রান্সের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চাইছে আমেরিকা বৃটেন পশ্চিম জার্মানী! গত ২২শে নভেম্বর এক কিলোগ্রাম সোনার দাম ছিল ফ্রান্সের সোনার বাজারে সাত হাজার ফ্রাঁ (১,৪০০ ডলার)। অথচ সরকারী দাম হল ৫,৫০০ ফ্রাঁ বা ১,১০০ ডলার। এ চাপে পাউণ্ডেরও দাম দাঁড়িয়েছে ২·৩৮ ডলার। ফ্রাঁ-ডলার-পাউণ্ডের তুলনায় পশ্চিম জার্মান মার্কের অবস্থা কিন্তু ঢের ভালো। তার দাম বেড়ে গেল, কিন্তু ১ ডলারের বিনিময়ে ৫·৩ ফ্রাঁ পাওয়া যেতে লাগলো—সরকারী দাম কিন্তু ৪·৯৩৭ ফ্রাঁ = ১ ডলার। ফ্রান্স কি ডি ভ্যালুয়েশন করবে? ফ্রান্সের এ ব্যাপারে তো বেশ বদনামও আছে। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৮, এই ত্রিশ বছরে ফ্রান্স পনেরো বার ডি ভ্যালুয়েশন ক করেছে, গড়ে দু-বছরে একবার।

১৯৫৮ সালে মুদ্রামূল্যহ্রাসের পর থেকে ফ্রান্সের অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হয়ে ওঠে। শিল্পজাত উৎপাদন প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বেড়ে যায়। ভিত্তিমূলক মূলধনের নবীনায়ন, টেকনোলজির প্রগতি, অর্থনীতির কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন এবং কিছু কিছু আধুনিকতম বিভাগের বিকাশ ফ্রান্সের এই সাফল্য

এনে দেয়। তাছাড়া ইন্দো-চীনের যুদ্ধের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে ও আলজিরিয়ার রক্তমোক্ষন থেকে মুক্ত হয়ে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের রণক্ষেত্রের উৎসাহী ঘোড়া ফ্রান্স দ্রুত ছুটের রাস্তা ধরতে চাইছিল। ফলে, ১৯৫৯ সালে ফ্রান্সের বৈদেশিকখাতে দেনাপাওনার ক্ষেত্রে ঘাটতি চলে গিয়ে বরং উদ্বৃত্ত হতে দেখা গেল। বিদেশী মুদ্রাতো বটেই, সোনার সঞ্চয়ও অনেকখানি বেড়ে যায়। গত বসন্তে এই সব জমার পরিমাণ ছ কোটি ডলারের অঙ্কও ছাড়িয়ে যায়। ফ্রান্স ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে বৈদেশিকমুদ্রায় নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ তুলে দিলো, ফ্রান্স বিদেশী মূলধন টানতে লাগলো। আর অর্থনৈতিক মর্যাদায় ফ্রান্স হয়ে দাঁড়ালো প্রায় এক নম্বর।

দেনাপাওনায় স্বাধীন, ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের প্রায় এক নম্বর দেশ ফ্রান্স এবার ডলার-পাউণ্ডের উপরে টেক্কা দিতে চাইলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বিনিময় মাধ্যম স্বর্ণপত্রের বিরুদ্ধে ফ্রান্স জেহাদ ঘোষণা করলো, বললো, 'আন্তর্জাতিক মুদ্রা একমাত্র সোনাই থাকবে।' তাছাড়া যেহেতু খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলছিল দ্রুতমূল্য বৃদ্ধি, সুতরাং সোনার দামও ডলারের অঙ্কে বাড়াতে হবে, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ডি ভ্যালুয়েশন করুক। এমনকি বৃটেনের মুদ্রামূল্যহ্রাসকৃত হারও ফ্রান্স মেনে নিলোনা। বললো, আরও খানিকটা পাউণ্ড ডি ভ্যালু করো। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে ডলার-পাউণ্ড স্টারলিংয়ের মোড়লির বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো ফ্রান্স। কিন্তু এর মধ্যে কি এমন হয়ে গেল যার ফলে ফ্রান্সের ফ্রাঁ-তে ঘুন ধরলো?

এদেশে-সেদেশে একচেটিয়া মূলধনপতিদের শ্রীচরণকমলেষু অর্থনীতিবিদরা ফ্রাঁর এই সাম্প্রতিক সঙ্কটের জন্য দায়ী করছেন গত বসন্তে ফ্রান্সের শ্রমিক ধর্মঘট ও রাজনৈতিক সঙ্কটকে। বলছেন, উৎপাদন হ্রাস, মজুরি ও পেনশন বাড়াবার ফলে উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে বিদেশে মূলধনের পলায়ন—এসমস্তই ফ্রাঁর সঙ্কটের মূলকারণ। কিন্তু এঁরা একবারও বলছেন না—একচেটিয়া মূলধনপতিদের মুনাফালোভের কথা, যে লোভ দশ বছরে জাতীয় সম্পদ পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও মজুরিবৃদ্ধির দাবিকে ঠেকিয়ে রাখে। গত দশ বছরে কোন কোন শিল্পে আসল মজুরি বাড়বার ঝোঁক দেখা দিলেও, কোন কোন অংশে নিদারুণ তা হ্রাস পেয়েছে। বেকারী পৌঁছলো পাঁচ লক্ষে।

মজুরি ও পেনশনের দাবি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রভৃতির দাবিতে গত

বসছে তাই নয়, ই এক শ্রমিক রাষ্ট্র-একচেটিয়া মূলধনতন্ত্রের যোগসাজসের অর্থনীতির ধাবন্ত রথের চাকা বন্ধ করে দিলো আক্রান্ত ধর্মঘটে। ফলে মালিকরা চোখে সর্ষে ফুল দেখে মজুরি বাড়ালো গড়পড়তা শতকরা চৌদ্দোভাগ। অবশ্য একচেটিয়া ব্যবসাদাররা ইতিমধ্যে জিনিসপত্তরের দাম বাড়িয়ে করলো আকাশ ছোঁয়া। ধীরে শ্রমঘণ্টা কমাবার ব্যবস্থা হল, ট্রেড ইউনিয়নগুলির ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কিছু দায়িত্ব তারা মেনে নিলো। একচেটিয়া মূলধনপতিদের রাষ্ট্রশক্তি এগিয়ে এলো মালিকদের দেয় অর্থের ঘাটতি মেটানোর কাজে সাহায্য দিতে। ফরাসী বাজেটে ঘাটতি হল এতে ১০৫০ কোটি ফ্রাঁ—মুদ্রিত নোটে এই ঘাটতি পুরণ করা হবে। আর ফলে হৈ হৈ করে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বেড়ে উঠলো। এতো গেল মূলধনপতিদের সেবাদাস রাষ্ট্রশক্তির সোজা সুজি দাম বাড়াবার চক্রান্ত, অন্যদিকে চলেছে ২৫০০ কোটি ফ্রাঁ অনুৎপাদক সামরিক ব্যয়, সঙ্গে আছে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের ব্যয়জনিত চাপ। সঙ্গে সঙ্গে কমন মার্কেটের অন্যান্য অংশীদার, বিশেষভাবে পশ্চিমজার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফ্রান্সের মূলধনপতিদের নিজেদের বাজার রক্ষা করার কাজে শক্ত সমর্থ হয়ে দেখা যাচ্ছে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের খাতে জমার ঘরে চলেছে টালমাটাল অবস্থা। রপ্তানীর চেয়ে বাড়ছে ঢের দ্রুতগতিতে আমদানি কিন্তু রপ্তানী বাড়াবার কাজে রাষ্ট্রশক্তি ততটা ক্ষমতা দেখাচ্ছেনা, যতটা তার চোখ রাঙানি দেশের শ্রমজীবী জনগণের প্রতি। চলেছে বৈদেশিক মূলধনপতিদের গলাকাটা প্রতিযোগিতার ছুরি। এছাড়া আছে বিদেশে মূলধন রপ্তানী। ১৯৬২-৬৭ সালে প্রতি বছর গড়ে ৪৮০ কোটি ফ্রাঁ মূলধন হিসাবে রপ্তানী হয়েছে বাইরে। ১৯৬৭ সালে রপ্তানী হয়েছে ২০০ কোটি ফ্রাঁর মূলধন। দেশের উৎপাদিকাশক্তি বিকাশে সাহায্য না করে এ মূলধন বিদেশে মুনাফা লুঠতে চলে গেছে। সুতরাং শ্রমিক আন্দোলনের চাপ নয়, বরং ঘাটতি ব্যয়, সামরিক ব্যয়, বৃহৎ আমদানীর অঙ্ক ও মূলধন রপ্তানী ফ্রান্সের মুদ্রার মূল্যকে নিচের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

কিন্তু আভ্যন্তরীন আর্থনীতিক অবস্থা এজন্য কতখানি দায়ী তা খতিয়ে দেখা দরকার। একথা ঠিক কিছু দিন আগে থেকেই ফরাসী ধনপতিদের এক বিশাল অংশ অন্যদেশে মূলধন পাঠাচ্ছিল। তা ছাড়া একদল ফাটকাবাজ ফ্রাঁ-র সরকারী ও বেসরকারী দামের ফারাকের জন্য বেশ কিছু মুনাফা লুঠছিল। ফ্রাঁ-র বৈদেশিক দাম স্থির রাখবার জন্য ফরাসী সরকার গত গ্রীষ্মেই

আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার থেকে ৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সোনা ও বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ কোটা থেকে তুলে নিয়েছিল। অন্যান্য দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ নেয় ফ্রান্স মোট ১৩০ কোটি ডলারের মত। গত বছর মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রায় ত্রিশ শতাংশ বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় হ্রাস পায়, সব রকম ঋণ ধরলে এই হ্রাসের পরিমাণ প্রায় চল্লিশ শতাংশ। বিদেশে মূলধন রপ্তানী রদ করতে ফ্রান্স যে সব নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা চালু করলো, তাতে ফ্রাঁর উপরে আস্থা আরও কমিয়ে দেয়। কিছুদিন পর এই বিধিনিষেধগুলি তুলে দিয়ে ফ্রান্স স্পষ্টই ডি-ভ্যালু করার অনিচ্ছা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে। এতে সোনা আর বিদেশী মুদ্রার ক্ষতি অনেকটা কমে যায়। ফরাসী উৎপাদন বাড়তে থাকে এবং বিদেশী বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অবস্থা ভালোর দিকে ফিরতে থাকে। আভ্যন্তরীণ আর্থনীতিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে গিয়েও আজ পশ্চিম জার্মানীর মার্কের ধাক্কা সামলাতে ফ্রান্স ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেননা বাজারে গুজব শীঘ্রই মার্কের মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হবে। গুজবের কিছু ভিত্তিও আছে। পশ্চিম জার্মানী মজুরী বৃদ্ধি রদ করে দিয়েছে, অন্য দিকে ফাটকাবাজদের ফ্রাঁ দিয়ে মার্ক কেনবার ফলে মার্কের দাম উর্ধমুখী। ফ্রাঁর যোগান চাহিদার চেয়ে অনেক বেড়ে যাওয়ার সোনা আর বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম জার্মানীতে চলে যেতে শুরু করে। গত নভেম্বরের সাত থেকে চোদ্দো তারিখের মধ্যে ফ্রান্সের জমা প্রায় ১০০ কোটি ফ্রাঁ হ্রাস পায়। পারীর বাজার এর ফলে ফাটকার ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে যায়। পারীর বাজারে গত বছর ১৮ই নভেম্বর ০.৫—০.৭ টন গড় কেনা বেচার হার ছাপিয়ে ৩.৫ টন সোনা হাতবদল হয়। বাজারে জোর গুজব উঠলো ফ্রাঁ ডিভ্যালু করা হবে। ওদিকে মার্কের চাপ ফ্রাঁর উপরে তীব্রভাবে বেড়ে ওঠে। পারী বনকে মার্ক রি-ভ্যালু করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এদিকে দেশের মধ্যে কিছু বিধিনিষেধ মানার বিধান দিয়ে জন কল্যাণকর কার্যকলাপ কমিয়ে মজুরির উপরে চাপ সৃষ্টি করে ফ্রান্সের একচেটিয়া মূলধন-পতিদের সরকার এই বিপদ থেকে নিস্তার চাইছে। অন্যদিকে বন্ কেবল রপ্তানীকর বাঁচিয়ে এবং আমদানী হার ১৫ মাসের জন্য শতকরা চারভাগ কমিয়ে ফ্রান্সের আবেদনের লোকদেখানো একধরণের মুখরক্ষা করেছে। পশ্চিম জার্মানীর মুদ্রার আক্রমণ তার কূটনৈতিক আক্রমণেরই একটি বিশেষ দিক— এই সুযোগে প্রায় স্বাধীন মতাবলম্বী, সাম্রাজ্যবাদী মহলের কালো ভেড়া ফরাসী দেশকে কব্জায় এনে, ইউরোপে পশ্চিমজার্মানীর যুদ্ধের পক্ষে যাতে প্ররোচনার

এলাকা বাড়িয়ে তোলা যায়। ইউরোপের স্থায়ী শান্তির ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষ পশ্চিমজার্মানীর যুদ্ধ চক্রান্ত এবং নয়া ক্যাসীবাদী কর্মপন্থা। কে জানে ফ্রান্সের এই মুদ্রাসঙ্কটের যুগে কোন সুবিধা বন পাম্পীর উপরে চাপ দিয়ে মানিয়ে নেবে।

শুভব্রত রায়

'স্বাধীন' সংবাদপত্র ও সাম্প্রদায়িকতার স্বাধীনতা

পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল অংশ ও সাধারণ বাঙালীর মনে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য অনেক সময়েই খুব পরিষ্কার নয়। কোন কোন প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মতে সাম্প্রদায়িকতা একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যাই নয়। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন ও সংগ্রামী মানুষের আন্দোলনে এই ঠুনকো সমস্যা ধুয়ে মুছে যাবে। তবে চোখ রাখতে হবে পাকিস্তানের দিকে। আসলে ঐ 'ইসলামিক রাষ্ট্রে'র দ্বারা হিন্দুরা ওদিকে নিগৃহীত হলেই, এ-দিকে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতটি বিষিয়ে ওঠে। অর্থাৎ এঁদের মতে আয়ুবশাহীই সব নষ্টামীর কেন্দ্র। আরো কেউ কেউ মনে করেন, দেশের শাসকগোষ্ঠী সাধারণ-মানুষের লড়াইকে ভেঙে দেবার জন্য সাম্প্রদায়িকতার আগুনে সময় মত ইন্ধন যোগায়। একমাত্র জনগণের চেতনাবৃদ্ধি যতদিনে না হচ্ছে, ততদিন প্রতি-বিধান করার কোন রাস্তাই খোলা নেই। প্রথম দল আসলে একচক্ষু হরিণ আর দ্বিতীয় গোষ্ঠীর আদর্শবাদিতা একধরণের ভাগ্যবাদমাত্র। ১৯৬৪ সালে পশ্চিম বাঙলায় দাঙ্গার সময় বামপন্থী মহলে দু-ধরণের মতই সোচ্চার দেখেছি। এ ছাড়াও আছেন যাঁরা মনে করেন যাই হোক না কেন, সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে হবে।

উত্তর ভারতব্যাপী জনসংঘ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকদের শক্তিবৃদ্ধি আজ নতুন করে গণতান্ত্রিক মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। সাম্প্রদায়িকতাকে যে রাষ্ট্রশক্তি দখল করার কাজে অস্ত্রহিসাবেও ব্যবহার করা যায়, আজ তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেশী একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠী এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী মূলধনপতিদের কাছে সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা, ভাষাবিদ্বেষ প্রভৃতি ক্ষমতা বিস্তার ও রক্ষা করার অস্ত্র-মাত্র। জনগণের পশ্চাদপদ অংশকে প্রভাবিত করে তারা কাজ হাসিল করতে চায়। সঙ্কীর্ণতার জিগির তুলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে আজ ভাঙতে চাইছে। নয়া ঔপনিবেশিকতার জোয়াল চাপিয়ে দিতে হলে আগে দেশটাকে

টুকরো টুকরো করা খুবই দরকার। অন্যদিকে 'হিন্দু-হিন্দী হিন্দুস্তানে'র জিগির তুলে তাদেরই এক বশংবদ শক্তি দেশটাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়ে, সাম্প্রদায়িকতার সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতায় পৌঁছতে চায়। এই রাজনৈতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়তে হলে উপযুক্ত সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন।

তা ছাড়া এর সঙ্গে সঙ্গে শিবসেনার মত স্বাধিকারপ্রমত্ত কংগ্রেসীদের সেবক সংগঠনের কথাও আমাদের বন্ধুদের জানা আছে।

এপ্রসঙ্গে কোটিপতিদের মুনাফা সংগ্রহ ও ভাবাদর্শ প্রচারের বাহন হিসাবে ব্যাপক প্রচারিত সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা স্মরণ করা দরকার। যথার্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা মানুষের বাঁচামরার সংগ্রাম সম্পর্কে এদের শাসক-শোষকের প্রতি পক্ষপাতমূলক ভূমিকার কথা আমাদের অজানা নেই। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারগুলি অর্জন ও রক্ষার সংগ্রামে নিযুক্ত সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ বদলে দিতে এরা সর্বদা এক-পা তুলেই আছে। 'হলদে সাংবাদিকতা' এক্ষেত্রে এদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তিলকে তাল করা, বা মিথ্যাকে নিরঙ্কুশ সত্যের রূপ দেওয়া, বা অর্ধ-সত্য বা অসত্যকে বাগাড়ম্বর দিয়ে উপাদেয় করে বিভ্রান্তিকর তাৎপর্যে প্রকাশ করার মত কাজে এরা সিদ্ধহস্ত। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯৬৮ সালের জুনমাসে কলকাতার এক বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রে তাদের কল্যাণীর নিজস্ব সংবাদদাতার একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। খবরে প্রকাশ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের কোন এক নামহীন গ্রামে নাকি হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়েছে। ১৪ লাইনে ডবল কলমে বড় হরফে ছাপা এই সংবাদটিতে সেই রমণী বা অপরাধীর কোন নামধাম নেই। তখন সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কমিশনের অধিবেশন চলছিল। শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী ঐ সংবাদপত্রের কাটিং ঐ কমিশনের সদস্য শ্রীভূপেশ গুপ্তকে পাঠিয়েছিলেন। কিভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ পরিবেশন করে জনগণের মন বিষিয়ে তোলা হয় তার উদাহরণ দিতে ভূপেশবাবু ঐ কাটিংটি কমিশনের কাছে পেশ করেন। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী বহু প্রস্তাবেরই বিরোধিতা করছিলেন কমিশনের অন্যতম সদস্য জনসংঘের সভাপতি শ্রীঅটল-বিহারী বাজপেয়ী। তিনিও সাংবাদিকতার নামে সাম্প্রদায়িকতার এই খুল্লা-খেলাতিতে সায় দিতে পারেন নি। আরো একটি উদাহরণ দিই। আমাদের সকলেরই জানা আছে, উত্তর বাঙলার গত বিধ্বংসী প্লাবনে বহু ভারতীয় নাগরিক পূর্ব পাকিস্থানে ভেসে যান; পূর্ব বাঙলার মানুষ যে আতিথেয়তা ও

মানবিকতার প্রমাণ দিয়েছেন তা আমাদের এখনও মনে আছে। ভেসে যাওয়া পশ্চিমবাঙলার মানুষ এ বাঙলা ও বাঙলার এই অস্বাভাবিক যাতায়াতের জন্য এই দুঃখের মধ্যেও বন্যাকে 'ভিসা পাশপোর্ট' নাম দিয়েছিল। সম্প্রতি কলকাতায় প্রকাশিত একটি ইংরাজি দৈনিকপত্রের চিঠিপত্র-স্তম্ভে শ্রীপুলিন দে মহাশয় লিখেছেন যে,গত১৯৫২সাল থেকে নবজাগ্রত পূর্ববঙ্গবাসী সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী হয়ে উঠেছেন তো বটেই, ১৯৬৪ সালে দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে তাঁরা সক্রিয় প্রতিরোধও করেছেন। আমরা জানি অনেকে প্রাণও দিয়েছেন। তা ছাড়া পূর্ব বাঙলার মানুষ স্বাধিকারের আন্দোলনে আজ সমস্ত প্রতিক্রিয়াকে দুর্বার প্লাবনে ভাসিয়ে দিতে চায়। এ দেশ ও দেশ উভয় দেশের লাভের গুড় যে-পিঁপড়ে খেতে চায়, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের ভারত-পাক তল্পি-দারেরা এতে বিচলিত ও হন্যে হয়ে উঠেছে। পশ্চিম বাঙলার সম্ভাব্য নির্বাচনের আগে হিন্দুমুসলিম নাগরিকদের মন পরস্পরের প্রতি যাতে বিষিয়ে তোলা যায়, উত্তর বাঙলার বন্যাকেও সে কাজে দেখছি ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জনৈক কংগ্রেসী ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও বর্তমান নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পারিবারিক সম্পত্তি ঐ একই বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় সুকুমার মতি বালকবালিকাদের জন্য রঙীন কার্টুনযোগে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে কেমন অদ্ভুত রকমের। ঐ কার্টুনগুলিতে দেখানো হয়েছে যে ১৯০২ সালে মিসেস এমাকে আফ্রিদিরা চুরি করে নিয়ে গেলে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর জনৈকা রেডক্রশ নার্সের সঙ্গে আফ্রিদি সরদারদের চুক্তি হয় যে ইংরেজরা আফ্রিদিদের আর আক্রমণ করবে না। তারাও মিসেস্ এমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। ফেরত তারা পাঠালেন, কিন্তু একজন ইংরেজ রমণীকে অপমান করার জন্য বিক্ষুব্ধ ইংরেজরা ঐ চুক্তিপত্রকে ছিঁড়ে ফেললো, উপরন্তু আফ্রিদিদের গ্রামের পর গ্রাম বোমাবর্ষণ করে ছিন্নভিন্ন করে জ্বালিয়ে দিলে। ঐ কার্টুনটি শেষে দেখাচ্ছেন একটি মেয়েকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাকে ঘিরে ফেজ টুপি মাথায় কয়েকজন মানুষ। নিচে মন্তব্য: আমরা শান্তিবাদী···আমরা কিছু বলবো না। জনৈকা গীতা বাগচি উত্তরবঙ্গের জলপ্লাবনে নাকি পূর্ব পাকিস্তানে ভেসে যান। ঐ কার্টুনটি প্রকাশ হবার কয়েকদিন আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রচারিত সংবাদপত্রে খবর বেরুচ্ছিল গীতা বাগচি কোথায়—ইত্যাদি। অর্থাৎ বন্যার সময়ের মানবিকতার কথাগুলি আর যেন মনে পড়লো না। যুক্তফ্রন্টের মারফৎ আমরা যা জেনেছি

তাতে মনে হয়, শত শত পশ্চিমবঙ্গবাসী বানভাসি নরনারীর মত হয়তো গীতা বাগচিকে আমরা মরজগতে আর কখনও ফিরে পাবো না। উত্তর বাঙলায় এই দুর্দৈবের জন্য দায়ী যে আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং সেচ ও নদী পরিকল্পনার অবৈজ্ঞানিক ও অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সে সম্বন্ধে ঐ পত্রিকাগুলি কিন্তু নীরব। ঐ কার্টুনিষ্টের তুলিও তখন পঙ্গু। আমরা বহু ভাই-বোনের মত গীতা বাগচিকে আর আমাদের মধ্যে জীবিতের তালিকায় হয়তো দেখবো না, কিন্তু ঐ বানের জন্য ঘৃণা ও তিরস্কারের ভাগীতো পূর্ববঙ্গবাসীরা হতে পারেন না! আসল দুঃকৃতিকারীরা এদেশেই বহাল-তবিয়তে আছেন, নির্বাচনের আগে গালভরা প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন। মনে পড়ছে, এই বন্যা ও ধসের অব্যবহিত পরে চিরনিন্দিত ও তথাকথিত বখে যাওয়া তরুণদের অকুণ্ঠ আপ্রাণ সেবাব্রত, সমতল ও পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন এবং পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের নরনারীর মধ্যে স্বাভাবিক ও মানবিক সহযোগিতা। মনে পড়ছে, বানভাসি হয়ে পূর্ব বাঙলায় ভেসে গিয়ে প্রত্যাবর্তনের পর জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীযোগীন রায় ও তাঁর স্ত্রীর কথাগুলি: 'ভারতের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে সীমান্তের অপর পারে পাকিস্তানের সরকার ও জনসাধারণ যে মহানুভবতা ও মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার।'

গত কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়ে' প্রখ্যাত বুদ্ধিবাদী শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ উত্তর বাঙলায় সেবাব্রতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তার কিছুটা বিবৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমাদের সঙ্গে দেখা হলো যাঁরা তিস্তার বানে ভেসে গিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁরা একবাক্যে পাকিস্তানের মানুষ ও সরকারের সুবুদ্ধির তারিফ করলেন। তাঁরা বানভাসি মানুষদের উদ্ধার করেছেন, তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেছেন, খাইয়ে-দাইয়ে রিলিফ ক্যাম্পে রেখে ফেরৎ পাঠিয়েছেন ভারতবর্ষে।"

পশ্চিমবঙ্গের ঐ সংবাদপত্রগুলির বিষোদগারের লক্ষ্য কি? আমরা আগেই বলেছি এতদ্ প্রতিক্রিয়ার হাতকে শক্ত করা মাত্র। ভারত ব্যাপী এই সব সংবাদ-পত্রগুলি ব্যাপক নরহত্যার জন্য ঘরে ঘরে ঘাতক তৈরি করার জন্য জঘন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। রুচি, সংস্কৃতি বা মানবিকতা এগুলি এদের কাছে কথার কথা মাত্র। এদের তাড়াটে লেখকদের মধ্যে ক্রমাগত নামী লোকজনের মুখও দেখা যাচ্ছে। দীপালি সংখ্যা অর্গানাইজারে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার দাবার যে

সুচতুর উস্কানি দিয়েছেন; এমন যাঁদের লেখা কোন সংখ্যালঘু নাগরিক লিখে নিস্তার পেতেন কি? এরই নাম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র? শ্রীনগরে অনেক কাগজ কালি ব্যয় হল জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার জন্ত। সে কি সবটাই ফাঁকি? এইসব পত্রপত্রিকার মালিকগোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি লঙ্ঘন করে প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিলেও সরকার নিশ্চুপ থাকেন কি করে? তাদের মধ্যে অনেকেই কি হবে এঁদের পেছনে আছেন? তাহলে তো সর্বেতেই ভূত। তাসখন্দ চুক্তির তৃতীয় বর্ষ পুর্তি উপলক্ষ্যে এসব কথা কি নতুন করে ভাবার সময় হয় নি?

শান্তিময় রায়

শিল্পনীতি ও স্থায়ী সরকার

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচনী প্রচারে একটা প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে. স্থায়ী সরকার কে করতে পারবে, কংগ্রেস না যুক্তফ্রন্ট? দু-পক্ষই নানা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন যে অপরপক্ষের স্থায়িত্বের কোনও নিশ্চয়তা নেই। কংগ্রেসের মধ্যে উপদলীয় কলহ না বেড়ে গিয়ে কমে যাচ্ছে এমন কথা কেউই বলতে পারেন না। অন্তদিকে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আদর্শগত অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও কোন কোন মৌলিক প্রশ্ন তাদের এক ফ্রন্টে মিলিয়েছে সেটা বোঝা দরকার। এই মৌলিক প্রশ্নগুলির কষ্টিপাথরেই যাচাই হবে সম্ভাব্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্ব। একথা বোঝা প্রয়োজন ঐতিহাসিক কারণেই যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠেছে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বর্তমান আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস, তাই ব্যর্থ কংগ্রেসের বিপ্রতীপে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কংগ্রেসবিরোধী দলগুলির দিকে নতুন নেতৃত্বের আশায় তাকিয়ে আছে। সাধারণ মানুষ আদর্শের কচকচি বোঝে না, তাই যে-সব পার্টিকে তারা জনদরদী বলে মনে করে, আদর্শের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের তারা এক করেছে এবং করবে।

কিন্তু একটা কথা যুক্তফ্রন্টের নেতাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। জনসাধারণ তাঁদের বিভিন্ন দলকে এক করেছে সত্য, কিন্তু প্রতিদিনের প্রতিটি কাজে সে ঐক্যকে টিকিয়ে রাখা ও তাকে সম্প্রসারিত করার জন্ত যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রয়োজন তা, জনসাধারণের কাছ থেকে আসবে না। তার জন্ত প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব। কেন্দ্রের অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ যদি না হত,

তাহলে এই নেতৃত্ব গত যুক্তফ্রন্টের সরকারের সময় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠার সময় পেত। ২রা অক্টোবরের ঘটনার পর সেই লক্ষণগুলিই স্পষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু একথা সত্য যে প্রথম থেকেই যুক্তফ্রন্টের পার্টিগুলি নিজেদের ঐক্য বজায় রাখবার জন্ম তৎপরতা, বিচক্ষণতা ও সাহস দেখান নি। তাই এবারে প্রয়োজন গোড়া থেকেই সাবধান হওয়া।

যুক্তফ্রণ্টের নেতাদের বুঝতে হবে এবং জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করতে হবে—তাঁদের ঐক্যের মূল ভিত্তি কি ? একদিকে দক্ষিণঘেঁষা ও সংস্কারবাদী কিছু দল অন্তদিকে কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট-পার্টি (মার্কসবাদী) ইত্যাদি—যাদের আদর্শ বামপন্থী ও বিপ্লবী—এই দুয়েরই মিলন হয়েছে যুক্তফ্রণ্টে। নিশ্চয় একথা বলতে হবে যে এমন একটা মূলনীতি আছে যার ভিত্তিতে উভয়বিধ আদর্শের লোকই একতাবদ্ধ হয়েছেন। সেই মূলনীতিটি কি ?

যুক্তফ্রণ্টের দক্ষিণঘেঁষা পার্টিগুলির দৃষ্টিভঙ্গি মূলত রায়তী স্বচ্ছল কৃষক ও ছোটখাটো কারবারীর দৃষ্টিভঙ্গি। এঁরা ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ চান না—কিন্তু জমিদারী-জোতদারী শোষণ, অর্থনীতিতে বৃহৎ পুঁজিপতি ও কালোবাজারীদের আধিপত্য—এ সবের অবসান দেখতে চান। কেননা, আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় স্বচ্ছল কৃষক ও ছোটখাটো কারবারীদের বিপদ শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে আসছে না; আসছে জমিদার, জোতদার, বৃহৎ পুঁজিপতি ও কালো-বাজারীদের কাছ থেকে। কংগ্রেস ক্রমশই এই শেষোক্ত শ্রেণীগুলির কুক্ষিগত হওয়ায় যুক্তফ্রণ্টের দক্ষিণঘেঁষা দলগুলি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

অন্তদিকে যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্গত বামপন্থী বিপ্লবী দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি হল শ্রমিক কৃষক নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিঃস্ব শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি। এঁরা পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করতে চান, উৎপাদনের উপকরণগুলি শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের মালিকানায় আনতে চান ও পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চান। কিন্তু এঁরাও জানেন যে কংগ্রেসকে নির্বাচনে পরাস্ত করে মন্ত্রিত্বের ক্ষমতা দখল করলেই একাজ সম্ভব হবে না। সমস্ত ভারতের অর্থনীতি, আমলাতন্ত্র, সৈন্য ও পুলিশবাহিনী এবং সংবিধানের আমূল পরিবর্তন ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তা সত্বেও, আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্ম এমন কতকগুলি কাজ করা প্রয়োজন যা যুক্তফ্রণ্ট সরকার নানারূপ সীমাবদ্ধতার

মধ্যেও করতে পারে এবং সে সুযোগ যখন রয়েছে তখন তাকে গ্রহণ করাই উচিত।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিস্থিতি কি ভাবে সৃষ্টি করা যায়? এ কথা মার্কসবাদী মাত্রেরই জানা উচিত যে শিল্পায়ন ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়েই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিকে শিল্পপ্রধান অর্থনীতিতে পরিণত করতে না পারলে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব; শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধতা ও সচেতনতা, যার ফলে ঐ শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিতে পারে, তা-ও অসম্ভব কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে। অবশ্যই এ কথা ঠিক যে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আগে সফল হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সুরু হয়েছে তার পরে। কিন্তু যেসব দেশে এই ঘটনা ঘটেছে তার বিশেষ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির কথা ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের দেশের যে বিশেষ পরিস্থিতি, তাতে আগে একটা রাজনৈতিক ও সামরিক বিপ্লব হয়ে যাবে এবং শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যে হাত দেবে, এমন নয়। বরং আমাদের দেশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হলো যে একটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি আংশিক ক্ষমতা হাতে পাচ্ছে এবং সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের উৎপাদিকা শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে। এই সুযোগ হাতছাড়া করলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে না। বিপ্লবের নামে কিছু চটকদারী বুলি ছাড়া যেতে পারে অবশ্যই।

দেশের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি বিপ্লবের কাজকে কেমন ভাবে সাহায্য করে, সে বিষয়ে বামপন্থী পার্টিগুলির মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতা নেই। অথচ, ভারতে উৎপাদিকা শক্তির যে সীমাবদ্ধতা, তাতে এই সব পার্টিগুলির সংগঠন ও শক্তি ক্রমশই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। গত খাদ্য সংকটের সময়ে আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা এই যে জোতদার-মহাজন-চোরাকারবারী চক্রকে দমন করা দুরূহ, যতদিন না পর্যন্ত এই চক্রের প্রভাব থেকে গ্রামের গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের বের করে আনা যাচ্ছে। কিন্তু এই চক্রের কাছে গ্রামের গরীবেরা যে ক্রমশই বাঁধা পড়েছে তার মূল কারণ হল গরীবদের জীবিকার অভাব। যদি দেশে শিল্পায়নের গতি দ্রুততর হত, গ্রামের গরীবেরা কল-কারখানায় চাকরি পেত, ছোটোখাটো

ব্যবসা চালাতে পারত, তাহলে তারা কখনোই জোতদারদের ক্রীতদাসত্বে বাঁধা পড়ত না। তখনই গড়ে উঠত শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন। জোতদারদের বিরুদ্ধে গ্রামের মেহনতী কৃষক সমাজের জোটও হত ক্রমশ শক্তিশালী। আর যতদিন শিল্পের বিকাশ অবরুদ্ধ থাকবে ততদিন গ্রামের গরীবদের সংঘবদ্ধ করার কাজও দুরূহ হবে, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দু একটা জোতদার-বর্গাদারে লড়াই হতে পারে কিন্তু গ্রামের গরীবেরা কোনও নির্ভরযোগ্য শক্তিতে পরিণত হবে না।

পশ্চিম বাঙলার ছোট খাটো শিল্প ও কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, বিদ্যুৎ, সেচ ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ, নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে যুক্তফ্রন্ট সরকার সব কিছু সীমাবদ্ধতা সত্বেও, অনেকটা দূর এগোতে পারে। এই সব কাজে সফল হলে যুক্তফ্রন্টের জনপ্রিয়তা বাড়বে। এটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হল দেশের অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তন আসবে। জোতদার-মহাজন-চোরাকারবারীর প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবে। বৃহৎ পুঁজির আক্রমণের বিরুদ্ধে ছোটখাটো শিল্পগুলি দাঁড়াতে পারবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো শ্রমিকদের সংখ্যা ও সংগঠনক্ষমতা বাড়বে। এই কারণেই ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেও এই সব কাজ করতে এগিয়ে এসেছে বিপ্লবী বামপন্থী দলগুলি। বর্তমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তাই স্বত্ববান কৃষক, ছোটখাটো কারবারী, গরীব ও ভূমিহীন কৃষক, নিঃস্ব মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকের স্বার্থে একটা মৌলিক ঐক্য রয়েছে—এক কথায় সে স্বার্থ হলো দেশের শিল্পায়ন ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ। এবং এই জন্যই মতাদর্শগত বিভিন্নতা সত্বেও বিভিন্ন দল আজ যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই ঐক্যের ঐতিহাসিক কারণ আছে। তাই এই ঐক্য ক্রমশই গড়ে উঠছে, উঠবে ও শক্তিশালী হবে। .

অন্যদিকে কংগ্রেসের, বিশেষ করে পশ্চিমবাঙলার কংগ্রেসের ভাঙনের মূল কারণ হলো এ রাজ্যের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটানোর তার শোচনীয় ব্যর্থতা। গত কুড়ি বছর ধরে পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেস ধীরে ধীরে জোতদার মহাজন আর চোরাকারবারীদের কুক্ষিগত হয়েছে। পশ্চিম বাঙলার শ্রমিকদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বিশেষ কিছু ছিল না; কিন্তু স্বত্ববান কৃষক ও ছোটখাটো শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তার যা কিছু প্রভাব ছিল, আজ কংগ্রেস তাও হারিয়েছে। সেচ ও সার, ঋণ ও কাঁচামাল সরবরাহ ইত্যাদির প্রতিটি ক্ষেত্রেই কংগ্রেস চরমতম দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে; জনসাধারণের টাকা

অসাধু কণ্ট্রাকটর, ঘুষখোর আমলা লুটেপুটে নিয়েছে ; জোতদার মহাজন আর কালোবাজারীদের অবাধ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে দেশের যারা উৎপাদক শ্রেণী অর্থাৎ শিল্পপতি, কৃষক থেকে সুরু করে শ্রমিক ও ক্ষেতমজুর পর্যন্ত সকলের কাছেই আজ কংগ্রেস বিরাগভাজন।

শুধু তাই নয়, যে পার্টি দেশের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের চাইতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অর্থ ও ক্ষমতার লালসাকে বড় স্থান দেয়, সে পার্টিও টিঁকতে পারে না। ব্যক্তিগত বা উপদলগত কলহ সব পার্টিতেই থাকতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর ও সাধারণ স্বার্থবোধ যতদিন থাকে ততদিন দলের ঐক্যটা বজায় থাকে। কংগ্রেস যদি পশ্চিম বাঙলার পুঁজিপতি শ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থটাও দেখত তাহলেও হয়তো তার ভাঙন আসতো না, কেননা একটা শ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থকে যে দেখত এবং সেই শ্রেণীই নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কংগ্রেসকে টিকিয়ে রাখত। কিন্তু লাইসেন্স আর পারমিট বিলি করার টাকায় যদি দল রাখতে হয় তাহলে পুঁজিপতি শ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থই উপেক্ষিত হয়, দেশের উন্নতি তো পরের কথা।

এই প্রসঙ্গে গত কুড়ি বছরে মহারাষ্ট্র আর পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেসী শাসনের তুলনা করা যেতে পারে। মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন কম শক্তিশালী ছিল না, বিশেষ করে সংযুক্ত-মহারাষ্ট্র-আন্দোলনের সময়ে। ঐ রাজ্যের শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থী নেতৃত্বের কথাও সকলের জানা। কিন্তু সারা ভারতে যখন কংগ্রেস ভাঙছে, তখন যে কয়েকটি মাত্র রাজ্যে কংগ্রেস স্থায়ী সরকার টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছে তার একটি হলো মহারাষ্ট্র। এর পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু বড় একটা কারণ হলো গত কুড়ি বছরে মহারাষ্ট্রেই ছোট-বড়-মাঝারি সব শিল্পেরই উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

১৯৫১ সালে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে রেজিষ্ট্রিকৃত কোম্পানির সংখ্যা ছিল ১৪২৮, ১৯৬২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩০৬০ অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি। আর ঐ সময়েই পশ্চিম বাঙলায় রেজিষ্ট্রিকৃত কোম্পানির সংখ্যা ১৪৯৩ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৫৪৫ অর্থাৎ শতকরা ৩ ভাগের মত মাত্র বেড়েছে। এই সব কারখানায় কর্মরত লোকের সংখ্যা মহারাষ্ট্রে বেড়েছে দ্বিগুণ আর পশ্চিম বাঙলায় বেড়েছে শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ। লগ্নীকৃত পুঁজির পরিমাণ মহারাষ্ট্রে বেড়েছে প্রায় চারগুণ আর পশ্চিম বাঙলায় বেড়েছে তিনগুণের মত।

পশ্চিমবাঙলার শিল্পায়নের একটা বড় প্রতিবন্ধক হলো পুঁজির অভাব।

ভারতের বিভিন্ন শিল্পে পুঁজি লগ্নী করার জন্য যে সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা আছে তাদের কাছ থেকে মহারাষ্ট্র যে পরিমাণ ধার পেয়েছে—পশ্চিম বাঙলা পেয়েছে তার থেকে অনেক কম। যেমন, ১৯৬৭ সালে জীবন বীমা কর্পোরেশনের মোট লগ্নীর শতকরা ৩১ ভাগ পেয়েছিল মহারাষ্ট্র আর পশ্চিমবাঙলা পেয়েছিল শতকরা ২৮ ভাগ। ঐ বছরেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট এ্যাণ্ড ইন্‌ভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনের মোট লগ্নীর শতকরা ৩৪ ভাগ পেয়েছিল মহারাষ্ট্র আর পশ্চিমবাঙলা পেয়েছিল শতকরা মাত্র ৮ ভাগ। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশনের লগ্নীর শতকরা ১৭ ভাগ পেয়েছিল মহারাষ্ট্র আর পশ্চিমবাঙলা পেয়েছিল শতকরা ১০ ভাগ।

পশ্চিমবাঙলার শিল্পায়নের পথে আর একটা প্রতিবন্ধক হলো কাঁচামালের অভাব। যে সমস্ত কাঁচামাল বিদেশ থেকে আসে তা কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভাগ করে দেন। ১৯৬৪ সালের হিসাবে দেখা যায় যে—

তামা—পশ্চিম বাঙলার যা প্রয়োজন তার শতকরা ১১·৫ ভাগ মাত্র বরাদ্দ হয়েছে। বরাদ্দের পরিমাণের ব্যাপারে ২২টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম বাঙলার স্থান চতুর্দশতম।

দস্তা—প্রয়োজনের শতকরা ৭ ভাগ মাত্র পশ্চিম বাঙলা পেয়েছে।

বরাদ্দের পরিমাণ হিসাবে এ রাজ্যের স্থান ১৬। সীসা—প্রয়োজনের শতকরা ২½ ভাগ মাত্র পাওয়া গেছে। পশ্চিমবাঙলার স্থান ১৬।

টিন—প্রয়োজনের শতকরা ১৭ ভাগ মাত্র পাওয়া গেছে। পশ্চিমবাঙলার স্থান ১১।

নিকেল—প্রয়োজনের শতকরা ½ ভাগ মাত্র পাওয়া গেছে। পশ্চিমবাঙলার স্থান সবচেয়ে নিচে।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নাই। টাকা ও কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে পশ্চিমবাঙলার বড় শিল্পগুলি যত না মার খেয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছোট ছোট শিল্পগুলি। তারা পথে বসেছে এবং যেহেতু এই শিল্পগুলিতেই শিল্প শ্রমিকদের বৃহত্তম অংশ কাজ করে সেইজন্য এ রাজ্যে বেকারীর সঙ্কটও তীব্রতর হয়েছে।

পশ্চিমবাঙলার এই শিল্প সঙ্কটে কার লাভ হয়েছে? লাভ হয়েছে যারা কাঁচামাল নিয়ে চোরা কারবার করে, আর যারা হুণ্ডীর কারবার করে। তাদেরই খপ্পরে গিয়ে পড়েছে পশ্চিমবাঙলার শিল্প তথা সমগ্র রাজ্যের মেহনতী

মানুষের ভাগ্য। এই চোরাকারবারী আর মহাজনেরা এ রাজ্যের কংগ্রেস দলকে এমন ভাবে কব্জা করেছে যাতে রাজ্যে শিল্পায়নের কোনও চেষ্টা করাই কংগ্রেস সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

পশ্চিমবাঙলার কংগ্রেসের এই ব্যর্থতা থেকে যুক্তফ্রন্টের শিক্ষা নিতে হবে। পরিষ্কার বুঝতে হবে যে পশ্চিমবাঙলার সমস্ত সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি হলো ছোটখাটো শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে তোলা এবং সম্প্রসারিত করা। যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাদের শিল্পনীতি আরও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষিত হওয়া উচিত। যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে যার যে সমালোচনাই থাক না কেন, এ ফ্রন্ট যে দুর্নীতিপরায়ণ নয়, চোরাবাজারী আর মহাজনদের পৃষ্ঠপোষণায় যে এ ফ্রন্ট দাঁড়ায়নি একথা সকলেই মানে। তাই জনসাধারণের আশা যে ফ্রন্টের সরকার এলে এ রাজ্যের অর্থনীতিতে নতুন প্রাণের সূচনা হবে।

সংবিধানের শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাঙলার শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান করতে পারেন। এ জন্য প্রয়োজন শুধু এ রাজ্যের শিল্পায়নের ব্যাপারটিকে অন্তরের সঙ্গে অগ্রাধিকার দেওয়া। কেননা, শিল্পায়নের মাধ্যমেই আজ কৃষক শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও ছোটখাটো ব্যবসায়ী, যারা জনসাধারণের শতকরা ৯৯ ভাগ, তাদের সকলেরই সাধারণ স্বার্থ রক্ষিত হয়। আর শিল্পের বিকাশ না ঘটলে এ রাজ্যে চোরাকারবারী, মহাজন আর জোতদার গোষ্ঠীরই অবাধ রাজত্ব চলবে, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অনিশ্চয়তার আবর্তে পাক খাবে।

কল্যান দত্ত

আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সারা উত্তর ভারতে ছোটখাট এক সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে। পাঞ্জাব থেকে বাঙলা দেশ—ভারতের এই বিপুল উত্তর খণ্ডে জনগণের সামনে ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সমস্ত কিছুর উপরে রায় দেবার সুযোগ আসছে ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনের মাত্র দু-বছর পরেই। লক্ষণীয় যে উত্তর ভারতের এই বিশাল অঞ্চলে রাজনৈতিক বল পরীক্ষায় নেমেছে বিভিন্নধর্মী শক্তিপুঞ্জ। গোটা ভারতের রাজনীতি বামে না ডাইনে মোড় নেবে, তারই যেন রাজনৈতিক বায়ুমানযন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে এই 'ছোট সাধারণ নির্বাচন'।

এ কথা আজ স্পষ্ট যে ভারত রাজনীতি-অর্থনীতির চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতের অর্থনীতিতে একচেটিয়া মূলধনপতিদের প্রতিপত্তির বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি—বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব এবং চাপ ক্রমশ গুণগত পরিবর্তন অর্জনের প্রয়াসী হয়ে উঠছে। ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মূল লক্ষ্যগুলিকে আজ আর কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের কার্যসূচীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। বহুবিধ কল্যাণকর লক্ষ্যের মধ্যে মোটা করে চিহ্নিত করছি পাঁচটিকে। যেমন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা শাসন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ধনীদরিদ্রের পার্থক্য হ্রাস, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ ও গোষ্ঠি নিরপেক্ষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি। ধাপে ধাপে এই লক্ষ্যগুলিকে চূর্ণ করা হয়েছে : আজ অবশিষ্ট আছে অনেক ক্ষেত্রেই শপথগুলির ছায়ামাত্র।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রভু হয়ে এসেছিলো এদেশের তাবৎ মূলধনপতি শ্রেণী। তাদেরই রাজনৈতিক দল ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা তাদের গরিষ্ঠাংশের অনুসৃত কর্মনীতির একদা অন্যতম ধর্ম ছিল। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে একচেটিয়া ও বৈদেশিক মূলধনের প্রতিপত্তির বিরোধী পরিকল্পিত অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সম্পদবৃদ্ধি প্রমুখ বহুবিধ কার্যাবলীর পক্ষে তাদের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিলো। একচেটিয়া মূলধনপতিদের গরিষ্ঠাংশ পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত মালিকানা-নিয়ন্ত্রণের তখনও বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে একচেটিয়া মূলধনপতিরা কংগ্রেসদলের মধ্যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া ব্যবসাদারদের পক্ষ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের হাতশক্ত করার জন্য কংগ্রেসের বাইরে থেকে কংগ্রেস মূলপতিদের একচেটিয়া মূলধনপতি, প্রাক্তন রাজন্যবর্গ ও সাম্রাজ্যবাদীদের সেবা করার স্পষ্ট পথ দেখিয়ে দিতে সমালোচনামূলক বিরোধী-দলের ভূমিকা নিয়ে স্বতন্ত্র দল গজিয়ে উঠেছে। এদের গায়ে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী পালিশও নেই। এরা হিংস্র, নৃশংস, ক্ষমতালিপ্সু, এরা গণতন্ত্রের ঘাতক বাহিনী। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তুলে পশ্চাদপদ জনসাধারণকে কুক্ষিগত করে জন সংঘ তার নোংরা হাত বাড়িয়েছে শাসনের ক্ষেত্রে। পার্লামেন্টে স্বতন্ত্র ও জনসংঘের জোট এক হতে চলেছে। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বেড়েছে, সাম্প্রদায়িকতার চাপ ক্রমবর্ধমান, বিদেশী মূলধনের দাপট ক্রমশক্তিশালী—এই পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারী মাসে হবে উত্তর ভারতের 'তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন'।

পশ্চিম বাঙলার দিকে তাকান। সারা ভারতের বিদেশী বেসরকারী মূলধনের পীঠস্থান এই। পশ্চিমবঙ্গ দেশীবিদেশী মোট মূলধনের প্রায় অর্ধেক এই রাজ্যে খাটছে। সুতরাং এ রাজ্যের রাজনীতি আরও জটিল ও ঘোরালো। কিন্তু উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেমন সাম্প্রদায়িক শক্তির অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা যায়, এরাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাবল্যে তা দুর্বল। এখানে তাই অন্যবিধ ভারত-পথিক রাজনীতির স্বপ্ন দেখছে মানুষ। ৯ই ফেব্রুয়ারী এই রাজ্য নির্বাচনিক রায়ও ব্যবহার করবে।

এই পশ্চিম বাঙলাতেই গণতান্ত্রিক ভারত-রাষ্ট্রের গতি কোন দিকে মোড় নিতে পারে তার অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন বরবাদ করে বেতনভোগী রাজ্যপালকে দিয়ে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এ রাজ্যেই কুৎসীত চক্রান্ত করা হয়েছে। এ রাজ্যেই মানুষ গণআন্দোলনের চাপে ক্ষমতালোভী পি. ডি. এফ কংগ্রেসী কোয়ালিশনকে হারিয়ে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ রাজ্যের উপরে দলীয় স্বার্থ ও একচেটিয়া মূলধনপতিদের স্বার্থকে জয়ী করতে চেয়ে গণতন্ত্রের মূলে কুড়োল মেরেছেন এ রাজ্যেই। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে সাংবিধানিক প্রশ্নকে জলন্ত করে তুলেছেন তাঁরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় অসহযোগিতায় ও সরকার ভেঙে দেওয়ার চক্রান্তে। ৯ই ফেব্রুয়ারী এর উত্তর দিতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা আজ ভারতে আর ঘুমন্ত সমস্যা নয়। একে খুঁচিয়ে তুলেছে যে গণতন্ত্র-ঘাতী-শক্তিগুলি, কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ তাদের দুধকলা দিয়ে দীর্ঘদিন পুষেছেন। ঘন ঘন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী প্যারা-মিলিটারী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও তার রাজনৈতিক বাহু জনসংঘের শক্তির বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ক্ষমতাও প্রয়োগ করা হয়নি। শিব সেনার মত প্রতিক্রিয়ার শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছে মহারাষ্ট্রে। বাঙলাদেশেও একদল 'আমরা বাঙালী', 'বাঙলা বাঁচাও' প্রভৃতির নামে প্রাদেশিকতার হাওয়া তুলে প্রতিক্রিয়ার কাজ হাসিল করার জন্য তৈরি হয়েছে। মুনাফাপতিদের দাক্ষিণ্যের ছিটেফোঁটার আশায় গজিয়ে উঠেছে এদল সে-পার্টি। সারা ভারত জুড়ে চলেছে হরিজন, পর্বতবাসী ও আদিবাসীদের উপরে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীস্বার্থের সংগঠিত আক্রমণ। ধর্মান্ধ, দুর্বোধ্যতাবাদী অন্ধকারের শক্তিগুলিকে বাড়িয়ে তুলেছে যে কেন্দ্রীয় শক্তি, তার বিপরীত অন্য পথের—প্রগতিশীলতার পথ দেখাতে হবে পশ্চিম বঙ্গকে।

ধনীদরিদ্রের ব্যবধান কি দূর হয়েছে? আমরা দেখছি—ক-বছরে পঁচাত্তরটি

একচেটিয়া ব্যবসায়ী পরিবার দেশের বিপুল সম্পদ কব্জা করে ফেলেছে ব্যাঙ্কে, শিল্পে, জমিতে, ব্যবসায়ে। দেখছি, গ্রামের জোতদার আক্রমণ—চালাচ্ছে ভাগচাষী, ক্ষেতমজুরের বিরুদ্ধে। শ্রমিক শ্রেণীর উপরে আক্রমণ চলেছে—ছাঁটাই-লে অফ-বেকারীর। আর এই বিপুল দারিদ্র্যের ভারত শ্মশানে একচেটিয়া ব্যবসায়ের আকাশচুম্বী সম্পদের মিনার গড়ে উঠছে।

পরিকল্পনা বরবাদ করে, মার্কিন নীতির কাছে মাথা নুইয়ে টাকার বৈদেশিক মূল্যমান হ্রাস করে এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের দাননীতির ও শিল্প বাণিজ্যে দমননীতির কাছে নতি স্বীকার করে কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী কেন্দ্রীয় শক্তি দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে বাণিজ্যমন্দার খড়্গ। আর পরিকল্পনার ধরণ-ধারণও তো আমরা জানি। বড়ো লোককে আরো বড়ো লোক করা হয়েছে আমলাতন্ত্রী উচ্চকোটির সহযোগিতায়। দেশের ব্যাপক উন্নতির ব্যবস্থা না করে, অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় দেশের সম্পদ যেমন বিনষ্ট হয়েছে, আবার তেমনি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মাথা বিক্রী চলেছে। অথচ দেশের মানুষের কর্মক্ষমতা, আভ্যন্তরীন সম্পদ-একচেটিয়া মূলধনপতিদের ক্ষমতা বিনষ্ট করে ও সাধারণ মূলধনপতিদের নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে পরিকল্পিত ব্যবহার এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে আর্থনীতিক সহযোগিতা ভারতকে দ্রুত আর্থনীতিক ও সামাজিক বিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারে। মূলধনতান্ত্রিক ফাঁদে ছটফট করছে ভারতের আর্থনীতিক বিকাশের লক্ষ্যগুলি। একে মুক্ত করার পথ দেখাতে হবে। ৮ই ফেব্রুয়ারী এসব কথা মনে রাখতে হবে।

আর ভারতের পররাষ্ট্রনীতির কথা? সে কথা বলাই বাহুল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, বৃটেনের চাপে মুক্তপক্ষ গুটিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি মার্কিন প্রভাবের খাঁচায় ঢুকছে। ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামে তার সহযোগিতা নেই, গণতান্ত্রিক জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত অনুপস্থিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানীর চাপে গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম বা কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য আদান-প্রদানও ক্ষীণ। অর্থাৎ এক কথায় কি অর্থনীতি কি রাজনীতি—ভারতের সমস্ত রাষ্ট্র কাঠামোর অন্ধিসন্ধিতে ঢুকে পড়েছে পশ্চিমের রক্তচোষা বাদুর, দেশের একচেটিয়া মূলধনপতি হায়নার দল। এই গণতন্ত্রের শ্মশান ভূমিকে ফুলেফলে শ্যামল করবার দায়িত্ব নেবে কে? দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার জোট? তাজোয়ে কংগ্রেসী পঞ্চায়েতপতির আগুনে কৃষিশ্রমিকের

রক্তমাংসে যারা গণতন্ত্রের শ্মশানকালীকে পিণ্ড যোগায়? যারা অন্ধ্রের হরিজন বালকের জলন্ত দেহের প্রদীপে সেই শ্মশানবাসিনীকে আরতি করে? রাঁচি ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানের নিরপরাধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্তে যারা শ্মশান তর্পণ করে?

পশ্চিম বাঙলায় যা হবে—গোটা ভারতে তারই পদধ্বনি দ্রুত হয়ে বাজবে। এ দেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-ছোট শিল্পপতির দল ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন দেখছে। এই সূর্যোদয়ের ভোরে নির্বাচনের সংগ্রামকে যেন আমরা ক্রুদ্ধ হঠকারিতায় বিপ্লববাদের অসহিষ্ণু উচ্ছ্বাসে দুর্বল করে না ফেলি। সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া মূলধনপতিদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্টের মোর্চার পতাকাতলে আজ সমবেত যুযুৎসব। বাম দক্ষিণের এই কুরুক্ষেত্রে আপনি কোন দিকে? পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে এই প্রশ্ন। ডাইনে না বাঁয়ে—সারা দেশের হৃদপিণ্ড তো বুকের বাঁ-দিকেই স্পন্দিত হচ্ছে।

তরুণ সান্যাল

আর্নোল্ড ৎসাইগ

আর্নোল্ড ৎসাইগ একাশি বছর বেঁচেছিলেন। সাহিত্যের ফসল ফলিয়েছেন প্রচুর, জীবনের শেষ ষাট বছর ধরে বিরতিহীন। তার সবটাই মহত্তম নয়। আরো বেঁচে থাকলে তাঁর হাত থেকে আরো কিছু পাওয়া যেত। কেননা একাশি বছর বয়সেও তিনি থামেন নি, মৃত্যু এসে জোর করে তাঁকে থামিয়েছে, যে-কারণে আর্নোল্ড ৎসাইগের মৃত্যু এতখানি শোকাবহ। তাই একাশি বছর বয়সে মৃত্যুর জন্যেও বার্লিনের মানুষ শোকাভিভূত হয়েছিল। ডরোথিয়া কবরখানায় ভিড় করে এসেছিল বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্মান সাহিত্যিকের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে। তবুও আর্নোল্ড ৎসাইগ বেঁচে রইলেন, যার মধ্যে বেঁচে রইলেন—যে সাহিত্যকর্ম, যে সংগ্রাম, এবং সর্বোপরি সাহিত্যিক বিবেকের যে সং দৃষ্টান্ত—তা শুধু বিপুল এক সম্পদ নয়, ঐশ্বর্যমণ্ডিত উত্তরাধিকারও।

আর্নোল্ড ৎসাইগ দেশত্যাগ করেছিলেন ১৯৩৩ সালে, হিটলার যখন ক্ষমতাসীন, জার্মানি যখন ফ্যাশিস্ট রাহুগ্রস্ত। ফ্যাশিস্টরা তাঁর বই পুড়িয়েছিল, তাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছিল। তবুও ফ্যাশিস্টবিরোধিতায় তিনি অবিচল ছিলেন, বরং হয়ে উঠেছিলেন আরো উদ্দীপ্ত, আরো প্রখর। তের বছর পরে ফিরে এসেছিলেন স্বদেশে যুদ্ধবিজয়ী বীরের মতো, বলা বাহুল্য, জার্মানির সেই অংশে যেখানে জার্মানির প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সমাজতন্ত্রের নির্মাণকার্য শুরু। হিটলারী যুদ্ধের শেষে বার্লিন তখন পুরোপুরি বিধ্বস্ত, তারই মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকেই বার্লিনের মানুষ বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। সে সম্বর্ধনা শুধু একজন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের উদ্দেশেই ছিল না, শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রে ফিরে এসে তিনি যে রাজনৈতিক ও নৈতিক বিবেকের পরিচয় দিয়েছিলেন তার উদ্দেশেও।

আর্নোল্ড ৎসাইগ অজস্র উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ লিখে গিয়েছেন। সাদা মানুষদের মস্ত যুদ্ধের কথা বলেছেন গ্রিশার উপাখ্যানে। সেখানে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রতি শুধু ধিক্কারই নয়, সোভিয়েত সমাজ-তন্ত্রের প্রতি অভিনন্দনও। শেষ উপন্যাস লিখে গিয়েছেন 'ট্রাউম ইস্ট টয়ের'

(স্বপ্ন হয় প্রিয়)। সেখানে তিনি নিজের মুখোমুখি : প্রগতিশীল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী নিজস্ব অভিজ্ঞতা পার হয়ে সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর পাশে দাঁড়াচ্ছে। স্বপ্ন তখন সত্যিই প্রিয়, যে স্বপ্ন সমাজতন্ত্রের, যে সমাজতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন স্বদেশভূমিতে, যে রূপায়ণের চিত্তভূমিতে তাঁর মনীষার আলোক বিকীর্ণ।

অমল দাশগুপ্ত

সম্প্রতি সুলেখক শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গীতশিল্পী শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবী ও রবীন্দ্র-পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমাদেবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমরা তাঁদের তিরোধানে শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁদের বান্ধব ও আত্মীয়পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি

বিখ্যাত মার্কিন লেখক জন স্টেইনবেক পরলোকগমন করেছেন। আগামী সংখ্যায় বিশেষ পঙ্‌ক্তিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে।

সম্পাদক

চাঁদি ও চাঁদ

পরিচয় এর সাম্প্রতিক কয়েকটি সংখ্যায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা থাকছে। আশা করছি অ্যাপলো-আট সম্পর্কেও থাকবে। বৈজ্ঞানিক আলোচনা যোগ্য ব্যক্তিরা করুন, অ্যাপোলো-আট সম্পর্কে আমার অন্য কিছু বক্তব্য আছে, আপনার সমীপে পেশ করছি, যদি মনে করেন এই বক্তব্য পরিচয়-এর পাঠকদের জানানো যেতে পারে তাহলে চিঠিটি প্রকাশ করবেন।

এই চিঠি লেখার আরো কারণ, অ্যাপোলো-আট সম্পর্কে যে-সব লেখা পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় চোখে পড়ছে তা একপেশে, ভাসাভাসা। অ্যাপোলো-আট গভীরতর যে প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়েছে তার কোন উল্লেখ সেখানে নেই। সংবাদপত্রের পাঠকরা জানেন, অ্যাপোলো-আট মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবার আগে এই অভিযানের যৌক্তিকতা ও সাফল্য সম্পর্কে বিশের কয়েকজন বিজ্ঞানী সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। চাঁদকে চক্কর দিয়ে অ্যাপোলো-আট ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছে বলেই এই সংশয় অপ্রমাণিত হচ্ছে না। বরং অ্যাপোলো-আট অভিযান থেকে কী ফল পাওয়া গেল তা দেখে, এখন আর সংশয় নয়, প্রত্যয়ের সঙ্গেই প্রশ্ন তোলা চলে : এই অভিযান কেন?

তিনজন নভশ্চর যতো কাছে থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠ অবলোকন করেছেন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আবদ্ধ জীব মানুষের পক্ষে তা অভূতপূর্ব। প্রথম হবার কৃতিত্ব অবশ্যই এই তিনজন নভশ্চরকে দিতে হবে। কিন্তু তারপরেই প্রশ্ন ওঠে, এ থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতি কতটুকু?

এই তিনজন নভশ্চর চাঁদকে দেখে বলেছেন, চাঁদকে দেখতে প্লাস্টার অফ প্যারিসের মতো। চাঁদ যে দেখতে এমনটিই তা তো আগে থেকেই জানা ছিল! কেননা অ্যাপোলো-আটের আগে আরো অনেকগুলো মনুষ্যহীন ব্যোমযান চাঁদের কাছ দিয়ে গিয়েছে, চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়েছে, চাঁদকে চক্কর দিয়ে ফিরে এসেছে, চাঁদের মাটিতে আলতোভাবে নেমেছে। এইসব ব্যোমযানের মধ্যে যে-সব যন্ত্রপাতি ছিল তার সাহায্যে তোলা হয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠের অজস্র আলোকচিত্র, সাদায় কালোয়, এমনকি রঙিনেও। চন্দ্রপৃষ্ঠের চেহারা কেমন তা জানতে বাকি ছিল না কিছু। এক্ষেত্রে প্রাণ হাতে নিয়ে, কাণ্ডজ্ঞান

বিসর্জন দিয়ে তিনজন নভশ্চরের অসমসাহসিক অভিযানের উদ্দেশ্য কি শুধুই বীরত্ব প্রদর্শন? তাই যদি হয় তবে এ-অভিযান অবশ্যই সার্থক। তবে অন্য একটি উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনের মাহাত্ম্য-প্রচার ও মহাশূন্যে নিরবলম্ব অবস্থান থেকে শাস্ত্রপাঠ। এ-উদ্দেশ্য কতখানি সার্থক ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানরাই তা বলতে পারেন।

আরো একটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তা হচ্ছে এই কথাটি বলতে পারা: দ্যাখ, আমরাই প্রথম চাঁদের দেশে মানুষ পাঠিয়েছি। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আমেরিকার মহাকাশ-গবেষণা সংগঠন 'ন্যাসা'-কে (NASA : National Aeronautics and Space Administration) অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল অর্থ মঞ্জুর করেছিলেন। কিউবার ব্যাপার নিয়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডির মুখে সে-সময়ে চুনকালি পড়েছিল। চাঁদে মানুষ পাঠাবার সংকল্প ঘোষণা এই চুনকালি মোছার একটা বাতুল প্রচেষ্টা ছিল মাত্র। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ভিয়েতনামের ব্যাপার নিয়ে চুনকালি মেখেছেন। তাই হয়তো ভাবলেন, বিদায় নেবার আগে চাঁদের আয়নায় নিজের মুখখানাকে চাঁদপানা করে দেখি ও দেখাই। ডীন রাস্ক যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি হন তো এই সুযোগ অবশ্যই নেবেন। গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজির চাল ঠিক করার চেয়ে মহাকাশে রকেট পাঠানোটা অনেক সহজ। ভিয়েতনামকে উদ্ধার করার চেয়ে চাঁদের দেশে অভিযান করাটা অনেক নিরাপদ। ভাড়া বা নিষ্ক্রমণ বেগ সংক্রান্ত হিসেবকে পুঁজিবাদী সঙ্কট স্পর্শ করে না। প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ তো ডীন রাস্কের আশীর্বাদ কুড়িয়ে ইতিমধ্যেই চন্দ্রযাত্রার রিজার্ভেশন বুকিং করতে শুরু করেছেন।

জিজ্ঞেস করি, প্রথম না হয় হওয়া গেল, কিন্তু তাতে কোন্ বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে? প্রথম হবার জন্যে এই বৈজ্ঞানিক বিবেচনাহীন তাড়াহুড়োই বা কেন? কার সঙ্গে প্রতিযোগিতা? সোভিয়েত ইউনিয়ন কি কোনোদিন বলেছে, এসো দিকি, কার কতখানি দৌড় দেখা যাক, কে আগে চাঁদে পৌঁছতে পারে? আসলে মহাকাশ-অভিযানে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই (বিশেষ করে গোড়ার দিকে) প্রথম হবার কৃতিত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের। আমেরিকার মহাকাশ-অভিযান শুরু হয়েছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রসূত মনোভাব থেকে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে। কেননা নইলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ইমেজটি ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা।

মার্কিনী মহাকাশ-অভিযানের কর্তারা গত তের বছর ধরে এই খাতে ব্যয় করেছেন ৩২ বিলিয়ন ডলার (১ বিলিয়ন=১০০০ মিলিয়ন)। এই অর্থের ৭০ শতাংশই ব্যয় হয়েছে মানুষকে মহাকাশে পাঠাবার জন্যে। অথচ মানুষ-গুলো মহাকাশে গিয়ে যে করবে তার কোনো গঠনমূলক পরিকল্পনা নেই। তাই চাঁদের দেশে গিয়েও তিনজন নভশ্চরকে শাস্ত্রপাঠ করে সময় কাটাতে হয়। মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণের চেয়েও স্যান্টা ক্লস অবিষ্কার মুখ্য হয়ে ওঠে।

তবে কেন এত তোড়জোড়, এত আয়োজন, এই বিপুল অর্থব্যয় ? পৃথিবী থেকে এক গ্যালন জল চাঁদের দেশে পাঠাতে হলেও খরচ পড়ে একলক্ষ ডলারের কাছাকাছি। এই তিনজন মানুষকে চাঁদের দেশে পাঠাবার জন্যে পৃথিবীর মাটি থেকে মোট ওজন তুলতে হয়েছে ২,৭৫০ টন। সেজন্যে রকেটে ধাক্কা তৈরি করতে হয়েছে সাড়ে-সাত মিলিয়ন পাউণ্ডের। খরচ পড়েছে এক বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। এই অর্থের সাহায্যে চাঁদের দেশে মনুষ্যহীন ব্যোমযান পাঠাবার পুরো একটি প্রোগ্রাম কার্যকর করা যেত। বিজ্ঞানী মাত্রই জানেন, গবেষণার জন্যে এক্স্পেরিমেন্ট রিপীট করতে হয়। এক্ষেত্রে চাঁদের দেশে মানুষ না পাঠিয়ে আরো কয়েকবার যন্ত্রপাতি সমেত মনুষ্যহীন রকেট পাঠাবার এক্স্পেরিমেন্টটি রিপীট করার প্রয়োজন ছিল। অন্তত চাঁদের দিকে এমনভাবে সরাসরি লাফ না মেরে প্রথম ধাপে পৃথিবীর কক্ষপথে মধ্যবর্তী একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলে সত্যিকারের একটি বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন সিদ্ধ হত। অর্থের বরাদ্দ যেখানে অফুরন্ত নয় সেখানে গবেষণার পর্যায়গুলো সুবিন্যস্ত হওয়া চাই। দ্যাখ, আমি কতবড়ো মস্তান হয়েছি, এই মনোভাব নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় না।

অর্থের বরাদ্দ অফুরন্ত তো নয়-ই, এখন বরং টানাটানির দিকে। বর্তমান দশকের গোড়ার দিকে ন্যাসা-র বাজেট ছিল ৪০০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৬৬ সালে ৬ বিলিয়ন ডলার। তারপরে তিন বছর ধরে কাটাছাঁট হয়ে চাঁদে মানুষ পাঠাবার বছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৪½ বিলিয়ন ডলারে। সামনের বছরে আরো কম হবার সম্ভাবনা। কাজেই অর্থ বাঁচাবার তাগিদটা জরুরি ছিল। শেষপর্যন্ত তিনজন নভশ্চরের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে অর্থ বাঁচানো হয়েছে।

ছিনিমিনি বইকি। যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনের প্রাক্কালে যে রকেটটি তিনজন মানুষ নিয়ে চাঁদের দিকে যাত্রা করেছিল তা মনুষ্যবহনের উপযোগী কিনা তার কোনো পরীক্ষা ইতিপূর্বে হয়নি। দুটি প্রাথমিক পরীক্ষা ছিল মনুষ্যবিহীন,

তারও একটি সফল, অপরটি ব্যর্থ। এ-অবস্থায় মানুষ সমেত [illegible] পাঠাবার আগে রকেটটিকে পৃথিবীর কক্ষপথে পাক খাইয়ে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন ছিল। তাতে খরচ পড়ত ২০০ মিলিয়ন ডলারের মতো। পরীক্ষাটি অন্তত একবার রিপীট করতে হত। তাতে আরো ২০০ মিলিয়ন ডলার। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে আরো ১০০ মিলিয়ন ডলার। সবটাই বাতিল করে দিয়ে ন্যাসা অর্ধ বিলিয়ন ডলার বাঁচিয়েছে।

যাই হোক, এমন প্রকাণ্ড একটা অবিমৃষ্যতার পরেও যে নভশ্চর তিনজন প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন এ ঘটনা অবশ্যই আনন্দের। প্রশংসারও, কেননা তাঁরা অসাধারণ সাহস, বীরত্ব, বিবেচনা ও ধীরমস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছেন। আর আমাদের গর্ব এইজন্যে যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে ধরা দিয়ে, চাঁদের অ-দেখা দিক চোখে দেখে আবার যাঁরা পৃথিবীতে ফিরে এলেন তাঁরা আমাদের মতোই মানুষ, দু-পায়ে হাঁটেন।

অমল দাশগুপ্ত

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চা[illegible]
বাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশি[illegible]